ছিলেন—ফকিরাণীর কথায় বিশ্বাস রাখিয়া একমাস পর্য্যন্ত নটে গাছ চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি গাছগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মিয়া ভাই চিনিসহ চিবাইয়া খাইতেন। বলা বাহুল্য একমাসেই তাঁহার দৈনিক মুন্ত্র ত্যাগ কালিন জ্বালা, আর শরীরের চাকা চাকা দাগ এবং হাত পায়ের ফুলা ও বিকৃত শ্রী দূর হইয়া গিয়াছিল।

আমি এই দিন হইতে বহু ঐরূপ প্রকৃতির রোগী শরীরে কাঁটানটে ব্যবহার করিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে উপকার পাইয়াছি। স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠকগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

---

## বিবিধ সংগ্রহ।

**মেদিনীপুরে জলের কল।**—মেদিনীপুর সহরে জলের কল স্থাপিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এজন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিতেছেন এবং এক লক্ষ টাকা ধার দিতেছেন। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা।

---

**প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসকের মৃত্যু**—প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক লেফ্‌টন্যাণ্ট্‌ কর্ণেল আর, বার্ড স্মি, আই, ই মহোদয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া অস্ত্র চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি বিলাত যাইতেছিলেন। ভারত ত্যাগের পূর্ব্বেই পথি মধ্যে তাঁহার রোগ বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওয়েলিংটন নামক স্থানের এক হাঁসপাতালে তাঁহার উদরে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।

---

**প্লেগের ঔষধ!**—পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্লেগ-পীড়িত স্থানের লোকদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছেন:—

১। বাড়ীর মধ্যে যেটী বড় ঘর ও যেখানে বায়ু নির্ব্বিঘ্নে চলাচল করিতে পারে, সেই ঘরে দরজা জানালা খুলিয়া রাখিয়া রোগীকে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া রাখিবে। যদি বৃষ্টি না থাকে, তবে ঘরের বাহিরে ছা- যুক্ত স্থানে রাখিবে।

২। তরল পদার্থই রোগীর একমাত্র পথ্য হইবে।

৩। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা জল পা- করিতে দিবে। তৃষ্ণার সময় যথেষ্ট শীতল জল পা- করিতে না দেওয়া অত্যন্ত ভুল।

৪। দুই ঘণ্টা পর পর রোগীকে এক কাঁচ্চা জ- এক ফোঁটা টিংচার আওডিন সেবন করাইবে। রো- যদি ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ খাওয়া- না।

৫। প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার রোগীর কুঁচ- উপর টিংচার আওডিনের প্রলেপ দিবে, অন্য কোন- দিবে না।

প্লেগ রোগ কেবল আওডিন প্রয়োগেই অনেক- প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে- লোকেরা আওডিন খাইলে তাহাদের আর প্লেগে- থাকে না। যে স্থানে প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থা- কোন লোকের যদি জর হয় বা শরীর খারাপ বো- তবে তৎক্ষণাৎ জোলাপ দিবে। দাস্ত হইবার- তাহাকে প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় ১ ফোঁটা টিংচার আ- এক ছটাক ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে। ই- প্লেগ নিবারিত হইবে। (সময়)

---

# স্বাস্থ্য-সমাচার

## সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু, এম, বি।

সপ্তম বর্ষ

১৩২৫

কার্য্যালয়

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ্ প্রেস
৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# সপ্তম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচি।


| বিষয়। | লেখক। | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| আলোচনা ... ... ... | ... | ১,৩৯,৪৯,৭৩,৯৭,১২১,১৪৫,১৬৯,১৯৩,২১৭,২৪১,২৬৫ |
| আকন্দ ... ... ... | শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ ... ... ... | ৬৮ |
| আয়ুর্ব্বেদই ভবিষ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদর্শ পথ প্রদর্শক ... | কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি,এ,এল,এম্,এস্ ... | ১৬৩,২০৮ |
| আদা ... ... ... | শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ ... ... | ১৯৭ |
| আহার সম্বন্ধে উপদেশ ... | শ্রীরাখাল চন্দ্র নাগ ... ... ... | ২২১ |
| ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ... ... | ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী ... ... | ১৩৮ |
| উষ্ণোদকের উপকারিতা ... | শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম্, এ, ... ... | ১৯৫ |
| করবী ... ... ... | ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ ... | ১৫ |
| কফি ... ... ... | ... ... ... ... | ১০৭ |
| কৃত্রিম উপায়ে শিশুপালন ও তাহার অপকারিতা | ... ... ... ... | ২৩০ |
| খাদ্য ও পরিপাক ... ... | ... ... ... ... | ২৮১ |
| গ্রীষ্মে স্বাস্থ্য-রক্ষা ... ... | ... ... ... ... | ২৫ |
| গ্রামের স্বাস্থ্য ... ... | ... ... .. ... | ৬৩ |
| গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা ... | ... ... ... ... | ২৪৪ |
| চিকিৎসা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা | ... ... ... ... | ২১৯ |
| জার্ম্মণীতে ছাত্র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা ... | ... ... ... ... | ৯৯ |
| জীবন রক্ষার্থ নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য ... | ... ... ... ... | ১৮০ |
| টাইফয়েড্ জ্বর ও তাহার প্রতিকার ... | ... ... .... ... | ১১৭ |
| ঢাকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ... | ... ... ... ... | ২৭৫ |
| ত্বক ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ ... ... | ... ... ... ... | ২০৫ |
| দেহের আবর্জ্জনা ও জল ... | ... ... ... ... | ৯০ |
| দন্ত ধাবন ... ... | ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী ... ... | ১৩৫ |
| ধূমপান নিবারণ আইন ... | ... ... ... ... | ২৬৭ |
| নিশ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ... | ... ... ... ... | ২৫৩ |
| নিদ্রার কথা ... ... | ... ... ... ... | ২৫৭ |
| পানীয়ের আবশ্যকতা ... ... | ... ... ... ... | ২৭৯ |
| প্রাপ্তিস্বীকার ... ... | ... ... ... ... | ২৪ |
| প্লেগ ও মূষিক ... ... | ... ... ... ... | ৩৭ |
| পরিমিত আহার ... ... | ... ... ... ... | ১৭৪ |
| বিবিধ সংগ্রহ ... ... | ২৩,৪১,৭২,১২০,১৪৪,১৬৮,২১৬,২৩৯,২৬৪,২৮৭, | |
| বাসক বা বাকস .. ... | ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ ... | ২৭ |
| বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্যউন্নতির ব্যবস্থা ... | শ্রীদিনেন্দ্র কুমার রায় ... ... ... | ৫৮ |
| বিজতাড়ক ... ... | ... ... ... ... | ৭১ |
| বঙ্গের স্বাস্থ্য ... ... | ... ... ... ... | ৭৪ |
| বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের অবনতি | ... ... ... ... | |
| বঙ্গের আবগারী আয় ... ... | ... ... ... ... | |

| বিষয়। | লেখক। | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| বর্ণ চিকিৎসা | ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বকসী | ১১৪ |
| বসন্তে মুষ্টিযোগ | ... | ২৭৩ |
| বার্দ্ধক্যের স্বাস্থ্যনীতি | ... | ১৪০ |
| বিশুদ্ধ বায়ু | ... | ১৬৬ |
| ভারতনারী ও যক্ষ্মা | ... | ৯২ |
| ভারতের কুষ্ঠরোগী | ... | ২৬২ |
| মশক ও মানুষ | শ্রীগদাধর দত্ত | ৩ |
| মশক সমস্যা | ... | ২৮৪ |
| মন ও শরীরের উন্নতি সাধন | ... | ২৬৮ |
| ম্যালেরিয়া | রায় বাহাদুর শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্‌. এ, বি, এল, | ২১<br>১০,২৯,৫২,৭৭,১০১,১২৫,১৫৯,১৭৭,২১০,২৬৩ |
| মানব দেহে শিল্প সৌন্দর্য্য | ... | ৯৪ |
| মাংসাহারে ফল | শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু | ১১২ |
| মাংস কি অস্বাভাবিক খাদ্য | ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত | ১৬২ |
| মাংস ভোজন | ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার ঘোষ | ১৪৭ |
| মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যরক্ষা | ... | ১৫০ |
| ম্যালেরিয়া তত্ত্ব | শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায় | ২৫৯ |
| মেদবৃদ্ধি বা স্থূলতা | ... | ১৯৯ |
| রোগী বীর | ... | ১৮,৮৫ |
| শরীর চর্চ্চা | শ্রীশচীন্দ্র নাথ মজুমদার | ১৭৩ |
| শৈশবে নিদ্রা | ... | ১৮৫ |
| শিশু পালন | ... | ২০১ |
| শরীর তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা | ... | ৬৪ |
| স্বাস্থ্য ও স্বরোদয় | শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র বকসী | ২৭ |
| স্বাস্থ্য কমিশনারের বক্তৃতা | ... | ৫১ |
| সুরা ও স্বাস্থ্য | ... | ৬৫ |
| সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা | ... | ১০৪ |
| সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন | শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র | ১২৩ |
| সভ্যতা ও সংক্রামতা | শ্রীবিমলেন্দু মিত্র | ১৭১ |
| স্বাস্থ্য কন্‌ফারেন্সে গভর্ণমেণ্টের বক্তৃতা | ... | ২২৩ |
| স্বাস্থ্য রক্ষায় আমাদের অমনোযোগিতা | ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত | ২৪১ |
| স্নায়ুবীয় উত্তেজনা | ... | ৪১ |
| হৃদরোগ ও তাহার গৃহ চিকিৎসা | ... | ২৪৭ |
| হুকওয়াম | ... | |



# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্‌।"

৭ম বর্ষ } বৈশাখ ১৩২৫ সাল { ১ম সংখ্যা।


## আলোচনা

**স্বাস্থ্য সমাচারের সপ্তম বর্ষ** :—ভগবৎ কৃপায় স্বাস্থ্য-সমাচার সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের প্রথমে আমরা সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ছয় বৎসর ধরিয়া স্বাস্থ্য-সমাচার দেশে স্বাস্থ্য-বার্ত্তা প্রচার করিয়াছে, ভবিষ্যতেও সাধ্যমত প্রচারে রত থাকিবে। যাঁহারা এযাবৎ স্বাস্থ্য-সমাচারের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, আশাকরি ভবিষ্যতেও তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

**সমাজ-সেবা-প্রদর্শনী** :—বঙ্গীয় হিত-সাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে কলিকাতায় যে প্রদর্শনী বসিয়াছিল, তাহাতে মানচিত্র, তালিকা, ম্যাজিক-লণ্ঠন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা দেশের অবস্থা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণে প্রদর্শনী দেখিয়া দেশের শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অবস্থা এবং এগুলির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর এবং দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে প্রদর্শিত জিনিষগুলি স্থায়ী ভাবে এক স্থানে রাখা হইবে। বঙ্গের প্রতি জেলায় এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ সুফল লাভের সম্ভাবনা। আমাদের দেশের সাধারণে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই উন্নতির পথে প্রধান বিঘ্ন স্বরূপ। সকল জেলায় এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে হিত-সাধন-মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

**দেশীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা** :—যুদ্ধের জন্য ডাক্তারী ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধনী-গণের এজন্য বিশেষ অসুবিধা না হইলেও সাধারণের পক্ষে রোগীকে উপযুক্ত ঔষধাদি দেওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। বহুলোকে ডাক্তারের নিকট ব্যবস্থা লইয়াও অত্যধিক মূল্যের জন্য ঔষধ ক্রয় ও সেবন হইতে বিরত থাকিতেছেন। অনেকের মতে সুলভ দেশীয় চিকিৎসা ও ঔষধাদির বিশেষরূপ প্রচলন না হইলে চিকিৎসার

অভাবে দেশের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটিবে। এখন হইতেই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। গত জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রী মহোদয়াও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছেন, "প্লেগ, কলেরা এবং সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেই কি গ্রামে, কি নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে লোকের গড়ে পরমায়ু এত কম, অর্থাৎ ২৩·৫ বৎসর; এই স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার অভাব তাহার অন্যতম। ইংলণ্ডে গড়ে পরমায়ু ৪০ বৎসর। নিউজিলণ্ডে ৬০ বৎসর। ব্যাধির চিকিৎসা-বিধানের প্রধান অসুবিধা এই যে পল্লী অঞ্চলেও বৈদেশিক চিকিৎসা পদ্ধতিই বিশেষরূপে উৎসাহ পায়, দেশীয় পদ্ধতি কোনরূপ সাহায্য পায় না। সরকারী হাঁসপাতাল, সরকারী ঔষধালয়, সরকারী চিকিৎসক, সমস্তই বৈদেশিক পদ্ধতির। আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানি ঔষধ, হাঁসপাতাল, ঔষধালয় ও চিকিৎসকগণ সরকারের নিকট অপরিচিত এবং ডাক্তারের পক্ষে বৈদ্যসংসর্গ অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তার থাকিলে দেশের স্বাস্থ্যের এত অবনতি ঘটিত না, বক্তৃতায় এইরূপ মতই প্রকাশ পাইয়াছে।

**মাদক সেবনে অনিষ্ট**ঃ—সুরা, সিদ্ধি, গাঁজা, অহিফেন, চরস এবং কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে ভারতবাসীর যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া, সংপ্রতি ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রথিত নামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—"বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা ও ভূয়োদর্শনের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে,—(ক) সুরা, কোকেন, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস বিষ। (খ) ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে ঐ সকল বিষ অত্যল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল মাদক দ্রব্য কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দীর্ঘকালের জন্য দূর করিতে পারে না। (গ) যাঁহারা সুরাপান বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, তাঁহারা মাদকসেবীদিগের অপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। (ঘ) সুরাপানের কুফল এক পুরুষ পরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে! (ঙ) দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সুরাপায়ী ব্যক্তিগণ অতি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (চ) সুরাপানের ফলে প্লেগ নিবারণ করিতে পারা যায় না। (ছ) ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মারোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে সুরাপায়িগণ অতি শীঘ্র ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। যাঁহারা সুরাপায়ী নহেন, ঐ সকল বীজাণু তাঁহাদিগকে সহজে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। (জ) সুরা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, অহিফেন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। (ঝ) এইজন্য আমরা ভারতবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রাদেশ ও সামাজিক প্রথানুসারে পানাহারের ব্যবস্থা করুন।"

"আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারি তালিকা দৃষ্টে দেশে মদ্যসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই মনে হয়। এ সময় মাদক সেবনের কুফল সম্বন্ধে পুস্তিকাদি যত অধিক প্রচার হয়, তত দেশের পক্ষে মঙ্গল।



# মশক ও মানুষ

লেখক—শ্রীগদাধর দত্ত

পানামা যোজককে পানামা খালে পরিণত করিতে যতগুলি বাধা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

পানামা খাল খনিত হওয়ায় পৃথিবীর লোকের যে কত প্রকারে উপকার হইয়াছে তাহা আমাদের মত পরপোষ্য জাতি কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না, যাহারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে ও সভ্যতায় পৃথিবী আছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, কেবল তাহারাই ইহার উপকারীতা বুঝিতে সক্ষম। সুয়েজ খালের সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে, সেইজন্য ইহার গুরুত্ব আমরা কিছু অবগত আছি। সুয়েজ খাল ইউরোপবাসীর বিশেষতঃ ইংরেজের যেরূপ আবশ্যকীয়, পানামা খাল সমগ্র পৃথিবীবাসীর বিশেষতঃ আমেরিকাবাসীদের তদপেক্ষা বহুগুণে আবশ্যকীয়। সেইজন্যই পানামা খাল এত আয়াস স্বীকার করিয়াও খনন করা হইয়াছে।

স্যাকসন মিলস্ পানামা খালের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে, মশক ও মানুষে যে ভীষণ সমর হইয়াছিল এবং অতি ক্ষুদ্র হইলেও মানুষের এই ভয়ঙ্কর শত্রু মশককে যে অবশেষে মানুষের কৌশলের নিকট পরাজিত ও সবংশে লুপ্ত হইতে হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ব্যয়সাপেক্ষ মশক-যজ্ঞের পর আর সেখানে ম্যালেরিয়া কিম্বা পীতজ্বর দেখা, দেয় নাই। আশা করি আমাদের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে এ সংবাদ অপ্রীতিকর হইবে না।

"পানামা খাল খনন করার প্রারম্ভ হইতেই আমেরিকানদের নিকট এমন একটী গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইল যাহার সমাধানের উপর ইহার সাফল্য কিম্বা নিষ্ফলতা নির্ভর করিতেছিল। পানামা যোজকে ফরাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কেবল মশকের নিদারুণ উৎপাতে তাহা টিকিতে পারে নাই। যদি আমেরিকানদের এই ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা না থাকিত, তবে এই মহোপকারী কার্য্য কিছুতেই সমাধা করা যাইত না। ফরাসীরা সুন্দর সুন্দর হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইয়া ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরাক্রান্ত রোগীদিগকে অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করাইত। কিন্তু ফরাসীরা ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর সংক্রামিত হওয়ার কারণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় তাহারা এই উভয় প্রকার জ্বরের প্রতিষেধক ও উচ্ছেদ সাধন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অক্ষম ছিল। তখনও তাহাদের বিশ্বাস ছিল জলাভূমি উদ্ভূত বিষাক্ত বাষ্পই ম্যালেরিয়ার কারণ। আকাশে যে সাদা সাদা মেঘ দেখা যাইত, ফরাসীরা উহাদিগকে "শ্বেত-মৃত্যু" নামে অভিহিত করিত। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, যেখানে কারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতা, সেখানে চিকিৎসা নৈপুণ্য কিছুই করিতে পারে নাই, কাজেই ফরাসীদের উদ্যম সফল হয় নাই। এই রোগে তাহাদের হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মার্কিনবাসীরা যখন পানামা খনন করিবার ভার লইলেন, তখন হইতেই এই রোগের প্রকৃতি ও ইহার সংক্রমণ হওয়ার গুপ্ত-রহস্যের উপর বিজ্ঞান কতকটা আলোক পাত করিয়াছে। বিজ্ঞান ও ভৈষজ্যতত্ত্বই পানামা খননের সাফল্যের প্রধান কারণ। যদিও এই চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণের নাম পানামার সাফল্যের সহিত স্পষ্ট সংশ্লিষ্ট নাই, তথাপি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তাঁহাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ ও আবিষ্কারের প্রতি সম্মান দেখাইতে ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। ম্যালেরিয়ার কারণ যে বিষাক্ত

বাষ্প নয়, কিম্বা স্পর্শ-সংক্রামকও নয়; কিন্তু এই জ্বরাক্রান্ত রোগীকে দংশন করিয়া একরূপ মশক (Anopheles Mosquito) সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে যে ঐ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, এই আবিষ্কারের প্রথম সম্মান মেজর (এক্ষণে সার) রোনাল্ডের প্রাপ্য। তিনি পূর্ব্বে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে ছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎসর তাঁহার জীবন এই আবিষ্কারের জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি নিয়মিত পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, মানুষের রক্তমধ্যে একরূপ জীবন্ত বীজাণুর বিদ্যমানতাই ম্যালেরিয়ার কারণ; এনোফিলিস্ জাতীয় মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া এই জীবন্ত বীজাণু নিজ উদর মধ্যে লয় এবং ঐ মশা যদি কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তখনই ঐ জীবন্ত বীজাণু এই সুস্থ ব্যক্তির রক্তকণিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জ্বরোৎপাদন করে। মশা যে পর্য্যন্ত রোগীকে না দংশন করে সে পর্য্যন্ত উহার দংশনে জ্বর হইতে পারে না। এই মতের সারবত্তা ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী কর্ত্তৃক মেজর রস্, সুয়েজ খালের তীরে দশ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত ইশমাইলিয়া বন্দরের ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সামান্য নগরে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। এই নূতন আবিস্কারের উপর স্থাপিত নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি এরূপ কার্য্যকারী হইয়াছিল যে, তিন বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর তথা হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। পোর্ট সৈয়দেও এইরূপ হইয়াছিল।

যদি ম্যালেরিয়ার কারণ মশক দংশন হয়, তবে পীতজ্বরও এই কারণেই হয়, এ অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। মশককে পুনরায় ভয়ানক সন্দেহের চক্ষে দেখা যাইতে লাগিল। স্পেনের সহিত যখন আমেরিকার যুদ্ধ হয়, তখন হইতে এই পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হয়। কারণ মার্কিন সৈন্য মধ্যে এই রোগের ভয়ঙ্কর আক্রমণ হয়। ডাক্তারেরা এই রোগের কোনই প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় তাঁহাদের চিকিৎসা কেবল পরীক্ষার সামিল স্বরূপ হইতে লাগিল। ওয়ালটার রিড্, জেমস্ কেরল, লেজিয়ার ও এরিস্টাইডিস্ এগ্রামান্টি নামক চারি জন সৈন্য দলভুক্ত ডাক্তার দ্বারা একটী অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত চারিজন ডাক্তারের দুই জন নিজ শরীরের উপর পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

এনোফেলিস্ হইতে ভিন্ন ষ্টেগোমিয়া (Stegomyia) নামক মশক দ্বারা ডাক্তার কেরল নিজ শরীরের উপর দংশিত হইলেন। তিনি অচিরে পীতজ্বর দ্বারা ভয়ানক ভাবে আক্রান্ত হইলেন। এমন কি তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ছিল না। তৎপর ডাঃ লেজিয়ার পীতজ্বর হাঁসপাতালে একটা মশককে তাহার হাতের উপর দংশন করিতে দিলেন। চারি দিনের মধ্যে তিনি এরূপ উৎকট পীতজ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। যদি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও মানব জাতীর হিতের জন্য কেহ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইনি তাঁহাদের অন্যতম। এই সব পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হইল যে ম্যালেরিয়ার ন্যায় পীতজ্বরও মশক দংশন সম্ভূত। কিন্তু ইহা এখনও অনিশ্চিত রহিল যে, একজন রোগীকে কতক্ষণ দংশন করার পর মশক নিজ রোগ ছড়াইতে সক্ষম হয় এবং কতক্ষণে একটী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী একটী সুস্থ মশককে দূষিত করিতে পারে। কাজেই আরও পরীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা গেল। সৈন্যদলের সকলেই অবগত ছিল যে ডাঃ কেরল ও ডাঃ লেজিয়ারের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আত্মোৎসর্গকারীর অভাব হইল না। প্রথমে কিসিংগার ও মোরান নামক দুইজন তরুণ যুবক পরীক্ষিত হইতে উপস্থিত হইল। ডাঃ রিড্ এই পরীক্ষার ফল যে সাংঘাতিক হইতে পারে তাহা তাহাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং জেনেরাল উড্ জন্য তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিবেন তাহাও বলিলেন। উভয় যুবকই পরীক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল, কিন্তু আর্থিক পুরস্কার লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। যখন যুবকদ্বয় সমস্বরে এই কথা বলিল, তখন ডাঃ রিড্ গভীর সম্ভ্রমে তাঁহার টুপী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যুবকদ্বয়, তোমরা আমার নমস্কার গ্রহণ কর।" কিসিংগার মশক দংশন দ্বারা নিজ শরীরে রোগ গ্রহণ করিল এবং অচিরেই আরোগ্য লাভ করিল। মোরানের জন্য একটী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই কক্ষে পীতজ্বরাক্রান্ত রোগীকে দংশন করিয়া বিষাক্ত হইয়াছে এরূপ পনেরটী মশককে প্রবিষ্ট করান হইল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল ডাঃ রিড্ তাহা নিম্নলিখিত ভাবে নিজে প্রকাশ করিয়াছেন :—



যে দিবস মশকগুলিকে কক্ষে প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল, সেই দিন মধ্যাহ্নে সদ্যস্নাত, কেবলমাত্র রাত্রিবাস পরিহিত মোরান সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শয়ন করিয়াছিল। তাহার প্রবেশের দুই মিনিট মধ্যে মশকেরা তাহার হাতে ও মুখে দংশন করিতে লাগিল। এইবার মোট সাতটী মশা তাহাকে দংশন করিল। সেই দিন পুনরায় ৪½ ঘটিকার সময় মোরান সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বিশ মিনিট অবস্থান করে এবং আর পাঁচটী মশক কর্ত্তৃক দংশিত হয়। পরদিন ৪½টায় পুনরায় প্রবেশ করে এবং পনের মিনিটের মধ্যে তিনটী মশা দংশন করে। সর্ব্বসাকুল্যে পনেরটী দংশন হয়। খৃষ্টের জন্ম দিনে ১১ ঘটিকার সময় এই বীর যুবক পীতজ্বরাক্রান্ত হইল এবং এই ভীষণ জ্বরের আক্রমণ মধ্যে একটী কাতর বাক্যও উচ্চারণ না করিয়া নীরবে সেই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল।

এখন অন্য প্রকার পরীক্ষা বাকী রহিল। ইহা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক যে, পীতজ্বরাক্রান্ত রোগীর স্পর্শ দ্বারা কিম্বা তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তি এই রোগাক্রান্ত হয় কিনা? এই পরীক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষা অপেক্ষাও শঙ্কট জনক। বিশ ফিট লম্বা এবং ফিট প্রস্থ একটী কাষ্ঠ কক্ষ নির্ম্মিত হইল। এই কক্ষে পীতজ্বরাক্রান্ত রোগীর অনেকগুলি বিছানা পত্র রাখা হইল। এই কক্ষে যাহাতে মশক প্রবেশ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। ক্রমাগত বিশ দিন ধরিয়া ডাঃ ক্লার্ক ও তাঁহার সহযোগীগণ ঐ কক্ষে যাইয়া ঐ সমস্ত বিছানায় শয়ন করিতেন এবং বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন। ঐ সমস্ত বিছানা পত্রে এত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ছিল যে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে ঐ গৃহে এক মিনিট থাকাও অসম্ভব ছিল। সুখের বিষয় কাহারও জ্বর হইল না এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া তাঁহারা বাহির হইলেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে সংস্পর্শে এই জ্বর সংক্রামিত হয় না, মশকই ইহার একমাত্র বাহক।

পৃথিবীর এই নূতন বাণিজ্য পথ নির্ম্মাণকারীদের প্রশংসা করিবার সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ডাঃ লেজিয়ার প্রভৃতি আত্মোৎসর্গকারী বীরবৃন্দ ব্যতীত এই বিশাল ব্যাপার কিছুতেই সমাধা হইত না।

সমস্ত মশকই দেখিতে প্রায় একরূপ বটে কিন্তু Anopheles ও Stegomyia মশকে বিশেষ পার্থক্য আছে। Anopheles মশক পরিস্কার আবদ্ধ জলে ডিম পাড়িতে ভালবাসে। খুব বৃষ্টিতে স্থানে স্থানে যে জল আটকাইয়া থাকে সেইগুলি ইহাদের প্রিয় বাসভূমি। আবার Stegomyia মশক বাবুদের মত সুহরে থাকিতে খুব পছন্দ করে। জলের চৌবাচ্চা ও অন্যান্য স্থানে থাকিতে ভালবাসে। কোন্ জাতীয় মশকের কত পরমায়ু ও উহারা কতদূর উড়িয়া যাইতে পারে তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় নাই; কিন্তু ইহাদের তারতম্য আছে। Stegomyia মশক তিন মাস জীবিত থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান করা যায়। ডাঃ কার্ণিশ বলেন যে রোগাক্রমণের প্রথম তিন দিনে দংশন করিলে ইহারা অতি ভয়ঙ্কর হয়। আরও বার দিন ইহাদের রোগ প্রচার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। রোগদুষ্ট Stegomyia মশক দংশন করিলে লোকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া তিন দিন ঐ রোগী সুস্থ মশককে রোগ বীজ বহনোপযোগী করিতে পারে। ডাঃ বিশপ বলেন যে ষাট দিবসের মধ্যে কোন নূতন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে

যে, রোগ বীজ একেবারে তীরোহিত হইয়াছে ; কারণ যে সমস্ত মশক রোগদুষ্ট হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে তাহারা রোগ বিস্তার করিতে জীবিত থাকিতে পারে না। ৯০ দিন পরে সমস্ত সন্দেহ একেবারে দুরীভূত হইয়া যায়। যদি কোন দেশে এইরূপ শেষ রোগীর আরোগ্যের পর তিন মাস অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ঐ দেশ অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত যে, ঐ দেশ মধ্যে আর পীতজ্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। কেবল অন্য দেশ হইতেই ঐ রোগবীজাণু পুনরায় আসিতে পারে। অতএব ইহা সম্ভবপর যে, যে কোন দেশে রীতিমত স্বাস্থ্য বিধানের বন্দোবস্ত করিলে এবং সমুদ্রাগত বিদেশী লোকের আগমন বন্ধ করিলে এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণ হইতে দেশকে একেবারে মুক্ত করা যায়।

Anopheles জাতীয় মশক অন্য প্রকারে মানুষের ক্লেশ বৃদ্ধি করে। পীতজ্বরাক্রান্ত রোগী হয় তাড়াতাড়ি মরিয়া যায়, না হয় তাড়াতাড়ি আরাম হইয়া উঠে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী প্রায়ই মরে না কিন্তু তিন বৎসর সে Anopheles মশককুলকে দূষিত করে। পানামায় শতকরা পঞ্চাশটী লোকের রক্তে ম্যালেরিয়া বীজ দৃষ্ট হইয়াছিল!

১৯১৩ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে Royal Colonial Instituteএ ম্যালেরিয়াতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি সার রোণাল্ড রস্ কয়েকটী খুব জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—"শিশু মাত্রেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় এবং অনেক শিশু ইহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; যাহারা জীবিত থাকে তাহারা অনেক দিন রুগ্ন থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরাই কেবল রোগ একটু কম ভোগ করে। এই ইউরোপে আমাদের প্রায় সকল বালক বালিকাই হাম, রক্তজ্বর প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। আমি যখন ১৯০৬ অব্দে গ্রীসে ম্যালেরিয়া বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতাম, তখন, যে গ্রীস আজ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া কঙ্কালসার হইতেছে, আমি মনে করিতে পারিতাম না যে, ইহারাই কি সেই পৃথিবীজয়ী গ্রীসের বংশধর। ইহাতেই আমি অনুমান করিলাম যে পার্শিয়ার সহিত যুদ্ধের সময়ই ম্যালেরিয়া গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। কিছুতেই অনুমান করা যায় না যে সুন্দর শারীরিক গঠন ও অসাধারণ ব্যায়াম সম্পন্ন জাতি যাহা এখনও গ্রীক ভাস্কর-খোদিত প্রস্তরে দৃষ্ট হয়, তাহারা বাল্যে জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত ছিল। ইহাও আবার অনুরূপ আশ্চর্য্যজনক যে, গ্রীষ্ম-মণ্ডলের ম্যালেরিয়া পীড়িত অনেক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। আমি জানি, জুলু মাসই প্রভৃতির ন্যায় বীরজাতি আফ্রিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; অথচ ও জাতি যেখানে বাস করে সে সমস্ত দেশ সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়া মুক্ত নয়। বাল্যের ম্যালেরিয়া প্রতাপ যৌবনের শারীরিক শক্তির উপর যাহাই হোক মানসিক শক্তির উপর প্রভাব অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বিস্তার করে এবং যে দেশে এই জ্বরের প্রকোপ বেশী সে দেশের যে আভ্যান্তরিক উন্নতির লাঘব হয় ইহা অবধারিত ব্যাপার।"

পানামা যোজক Anopheles মশক বংশ বৃদ্ধির পক্ষে অতি সুন্দর উপযুক্ত স্থান। খাল খনন করিবার জন্য যে স্থান মার্কিনবাসীরা মনোনীত করিয়াছি পৃথিবীর মধ্যে তাহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়া স্থান। অতি বৃষ্টি জন্য ডোবা প্রভৃতি জলপূর্ণ হইয়া যায়। এই জলাশয়ে মানুষ ধ্বংশকারী ক্ষুদ্র জীবাণু জন্মগ্রহণ করে, ইহারা পীড়িত হইতে সুস্থ ব্যক্তিকে পীড়িত করে ; এইরূপে ম্যালেরিয়াকে ইহারা দেশে বিস্তৃত করে এবং এই বিষ বিলুপ্ত হইতে দেয় না। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, পীতজ্বরাক্রান্ত রোগী মশককে কেবল তিন দিন দূষিত করিতে পারে ; কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগী তিন বৎসর দূষিত করিতে পারে। পীতজ্বর তাড়ান যত সহজ, ম্যালেরিয়া তাড়ান তত সহজ নয়। ইহা সত্য এবং সুখের বিষয় যে, ম্যালেরিয়ার কারণ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং যে প্রকারে ইহা বিস্তৃত হয় তাহাও জানা গিয়াছে। যদি সমস্ত ম্যালেরি



রোগীকে একটী স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা যায় এবং ঐ স্থান তাম্রের অতি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবরিত করা যায়, যেন তাহাতে মশক প্রবেশ করিতে না পারে এবং এইরূপে সংক্রামকতা কমাইতে কমাইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর মশক বৃদ্ধির স্থানগুলির উপর তত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় না এবং এমতাবস্থায় মানুষ ও মশক সম্পূর্ণ বন্ধুভাবে পরস্পর একত্রে বাস করিতে পারে। কিন্তু শতকরা ৫০ হইতে ৮০ জন লোক যেখানে রোগাক্রান্ত, সেখানে এ পরীক্ষা যেমন বিপজ্জনক তেমনি অসম্ভব ; তবে এইরূপে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু হ্রাস করা যায় মাত্র।

আমেরিকায় কেবল বিধি বন্দোবস্ত করিতে আড়াই বৎসর লাগিয়াছিল। তারপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কাজ দাঁড়াইল জঙ্গলাদি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত করা। ১৯০৪ সালে কর্ণেল গরগাস স্বাস্থ্য বিভাগের সভাপতি হইয়া আসিলেন। তিনি ইহা উপলব্ধি করিলেন যে তাহার বিভাগের উন্নতির উপরই খাল খননের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা যদি আমাদের লোকজনকে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারি, তবে এই বিশাল কার্য্যে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।'

আমেরিকা যখন কাজ আরম্ভ করে তখন পীতজ্বর কতকটা স্থিরভাবে ছিল—যদিও ইহা কম ছিল ; কিন্তু হঠাৎ প্রকোপ আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ১৯০৪ সালে ৬টী রোগীর মধ্যে মাত্র একটী মরিল। ১৯০৫ সালে জানুয়ারীতে ১৯টীর মধ্যে ৮ জন মরে ; যে মাসে জনের মধ্যে ৭ জন মরে ; জুন মাসে মৃত্যুহার ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইল। এই মাসে ৬২ জন পীড়িত হইয়া পড়ে ১৯ জন মরে ; যে সমস্ত লোক খাল খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। অনেকে চাকুরী ছাড়িয়া গৃহগামী জাহাজে য়া পড়িল।

১৯০৫ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে জানা যায়ঃ—'যোজকের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল ; অনেকে মার্কিন রাজ্যে যাওয়ার জন্য নিজ নিজ পদ ত্যাগ করিলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা কেহ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেহবা মরিয়া হইয়া রহিলেন, তাঁহাদের মনের ধারণা জন্মিয়াছিল যে এ রোগের আর ঔষধ নাই। সকলেরই মানসিক অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ কল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা যে কাজের নয় এবং তাহাতে কোন উপকার হইতে পারে না, পরস্পর সেইরূপ বলাবলি করিত এবং কোন বিধি নিষেধ মানিয়া চলিত না। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব মার্কিনবাসীরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

মূল সূত্রটী ছিন্ন হওয়াতেই অবস্থা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মচারীরা সকলেই 'কাল যখন মরিতেই হইবে তখন আজ খাও দাও আর মজা কর' এই নীতি অবলম্বন করিল। তাহারা এত নিরাশ হইয়াছিল যে, তাহাদের থাকিবার স্থান সকল যে সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিল ; স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল বিধান ছিল কেহই তাহা মানিয়া চলিত না। অবস্থা এমন শঙ্কট জনক হইয়া দাঁড়াইল যে, হয় ত, আমেরিকানদের চিরকালের জন্য এই খাল খনন কার্য্যে জলাঞ্জলী দিতে হইত। যে মহাত্মার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণের এই অন্ধ বিশ্বাস এবং এই মহৎ কাজের দায়ীত্ব কর্ম্মচারীদের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল তিনি ক্যানাল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চারলস্ মেগুন।

তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিবার জন্য কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তিনি সরলভাবে ঘোষণা করিলেন যে, এই জ্বরের প্রকোপে তিনি নিজেই ভীত হইয়াছেন, এবং যাহারা ভীত হয় নাই বলিতেছে তাহারা মিথ্যাবাদী। তারপর জানালার জালগুলি পুনরায় মেরামত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যাহারা পুনরায় ঐ সকল পর্দ্দা ছিন্ন করিবে তাহাদিগকে কঠোর

ভাবে দণ্ডিত করা হইবে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে বিচারক মেগুনের মত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যখন স্বীকার করিতেছেন যে তিনি নিজেই ভীত হইয়াছেন তখন এমন কে নির্ব্বোধ আছে যে সে নিজে নির্ভীক বলিতে পারে। আবার, বিচারক মেগুনের মত দৃঢ়চিত্ত লোক যে হুকুম প্রচার করেন তাহা অবহেলা করিলে যে ব্যবস্থিত দণ্ডভোগ করিতেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শাসনকর্ত্তা মেগুন ১৯০৫ সালে যোজকে আসেন, তখন পীতজ্বরের প্রকোপ খুব বেশী হয়। কর্ণেল গরগাসের (Colonel Gorgas) সাহায্যে তখন হইতেই তিনি জ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই সমস্ত রোগীকে বাড়ীতেই হোক কি হাঁসপাতালেই হোক জালদ্বারা বেষ্টিত স্থানে রাখিলেন। ইহার ফল এই হইল যে Stegomyia মশক ঐ স্থানে প্রবেশও করিতে পারিত না, বিষাক্তও হইতে পারিত না। তারপর কলন ও পানাম নগরদ্বয় পরিস্কৃত করা হইল। খাল খননকারী কর্ম্মচারীদের বাসস্থান ও সমগ্র সহরের অধিবাসীর ঘর দরজা প্রভৃতি গন্ধক ও তদ্রূপ উগ্র গন্ধবিশিষ্ট জিনিষ পোড়াইয়া তাহার ধূম দ্বারা শুদ্ধীকৃত করা হইল। ধূলা এবং আবর্জ্জনা রাশি দগ্ধীভূত করা হইল। তীক্ষ্ণ তদন্তের ব্যবস্থার ত্রুটি রহিল না। সমস্ত বিদেশী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করা হইল, কারণ বিদেশ হইতে ঐ রক্তবীজের বংশ আসিতে পারে।

কিন্তু সমস্ত সাময়িক ব্যবস্থা অপেক্ষা কলন ও পানামা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বন্দোবস্ত অনেক বেশী করা হইল। বিলাতি মাটী ও ইষ্টক দ্বারা সমগ্র নগরদ্বয় মেরামত করা হইল। জল নিকাশের জন্য সুন্দর পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত হইল। সর্ব্ব-সাধারণে যাহাতে পরিস্কৃত জল পান করিতে পারে, সে জন্য জলের কল বসান হইয়াছিল। এ যাবৎ চৌবাচ্ছায় জল ধরিয়া রাখা হইত এবং তাহাতে Stegomyia মসক প্রচুর পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করিত। এখন আর চৌবাচ্ছার দরকার রহিল না এবং সহরের উপর যে খা[illegible] জল জমিত তাহা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বাহিত হই[illegible] যাইত।

এই সমস্ত কঠোর সংস্কারের ফল স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল। মাসিক হিসাবে পীতজ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জুলাই মাসে বিয়াল্লিশ জন আক্রান্ত হইয়া তের জন মরিল। আগ[illegible] মাসে খুব উন্নতি দেখা গেল। ২৭ জন আক্রান্ত হই[illegible] ৯ জন মরিল। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে [illegible] অবস্থা আরও উন্নত হইল। ডিসেম্বর মাসে কে[illegible] একটী মাত্র রোগী রহিল। সর্ব্বশেষ রোগী আরো[illegible] হওয়ার পর তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। কাজে[illegible] মশকের আর বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না এ[illegible] রোগের সংক্রামতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবস্থা এত ভাল হইল যে, যদি ভিন্ন দেশ হইতে আ[illegible] রোগ বীজ না আসে তবে এই রোগ হওয়ার আর সম্ভাবনা রহিল না। যদি লোকের জ্বর হওয়া মা[illegible] তাহাকে অন্য লোকের সংস্রব হইতে পৃথক রাখা যা[illegible] তবে ইহা নিশ্চিত যে রোগ আর কিছুতেই বিস্তৃতি [illegible] করিতে পারে না। আমরা বলিতে পারি যে পীত[illegible] যোজক হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পীত জ্বর হইতে ম্যালেরিয়া আবার ভিন্ন প্রকৃতি[illegible] এই ক্ষুদ্র Anopheles জাতীয় মশকের বিরুদ্ধে [illegible] বৎসর যাবত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। এই মশকের [illegible] খোলা স্থানে যে জল জমিয়া থাকে, তাহাতেই [illegible] প্রাপ্ত হয়। ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর স্থানের স্থবনে[illegible] করা একেবারে সম্ভবপর নহে, কিন্তু কর্ম্মচারীরা [illegible] যেখানে যাইত তখন সেইখানেই মশকের বিরুদ্ধে [illegible] সংগ্রাম করিত। স্মরণ রাখা দরকার যে Anophe[illegible] মশক মাত্র ১০০ কি ২০০ গজ মাত্র উড়িতে পা[illegible] কাজেই প্রত্যেক গ্রাম ও বসতির চতুর্দ্দিকের কয়ে[illegible] গজের ভিতর যত জঙ্গল ছিল তাহা পরিস্কৃত করা [illegible] আবদ্ধ জল নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হইত। [illegible] জলাশয়ে তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইল; এই তৈল [illegible] পাকস্থলীকে এমনভাবে উল্টাইয়া দেয় যে তাহা আর [illegible] ভাল হয় না।

১২০০ একর স্থানে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। পীতজ্বরের মত ম্যালেরিয়াতেও গৃহাদি পর্দ্দা ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল। অকাতরে কুইনাইন বিতরণ করা হইত। ফলে ম্যালেরিয়া একেবারে উচ্ছেদ না হইলেও এক তৃতীয়াংশ রোগ কমিয়াছিল। তথাপি [illegible]লিশ হাজার লোকের মধ্যে (১৯১২) হাঁসপাতালে [illegible]০০ রোগী হইয়াছিল এবং ৩২টী রোগী মরিয়াছিল, [illegible]মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ছিল ২২টী। অতি বৃষ্টি নিবন্ধন এই দেশের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন সম্ভবপর হইতে পারে না এবং সেই জন্যই এনোফিলিশ মশক একেবারে ধ্বংস কিম্বা সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করা যায় না। লোকে সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া বীজ রক্তে লইয়া এদেশ [illegible]দেশ যাতায়াত করে, মশককুলও সেই রক্তদ্বারা বিষাক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাহারাই সংক্রামকতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু উপরোক্ত বিধান দ্বারা রোগের প্রকোপ অনেক হ্রাস করা যায়। ১৯০৬ সালে ২৬,০০০ লোকের মধ্যে ২১,৭৩৯ জন ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়াছিল। ১৯১২ সালে এই সংখ্যা কত কমিয়াছিল তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। ১৯০৬ সালে সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, যে কোন শ্বেতাঙ্গ যোজকে আসিলেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এক্ষণে পূর্ণ স্বাস্থ্যে এবং ম্যালেরিয়াদ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা না করিয়া নির্ভয়ে লোকের বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা জানিয়া রাখা ভাল যে, যতদিন মার্কিনবাসী খাল খনন কার্য্যে রত ছিল—১৯০৪ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত—এই আট বৎসরে মোট মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫১৪১ জন, তন্মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ছিল ২৮৪ জন। এই মৃতের মধ্যে ৪১১৯ জন [illegible] রোগে ও ১০২২ দৈব দুর্ঘটনা দ্বারা। ১৯০৪ সালে পানামায় যে ইংরেজ দূত ছিলেন তিনি ডাক্তার রস্‌কে [illegible]য়াছিলেন যে, ফরাসীরা যে নয় বৎসর যাবত খাল [illegible]নের চেষ্টা করিয়াছিল সেই সময়ের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ [illegible]জার লোক হারাইয়াছিল। সকলেই প্রায় ম্যালেরিয়া [illegible] পীতজ্বরাক্রান্ত হইয়াছিল।





এক্ষণে নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত করা যাইতে পারে যে, স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতির সম্যক্ অনুষ্ঠানে, পানামাতে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, পৃথিবীর যে কোন ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর পূর্ণ গ্রীষ্ম-মণ্ডলস্থ দেশে তাহা সম্ভবপর। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পানামায় যে কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে নয় কোটী নাগরিকের দ্বারা গঠিত প্রবল প্রতাপান্বিত একটী সাধারণতন্ত্রের সমস্ত ধন দৌলত ও শক্তি ছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জলের ন্যায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কেবল স্বাস্থ্য বিভাগেই ১,৫৫০০০০০ ডলার (৪৬৫০০০০০ টাকার উপর) ব্যয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহার একটী পয়সাও অপব্যয় করা হয় নাই।

জলের কল, ড্রেনে আরও ২৫০০০০০ ডলার (৭৫০০০০০ টাকার উপর) খরচ হইয়াছিল, কাজেই মোট স্বাস্থ্যবিভাগে খরচ হইয়াছিল ১৮০০০০০০ ডলার অর্থাৎ ৫৪০০০০০০ টাকার উপর। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ কোন দেশের ভাগ্যে স্বাস্থ্যবিভাগের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। যোজকের শাসন প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল; ইহা যোজকের যে কোন লোককে ইচ্ছামত নির্ব্বাসন করিতে পারিত এবং কোন নিয়ম প্রয়োজন মত প্রচলিত করিতে পারিত, কাজেই কতকটা সামরিক গভর্ণমেন্টের মত ছিল। কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিই দৃষ্টি ছিল না, নৈতিক এবং মানসিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্ব বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মশক ধ্বংশ, জাল ঘেরাও ছাড়া পবিত্র আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত ছিল। এক কথায়, পানামায় যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ দেশের লোকের আশা করা উচিত যে ভবিষ্যতে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি অবসম্ভাবী।

কর্ণেল গরগাস উৎসাহিত হইয়া লিখিয়াছেন,—"আমার বিবেচনায়, স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী ইহা দেখাইতে পারেন যে, যে কোন লোক গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করুক, ম্যালেরিয়া কিম্বা পীতজ্বরাক্রান্ত হইবে না। ইহার জন্য যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অতি সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য।

# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### শোণিত সঞ্চালন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে হৃদ্‌যন্ত্রের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তিন আউন্স রক্ত বাম নিম্ন প্রকোষ্ঠ ( Left Ventricle) হইতে মহাধমনী ( Aorta ) মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মহাধমনী একটি সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় ধমনী ব্যতীত কিছুই নহে। এই ধমনীর ব্যাস এক ইঞ্চি। আকারে প্রকারে ইহা অনেকটা শিরারই মত, তবে ইহার বিশিষ্টতা এই যে, উহার মধ্য-আস্তরণে (Middle Coat ) নমনশীল তন্তুজালের আধিক্য খুব বেশী। মহাধমনীর আবরণ-প্রাচীরে নমনশীল তন্তুজালের এত আধিক্য কেন, তাহা বুঝিবার জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। পাঠক একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। হৃদ্-পিণ্ড হইতে নির্গত সমস্ত শোণিতের বেগ এই মহাধমনীকেই একাকী সামলাইতে হয়। এই ধমনী ( Aorta ) নমনশীল তন্তুজালে নির্ম্মিত না হইয়া দৃঢ় তন্তুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত হইলে শোণিতের তীব্র তাড়না সহ্য করা উহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইত না।

যেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বশতঃ তিন আউন্স রক্ত মহাধমনীতে প্রবেশ করে, অমনই উহা শোণিতের স্থান সঙ্কুলনের জন্য ফুলিয়া উঠে, তাহার পর নমনীয় তন্তুজাল প্রসারিত এবং পৈশিক তন্তুপুঞ্জ আকুঞ্চিত হইতে সমগ্র ধমনী মধ্যে রক্ত প্রবাহিত করিতে থাকে। রক্ত যতই প্রবাহিত হইতে থাকে স্ফীতি তরঙ্গও সেই সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকে। রক্তের সঞ্চাপজনিত ধমনীর এই স্ফীতি ধমনীর সর্ব্বত্র লক্ষিত ও অনুভূত হয় এবং ইহাই নাড়ীর গতি ( Pulse ) নামে পরিচিত। শোণিতের এই গতি বশতঃ হৃদ্‌পিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন দ্বারা ধমনী মাত্রেই প্রত্যেক অভিঘাত বা স্পন্দন ( Pulse ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাড়ীর গতি দেখিবার জন্য চিকিৎসকে[illegible] সাধারণতঃ যে ধমনীটি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, তাহা[র] সাধারণ নাম ব্যাস ধমনী ( Radial Artery )। [illegible] ধমনী পুরোবাহুর বহির্ভাগে বিন্যস্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশে[র] একটু উপরে মণিবন্ধের নিকট ধমনীটি অনায়াসে অনু[ভব] করিতে পারা যায়। ধমনীর স্পন্দন বা আঘাত সং[illegible] দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বুঝিতে পারা যায়। কে[বল] তাহাই নহে, ধমনীর স্পন্দন দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের আকু[illegible] ক্রিয়া ঠিক তালে তালে সমান বেগে চলিতেছে [illegible] তাহাও এই ধমনী-স্পন্দনের দ্বারা নির্ণয় করা যাই[তে] পারে। যে সময় ধমনী-প্রাচীরের নমনীয়তার বি[illegible] ঘটে তখন ধমনী স্পন্দনের ক্রম-বিপর্য্যায় ঘটে; [illegible] একবার হঠাৎ দ্রুতবেগে ধমনীর স্পন্দন ক্রিয়া হই[illegible] পর তখনই উহা অতি মন্দ বা শ্লথ হইয়া পড়ে। [illegible] প্রকার আকস্মিক স্পন্দন এবং উহার বেগ হ্রাস [illegible] ধমনী-প্রাচীরের দৃঢ় অংশে বিষম আঘাত লাগিয়া [illegible] ফাটিয়া যাইতে পারে। এই প্রকার ধমনী প্রাচীর বি[illegible] ভয়াবহ, বিশেষতঃ মস্তিষ্কস্থিত ধমনীর প্রাচীর [illegible] আকস্মিক দ্রুত স্পন্দন ও উহার আকস্মিক নিবৃত্তির [illegible] ফাটিয়া গেলে ব্যাপার সাংঘাতিক হইয়া উঠে। [illegible] ঐরূপ ক্ষেত্রে Apoplexy হইবার সম্ভাবনা [illegible] অধিক।

এখন আমরা আবার মহাধমনীর বা (Aorta) [illegible] কথা বলিব। এই ধমনীটি বাম নিম্ন প্রকোষ্ঠ (L[eft] Ventricle) হইতে উঠিয়া উপরের দিকে গিয়া দুই[illegible] আন্দাজ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে এবং সেখান হইতে [illegible] ভাবে শ্বাসনালী শাখা ও অন্ননালী পর্য্যন্ত খিলানের [illegible] গিয়া শেষটা মেরুদণ্ডের পার্শ্বে বিসর্পিত হইয়াছে। [illegible]



[illegible]মনীর শোণিতধারা উহার এই বক্রভাগে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহার কিয়দংশ মহাধমনীর (Aorta) তিনটি প্রধান ধমনী যোগে বহিয়া যায়। ( ৪০ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য )। মহাধমনীজাত এই তিনটি ধমনীর মধ্যে যেটি সর্ব্বদক্ষিণ দিকে গিয়াছে, সেটি আবার দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,—একটি গিয়াছে দক্ষিণ উর্দ্ধ প্রত্যঙ্গে (Right subclavian), আর একটি গিয়াছে মস্তক ও গ্রীবার দক্ষিণ ভাগে (Right common cartoid) [illegible]ার এই দুইটী ধমনীর মধ্যবর্ত্তী ধমনীটি উর্দ্ধগতি [illegible]বলম্বনে মস্তকের ও গ্রীবার বামভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে, [ই]হার নাম বাম ভাগের সাধারণ কার্টয়িড ধমনী ( Left [C]ommon cartoid artery, ) সর্ব্ব বামভাগে [প্র]সারিত ধমনীর নাম বাম সবক্লেভিয়ান (Left subcla[vi]an ) এই ধমনী বাম ভাগের উর্দ্ধ প্রত্যঙ্গে শোণিত [সঞ্চা]লনের জন্য বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং মহাধমনীতে [illegible]মেই যে শোণিত প্রবাহিত হয়, তাহার কিয়দংশ [মস্ত]ক, গ্রীবা ও উর্দ্ধ প্রত্যঙ্গ সমূহে সঞ্চালন করে। [illegible]র অবশিষ্টাংশ মহাধমনী ও তাহার নিম্নগ অংশ বহিয়া [সঞ্চা]লিত হইতে থাকে। মহাধমনী যতই নিম্নগামী [হই]য়াছে ততই উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াছে। [মহা]ধমনী ঐরূপ ক্রম সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিবার উদ্দেশ্য [illegible], তন্তু, অস্থি, চর্ম্ম এবং শরীরের অন্যান্য তন্তু-[illegible]দানে শোণিত সঞ্চালন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার [illegible] মহাধমনী নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমাগত নানা [illegible] ঐ শাখারাজিকে প্রেরণ করিতে করিতে স্বয়ং [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

[illegible] উদরেও মহাধমনী শাখাপুঞ্জ বিস্তার করিয়াছে এবং [illegible], পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্রমালা (Intestines) [illegible] প্রভৃতি যন্ত্র সমূহে বহু শাখা বিস্তার করিয়াছে [illegible] বস্তিদেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দুই শাখায় বিভক্ত [হই]য়াছে। এই শাখার প্রত্যেকটি আবার দুইটি বিভিন্ন [শা]খায় বিভক্ত হইয়া আত্ম প্রসারণ করিয়াছে। এক [illegible] ধমনীর একটি শাখা সেইদিকে পদের সম্মুখ [illegible] প্রসারিত, ইহার নাম ( Femoral Artery ) পাদ-ধমনী, ইহা সমস্ত চরণে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে। ইহার আর একটি শাখা নিহিত হইয়া মূত্রাশয় এবং অন্যান্য যন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেহ হইতে বাহির হইয়া চরণের পশ্চাদ্ভাগে গিয়াছে এবং কতিপয় পেশী এবং নিতম্ব প্রদেশের পেশী ও তন্তু প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া তৎসমুদয়ে রক্ত সঞ্চার করিয়াছে।

ধমনী সমূহ তাহাদিগের শাখাপুঞ্জ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা প্রভৃতির ভিতর দিয়া নানাপথে প্রবাহিত রক্ত কিরূপে আবার হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে, ইহা ভাবিবার ও বুঝিবার কথা বটে। শোণিত ধমনীপথে নির্গত হইয়া শিরাপথে হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরিয়া আসে। ধমনীমালা এবং শিরাপুঞ্জের সংযোগস্থলে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু-সমবায় বা জালিকামালার সন্নিবেশ রহিয়াছে। জালিকামালার ( Capillaries ) ভিতর দিয়া বহিয়া যাইবার সময় শোণিত অতি মৃদুগতিতে চলিতে থাকে আর এই সূক্ষ্ম জালিকামালার মধ্যে থাকিবার সময়েই দেহসম্বন্ধে সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। ঐ সময়ে রক্তের লোহিত কণিকাসমূহ তন্তুসমূহের পুষ্টির জন্য সংগৃহীত অক্সিজেন বর্জ্জন করে, রক্তের রসভাগও (Serum) ঐ সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। শোণিতের রসে ঐ সময় শরীরের তন্তুজাল আপ্লুত ও অভিষিক্ত হইয়া তাহাদিগের পুষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত রস শোষণ করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা শরীরের লসীকা তন্ত্রে (Lymphatic System) সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়।

লসীকা তন্ত্র ( Lymphatic system ) লসীকা ধার পুঞ্জের ( Lymphvessels ) সমবায়ে রচিত। লসীকাধারগুলি জালিকামালা ( Capillaries ) অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মতর, ইহাদিগের আকার লসীকাগ্রন্থি ( Lymph glands ) অপেক্ষা ছোট। লসীকাধারপুঞ্জের সমবায় সঞ্জাত লসীকাতন্ত্রে মাঝে মাঝে লসীকা গ্রন্থিগুলি সন্নিবিষ্ট, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে লসীকা সঞ্চয় ভাণ্ডার। এই গ্রন্থি সমূহের দ্বারা রক্তের শ্বেতকণিকারাজি উৎপাদিত হইয়া লসীকাতে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

সমস্ত শরীরে লসীকা ধারা প্রধানতঃ বক্ষঃপ্রণালী (Thoracic Duct) পথে প্রবাহিত হয়, এই প্রণালী গলদেশের বামভাগস্থিত বৃহৎ শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগে একটী ক্ষুদ্র লসীকা নালী আছে, উহার নাম দক্ষিণ লসীকা নালী (Right Lymphatic duct); এই নালী সংযোগে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগ হইতে যে লসীকাধারা বহিয়া আইসে, তাহা দক্ষিণ ভাগে ঊর্দ্ধ প্রত্যঙ্গে এবং মস্তক ও গ্রীবার দক্ষিণ ভাগে লসীকা সঞ্চার করে। সুতরাং জালিকাসমূহ হইতে যে রস ধারা বিনির্গত হইতে থাকে তাহার সমস্তই পরিশেষে শিরাতন্ত্রে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়াটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় রক্তধারা জালিকাপুঞ্জ (Capellaries) হইতে বাহির হইয়া শিরাপুঞ্জেও বহিয়া থাকে। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন্ ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে শোণিত শিরাপুঞ্জের প্রবাহিত হয়? প্রথমতঃ হৃদ্যন্ত্র বা কেন্দ্রস্থ সঞ্চালন যন্ত্র রক্তকে পশ্চাদভাগ হইতে চাপ দিয়া উহাকে গতিশীল ও প্রবাহিত করে। তদ্ব্যতীত শিরাসমূহের প্রাচীর পট অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া বাহিরের বা পেশীপুঞ্জের সামান্য চাপেই রক্ত চঞ্চল ও গতিশীল হইয়া শিরাসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া থাকে। শিরা সকলের উপর চাপ পড়াতে উহার অভ্যন্তরস্থ রক্ত হৃদ্যন্ত্রের অভিমুখে অথবা উহা হইতে দূরবর্ত্তী অংশে প্রবাহিত হইতে পারে। সুতাং এই শিরা সঞ্চালন বিষয়ে এমন কোন অদ্ভুত কৌশল-কলা বিদ্যমান আছে, যাহার প্রভাবে রক্ত বিভিন্ন দিকে না যাইয়া নিয়মিত ভাবে হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বিসর্পিত শিরা সমুহের সর্ব্বত্র কপাটবৎ যে সকল পেশীপট রহিয়াছে তাহাদিগের দ্বারা রক্ত হৃদয়াভিমুখে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহারা প্রবাহিত রক্তকে কেবল হৃদ্যন্ত্রের দিকে অবাধে গমন করিতে দেয়, কিন্তু যে সময় চাপের আতিশয্য বশতঃ রক্ত বিপরীত পথে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন ঐ কপাট বা পেশী-পটে স্থলীগুলি (Flaps) তাহার গতিরোধ করে, ফলে শিরা স্থলীসমূহের সান্নিধ্যে ফুলিয়া উঠে। হস্তের উপরিভাগে মণিবন্ধনের নি… উপরে যে সকল নীল শিরা দেখা যায়, তন্মধ্যে একটিকে ধরিলে এই কথার যাথার্থ্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

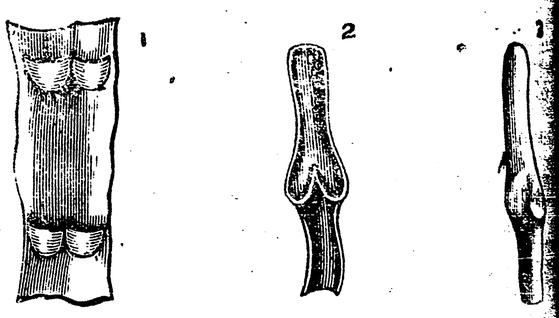




চিত্র ৪৬। শিরার কপাট সমূহ (Valves) দেখান হইয়াছে।

1. শিরার কর্ত্তিত অংশ বিস্তৃত করিয়া দুই অংশে বি… কপাট দেখান হইয়াছে।
2. শিরা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত করিয়া বদ্ধ অবস্থায় কপা… দুই অংশ কিরূপে সংযুক্ত থাকে তাহা দেখান হইয়াছে।
3. শিরা-স্থলীসমূহের সান্নিধ্যে ফুলিয়া রহিয়াছে।

ঐরূপ ভাবে শিরা চাপিয়া ধরিলে, কর-পল্লবের দি… যে শিরাগুলি ফুলিয়া খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঐ স… নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শিরার স্থলীসমূহের (Valve… অবস্থান দেখা যাইবে। উপরে যে চিত্র প্রদত্ত হইয়া… তদ্দ্বারা শিরাস্থলী সমূহের ক্রিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

সূক্ষ্ম শিরা সমূহের সম্মিলনে বড় বড় শিরা … উৎপন্ন হইয়াছে ইহারা আবার স্ব স্ব গতি অনু… ঊর্দ্ধ মহাশিরা (Superior Vena Cava) … মহাশিরা (Inferior Vena Cava) নামক শিরা … সম্মিলিত হইয়াছে।

ঊর্দ্ধমহাশিরা ঊর্দ্ধপ্রত্যঙ্গ সমূহ, মস্তক ও গ্রী… শোণিত প্রতি প্রেরণ করিতেছে। নিম্ন মহাশিরা … নিম্নপ্রত্যঙ্গ সমূহ, বস্তিপ্রদেশ, পাকস্থলী, অ… অগ্ন্যাশয়, যকৃত, বৃক্ক প্রভৃতির শোণিত হৃদ্যন্ত্রে প্রেরণ করিতেছে।

এই দুইটি মহাশিরার মুখ দুইটি হৃদ্যন্ত্রের … ঊর্দ্ধকক্ষে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং শোণিত প্রবা…



…প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র-তন্ত্রে সঞ্চরণ করিবার পর পুনর্ব্বার অবাধে হৃদ্যন্ত্রে ফিরিয়া যাইতে পারে। শোণিত সঞ্চার বা শোণিত-সঞ্চালন ক্রিয়ার বিবরণ পড়িতে এত সময় লাগিল, কিন্তু ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইতে পনের সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে না, অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্রের শোণিত দেহের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র তন্ত্রের পরিভ্রমণ করিয়া হৃদ্যন্ত্রে ফিরিয়া আসিতে ১৫ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে না।

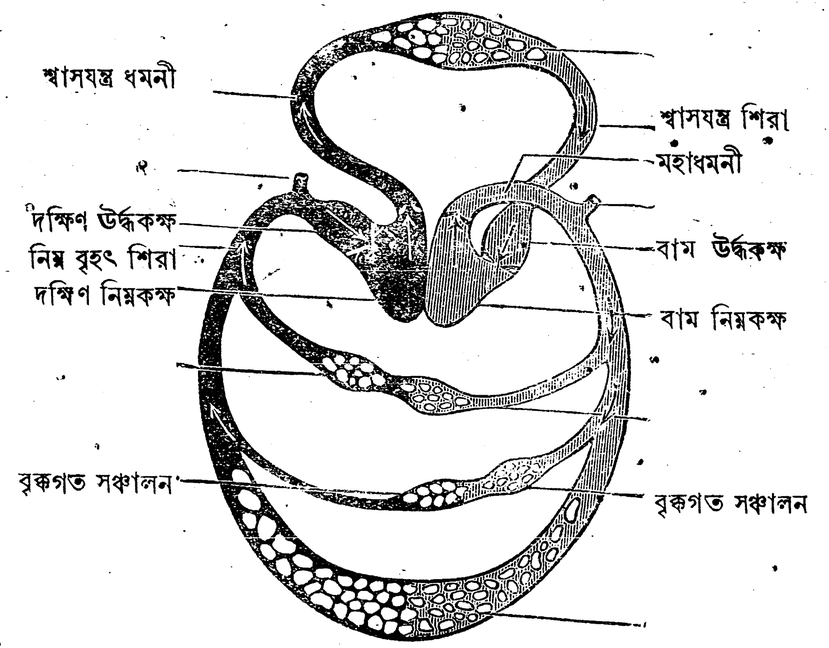

নিম্নে যে চিত্রটি প্রকাশিত হইল, উহাতে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যবস্থাত্মক প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ বা মসীময় অংশটি শিরামধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) পূর্ণ রক্ত সমন্বিত। এই চিত্রে শোণিতের চারি প্রকার সঞ্চালন-ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা:—

১। শ্বাসযন্ত্রগত সঞ্চালন। (Pulmonary Circulation.)
২। শরীরগত সঞ্চালন। (Systemic Circulation.)
৩। স্থানিক সঞ্চালন। (Portal Circulation.)
৪। বৃক্কগত সঞ্চালন। (Renal Circulation.)




চিত্র ৪৭। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যবস্থাত্মক প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্বাসযন্ত্রগত সঞ্চালন (Pulmonary Circulation) ক্রিয়ার পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন। ইহা শ্বাসযন্ত্র মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন ব্যতীত কিছুই নহে। চিত্র দর্শনে রক্তের এই সঞ্চালন-ক্রিয়া বেশ বুঝা যায়। শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া—

দুইটি মহাশিরা দ্বারা দক্ষিণ-ঊর্দ্ধ কক্ষে, ও তথা হইতে দক্ষিণ নিম্নকক্ষে, এবং তথা হইতে শ্বাসযন্ত্র নালী পথে এবং তথা হইতে শ্বাসযন্ত্র শিরা সমূহের দ্বারা বামঊর্দ্ধ কক্ষে চলিতেছে।

**শরীর গত সঞ্চালন।**—উদরপ্রদেশের কতিপয় যন্ত্র এবং কীডনী বা বৃক্কদ্বয় ভিন্ন সমগ্র মানব শরীরে যে ব্যবস্থা দ্বারা শোণিত সঞ্চালন হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃতপ্রস্তাবে শরীর গত সঞ্চালন (Systemic Circulation.) এই সঞ্চালন কার্য্যে রক্তের গতি এইরূপঃ—

বাম ঊর্দ্ধ কক্ষ হইতে, বাম নিম্ন কক্ষে, তৎপরে মহাধমনীতে; মহাধমনী হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাপুঞ্জে এবং তৎপরে জালিকামালায়।

তাহার পর জালিকাপুঞ্জ হইতে (রক্ত, জালিকাপুঞ্জ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে অক্সিজেন ও খাদ্যসার বর্জ্জন বা বিতরণ পূর্ব্বক তন্তুজালের পুষ্টিসাধন ও আবর্জ্জনা সংগ্রহ করে) শিরাপুঞ্জে প্রবেশ করে, এই শিরাপুঞ্জের দ্বারা ঊর্দ্ধমহাশিরা ও নিম্নমহাশিরা গঠিত।

**স্থানিক সঞ্চালন।** (Portal Circulation.)

মহাধমনীর (Aorta) শাখা প্রশাখা পুঞ্জ এই সব যন্ত্রে শোণিত বহিয়া লইয়া যায়,

মহাধমনীর শাখাপুঞ্জ হইতে পাকস্থলী, অন্ত্রমালা, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের জালিকাগুলিতে শোণিত প্রবেশ করে।

ঐ জালিকা সমূহ হইতে ক্ষুদ্র শিরা সমূহে রক্ত প্রবেশ করে, ঐ সকল ক্ষুদ্র শিরা বাহিয়া রক্ত তোরণী-শিরা নামক বৃহৎ শিরা মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

বৃহৎ তোরণী শিরা বাহিয়া রক্ত যকৃৎ মধ্যে প্রবেশ করে। যকৃতে প্রবেশ করিবার পর রক্তের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, যকৃৎ সম্বন্ধে আলোচনাকালে তাহা বিবৃত হইবে। রক্তপ্রবাহ তাহার পর যকৃৎ হইতে যকৃৎ শিরায় (Hepatic veins) প্রবাহিত হয়;

তাহার পর যকৃৎ শিরা হইতে নিম্ন বৃহৎ শিরায় (Inferior venacava) প্রবেশ করে।

পরে নিম্ন বৃহৎ শিরা হইতে হৃদ্‌যন্ত্রে চলিয়া যায়।

**বৃক্কগত সঞ্চালন।** (Renal Circulation) কিডনী (Kidneys) বা বৃক্কদ্বয়ের মধ্যে শোণিত সঞ্চালনের নাম রেণেল সঞ্চালন ক্রিয়া। আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছদে কিড্‌নী বা বৃক্ক সম্বন্ধে আলোচনা কালে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

এ পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা যে সব তথ্যের অবতারণা করিয়াছি, উইলিয়াম হার্ভি নামক একজন বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত এই সমস্ত তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রচার করেন। এই সকল তত্ত্বের উন্মেষ করিবার জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রক্তের গতি-তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি গুলির অবতারণা করেন ঃ—

১। একটি শিরা ছেদন করিলে, আমরা রক্ত বন্ধ করিবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের সুদূরবর্ত্তী স্থানে শিরার যে অংশটি রহিয়াছে তাহা জোরে টিপিয়া ধরিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

২। যদি একটি ধমনী ছেদন করা হয়, উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত ঝলকে ঝলকে বাহির হইতে থাকে তখন রক্ত বন্ধ করিতে হইলে ধমনীর যে অংশটি হৃদ্‌যন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত সেই স্থানটি টিপিয়া ধরিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শিরা ও ধমনী সম্বন্ধে এই দুইটী অতি সাধারণ তথ্য সকলের স্মরণ রাখা উচিত। কারণ ক্ষতস্থানের রক্তস্রাব নিবারণ বিষয়ে ইহারা বিশেষ সহায়ক।



# করবী

লেখক—ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ

**পরিচয়।**—ইহা একটী বিষাক্ত ফুলের গাছ। বঙ্গের অনেক স্থানে এই ফুল জন্মে। শ্বেত, গোলাপি, লাল, হরিদ্রা এবং কৃষ্ণ ভেদে করবী পাঁচ প্রকার। সাধারণত হরিদ্রা বর্ণের করবীই অধিক। পাঁচ প্রকার ফুলই বিষাক্ত। আমরা হরিদ্রা বর্ণের করবীর গুণই উল্লেখ করিব। বঙ্গের স্থান বিশেষে ইহাকে “কলকি” ফুলও কহে। এই উদ্ভিদ বড় হইয়া থাকে। পাতা সরু তীক্ষ্ণাগ্র হয়। একরূপ শ্বেত বর্ণের আঠা করবী পত্রে জন্মে, এই আঠাও বিষাক্ত। ফুলের নিম্নাংশেও আঠা থাকে। ইহার ফলই অধিকতর বিষাক্ত। তীব্র বিষের মধ্যে করবী অন্যতম। ফলের গাত্রে হরিৎ বর্ণের একরূপ মাংসতুল্য পদার্থ আছে। এই মাংসের মধ্যে কঠিনাবরণে বিচি থাকে। তাহার মধ্যে যে শাঁস আছে উহাই তীব্র বিষ।

এই বিষ কোনরূপে উদরস্থ হইলে ঠিক ধাঁটি কলেরার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত করে। পরিশেষে আক্ষেপ-সহ ভীষণ ঘর্ম্ম হইয়া জীবন বাহির হয়। এই জন্য এই দ্রব্য অতি সতর্কতা সহ সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। বঙ্গের অনেক অভিমানিনী কামিনী করবী ভক্ষণে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। এই জন্য বহু অভিজ্ঞ গৃহস্বামী বাড়ীর নিকটবর্ত্তী করবী বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন। দুই একটী করবী-কৃত বিষাক্ত রোগিণী আমি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে একটী কিশোরীকে ভিন্ন অন্য গুলিকে আরোগ্য করিতে পারি নাই।

সাবধান গৃহস্থগণ বাড়ীর নিকটে করবী বৃক্ষ রাখিবেন না—স্থানে স্থানে পুলিশ করবী বৃক্ষ চৌকিদার দ্বারা নষ্ট করিয়া থাকে। যদি হিন্দুগৃহীর করবী ফুল দিয়া পূজা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে উহা প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানে রক্ষা করিবেন এবং গৃহকর্ত্তা স্বহস্তে ফলগুলি পোড়াইয়া দিবেন। ঔষধার্থে আবশ্যক হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত লইয়া কার্য্য করিবেন। কিন্তু বিজগুলি পোড়াইবার সময় আবার সতর্ক হওয়া চাই, উহার ধূম গাত্রে অধিক সময় লাগিলে সর্ব্বশরীর কাল হইয়া চুলকাইতে থাকে। কাহারও বা গায়ে ক্ষত হয়। এই বিষয়ে একটী গল্প লিখিতে বাধ্য হইলাম।

একটী পল্লীকামিনী বড় ক্ষেপা এবং ঝগড়াটে ছিল; সে একদিন সন্ধ্যাকালে বাটীর নিকটস্থ ৪।৫টী করবী বৃক্ষের ফল কুড়াইয়া একটী তেমাথা পথের পার্শ্বে তাহা পোড়াইতে থাকে। এই সময় কোন যুবতী আসিয়া বলেন যে ওগো বাছা, ওরূপ করে কঞ্চি দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া করবী বিচি-পোড়া ধোঁয়া গায়ে লাগাইওনা, সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়া যাইবে। আর যাবে কোথা, বুড়ী যুবতীকে তো যা মুখে আসিতে লাগিল গালি দিতে লাগিল, যুবতী হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুড়ী যে “কঞ্চি” বলিলে ক্ষেপে, তাহা তাহার জানা ছিল না। বুড়ীর উচ্চস্বর ক্রমশঃ নিম্ন হইতে লাগিল। ইহার পর ঘণ্টাখানেক বাদে উন্মাদিনী বুড়ীর স্বর ভঙ্গ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ক্রমে ভেদ বমি এবং কম্পন আরম্ভ হইল। বুড়ীর এক দূর সম্পর্কীয় ভাইপো একটী কবিরাজ ডাকিল—তিন দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া “কঞ্চি বুড়ী” স্বর্গে গেল।

এই ঘটনা হইতে জানিয়াছি যে করবীর বীজের পোড়ান ধূমও বিষাক্ত। সুতরাং ইহাকে সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

**ক্রিয়া।**—পূর্ণ রেচক, বমনকারক, মূত্ররোধক, ঘর্ম্মকারক, আক্ষেপজনক। সেবন পরেই ঘোর উত্তেজনা আইসে, তাহার পর পূর্ণ অবসাদ। এই উদ্ভিদের ডাক্তারি গ্রন্থে উল্লেখ নাই। হোমিওপ্যাথিক পণ্ডিত মহাশয়েরা

করবীর Provoking করিয়া দেখিতে পারেন। কলেরায় বোধ হয় উপকার হয়। দেশীয় অশ্ব চিকিৎসকগণ ইহা অশ্বের পীড়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেখিয়াছি অশ্বের কম্প আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতে থাকিলে, অশ্ব চিকিৎসকগণ অতি সামান্য পরিমাণ করবী মূল ব্যবহার করেন কিন্তু ফল ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

নাম ঃ—

সংস্কৃতে—করবী, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভক, অশ্বমারক

হিন্দি—কনের ( শ্বেত রক্ত ভেদে )

মহারাষ্ট্রে—কনের, কুলনী, শ্বেত ফুলাংচি ইত্যাদি।

গুজরাটে—কনের ও কুলনী।

কর্ণাটে—বাকলা লিঙ্গে, কেগলা লিঙ্গে।

তৈলঙ্গে—কনের, চেহু।

ফারসি—খরহে হয়া।

আরবী—স্থমুন, হিমারদকূলি।

ইংরেজী—Sweet scented oleander.

ল্যাটিন—Cerbera Thevetia.

ব্যবহার।—নির্ঘণ্ট রত্নকার গ্রন্থমতে ইহার গুণ উষ্ণবীর্য্য, কটু তীক্ত কষায় ও তীক্ষ্ণ।

বিস্ফোট, কুষ্ঠ, ক্রিমি, কণ্ডু ব্রণ কফ জর এবং নেত্র রোগ ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার করা যায়, ইহার ঘোর বিষাক্ততা জন্য কখনও ব্যবহার করি নাই, কেবল ইহার আঠা গোলমরিচ চূর্ণ সহ ব্যবহার করিয়া ব্রণ রোগে দিয়া উপকার পাইয়াছি। ফোড়া, বাঘি বঁসাইতে হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভেষজ। চুলকণা পীড়ায় ইহার আঠা নারিকেল তৈল সহ মাখিলে যথেষ্ট উপকার হয়। সাবধান করবীর আঠা উদরস্থ হইলে কিম্বা চক্ষুতে লাগিলে কিন্তু ভীষণ অনিষ্ঠ করিবে। আবার গাত্রে অধিক লাগিলে ক্ষত হইতে পারে। এই জন্য করবী আঠা অর্দ্ধতোলা আর নারিকেল তৈল পোয়া মিশাইয়া লইবে।

ইহার পাতা-ধৌত জলে শিশুকে স্নান করাইলে তাহার চর্ম্মরোগ এবং অতি ঘর্ম্ম পীড়া আরোগ্য হয়। তাই বলিয়া পাতা অধিকক্ষণ জলে রাখিবে না বা রগড়াইয়া লইবে না। বহু প্রসূতি ২।১টা করবী পত্র ১।২ সের জলে দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া শিশুকে স্নান করাইয়া থাকেন। আঁচিল পীড়ায় ইহার আঠা উৎকৃ[illegible] কার্য্য করে, ২।১ ফোঁটা আঠা ২।১ ঘণ্টা আঁচিলে লাগাইতে হয়।

করবীকৃত বিষাক্তের চিকিৎসা।—এক সম[illegible] যশোহর সদরে একটি কার্য্যের জন্য চারি দিন অবস্থা[illegible] করি। তখন যে বাসা বাড়ীতে ছিলাম সেই বাসা[illegible] গৃহিণী, একদিন স্বামীর কুচরিত্রের জন্য প্রভাত হই[illegible] ১২টা পর্য্যন্ত ঝগড়া করিয়াছিলেন। সেদিন রবিবা[illegible] বাবু স্ত্রীর কথা অবহেলা করিয়া অভিষ্ট স্থানে চলি[illegible] গেলেন। গৃহস্বামিনী ছয় বর্ষের কন্যাকে ভাত খাওয়াই[illegible] নিকটবর্ত্তী করবী ফুলের গাছ হইতে ৪টি ফ[illegible] পাড়িয়া ইটের উপর রাখিয়া সেগুলি ভালরূপে পেষ[illegible] করিলেন এবং একখানি দীর্ঘ পত্র পিতার নামে, আর [illegible] একখানি অর্দ্ধ ইংরেজী অর্দ্ধ বাঙ্গলা পত্র পুলিস সাহেবে[illegible] নামে লিখিয়া সেই পিষ্ট করবী ভক্ষণ করিলেন। [illegible] কেহ জানিল না। যখন ঘোর বিষাক্ত হইয়া আক্ষে[illegible] সহ "গোঁ গোঁ" করিতেছিলেন তখন আমার সঙ্গী এক[illegible] বালক তাহা জানিল। সে আমাকে তাহা জানাইল[illegible] আমি স্ত্রীলোকটির আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিয়া তাহা[illegible] নিকট ঘটনা অস্পষ্ট ভাবে শুনিলাম মাত্র "কর[illegible] খাইয়াছে"। কথা বুঝিয়া তাহাকে তখন উপস্থিত মতে ব[illegible] করাইবার জন্য সামান্য লবণ জলসহ অতি কষ্টে গি[illegible] খাওয়াইলাম, বমির সহিত থেতলান করবীর অংশ বি[illegible] উঠিল। দেখিলাম পার্শ্বে ইটের গায়ে করবী [illegible] চিহ্ন রহিয়াছে। বমিতে অল্প উঠিল বটে কিন্তু [illegible] ঘর্ম্ম ও আক্ষেপ হইতে লাগিল। নাড়ি নাই, শরী[illegible] একদম ঠাণ্ডা। একটী প্রতিবাসীর দ্বারা আনিত এ[illegible] আউন্স একশা নম্বর ব্রাণ্ডি খাওয়ান হইল। তাহা উঠি[illegible] গেল। তখন মৃত্যুর বড় বাকী নাই, তাই তাড়াতা[illegible] Dying declaration 'মৃত্যু কালিন জবানবন্দী' লে[illegible] ইবার জন্য পুলিষ ডাকা হইল। এই সময় [illegible]



[illegible]ক ফ্যারাইডিস্ ব্যাটারি পাইলাম, তাহাই [illegible]গাইবার জন্য যোগাড় করিতে করিতে একটা ভীষণ Spasm আক্ষেপ হইয়া সব ফুরাইয়া গেল।

আবার আর এক দিন যশোহর গাগুরায় আমার পরিচিত একটী কায়স্থ বিধবা বাড়ীর লোকের উপর বিরক্ত হইয়া করবী খাইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম অনবরত ভেদ আর আক্ষেপ হইতেছে, ঘর্ম্মে শরীর [illegible] গিয়াছে। বমি নাই, করবী ভালরূপ বাটিয়া [illegible] খাইয়াছে। সুতরাং বমি দ্বারা উঠাইবার আশা [illegible]। ঘর্ম্ম আর হিমাঙ্গ জন্য ব্রাণ্ডির সঙ্গে কাফি [illegible] খাওয়ান হইল। এই কার্য্যে মুখের মধ্যে রবারের নল দিতে হইয়াছিল—সে এক কঠিন ব্যাপার। গলা-নলি [illegible]দূর আক্ষিপ্ত ছিল যে Elastic cathetre পর্য্যন্ত [illegible] প্রবেশ করান অতি কঠিন হইয়াছিল। এইরূপে ২।৩ [illegible]র ব্রাণ্ডি খাওয়ানতে নাড়ি অনুভূত হইল, শরীর উষ্ণ [illegible]হইল। অনবরত ব্যাটারি চলিতে লাগিল। দাস্ত [illegible]কিছু বন্ধ হইল। কিন্তু ভীষণ পেট ফুলিয়া উঠিল। [illegible]হসা একটুকু বমি হইয়া রক্ত উঠিল, সে রক্ত অনেকটা [illegible]যত এবং কাল। পাকস্থলির শোণিত বলিয়াই [illegible]তীত হইল। আবার ভয়ঙ্কর "ফিট" হইতে লাগিল। [illegible]ঙ্গে স্থটের গুড়া আর সরিষার গুড়া মাখান হইতে [illegible]গিল। শরীর খুব উষ্ণ হইল। তখন বারে বারে [illegible] খাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা "ফিট্" হইয়া সব [illegible]রাইয়া গেল।

[illegible] একটী ১২ ১৩ বর্ষের কায়স্থ বালিকা খুড়ির উপর [illegible] একটা করবীর বিচির শাঁস অর্দ্ধেকটা চিবাইয়া [illegible]ইয়াছিল। তাহার ঠিক যেন কলেরা পীড়া হইয়াছে [illegible] বোধ হইল। এই জন্য একজন হোমিওপ্যাথিক [illegible]ক্তার ৭।৮ মাত্রা ঔষধ দিয়াছিলেন। বালিকা যখন [illegible] বলিল আমি করবী খাইয়াছি তখন আমার ডাক [illegible]। আমি 'ষ্টমাক পাম্প দিয়া পাকাশয় ধৌত করিয়া একদমে ২ আউন্স ব্রাণ্ডি খাইতে দিলাম। আর পিয়াজের রসসহ চিনি মিশাইয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর দিতে লাগিলাম। গাত্রে তাজা সরিষার গুড়া আর পিয়াজের রস মাখাইতে বালিকা বলিয়া উঠিল "শরীর জলে গেল।" আবার নিদ্রা যাইবার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, একটী ঘটিতে জল রাখিয়া তাহাতে নিশাদল দিয়া সেই জল spirit সহ মাথায় পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইতে লাগিল। ইহার অগ্রে একবার বমি হইয়া কতকটা জল সহ করবীর অংশ কিছু উঠিয়া গেল, নিদ্রার জন্য বড় বিরক্ত করিতে লাগিল। আমাদের অমতে তাহার সেই খুড়ী তাহা করিতে দিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় নিদ্রার পর তাহার কুলক্ষণ সমস্ত দূর হইল। মাত্র সামান্য পরিমাণ দাস্ত হইতে লাগিল। তখন অতি অল্প মাত্রায় কাফি দেওয়া হইল। আর জল উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত হরিদ্রার গুড়া মিশাইয়া ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইতে লাগিল। এই ভাবে দুই দিন চলিল, তাহার পর সুস্থ হইল।

এই দিন হইতে জানিলাম এবং বুঝিলাম যে হরিদ্রা মিশ্রিত চা, কাফি করবীর বিষ নষ্ট করে। পিয়াজের রস আর চিনিও করবীর বীষ নাশক, কিন্তু হরিদ্রাই শ্রেষ্ট। করবী বিষাক্ত রোগীকে বমন করান উচিত নহে; আক্ষেপ বৃদ্ধি হয়। সুবিধা হইলে পাকাশয় ধৌত করা উচিত।

এই করবী দ্বারা ঠিক কলেরার ন্যায় অবস্থা হয় বলিয়া একটী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ইহার দশমিক-ক্রম ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় নাই। বোধ হয় অভিজ্ঞ বড় বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা ইহার ঔষধক্রম প্রস্তুত করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দেশীয় দ্রব্য দ্বারা কলেরার একটা প্রকৃত ঔষধ প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

# শরীর চর্চ্চা

লেখক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### স্নান।

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে অবগাহন করিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ অবগাহন পূর্ব্বক নদীর স্রোতে স্নান অপেক্ষা চিত্তপ্রসন্নকর বস্তু অতি অল্পই আছে। দূষিত বায়ু যেমন শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, অপরিষ্কার জলও ততদূর ক্ষতিজনক। অপরিষ্কার, দুষ্ট জলে স্নান করিলে নানাপ্রকার কষ্টকর চর্ম্মরোগ জন্মায়. এই জন্যই পুষ্করিনী ইত্যাদি হইতে নদীর জলে স্নান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়; কারণ নদীর স্রোতে জল কখনও পঙ্কিল হইয়া উঠে না। অপর পক্ষে, পুষ্করিনী ও কূপের জল প্রায়ই অনাবিল থাকে না। সেজন্য যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলেই স্নান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমাদের দেশে সকল প্রকার পবিত্রানুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্নান দ্বারা শরীর পূত করিয়া লইবার ব্যবস্থা আবাহমান-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কারণ স্নান শরীর পরিষ্কার করা ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক প্রকার অপূর্ব্ব সজীবতা ও মনে প্রফুল্লতা সঞ্চার করে। শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য ব্যায়ামাভ্যাস যত প্রয়োজনীয়, স্নানও তত্তই আবশ্যকীয়। স্নানের প্রয়োজনীয়তা সকল সমাজের লোকেই অনুভব করিয়া থাকে। শরীরকে পরিষ্কার রাখা ব্যতীত শারীরিক বা মানসিক শ্রান্তি অপনোদন করিতে জলের শক্তি অপরাভূত।

বাঙ্গালী জাতি স্নান করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বশরীরে তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তৈল চর্ম্মকে মসৃন করে। বিশেষ শর্ষপ তৈলের ত্বককে সজীব ও মসৃন করিবার একটী অশ্চর্য্য গুণ আছে। নিয়মিত সরিষার তৈ... ব্যবহারে দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ কদাচিত জন্মাই... পারে। বিলাতী ব্যায়াম বিশেষজ্ঞেরা অধুনা জলে... সহিত সর্ষপ ব্যবহার করিতে উপদেশ প্রদান করিতে... ছেন। এমোনিয়া ব্যবহার করিবার রীতিও বহুকা... হইতে ইংরেজ সমাজে প্রচলিত।

আমাদের মতে পরিষ্কার শীতল জলে স্নান সর্ব্বাপে... প্রশস্ত, গ্রীষ্মকালে সকলেই শীতল জলে প্রত্যহ দুই তিন ব... স্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু শীতকালে অধিকাংশ ব্যক্তি... গরম জল ব্যবহার করেন। সাধারণত গরম জ... স্নানের পক্ষে অব্যবহার্য্য, অবশ্য রোগীর জন্য চিকিৎ... যাহা ব্যবস্থা করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র! ব্যায়ামকা... পক্ষে গরম জল কোনমতেই উপকারী নহে, বর... তাহাতে সজীবতার পরিবর্ত্তে শরীরে অবসাদ স... হয়। আমরা আট বৎসরকাল গরম জল স্নানের... ব্যবহার করি নাই এবং অসুস্থতা ব্যতীত এই ... সময়ের মধ্যে মাত্র দুই এক দিন স্নান বন্ধ গিয়া... শরীর অসুস্থ হইলেও গরম জলে স্নান করা সঙ্গ... নাই, কারণ গরম জলে স্নান করিলেই মাথধরা ... করিতে হয়। আর একটী কথা বলিবার আছে... গরম জলে স্নান অভ্যাস করিলে ঠাণ্ডা (Chi... লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, অপর পক্ষে শী... জল শরীরকে দৃঢ় করিতে সক্ষম হয়।

স্যাণ্ডো ব্যায়ামাভ্যাসের অব্যবহিত পরেই ... করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কাহারও ...পক্ষে এ অভ্যাস উপকারী হইলেও সাধারণতঃ এই প্রথায় অপকার হওয়াই সম্ভব। যাঁহারা শরীর চর্চ্চায় বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু নূতন অভ্যাসকারীর পক্ষে ইহা অহিতকর; এই প্রকার স্নানের ফলে নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ব্যায়ামাভ্যাসের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে স্নান করা উচিত।

ব্যায়ামের পর স্নান অপরিহার্য্য। ভারতবাসী পালোয়ানগণ ব্যায়ামভ্যাসের পর স্নানের বিষয়ে সাধারণত বিশেষ মনোযোগী, সে জন্য তাহাদিগের ভিতর চর্ম্মরোগের প্রসারও যথেষ্ট। ব্যায়ামাভ্যাসের সময় যে ক্লেদ শরীর হইতে নির্গত হয়, তাহা শরীরের ক্ষয়িত অংশ মাত্র। এই ক্ষয়িত অংশ শরীরের যথেষ্ট হানিকর, সেইজন্য ব্যায়ামের পর স্নান দ্বারা শরীরকে পরিস্কৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ স্বেদরূপে নির্গত এই দূষিত পদার্থ ত্বকের যথেষ্ট হানি করে। শিক্ষিত সমাজে ত্বক পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান ব্যবহারের অভ্যাস ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেজন্য দু একটী কথা বলা প্রয়োজন। সাবানের একটা বিশেষ উপকারীতা আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অপকৃষ্ট সাবান ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট সাবান চুণের পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাবানে ক্ষার অধিক পরিমাণে থাকিলে চর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। সেজন্য সম্ভব হইলে ক্ষার বিযুক্ত উৎকৃষ্ট সাবান অথবা অভাবপক্ষে সাবান ব্যবহার না করাই উচিত।

বিলাতি Flesh gloves প্রভৃতির কোন উপকারিতা এদেশে নাই। শীত প্রধান দেশ বলিয়া সেখানে Friction bath প্রভৃতি নানা প্রকার স্নানের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সিক্ত বস্ত্রে গাত্রমার্জ্জন করা পর্য্যন্ত সেদেশের এক প্রকার স্নান। দুই দেশের জল বায়ু বিভিন্ন, সে দেশের সাধারণ প্রথাগুলি এখানে চালাইবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া বোধ হয়।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### পরিচ্ছদ।

যে সকল চিত্রকর এবং ভাস্করেরা মানুষ্যের মূর্ত্তিকে ...জেদের প্রতিভা বলে চিত্রে অথবা ভাস্কর্য্যে ফুটাইয়া ...লিয়াছেন, তাহারা মানবদেহের শিল্প-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ...হইয়া তাহার নগ্ন মূর্ত্তিকেই অমর করিয়া রাখিয়াছেন। পরিচ্ছদ মানবদেহের সে সৌন্দর্য্য আদিম সভ্যতার ...সময় হইতেই আবৃত করিয়া আসিয়াছে। ব্যায়াম ...সম্বন্ধে বিলাতের মুখপত্র Health and Strength ...পত্রিকার সম্পাদক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন ...সভ্যতানুমোদী পরিচ্ছদ তাহার আবরণের দ্বারা ...মানুষকে অধিকতর দুর্ব্বল করিতেছে। যদি সকলকে ...নগ্নগাত্রে ফিরিতে হইত তাহা হইলে মানুষ তাহার ...বিবৃত অস্থি সমষ্টি অপরকে দেখাইতে লজ্জা পাইত। প্রাচীন রোমান বা গ্রীকেরা তাহাদের পেশীবহুল শক্তিমান বাহুদুটি সকল সময়েই উন্মুক্ত করিয়া রাখিত, কারণ এই নগ্নতার উত্তেজনা এই যে সবল মানুষ কখনও নিজেকে লুকাইবার চেষ্টা করে না, তাহার শরীরের সৌন্দর্য্য ও শক্তি বাহিরেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু অধুনা দুর্ব্বলের শিরাসঙ্কুল ও অস্থিবহুল দেহ দরজীর আশ্রয়ে আপনার সম্মান বজায় রাখিতেছে, যে হেতু দরজী বিকলাঙ্গ দুর্ব্বলকেও সুন্দর করিতে পারে। মানুষের দুর্ব্বলতার অনুপাতে পরিচ্ছদের আবরণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ায় আমরা এখনও বিলাতের মত পরিচ্ছদের কঠিন বাঁধনের ভিতর

পড়ি নাই। দেশের জল বায়ুর জন্য আমরা অপেক্ষকৃত ঢিলা কাপড় চোপড় ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্যায়াম-বিশেষজ্ঞেরা ঢিলা পরিচ্ছদের বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা ঢিলা পরিচ্ছদ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কোন প্রকার বাধা প্রদান করে না এবং পরিচ্ছদ 'আঁট' না হওয়ায় পেশীগুলি সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

শরীরের উত্তাপ রক্ষা ও বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্য হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য পরিচ্ছদের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য যেমন রেশমের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে অন্য কোন প্রকার পরিচ্ছদের দ্বারা ততদূর হয় না। সকল প্রকার পরিচ্ছদের মধ্যে রেশম যেমন লোভনীয় তেমনই উপকারী কিন্তু মহার্ঘ্য হওয়ার জন্য ইহা সাধারণের ব্যবহার যোগ্য নয়। এজন্য পরিষ্কার সুতার পরিচ্ছদই সাধারণের সমাধিক আদৃত।

ত্বকের পরেই স্বেদ শোষণকারী কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করা একান্ত উচিত, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বেদনির্গমনমাত্র শোষিত না হইলে তাহা নানা প্রকারে ত্বকের অনিষ্ট করে। কিন্তু এই শোষণকারী বস্ত্র প্রত্যহ কয়েক বার পরিবর্ত্তন করা উচিত, কারণ তাহা শীঘ্র স্বেদসিক্ত হইয়া বিযুক্ত হইয়া উঠে। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ মনে করা ভুল, কারণ নিজের সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরা অসম্ভব নয়। ত্বকের অব্যবহিত পরেই ফ্লানেল ( Flanel ) ব্যবহার করা আমরা অনিষ্টজনক মনে করি। শীতকালে ইহা আ প্রদ হইলেও গ্রীষ্মকালে ইহা সমূহ কষ্টদায়ক, ফ্লানেল অযথা ত্বকের উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া ত্বকের শিরা সমষ্টিকে উত্তেজিত করে, ফলে স্বেদও বহুল নির্গত হয়। ফ্লানেল শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই দাহ উৎপাদন করে, এই দাহ ত্বকের পক্ষে বি অনিষ্টজনক।

শরীরের ক্ষয়িত অংশ মল, মূত্র, স্বেদ ও নিশ্বাস বহির্গত হইয়া যায়। কোন প্রকার উত্তেজনা শরীরের ক্ষয় অধিক মাত্রায় হইলে অবসাদ অবশ্য সুতরাং এই উত্তেজনার দ্বারা স্নায়ুগুলিও অবসা হইয়া নিস্তেজ হইয়া যায়। পোষাক পরিচ্ছদের ত্বকের স্নায়ুগুলিরও অযথা উত্তেজনা হয়, সেজন্য নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

ডাক্তার লাইম্যান স্পেরী ( Lyman Sperry ) ফ্রান্সেস্ ওইলার্ড ( Frances Willard ) বলে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধান না হওয়ায় মানু কামুকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিচ্ছদের মানুষের সকল ইন্দ্রিয়েরই অত্যধিক উত্তেজনা বিশেষ 'আঁট' এবং অত্যধিক গরম পরিচ্ছদে প্রবৃত্তি অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় ইহাও ব্যায়ামকারীর রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।



# ম্যালেরিয়া

লেখক—রায় বাহাদুর শ্রীযদুনাথ মজুমদার, এম্, এ, বি, এল,

( বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি সাহেবের অনুমোদিত )

১। ম্যালেরিয়া জ্বর সহজে নিবারণ করা যায়। মানুষের শরীরে পরশরীরোপজীবী অতি ক্ষুদ্র কোন জীবাণু * যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিলে এই জ্বর হইতে পারে।

২। এই ক্ষুদ্র জীবাণু এনোফিলিস নামক মশক দ্বারায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে নীত হয়। এই জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিলে পরে জ্বর হয় বটে কিন্তু অপাক এবং ঠাণ্ডার দ্বারায় ইহা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। যদি শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে এবং অপাক না থাকে তবে ম্যালেরিয়া বিষ সহজে কিছু করিতে পারে না।

৩। রাত্রিতে সাবধানে মশারি ব্যবহার করা এবং আক্রান্ত হইলে সর্ব্ব ঋতুতেই কুইনাইন ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা এবং ম্যালেরিয়ার সময় অর্থাৎ আষাঢ়ের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় প্রতিরোধক-স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুইনাইন সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত ব্যায়াম অর্থাৎ শরীর পরিচালন, বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ জল সেবন, আহার বিহারে মিতাচার, গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি উপায় দ্বারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায়।

৪। দেহে যে সমস্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে তাহার ধ্বংস সাধনই ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং এই জীবাণু যাহাতে মশক দংশন দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে এবং মশক দংশন দ্বারা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলেও যাহাতে ঐ বিষ শরীরের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে শরীরকে এইরূপ ভাবে রাখা ইত্যাদি প্রতিরোধ উপায়গুলির তদ্রূপ উদ্দেশ্য। মশারি ব্যবহার করিলে মশায় কামড়াইতে পারিবে না সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এনোফিলিস মশক মারিয়া ফেলিলেও উহা দংশন করিতে পারিবে না। বাড়ীর নিকট ডোবা, গর্ত্ত ইত্যাদি বুজাইয়া ফেলিলে এনোফিলিস্ ইহাতে জন্মাইতে পারিবে না। গৃহাদিতে আলোক এবং বায়ু স্বচ্ছন্দভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখানে মশক থাকিতে পারে না। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণে কুইনাইন্ খাইতে পারিলে শরীরে যে অবস্থা হইবে তাহাতে মশক দংশনেও কিছু করিতে পারিবে না।

## নিবারণে পায়।

(১) অতএব বাড়ীর চারিদিকে খোলা রাখিবে; বাড়ীর নিকট কোন-গাছ জন্মাইবে না, যদি জন্মাইয়া থাকে তবে যাহাতে গৃহে আলোক প্রবেশের এবং বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত করে তাহা কটিয়া ফেলিবে। বাড়ীর নিকট সমস্ত জঙ্গল এবং ছায়াওয়ালা গাছ কাটিয়া ফেলিবে। মশকেরা দিনের বেলায় এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। বাড়ীর হাতার মধ্যে কোন স্থানে জল জমিতে দিও না, নালি কাটিয়া বাহির করিয়া দিবে।

---

* পরগাছা যেমন অন্য আশ্রয় না করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না এবং সকল সময়ই কোন কোন গাছের আশ্রয় ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। এই ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ মনুষ্য শরীর এবং এনোফিলিস্ নামক এক প্রকার মশক শরীর ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না বা বর্দ্ধিত হয় না। ইহা জলে, স্থলে, শূন্যে বা বায়ুতে কোথাও দেখা যায় না কেবল মশক ও মনুষ্য শরীরে দেখা যায়। এনোফিলিস্ মশক আকারে বড় একখানি কাঁটার ন্যায় কিন্তু ইহাদের গায়ে, পায়ে, শুঁড়ে ছোট ছোট সাদা দাগ আছে।

(২) গৃহ মধ্যে বিশেষতঃ শুইবার ঘরে যত অল্প জিনিষ রাখিতে পার তাহা রাখিবে। মাকড়সা বা অন্য প্রকার আবর্জ্জনা ঘরে রাখিও না, সংক্ষেপেতঃ গৃহগুলি এরূপ ভাবে রাখিবে যেন মশা লুকাইয়া থাকিতে না পারে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে এবং একটু রাত্রি হইলে খুলিয়া দিতে পার। সন্ধ্যার সময়ই মশারা ঘরে প্রবেশ করে। প্রত্যহ সকালে বৈকালে গৃহের সর্ব্বস্থানে ধূপের ধুয়া দিবে।

(৩) বাড়ীর নিকট ডোবা গর্ত্তাদি বুজাইয়া দিবে, যদি বুজাইতে না পার তাহা হইলে লাঠীর আগায় কেরোসিনে নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া সপ্তাহে একবার করিয়া ডোবা গুলির কিনারায় ঘুরাইয়া লইবে, উহাতে মশকের ডিম সব মরিয়া যাইবে। বাড়ীতে পুকুর থাকিলেও তাহাতে ঐরূপ করিবে তাহাতে জলের কোন ক্ষতি হইবে না। পুকুরে বা ডোবায় যথেষ্ট কই মাছ ছাড়িয়া দিবে উহারা মশার ডিম খাইয়া ফেলিবে।

(৪) মুখ না ঢাকিয়া হাঁড়ি কলস ইত্যাদি বাহিরে রাখিবে না উহাতে বর্ষার জল জমিলে মশায় ডিম পাড়ে। পরিত্যক্ত হাঁড়ি কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, যদি বাহিরে হাঁড়ি কলস রাখিতে হয় মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

(৫) সকল ঋতুতেই মশারির মধ্যে শুইবে।

অতি গরীব লোকেও পুরাতন ধুতি সাড়ির দ্বারায়ও মশারি তৈয়ার করিতে পারে। যদি একান্ত পক্ষে মশারি জোগাড় করিতে না পার তবে গায়ে সরিষার তৈল, মালিস করিয়া শয়ন করিবে। কোনরূপ তীব্র গন্ধের নিকট মশক আসে না।

(৬) বাড়ীতে কেহ জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র মশারির ভিতর রাখা উচিত।

(৭) কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর অয়েল বা তদ্রূপ কোন রেচক দ্বারায় জোলাপ লইবে; প্রত্যহ বাড়ীর বালক বালিকাদের জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যদি জিহ্বায় সাদা আবরণ দেখা যায় তখনই বুঝিবে যে উ অপরিষ্কার হইয়াছে, জোলাপ দেওয়া দরকার।

৮) আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসে মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সুস্থাবস্থায়ও ৮ গ্রে করিয়া কুইনাইন খাইবে। যেস্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব সেস্থানে ইহাপেক্ষা অধিক খাওয়া দরকা হইবে। যেস্থানে অনেক লোকের পেটে পিলে বড় দে যায় সেইস্থানে বুঝিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার প্রকো বেশী এবং এইরূপ হইলে সপ্তাহে প্রতিদিন ৪ গ্রে করিয়া কুইনাইন কিম্বা দুই তিন বারে ২৮ গ্রেণ কুইনা খাওয়া আবশ্যক। বালক এবং শিশুদের পক্ষে ই অপেক্ষা অল্প দিবে কিন্তু এটা সকলের জানা উচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের অপেক্ষা বালকেরা অধিক পরিমা কুইনাইন সহ্য করিতে পারে। ম্যালেরিয়া ঋতু সুস্থাবস্থায় এইরূপ কুইনাইন খাইলে যদি কোন প্রকা ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে তাহা হইলে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

## চিকিৎসা।

(৯ যখনই ম্যালেরিয়া জ্বর হয় অর্থাৎ হাত ঠাণ্ডা হইয়া শরীরে কম্প দিয়া জ্বর হয় এবং একটি বা দুই দিন বা তিন দিন অন্তর বিচ্ছেদ হয় তখনই বদ্ধ থাকিলে জোলাপ লওয়া উচিত এবং প্রতিদিন মাত্রায় বিচ্ছেদ অথবা জ্বর কম থাকা সময় ৬ কুইনাইন খাইবে। জ্বর সারিয়া গেলে পরেও সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ ৮ গ্রেণ করিয়া খাইবে এবং তা এক পক্ষ (১৫ দিন) ধরিয়া ৪ গ্রেণ করিয়া খাই অনেকের জ্বর সারিয়া গেলে যে পুনরায় জ্বর হয় কুইনাইন সেবনের জন্য নহে, অল্প পরিমাণে এবং দিনের জন্য কুইনাইন খাইবার ফল।

# বিবিধ সংগ্রহ।

হাঁসপাতালে দান ঃ—মাড়োয়ারী ধনী শ্রীযুক্ত ওয়ার মল হাওড়া জেনারেল হাঁসপাতালে এক্সরে ও অপর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির জন্য এককালীন ১৫ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

---

সর্প ও বন্য জন্তুর উৎপাত ঃ—আসাম প্রদেশে গত ১৯১৭ সালে সর্প ও বন্যজন্তু কর্ত্তৃক ২৮৯ জন নিহত হইয়াছে। ১৩৮ জন বন্য জন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ৩৪০ হইয়াছিল।

---

নূতন চিকিৎসালয় ঃ—গত ২৯শে এপ্রিল লেডি উইলংডন বোম্বাই নগরে এক নূতন হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। এই হাঁসপাতালে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা স্থান পাইবেন। এই হাঁসপাতাল ৺লোকগত সার হরকিষেণ দাসের অর্থে নির্ম্মিত হইবে।

---

## সমাজ সেবা প্রদর্শনীর কয়েকটী তালিকা।

বঙ্গে সর্প দংশনে মৃত্যু।

| | |
|---|---|
| ১৯০৩—৪ | ১০,৩৯৪ |
| ১৯০৮—৯ | ৭,৪০২ |
| ১৯১৩—১৪ | ৪,৪৯১ |
| ১৯১৫—১৬ | ৪,৬০৯ |

ভারতে শিশু মৃত্যু।

যে স্থলে ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১ জন মরে সেই স্থলে ভারতের প্রধান প্রধান প্রদেশ সমূহে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ তাহার তালিকা।

| | | |
|---|---|---|
| বঙ্গদেশ | ... | ২৭০ |
| মন্দ্রাজ | ... | ১৯৯ |
| বোম্বাই | ... | ৩২০ |
| পাঞ্জাব | ... | ৩০৬ |
| যুক্তপ্রদেশ | ... | ৩৫২ |
| বিহার | ... | ৩০৪ |
| ব্রহ্মদেশ | ... | ৩৩২ |

অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ইংলণ্ডের ২½, ৩, কি ৪ গুণ।

নানারোগ।

প্রত্যেক ১৫ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনের চক্ষু খারাপ। প্রত্যেক ৫ জন মধ্যে ১ জনের দাঁত খারাপ। প্রতি ৬ জন মধ্যে ২ জন টন্‌সিল এবং ৭ জন মধ্যে ১ জনে স্ক্রুফুলা রোগে ভুগিতেছে।

বঙ্গে মাদক দ্রব্যের কাটতি।

মদ।

১৯১৫—৩১৩৯৫০০ সের।

১৯১৬—৩০১০০০০ সের।

১৯ ৭—৩১৮৫০০ সের।

গাঁজা।

১৯১৫—৯২০১৬ সের।
১৯১৬—৭৩২৯৮ সের।
১৯১৭—৭৫১৯৩ সের।

আফিং।

১৯১৫—৫২৮২৩ সের।
১৯১৬—৪৩৪৭৯ সের।
১৯১৭—৩৮১১৮ সের।

মাতলামির জন্য দণ্ড প্রাপ্ত।

বঙ্গে।

| | |
|---|---|
| ১৯১০—১১ | ৯২৮৭ |
| ১৯১৫—১৬ | ৯৩৭৮ |
| ১৯১৬—১৭ | ১৮৬৫ |
| ১৯১৬—১৭ | ৯৫৬৮ |

কলিকাতায়।

| | |
|---|---|
| ১৯১০—১১ | ৮২১৬ |
| ১৯১৫—১৬ | ৬৭৬৩ |
| ১৯১৬—১৭ | ৬৯৬৫ |

---

আর্থিক অবস্থা ও শিশুমৃত্যু ঃ—১৯১৪ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে এক বৎসরের কম বয়স্ক হাজার শিশুর মধ্যে ১০৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে ১১ কিন্তু ১৯১৬ সালে ৯১, ১৯১৭ সালে ৯৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইংলণ্ডের গরীব লোকদের কেহই এখন বেকার অবস্থায় বসিয়া নাই সকলেই বেশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে সুতরাং শিশুদিগকে ভাল খাওয়াইতেছে ও পরাইতেছে, ভাল স্থানে রাখিতেছে, কাজেই মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে। ১৯১৭ সালে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সঙ্গে মৃত্যু সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

---

## প্রাপ্তি স্বীকার।

ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথিক মতে তাহার প্রতিকার—ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক ডাক্তার আর, এল্, সুর, ১০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

লেখক এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য কলিকাতার এইচ, পি, ক্লাব হইতে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুস্তিকাখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

ছেলেদের গোরা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু কাব্য-বিনোদ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত স চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দৌলতপুর, খুলনা। মূল্য আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব লীলা প্রাঞ্জল পদ্যে ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া আ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ছাপা ও কাগজ ভাল।

---

# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল { ২য় সংখ্যা

## গ্রীষ্মে স্বাস্থ্য-রক্ষা

যে কোন কারণে শরীরকে নিস্তেজ করে, তাহা তেই রোগোৎপত্তির সুবিধা হয়। গ্রীষ্মে সাধারণতঃ লের শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। শরীরের কগুলি গ্রন্থিকে এই কালে অনেক অতিরিক্ত পরিশ্রম তে হয়। ভারতবর্ষে সর্দ্দিগরমী প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিরণে নিজেকে অধিকক্ষণ উন্মুক্ত রাখিলে ইহার ং আক্রমণ হয়। বিশেষ গ্রীষ্মের সময় রাত্রিকালেও মণ হইতে পারে। মস্তক এবং ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পাগড়ী বা হ্যাট ব্যবহার দ্বারা রৌদ্রকিরণ হইতে করিলে সর্দ্দিগরমীর আশঙ্কা অনেক কমিয়া যায়। বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা রাখা এবং অধিক লোকের নিবারণ করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার মাদক সেবন ত বিরত থাকা এই রোগ হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে ষ আবশ্যক। আহারের অব্যবহিত পরেই শয্যা ণের অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। রোগের প্রকাশ পাইলে—

(১) রোগীকে ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা ার ঘরে আনয়ন করিতে হইবে।

(২) তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিতে হইবে। মস্তক এবং স্কন্ধদেশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া রোগীকে লম্বাভাবে শোয়াইতে হইবে।

(৩) যে পর্য্যন্ত না রোগীর জ্ঞান হয় বা চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত রোগীর মস্তক, বক্ষ এবং মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিতে হইবে।

(৪) রোগীকে যথাসম্ভব স্থীর ভাবে থাকিতে দিতে হইবে।

শীত কাল অপেক্ষা গ্রীষ্ম কালে গৃহের অধিক সংখ্যক দরজা জানালা উন্মুক্ত রাখা, বায়ু চলাচলের ভালরূপ ব্যবস্থা করা এবং যথাসম্ভব মুক্ত বায়ুতে থাকা মানবের স্বাস্থ্যের মঙ্গলের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই ঋতুতে এসকলের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত।

রাত্রির বাতাসের জন্য ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। মশকে ম্যালেরিয়া বিষ ব্যাপ্ত করে, কিন্তু এজন্য বাতাসকে দোষ দেওয়া যায় না। মশারী, পর্দ্দা বা অন্য উপায়ের দ্বারা মশক এবং মক্ষিকাকে দূরে রাখিতে হইবে, কেবল আরামের জন্য নহে, স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়া ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই সকল সর্ব্বদাই রোগ

বীজ বহন করে, রোগীর গৃহ হইতে এসকলকে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

গৃহের জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইবে। বসতবাটী, কর্ম্মস্থল বা যেখানেই থাক না কেন নির্ম্মল বায়ু চলাচলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গ্রীষ্ম কালে যথা সম্ভব মুক্ত বায়ুতে থাকার সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।

গৃহের এবং আস্তাবল ও গোশালার আবর্জ্জনায় মক্ষিকা উৎপত্তির সুবিধা হয়। পুরাতন টিন, টব, পাত্র বা খানায় জল জমিয়া মশকের সৃষ্টি করে। এসকলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

## শিশুদের জন্য নিয়ম

এ সময়ে আহারের দোষে শিশুদের নানা প্রকার রোগাক্রমণ হইয়া থাকে।

মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর প্রকৃষ্ট আহার। যেখানে মাতৃদুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব, সেখানে স্বাস্থ্যবতী গাভীর দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোনরূপ পেটেণ্ট ফুড কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধই একমাত্র এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে কোন কঠিন খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। দন্ত নির্গমের পূর্ব্বে শিশুকে শ্বেত-সারময় কোন খাদ্য দেওয়া অনুচিত, শিশু ইহা পরিপাক করিতে পারে না। দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে কোন রূপ তৈয়ারী মিষ্টান্ন দেওয়া উচিত নয়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ফুটান জল ঠাণ্ডা করিয়া এ সময় শিশুকে মধ্যে মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে।

## পরিচ্ছন্নতা

শিশুকে স্তন্য দিবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনবৃন্ত ধৌত করা আবশ্যক। বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করাইতে হইলে সেই বোতল প্রতিবার ১০ মিনিট কাল ফুটন্ত জলে রাখিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। বোতলে লম্বা রবারের নল ব্যবহার করা অনুচিত, ইহা পরিষ্কার রাখা যায় না। রবারের বৃন্তটি পরিষ্কার করিয়া লবণের জলে ডুবাইয়া রাখা উচিত। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটী করিয়া নূ রবারের বৃন্ত আনা কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ যাহাতে ঠিক থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রা আবশ্যক। একবার মাত্র খারাপ দুগ্ধ খাওয়ানতে বি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে দুগ্ধ রাখার জন্য বরফের আবশ্যক হইতে পারে। পাওয়া না যাইলে দুই বেলা টাট্‌কা দুগ্ধ সংগ্রহের ব্য করা উচিত।

শিশুকে প্রতিদিন স্নান করান এবং তাহার অ নখ এবং চক্ষু সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

## পরিচ্ছদ

গ্রীষ্ম কালে শিশুরা অধিকাংশ সময়েই গো পরিতে আপত্তি জানায়। পোষাক আরাম দায়ক আলগা হওয়া উচিত। রাত্রে পোষাক খুলিয়া কর্ত্তব্য।

## সাধারণ নিয়ম

গ্রীষ্ম কালে অতিরিক্ত উত্তপ্ত স্থানে বা ঝড়ের মুখে শিশুকে রাখা উচিত নয়। অন্ততঃ দিনে এ কোষ্ঠ সাফ হওয়া উচিত, ইহার ব্যতিক্রম হইলে হইবার সম্ভাবনা। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে গরম পিচকারীর ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উদরাময়ের প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য উচিত। শিশুর মুখে চুম্বন করা অনুচিত।

## বালকগণের পক্ষে

দুগ্ধ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, হিসাবে নহে। পাকস্থলীর বাহিরেই দুগ্ধ তরল কিন্তু পাকস্থলীতে গিয়া ইহা কঠিন আকার ধারন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুবিধামত যখন তখন পান করা উচিত নয়।

কাঁচা অথবা অতিপক্ক ফল আহার করা উভয়েই উদরাময় আনয়ন করিতে পারে।

বালকগণকে হাত এবং নখ সর্ব্বদা পরিষ্কার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধিকাংশ সংক্রামক



সময়ে সময়ে এইরূপ অপরিচ্ছন্নতা হইতে আক্রমিত হয়। প্রত্যেক বার আহার গ্রহণের পূর্ব্বে হাত উত্তমরূপে ধৌত করা এবং পরে মুখ ও দন্ত উত্তমরূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্ম কালে অতিরিক্ত পরিশ্রম, বা ক্রিড়া দ্বারা অথবা বিষম গরম ঘরে বা রৌদ্রে থাকিয়া রক্তের তাপ বৃদ্ধি করা বিশেষ বিপজ্জনক।

বাস গৃহের সর্ব্বত্র সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত। ইহার দ্বারা রোগ উৎপাদন কারী বীজাণু সমূলে বিনষ্ট হয়। বীজাণু সমূহ অন্ধকার সেঁতসেঁতে এবং মলিন স্থানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য সকল স্থানেই সূর্য্য কিরণ প্রবেশের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

গ্রীষ্ম কালে গরম কাপড় পরিয়া শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট জনক।

গ্রীষ্ম কালে শীত কাল অপেক্ষা অল্প আহারের আবশ্যক হইয়া থাকে। তৈল, ঘৃত, মাংস, মিষ্টান্ন অপেক্ষা গ্রীষ্ম কালে অধিক ফলমূল ও সব্জি খাওয়া ভাল। ধীরে সুস্থে উত্তমরূপে চর্ব্বন করিয়া আহার করা উচিত। ক্লান্ত বা রাগান্বিত অবস্থায় আহার করা অনুচিত। আহারের সময় ব্যতিরেকে অপর সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করা যাইতে পারে। কোনরূপ মাদক সেবন করা কিছুতেই উচিত নয়।

যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত, কোষ্ঠ বদ্ধতার ফলে নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে।

কূপ ও নদীর জল দূষিত থাকিলে পানে টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি আক্রমণের সম্ভাবনা। সন্দেহ থাকিলে জল ভালরূপে ফুটাইয়া তবে পান করা উচিত।

গ্রীষ্ম কালে প্রত্যেক বিষয়েই ধীর হওয়া উচিত। হালকা ও আলগা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাস্তার ছায়াযুক্ত পার্শ্ব দিয়া চলা ফিরা করা কর্ত্তব্য।

অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান পরিত্যাগ করিতে হইবে। আহারের পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান অনিষ্ট জনক। আবশ্যক বোধ করিলে ১ হইতে ২ ঘণ্টা পরে স্নান করা যাইতে পারে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া গা মুছিবার পর শীত অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ গরম জলে পুনরায় স্নান করা উচিত।

---

# বাসক বা বাকস

লেখক—ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

এই উদ্ভিদ মাটিতে অধিক জন্মে। বঙ্গদেশ ব্যতীত উড়িষ্যা বিহার, অযোধ্যার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য ভারতে ইহার আধিক্য দেখা যায়। এক অযোধ্যার "রাম ঘাটে" অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয়গণের রাজপ্রসাদ চিহ্নিত স্থানে যত বাকস জন্মে যে তাহাতে বোধ হয় ভারতের ৩৩ কোটী লোকের ঔষধ হইতে পারে। এই স্থানে এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা নিয়ত বাকসের মালা প্রস্তুত করিতেছে। ইহাদের সাধারণ নাম আড়ুসেমাল বীণবন্‌শী।

এই উদ্ভিদের সাদা ফুল হয়। আকারে ক্ষুদ্র তীল ফুলের ন্যায়, ইহাতে স্নিগ্ধ সুগন্ধ আছে। বাসক মধু শূন্য নহে। মাছিতে বাকস ফুলে মধু সংগ্রহ করিয়া যে মধু প্রস্তুত করে তাহাকে অযোধ্যাপ্রদেশে আর নৈমিষারণ্য অঞ্চলে "আরু মৌ" কহে। বহু বিলাসী ব্যক্তি এই দ্রব্য দুগ্ধ সহ খাইয়া থাকেন কিন্তু একটুকু কেমন মাদক গুণ আছে। যাহারা কখনও বাকস মৌ খান নাই তাহারা সহস্য অধিক পরিমাণে খাইলে মাদকতা অনুভব করিবেন। ইহার পাতা চওড়া এবং দীর্ঘ, অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ বড় ক্ষণভঙ্গুর। পরিপক্ক গাছের শাখা, কাণ্ড এবং শক্ত শিকড় দিয়া বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর বৈরাগীগণ মালা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহার ফুলে দেবপূজা হয়। সময় সময় বাকসের একরূপ ক্ষুদ্র ফল হয়।

নাম। সংস্কৃত—বাসক, বাসা, শিংহিকা, বৈদ্যমাতা বৈদ্যসিংহী, রামরূপক, মাতৃসিংহী ইত্যাদি।

অমরকোশে শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে—

"বাসকো বাসিকা বাসাসিংহিকা রামরূপকঃ
মাতৃসিংহী বৈদ্যমাতা বৃষঃকসলোৎপাটন"।

হিন্দি—বাসা, অড়ুসা, বিসোংড়া।
মারহট্টে—আড়ুব্বসা।
কর্ণাটে—আড়সোগে।
উড়িষ্যায়—বাসা, বাসিকা।
তৈলঙ্গে—আড়াপাকু, আড়সারং।
তামিলে—অড়টোডে।
ল্যাটিনে—আধাটোডা ভেসিকা।
ইংরেজী—মালাবরনাট।

ক্রিয়া—কফনিঃবারক, আক্ষেপ নিবারক, পর্য্যায় নিবারক, বমন নিবারক এবং ক্ষয় নিবারক। ইহার পাতার উপাদানে নাইট্রোজিনাস অর্থাৎ শরীর রক্ষোপযোগী দ্রব্য আছে। আবার কার্ব্বনিক গ্যাস নাশক কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ দ্রব্য আছে বলিয়া বাসক ক্ষয়নাশক গুণশালী।

ব্যবহার। কাসি সংযুক্ত জ্বরে, চক্ষু পীড়ায়, শ্বাস রোগে, হুপিংকফে এবং পুরাতন জীর্ণ জ্বরে, হৃদপিণ্ডের পীড়ায়, যকৃৎ বিকৃতি পীড়ায় অর্থাৎ জনডিস্ (কামলা পীড়ায়) দেশীয় কবিরাজগণ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজনির্ঘণ্টকার বলেন—

বাসতিক্তা কটুঃশীতাকফঘ্নী রক্তপিত্তজিৎ।
কামলা কফ ক্লম্মৎ জ্বর শ্বাসক্ষয়া পহা॥

অর্থাৎ বসা তিক্ত, কটু শীতল তথা কাসি রক্ত পিত্ত কামলা ও কফ বিকলতা, জ্বর, শ্বাস আর ক্ষয় পীড়া নাশক। ইহার শ্লেষ্মা নিবারক শক্তি দেখিয়া বৈদ্যগণ "বসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড" "বাসারিষ্ট" প্রভৃতি এবং ডাক্তারগণ সিরাপ প্রস্তুত করিতেছেন। বস্তুত বাসক বিদেশী ইপি সেনেগা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যুত বা বিশেষে অমৃত। বাসা কুষ্মাণ্ড খণ্ড, বাসারিষ্ট, বা সিরাপ খাইয়া বহু রোগী নব জীবন লাভ কর থাকেন।

কাসিযুক্ত জীর্ণ জ্বরে বাসক ব্যবহার করিলে উপকার হয় ইহা আমাদের শত শত স্থানের দ্রষ্টব্য স

শ্লেষ্মা তরল করিতে ইহার ক্ষমতা অতুল্য। ফুসফুস সম্বন্ধীয় যে কোন উপদ্রবে বাসক ব্যব করা যায়।

ফুসফুস পীড়িত ব্যক্তিকে নিম্নের ব্যবস্থিত দেওয়া যাইতে পারে—

বাসকের পাতা ডাটা—১ পোয়া
বকফুলের পাতা ফুল—১ পোয়া
অর্ক পত্র (আকন্দ পত্র)—১ তোলা
চালকুমড়া—১ পোয়া

এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের রাখিতে পরিশেষে তাহা ফিলটারিংপেপারে বা ব্লটিংকাগজে শুভ্র ফ্লানেল বস্ত্রে ছাকিয়া তাহার সহিত কিসমিস চিনি সমপরিমানে লইয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ পোয়া চিনি পোয়া কিসমিস লইয়া পুনরায় সিদ্ধ করিবে। যখন পোয়া থাকিবে তখন নামাইয়া প্রত্যহ প্রাতে আর ২ ড্রাম (১২০ ফোটা) করিয়া গরম দুগ্ধসহ খাইতে এই ব্যবস্থায় আমি বহু পীড়িত ব্যক্তিকে কাসির পাতে উপকার লাভ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ত্তমান ডাক্তারী ঔষধ দুর্ম্মূল্যের বাজারে সাধ এইরূপ দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অল্প মূল্যে আরোগ্য করিতে পারেন।

জীর্ণজ্বর কাসিতে নিম্নের ব্যবস্থা অতি ফলপ্রদ—

আতৈস—১ তোলা
মুথা—১ তোলা
আকন্দ নির্য্যাস (আঠা)—সিকিতোলা
কন্টিকারী—½ অর্দ্ধ পোয়া



বাকস পত্র—১ পোয়া
বকফুলের পাতা—½ পোয়া
জল ⁄১ সের শেষ—১ পোয়া

মাত্রা ২ ড্রাম। দিনে ১ বার।

আবার নূতনজ্বর, কাসি, পার্শ্ব বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবে নিম্ন ব্যবস্থিত ঔষধ উৎকৃষ্ট।

বাকস পত্র—২ তোলা
গুলঞ্চ—১ তোলা
ক্ষেত্রপটপটি (ক্ষেতপাপড়া)—১ তোলা
রক্তচন্দন—½ তোলা
কিস মিস্—২ তোলা
বিল্বপত্র—১ তোলা
এক সের জল—শেষ অর্দ্ধ পোয়া। ১ তোলা মধু অথবা ½ আউন্স চিনির রস সহ শূন্য উদরে একবার মাত্র খাইতে দিবে। ইহার সঙ্গে বাকসের ফুল পিষিয়া রস লইয়া পার্শ্ব বেদনা স্থানে মালিষ করিতে হয়।

সাধারণতঃ শ্লেষ্মা শুষ্কতা পীড়ায় "বাকস মধু" নামক কবিরাজী ঔষধ চাটিয়া খাইলে যথেষ্ট উপকার হয়। কোন কোন অভিজ্ঞ দেশীয় চিকিৎসক এই বাকস মধু সহ "অর্কাবলেহ" অর্থাৎ—

সুট—১ তোলা
মরিচ—১ তোলা
পিপুল—১ তোলা
মধু—অর্দ্ধ ছটাক মিশাইয়া খাইতে দেন।

দেশীয় গুল্মে প্রস্তুত ঔষধগুলি সর্ব্বত্র সুলভ, সাধারণের মধ্যে ব্যবহারের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

### মল নিঃসার।

#### চর্ম্ম ও বৃক্কযুগ।

মানুষের শরীর যে কোষপুঞ্জের সমষ্টি—এ কথা বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে। এই কোষপুঞ্জের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কোষ রক্ত হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট ও ক্রিয়াশীল হয় এবং শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক কোন কোন পদার্থ বর্জ্জন করিয়া থাকে। এই বর্জ্জিত বস্তু রাসায়নিক কর্ম্মশালার Waste product বা বর্জ্জনীয় উপাদান বা নগর ও পল্লীর আবর্জ্জনা বা মলের উপমাস্থল বলা যাইতে পারে। শরীরের সর্ব্বত্র কোষ সমূহের এই গ্রহণ ও বর্জ্জন ক্রিয়া চলিতেছে, সুতরাং দেহের শোণিত সহস্র ধারায় কেবল যে শরীরের পুষ্টিকর উপাদান বহিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাহা নহে, শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কালে তাহাতে যে মল সঞ্চিত হইতেছে, তাহাও উহাকে বহিতে হইতেছে। শরীরে রক্ত ধারার দ্বারা কোষপুঞ্জের পুষ্টিকর উপাদান সংবহন এবং তৎসমুদয়ের মল বা আবর্জ্জনা নিষ্কাশন, এই দুইটি কাজই চলিতেছে।

শোণিত ধারা যে মল সম্ভার বহন করিতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইলে নিষ্কাশিত বা নিক্ষিপ্ত হয়। ঐরূপ কার্য্য ব্যবস্থা না থাকিলে বা উহার বিপর্য্যয় ঘটিলে শরীরে বিষক্রিয়া অনিবার্য্য। মানুষ যখন uræmia রোগে আক্রান্ত হয় তখন রক্তে এত অধিক পরিমাণে অনিষ্টকর বর্জ্জনীয় উপাদান সঞ্চিত হয় যে রোগী উহার প্রাবল্যে প্রলাপ বকিতে থাকে এবং

অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শোণিতে সঞ্চিত মলের প্রাচুর্য্য বশতঃ বিষক্রিয়া হওয়াতেই রোগীর ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে; সময়ে সময়ে রোগের অত্যন্ত প্রবলতা হেতু এই রোগে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

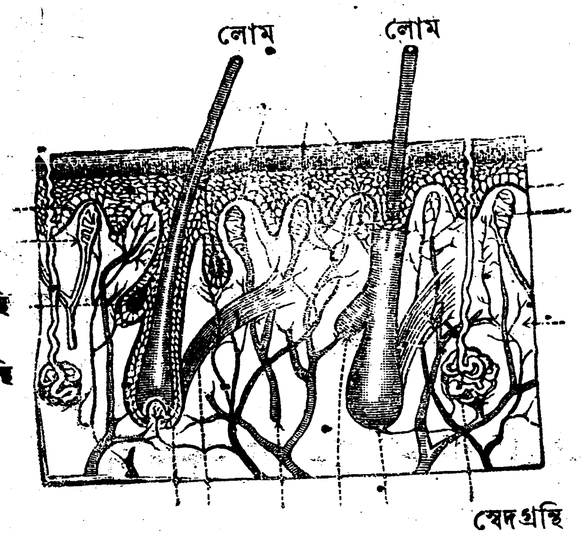

এই সকল কারণে দেহের উপাদানীভূত কোষপুঞ্জ হইতে মল নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শোণিত ধারার বিশুদ্ধি সাধনের উপযোগী সুকৌশল সম্পন্ন যন্ত্র-তন্ত্র থাকা আবশ্যক। বৃক্কদ্বয়ের উপর প্রধাণতঃ রক্ত ধারার পরিশোধন কার্য্যটি নির্ভর করিতেছে। শরীরের দ্বারাও রক্তশোধন কার্য্য কতকটা চলিয়া থাকে এবং অবস্থা বিশেষে ঐ কার্য্যের পরিমাণ খুব বাড়িতেও দেখা যায়।

চর্ম্ম হইতে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে স্বেদ বা ঘর্ম্ম বলে। শরীর হইতে অবিরত স্বেদ নির্গম হইলে আমরা উ... জানিতে পারি না। কারণ যে সময় ... নির্গম খুব বেশী হয় অথবা স্বেদ বাষ্পাকারে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে, যখন স্বেদ বি... চর্ম্মের উপর সঞ্চিত হয়, তখন আমরা ঘ... নির্গম দেখিতে ও জানিতে পারি। গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। যে গ্রন্থিগুলি দ্বারা স্বেদ নির্গম কাজটি সম্পা... হইতেছে, তাহারা রক্ত হইতে ভুক্তাবশেষ উপাদান ক্রমাগত পৃথক করিয়া দেহের বাহিরে ফেলিয়া দিতেছে। চর্ম্মে অসংখ্য ছি...




চিত্র ৪৮—ত্বকের কর্ত্তিত অংশ (বৃহদিকৃত)

আছে; এই ছিদ্রগুলি স্বেদ বাহী নালিকা গুলির মুখ স্বরূপ, সুতরাং ঐ সকল ছিদ্র দিয়া স্বেদ বা দেহের অনিষ্টকর মল বাহিরে নির্গত বা নিক্ষিপ্ত হয়। ( ৪৮ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য। ) এক খণ্ড চর্ম্মের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে, স্বেদগ্রন্থিগুলি চর্ম্মের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া বহুমুখে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মুখগুলি ছিদ্র সমবায়। এই ছিদ্র সংখ্যা সুবিপুল, একটা মুদ্রার দ্বারা চামড়ার যতখানি স্থান ঢাকা পড়ে তাহাতেও ন্যূন কল্পে ৩৮০০ ছিদ্র আছে। সমস্ত মানব শরীরে অন্যূন ত্রিশ লক্ষ স্বেদ নির্গম নালি আছে। সুতরাং প্রতি মিনিটে যদি একটি করিয়া ছিদ্র গণনা করা যায় তাহা হইলে ছিদ্র গণনা শেষ করিতে ছয় বৎসর লাগিবে, আর যদি এই সূক্ষ্ম নালিকা গুলিকে পরস্পরের প্রান্তদেশে জোড়া দিয়া সংলগ্ন করা যায়, তাহা হইলে উহারা দীর্ঘে আটাশ মাইল হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ এই মানব দেহে ২৮ মাইল দীর্ঘ স্বেদ নির্গম না... রহিয়াছে!

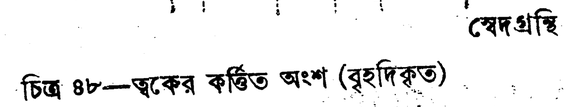

স্বেদে বা ঘর্ম্মে শতকরা ৯৯ অপেক্ষা কিছু অল্প ... আছে। বাকী সমস্তটা সাধারণ এবং অন্যান্য প্রকার লবণ। তদ্ভিন্ন হইাতে কিয়ৎ পরিমাণে urea আছে। urea প্রধানতঃ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম ও মূত্রের স্রাব অনেক পরিমাণে পর... সাপেক্ষ। গ্রীষ্মকালে যখন ঘর্ম্ম বহুল পরিমাণে বা... কারে বাহির হইয়া যায় সেই সময় রক্তের জলীয় উপা... স্বেদকূপ দ্বারা নির্গত হওয়াতে মূত্র অত্যন্ত গাঢ় ও ... গন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। আবার uræmia রোগে ... (kidneys) দ্বারা শোণিত শোধন কার্য্যটি খুব ... পরিমাণে সম্পন্ন হওয়াতে রক্তে মূত্রোপাদানের (... প্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে। ঐ অবস্থায় নিষ্ঠীবন বা থুথুতে এবং লালাতেও মূত্রোপাদানের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অবস্থায় চিকিৎসকেরা দেহের মল নিষ্কাশন করিবার জন্য উষ্ণ জলসিক্ত স্পঞ্জ দ্বারা শরীর মার্জ্জনা, তপ্ত বায়ুতে ও তপ্ত বাষ্পে স্নান প্রভৃতির দ্বারা এবং স্বেদনালীর উত্তেজনাকর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রক্তের ক্লেদ নির্গমের চেষ্টা করিয়া থাকেন! তদ্ভিন্ন তিনি রেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর অন্ত্র ও মলভাণ্ড পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মোট কথা এই অবস্থায় চিকিৎসক শরীরের সর্ব্বপ্রকার মলদ্বার মুক্ত করিয়া উহার ক্লেদ অপসারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই রোগে কোন কোন রোগীর ঘর্ম্মের সহিত urea এত অধিক পরিমাণে বাহির হয় যে রোগীর শরীর uread অতি সূক্ষ্ম দানা ( crystal ) সমূহে আকীর্ণ হয়। সুতরাং যাঁহারা সাধারণতঃ কীডনী বা বৃক্ক সংক্রান্ত রোগে ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করেন তাঁহারা গরম জলে স্নান ও শরীরের চর্ম্ম মার্জ্জনা করিয়া চর্ম্মের সর্ব্ববিধ ক্লেদ দূর করেন।

শরীরের ছিদ্র সমূহ হইতে আর এক প্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে তৈলোপাদান (sebum) বলে, ইহা শরীরের ত্বক্ চর্ম্মকে চাকচিক্যশালী করে। স্নেহগ্রন্থি ( sebaceous glands ) নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থি দ্বারা ঐ স্নেহ বস্তু নির্গত হইয়া থাকে। ( ৪৮ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য ) এই স্নেহবস্তু ( sebum ) মেদ জাত, কেশ কলাপকে মসৃণ ও কান্তিযুক্ত করাই ইহার কার্য্য।

এইবারে আমরা বৃক্কদ্বয় ( kidneys ) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শরীরের মল নিঃসারক গ্রন্থিগুলির মধ্যে এই দুইটি গ্রন্থি সুবৃহৎ। এই গ্রন্থি দুইটি উদরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবিষ্ট। মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে উভয়ের স্থিতি।

এই জন্য পৃষ্ঠশূলের কারণ বৃক্কের বিকার-জাত বলিয়া সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পৃষ্ঠশূল অপনোদন করিবার জন্য পূরা এক গ্লাস গরম জল পান করিতে হয়, ইহাতে বৃক্ক প্রক্ষালিত হইয়া স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃক্ক যুগল কি প্রকারে শোণিত-শোধন কার্য্য পরিচালনা করে এইবারে তাহার পরিচয় দিব। প্রথমে বৃক্কদ্বয়ে যেরূপ বৃহৎ ধমনী মালা সন্নিবেশিত আছে, যন্ত্রের আকারের তুলনায় তেমন বড় বড় ধমনী আর কোন যন্ত্রে নাই। এই ধমনী মালাকে renal artaries শোণিত-শোধনী ধমনী মালা বলে, এই ধমনী মালা প্রত্যক্ষ ভাবে মহাধমনী ( aorta ) হইতে বাহির হইয়া বৃক্ক দুইটির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্র ও মহাধমনী ব্যতীত এই ধমনী সকলের মধ্যে রক্তের চাপ খুব বেশী। কাজেই রক্তধারা অতিবেগে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। বৃহৎ ধমনীমালা বৃক্কদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াই বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখা ও প্রশাখার প্রান্ত আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ইংরাজী হরপ ( T ) টির ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। বৃক্কবাহী ধমনী গুলির শাখা প্রশাখা পুঞ্জ মিলিয়া আবার একটি ধমনীময় খিলান ( artereal arch ) গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ধমনী রচিত খিলান হইতে শ্রেণীবদ্ধ আধার সমূহ ( vessels ) পেরিফ্রি Periphry অভিমুখে গিয়াছে; এবং পশ্চাদ্ভাগে বৃক্ক যুগলের কেন্দ্রাংশেও প্রসারিত হইয়াছে।

Periphry অভিমুখগামী আধার শ্রেণী আবার অনেক শাখা প্রসারিত করিয়াছে। পরিশেষে এই আধার শ্রেণীর শাখাগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখায় পরিণত হইয়া বহু সংখ্যক জালিকার সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য যন্ত্রের জালিকামালার ন্যায় বৃক্কের এই সূক্ষ্ম আধার পুঞ্জ রচিত জালিকাগুলিতে মৃদুভাবে এবং অবাধে রক্ত-প্রবাহ বহিয়া থাকে, ইহাদিগের মধ্যে শোণিতের চাপ বেশী হইলে এগুলি প্রসারিত হয় এবং রক্তের চাপ কম পড়িলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

রক্তের আতিশয্য ঘটিলে ও চাপ অত্যন্ত অধিক হওয়াতে যখন এই আধার পুঞ্জ গ্রথিত জালিকা মালার অতি প্রসার ঘটে, তখন ইহাদিগের আবরণ পট ভেদ

করিয়া রক্তের তরল উপাদান বাহির হইয়া যাইতে পারে। শরীরের সকল অংশে শোণিত প্রবহন কার্য্যে এই প্রকার তরল উপাদান নির্গমের ব্যবস্থা আছে এবং অত্যাধিক পরিমাণে ঐ কাজটিও চলিতেছে, কিন্তু বৃক্কের জালক মালায় আধার শ্রেণীর সংখ্যা বাহুল্য এবং ধমনী-মালা মধ্যে শোণিতের চাপের আধিক্য বশতঃ বৃক্কে ঐ প্রকার তরলোপাদান বর্জ্জনের ক্রিয়াও অধিক হইয়া থাকে।

কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে যে তরল উপাদান নির্গত হয় এবং বৃক্কদ্বয় হইতে মূত্রাকারে যে তরল পদার্থ নির্গত হয় তদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাঠকের বোধ করি স্মরণ থাকিতে পারে জালিকামালার সাহায্যে যে




চিত্র ৪৯—বৃক্কের নালিকা এবং ইহার গতি-বৈচিত্র্য

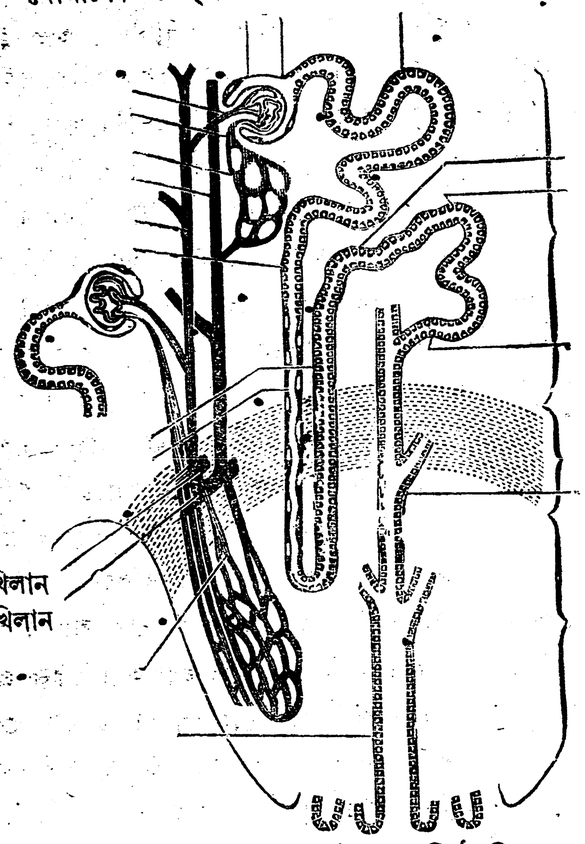

এখন বৃক্কের এই দীর্ঘ নালিকার কাজটি কি, একবার আলোচনা করা যাউক। ইহা সাধারণ নলের ন্যায়

রসধারা শরীরের সর্ব্বাংশে নীত হয় তাহা serum ন... রক্তরস নামক পুষ্টিকর তরল উপাদান, কিন্তু বৃক্কদ্বয়ে... বিশিষ্ট জালিকা পুঞ্জ চুঁয়াইয়া যে তরল পদার্থ বাহির হয় তাহা পুষ্টিকর রস নহে, সুতরাং জালিকাগুচ্ছ ( glome... ruli ) চুঁয়াইয়া যে তরল উপাদান বাহির হয় তাহাতে সাধারণ জল থাকে।

জালিকাগুচ্ছ একটি থলিয়া বা টুপীর ন্যায় একটি ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা। এই ঘেরাটোপটি প্রথম বোমান সাহেবের দৃষ্টিপথে পড়ে, তাই উহার নাম বোমানের ঘেরাটোপ ( Bowman's Capsule ) এ... ঘেরাটোপের ভিতর দিয়া জালকগুচ্ছে জল প্রবেশ করে।

## বৃক্কের নালিকা

বৃক্কে সহস্র সহস্র অতি সূক্ষ্ম নালিকা আছে। অনুবীক্ষণ ব্যতীত এই নালিকাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। জালিকাগু... হইতে যেমন ফোঁটায় ফোঁটায় জল চুঁয়াইয়া পড়িতে থাকে, এই আণুবীক্ষণিক নালি... ( Tubule ) অমনি সেই জলবিন্দু সকল সংগ্রহ করিতে থাকে। এই নালিকা গুলি... গতি সরল নহে, ইহারা বৃক্কদ্বয়ের উপাদান মধ্যে বাঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তা... দিগের বিভিন্ন অংশ সমূহে গিয়াছে ... তাহাদিগের বৈচিত্র্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন না... পাইয়াছে। উপরে প্রকাশিত চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকগণ এই নালিকাগুলির গতি... বৈচিত্র্য ইত্যাদি জানিতে পারিবেন। এ... নালিকার গতি-বৈচিত্র্য হেতু উহার না... বৈচিত্র্যও ঘটিয়াছে। এস্থলে আমরা নালিকা... গতি-বৈচিত্র্য ও নাম- বৈচিত্র্যের বিশদ ব... অনাবশ্যক মনে করি।

জল নির্গমের প্রণালী নহে। এই নালিকা স... ক্রিয়াশীল কোষাণুপুঞ্জের দ্বারা আবৃত। জালিকা...



...হিত নালিকায় জল প্রবেশ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বিশুদ্ধ জল। রক্তে যে সব লবণ আছে এই জলে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃক্কগত কোষপুঞ্জের (renal cells) ক্রিয়া বশতঃ জল যখন নালিকা বাহিয়া নিম্নগামী হয় তখন রক্তের বিষ-বস্তু ও ক্লেদ উহার সহিত মিলিত হয়। এখন রক্তের গতিধারার ...ার একবার অনুসরণ করা যাউক। রক্ত যখন জালিকা ...চ্ছের বাহিরে আইসে তখন ইহার জলভাগের একাংশ একটি কোষের দ্বারা শোষিত হয়। এই জল শোষণ...কারী কোষ আবার বিচিত্র আকার ধরিয়া জালিকাপুঞ্জে পরিণত হয়, সেই জালিকাপুঞ্জ নালিকা সমূহের মধ্যে সজ্জিত থাকে। এই প্রকার নালিকা মধ্যবর্ত্তী জালিকা-পুঞ্জের নাম

## "আন্তর্নালিক জালিকাপুঞ্জ"

—Inter tubular capillaries. এই অন্তর্নালিক জালিকাপুঞ্জ মিলিয়া একটি আধার গড়িয়াছে, এই আধারই বৃক্কগত শিরার মূল। যখন রক্ত এই অন্তর্না-...লিক জালিকাপুঞ্জের ভিতর দিয়া বাহিয়া যায় সেই সময় ...বৃক্ক কোষগুলি ( renal cells ) রক্ত হইতে লবণ ...সমূহ ও মূত্রোপাদান গ্রহণ করিয়া জালিকাগুচ্ছ বিশ্লিষ্ট জলে মিশাইয়া দেয়। সুতরাং বৃক্কগত শিরাপথে যে রক্ত ধারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিম্ন মহাধমনী মধ্যে প্রবেশ ...রে তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের শরীর জাত বিষ ও ক্লেদ মুক্ত।

আমরা দেখিয়াছি, জলধারা বৃক্কদ্বয়ের নালিকার ...ভিতর দিয়া বহিয়া উহাদিগের বৃক্কগুহা ( pelvis ) ...পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছে, এবং ঐখানে আসিয়াই উহাদিগের ...শেষ হইয়াছে। এই গুহা-প্রাচীর যদি মসৃণ হইত তাহা হইলে উহার গাত্রে অসংখ্য নালিকামুখের সমাবেশ কথনই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মানব-দেহ-শিল্পীর কৌশল এমন চমৎকার যে গুহাগাত্র কোনাকার ...টক-মালার দ্বারা আচ্ছন্ন। এই গঠন-নৈপুণ্য বশতঃ ...গুহের গাত্র ও তলদেশে স্থান সঙ্কুলানের এমন সুবিধা হইতেছে, প্রত্যেক নালিকার মুখ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে।

বৃক্কের এইরূপ গঠন ও ক্রিয়াপ্রণালী বশতঃ উহার মধ্যে বাহিত মূত্র পূর্ব্ব-বর্ণিত সম্প্রসারিত কক্ষে সঞ্চিত হয়। এই কক্ষটির নিম্নপ্রান্তলগ্ন একটি সরু নল আছে; উহা মরাল পুচ্ছের মূলদেশের ন্যায় স্থূল। এই নল দিয়া কক্ষমধ্যে সঞ্চিত মূত্র নিম্নগামী হয়। এই নলের নাম

## মূত্রপ্রসেক

( Urater ) এই মূত্রপ্রসেক দ্বারা মূত্রধারা বৃক্ক হইতে মূত্রাশয় ( Bladder ) মধ্যে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক বৃক্ক হইতে এক একটি মূত্রপ্রসেক নালী আসিয়া মূত্রাশয়ের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। মূত্রপ্রসেক মূত্রাশয়ের পেশীময় প্রাচীরের ভিতর দিয়া এমন কৌশলে বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, মূত্রাশয় হইতে কীডনী অর্থাৎ বৃক্কযুগলে মূত্রের ফিরিয়া যাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে। মূত্রাশয়ই মূত্রের আধার; এই আধারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মূত্র সঞ্চিত হইলে, তাহাতে যে এক প্রকার অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহাকে প্রস্রাবের বেগ বলে। এই প্রস্রাবের বেগ হইবামাত্র মূত্রাশয়ের মুখস্থিত গোলাকার মূত্ররোধক পেশী শিথিল হয় এবং প্রস্রাব নির্গত হয়। অল্প বয়স্ক বালকবালিকাদিগের মধ্যে কতকগুলি শিশুর স্নায়ুতন্ত্রে এরূপ বিকলতা দেখা যায় যে তাহারা মূত্ররোধক গোলাকার পেশীর পরিচালন কার্য্যটি আয়ত্ত করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞাত-সারে শয্যায় মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে।

অতিশয় এবং আকস্মিক উদ্বেগ বশতঃ সময়ে সময়ে ধমনীতে রক্তের চাপ এত অধিক হয় যে লোকে ঐ অবস্থায় স্বচ্ছ জলের ন্যায় প্রচুর মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এইরূপ ঘটিবার হেতু এই যে শোণিতের চাপে অত্যধিক পরিমাণ জল নালিকা মধ্যে নীত হওয়াতে রক্তের বিষময় বস্তু ও ক্লেদ আহরণের অবসর থাকে না।

আলকোহল প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ এবং ( diuretics ) পর্য্যায়ভুক্ত কতিপয় ঔষধ সেবনে

মানুষের মূত্রস্রাব অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু মূত্রস্রাব বেশী হয় বলিয়া রক্তের বিষ-বস্তু ও ক্লেদও যে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পানীয় জল অধিক পরিমাণে পান করিলে রক্তের জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মূত্রের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়। বিশেষতঃ ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে মূত্রের ঐরূপ পরিমাণ বৃদ্ধি বেশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ঈষদুষ্ণ গরম জলের মত স্রাবক আর নাই বলিলেই হয়। অনেকেই মূত্রের উজ্জ্বলতা ও বর্ণের গাঢ়তা দেখিলে শঙ্কিত হয়। আবার যদি সঞ্চিত মূত্রের নিম্নে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ জমিতে থাকে তাহা হইলে উহারা মহা ভীত হইয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। প্রস্রাবের পর সঞ্চিত মূত্রের নীচে ক্লেদ জমিলেই সাধারণতঃ লোকে কীড্নী বা বৃক্ক পীড়ায় আক্রান্ত হয় না। সাধারণ মূত্র অনেকক্ষণ কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে উহার নীচে কিঞ্চিৎ ক্লেদ জমিয়া থাকে, তাহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। সময়ে সময়ে কিছু বেশী পরিমাণে ক্লেদ জমিলেই যে বৃক্কের বিষম পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ভাবিতে হইবে, তাহাও নহে। অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মশলা চর্চ্চিত ও উপাদেয় খাদ্য আহার করিলেও ঐরূপ ফল ফলিয়া থাকে। আবার অল্প পরিমাণে জল পান করিলে এবং ব্যায়ামজনক শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ থাকিলেও সঞ্চিত মূত্রের তলায় ক্লেদ জমিয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় মাংস পলান্ন প্রভৃতি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া মুক্তস্থানে চলাফিরা করিলে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করিলে মূত্রে ক্লেদ সঞ্চয়ের প্রতিকার হইতে পারে। পানীয় জলটি ঈষদুষ্ণ হইলেই আশু ফল লাভের সম্ভাবনা। আহার সম্বন্ধে একটু সংযম ও শারীরিক পরিশ্রমে যে ঐ প্রকার রোগের প্রতিকার হইতে পারে ইহা হয়তঃ অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না কেননা মূত্রে ক্লেদ সঞ্চিত হইলেই তাঁহারা বৃক্কের বিষম বিকার বশতঃ দারুণ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। অনভিজ্ঞতা জনিত ভয়ে আমরা যে অনেক সময় তিলকে তাল করিয়া তুলি তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা যেমন বুঝেন, শারীর-তত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ষোল আনা "আনাড়ী" পরম পণ্ডিত লোকে তাহা বুঝিবেন না।

---

# স্বাস্থ্য ও স্বরোদয়

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী।

স্বাস্থ্যের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিশ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্য মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারাই এক সঙ্গে সমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারাই আমরা সমভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নি[illegible] অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয় তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ইংরাজি কি আধুনিক বাঙ্গালা কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারিরীক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অতীব কৌতুহল জনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েক খানি প্রাচীন যোগ শাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট সুবিস্তৃত নাড়ী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ নাড়ী সকল নাভির নিম্নে মুলাধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপে শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে খ্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উভয় নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চন্দ্র স্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নি স্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃত রূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত, পিঙ্গলা রৌদ্র অর্থাৎ তেজঃ রূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয় তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ূ প্রবাহিত হয় তখন সর্ব্বকার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হন নাই। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্য্যের সফলতা ও নিস্ফলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক তাহা বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদুর সুবিধা জনক সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। ধৈর্য্যচ্যুতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিষদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৌতুহলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল শ্বাস প্রবাহিত হইয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার অন্য নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যত্তিক্রম দেখা যায় তবেই বুঝিতে হইবে যে তাহার শরীরে হয় কোন ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছে, না হয় ব্যারাম আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্ত্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন তাহারা ব্যারামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যারামের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যারাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে শ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যারাম আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যারাম আরোগ্য হইবার পূর্ব্বেও এই অনিয়মিত ভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটি বিষদ তালিকা যোগ শাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যারামে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস অনেক ব্যারামই এই প্রণালিতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল মাথা ব্যাথা, কয়েক প্রকারের জ্বর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যারাম ( Asthma ) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যারামে ইহা ইন্দ্রজালের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের

টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু ডুবু খাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল সর্ব্বক্ষণ যখন এই আশঙ্কা করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্ত্তনের ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

এমন কি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই সকল রোগ আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথম। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নাসিকায় যায়। যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বাম পার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যারামের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অন্য প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়। যে নাসিকায় বায়ু বহিতেছে তাহা তুলার পুঁটলি ( Plug ) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলাদ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চাপনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম দুই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্য্যের সহিত কিছু কাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ। প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝাইতে হইলে অনেক গুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্য কি প্রকারে শ্বাসের ব্যারামের ( asthma ) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যারামের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক্ সেটি দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া সেই অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে হইবে; তাহার পর এক দেরী না করিয়া অর্থাৎ বায়ু কুম্ভক না করিয়া দক্ষি নাসাপুট অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া বা নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। আবার এ প্রকারে, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই ( সাধারণ প্রাণায়ামে ন্যায় বাম নাসিকা দ্বারা নহে ) শ্বাস গ্রহণ করিয়া বা নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ মিনিট করিতে পারিলে সদ্য ও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যা শ্বাসের ব্যারামের প্রকোপের সময় এই ক্রিয়া করি খুবই কষ্ট হয়। নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে প্রথম রোগীরা ইহা করিতেই চাহে না। কিন্তু এ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত যদি কিছু কাল, অন্তত মিনিট এইরূপ করা যায় তবে আর শেষে কষ্ট হয় প্রবল শ্বাসের টান ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। বো যেন এক মুহূর্ত্তে প্রবল ঝড় প্রসমিত হইয়া প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু টানিতে বলিলাম কারণ ব্যারামের সময় নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু যদি ব্যারামের সময় বাম নাসিকাপুট দিয়া প্রবাহিত হয় তবে উহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবল করিতে হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ এবং দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা তা এইরূপ বারে বারে করিতে হইবে। এই ক্রিয়া করি সময় বিছানায় শয়ন করিয়া করাই ভাল। বলা পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সুবিধাটুকুও ইহাতে লওয়া যা পারিবে।

শ্বাসের ব্যারামের ন্যায় অজীর্ণ রোগেও ইহা ফল প্রদ। যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে প্রবাহিত হয় তখনই আহারের প্রকৃষ্ট সময়। এই আহার করিলে তাহা সহজে জীর্ণ হয়। আহারের কিছু কাল দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হওয়া দর সেই জন্য আহারের পর কিছু কাল বাম পার্শ্বে শয়ন আবশ্যক। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই নিয়মটি অবলম্বন করিয়া দেখিলে উপকার পা সম্ভাবনা।



# প্লেগ ও মূষিক।

ভারতীয় প্লেগ কমিশন বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর প্রমাণিত করিয়াছেন যে (১) মানবের বিষ্টবনিক প্লেগ আক্রমণ রুগ্ন মূষিক হইতেই ঘটিয়া থাকে। (২) এই সংক্রামণ Rat-flea নামক এক প্রকার মক্ষিকা দ্বারাই মূষিক হইতে মূষিকে এবং মূষিক হইতে মানবে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে।

প্লেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা বহু পুস্তক লিখিত হইতেছে, কিন্তু সেই সকল পুস্তক চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন জনসাধারণের দৃষ্টি পথে অতি অল্পই পতিত হয়। এদেশে সর্ব্বত্র প্লেগের যেরূপ প্রভাব তাহাতে সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র সমূহে সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই প্রবন্ধটীতে সকল বিষয় সরল-ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দির শেষ ভাগে এবং দ্বিতীয় শতাব্দির প্রথম ভাগে ইজিপ্ট ও সিরিয়া দেশে প্লেগের আক্রমণ হইয়াছিল, ইতিহাসে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ। ইহার পরে সময়ে সময়ে অনেকেই এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ অব্দে একজন জাপানী ডাক্তার ( Yersin ) আবিষ্কার করেন যে Bacillus Pestis নামক এক প্রকার বিশেষ বিজাণুই এই রোগের কারণ। পরে তিনি ইহাও প্রমাণ করেন যে এক প্রকার মক্ষিকা দ্বারা রোগ বীজাণু বাহিত হয়। এই মক্ষিকা যে কেবল রোগ বীজাণু বহন করে তাহা নহে, মক্ষিকার পাকস্থলীতে বীজাণুর সংখ্যাও বিশেষ বর্দ্ধিত হয়।

নানাজাতীয় বিভিন্ন প্রকারের মূষিক আছে। তাহা-দিগকে গৃহ-মূষিক ও ক্ষেত্র-মূষিক এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গৃহ-মূষিক আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে শ্রেণীর দ্বারা প্লেগ রোগ বিস্তৃত হয় আমরা তাহারই বিষয় আলোচনা করিব। এই শ্রেণীর মূষিককে ডাক্তারীতে 'Mus Rattus' বলে। বোম্বাই প্লেগ কমিশন এক বৎসর গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই মূষিকই প্লেগ বিস্তারের জন্য বিশেষরূপে দায়ী। এক বৎসর ধরিয়া বিশেষ প্রমাণ ও পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, (১) "Mus Rattus"ই ভারতে প্লেগ বিস্তারের সর্ব্বপ্রধান কারণ (২) এবং এই শ্রেণীর মূষিক দ্বারাই প্লেগ রোগ এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ কালের মধ্যে মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হয়। এই মূষিকের বিশেষত্ব এই যে (১) ইহাদের বর্ণ ধূসর নহে, কাল। (২) আকৃতি বেঁটে এবং মোটা নহে কিন্তু ছোট ও ছুঁচাল। ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য লাঙ্গুল অপেক্ষা কম এবং কর্ণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহাদিগকে নর্দ্দমা কিম্বা ভিতের নীচে অপেক্ষা গৃহ মধ্যে এবং ছাদে ও চালে অধিক সময় দেখা যায়। কমিশন পরীক্ষার সময় অনেক গ্রামে কেবল 'Mus Rattus'ই দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল মূষিক মরিতে আরম্ভ করার ১ হইতে ২ সপ্তাহের মধ্যে সেই সকল গ্রামবাসীর মধ্যে প্লেগের আক্রমণ হইয়াছিল।

কিরূপে মূষিক হইতে মূষিকে এবং মূষিক হইতে মানবে প্লেগ সংক্রামিত হয় তাহার আলোচনার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে, পরে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

(১) প্লেগাক্রান্ত গৃহ-মূষিক হইতে রোগ ১ হইতে ২ সপ্তাহের মধ্যে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হয়।

(২) এক প্রকার মক্ষিকাই ( Rat flea ) রোগ-বীজ বাহকের কার্য্য করে এবং বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

( ৩ ) "Pestis Bacilli" প্লেগ বীজাণু মক্ষিকার পাকস্থলী মধ্যে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। ৭।৮ দিন বীজাণুর শক্তি বিশেষ বলবৎ থাকে, পরে মক্ষিকার শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

(৪) প্লেগের সময় রোগ বীজাণু মূষিকের দেহে বর্ত্তমান থাকে।

গৃহ মূষিকের মধ্যে যখন প্রথম প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন মক্ষিকা রোগাক্রান্ত মূষিকের রক্তের সহিত রোগ বীজাণু টানিয়া লয়। বীজাণুগুলি মক্ষিকার পাকস্থলী মধ্যে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে এক মূষিক হইতে অপর মূষিকে মক্ষিকা দ্বারা রোগ ব্যাপ্ত হয়। ক্রমশঃ রোগাক্রান্ত মূষিকগুলি মরিতে আরম্ভ করে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাকী মূষিকগুলি সেই বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করে, কিন্তু তাহাদের বাসা মক্ষিকাপূর্ণ থাকিয়া যায়। পরে মক্ষিকাগুলি সুযোগ মত সেই বাটীর বা নিকটস্থ বাটীর লোকদিগকে দংশন করিয়া রোগাক্রান্ত করে। এক্ষণে মক্ষিকা কিরূপে মনুষ্য শরীরে বিষ চালিত করে তাহা জানা আবশ্যক।

মক্ষিকা প্রত্যেক বার দংশন করিলেই যে তৎসঙ্গে রোগ বীজাণু চালিত করিয়া দেয় তাহা নহে। কিন্তু প্রত্যেকবার রক্ত শোষণের সময় কিয়ৎ পরিমাণে মল ত্যাগ করা ইহাদের সাধারণ অভ্যাস। মক্ষিকা দংশনের প্রদাহ জন্য লোকে সাধারণতঃ সেই স্থান চুলকাইয়া আঁচড় উৎপন্ন করে। মক্ষিকার মলের সহিত জীবিত বীজাণু বাহির হয়, শরীরে ক্ষত থাকিলে বা নূতন আঁচড় হইলে বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

দরিদ্রলোকেরা সাধারণতঃ অন্ধকার মলিন ঘরে মেঝেতেই শয়ন করিয়া থাকে এবং ফলে এই সকল লোকে মক্ষিকা দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এই কারণে ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা ভারতবাসীগণই প্লেগে অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। দংশন পদে হইলে কুঁচ্‌কিতে এবং হস্তে হইলে বগলে স্ফীতি হয়।

মূষিক সংস্রব হইতেই যে এই রোগের আক্রমণ ও বিস্তৃতি ঘটে তাহা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে আমরা যদি এই সংস্রব সম্বন্ধে ভালরূপ বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে ইহা মূষিকের স্বভাব এবং মানবের বসবাসের অভ্যাস উভয়েরই উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করে।

সাধারণতঃ মূষিকে ধুলা, আবর্জ্জনা এবং বাটীর মলিন, অন্ধকার ঘরের কোণে বাসা করে। আমা দেশের লোকের স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান অতি থাকায় বাটী ঘর এবং চতুস্পার্শ্ব আবর্জ্জনা ও ধূলি রাখার দিকে কাহারও বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। আলোক এবং বায়ু চলাচলেরও ব্যবস্থা করা হয় না অধিকাংশ বাটীতেই গৃহ-মূষিককে আকৃষ্ট করার উপ ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি প্রায় ছড়ান থাকিতে দেখা যায়।

ইহা স্থির নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে প্লেগ-বীজাণু মক্ষিকা বিশ হইতে ত্রিশ গজের অধিক চলিয়া যাই পারে না। তবে কিরূপে এক সহর হইতে দূরস্থিত এক সহরে প্লেগ সংক্রামিত হয়, ইহা জানিবার বিষয়।

(১) সময়ে সময়ে সংক্রামিত স্থান হইতে মূ নানাবিধ দ্রব্য বিশেষতঃ বাণিজ্যের শস্যাদির লুক্কায়িত থাকিয়া, জাহাজ রেল বা অন্য যান যোগে স্থানে আনীত হয়। এইরূপে প্লেগবিষ-বাহী মক্ষি চালিত হইয়া স্থানান্তরে সুস্থ মানবের শরীরে প্লেগ বী প্রবেশ করাইয়া দেয়। সেই হইতে ক্রমশঃ বহু লোক স্থানীয় মূষিকগণ রোগাক্রান্ত হইয়া রোগের বিস্তৃতি ঘটায়।

(২) লোকে স্থানান্তরে যাইবার সময় নিজের পোষাক বা মাল পত্রাদির সঙ্গে মক্ষিকা বা মূষিক করিয়া লইয়া যাওয়াও রোগের বিস্তৃতি ঘটায়।

কিরূপে প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে আগত একজন ব্যক্তি নূতন স্থানে রোগ বিস্তৃতির কারণ স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্লেগাক্রান্ত হইলেই মূষিক বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করে, মক্ষিকারা তখন মনু আক্রমণ করিবার সুযোগ দেখে। রোগাক্রান্ত বাটী স্থান হইতে আগত লোকে নিজের শরীরে, বা বিছানা বা মালের সহিত নূতন স্থানে মক্ষিকা করিয়া আনিতে পারে। এই সকল মক্ষিকার প্লেগ বীজাণু পূর্ণ থাকিতে পারে। নূতন স্থানে মক্ষিকারা তাহাদের অভ্যাস মত মানুষকে করিয়া মূষিককে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে।



ক্ষিকা দ্বারা দংশিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্লেগের র্ভাব হইতে পারে এবং পরে মানুষের মধ্যেও রোগের বিস্তৃতি ঘটে। মোটের উপর প্লেগাক্রান্ত স্থানে রোগ বিস্তারের জন্য মূষিককে এবং রোগাক্রান্ত স্থান হইতে বর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে রোগ বিস্তারের জন্য মানুষকে দায়ী করা যাইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইল সাধারণের উপকারের জন্য তাহা হইতে দুইটি বিশেষ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

(১) প্লেগরোগী সংক্রামক দোষে দোষী নহে এবং তাহাদের নিকটে যাইতে ভয়ের কারণ নাই। রোগা- ক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে বা তাহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে সংক্রামণ ঘটে না। সাধারণতঃ যখন মনুষ্যের শরীরে প্লেগ বীজাণু প্রবেশ লাভ করে তখনই রোগাক্রমণ হয়।

(২) গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যনীতির উপরই রোগ প্রতিষেধ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গৃহে বা তন্নিকটে এমন আবর্জ্জনার স্তূপ রাখা উচিত নয়, যাহাতে মূষিকে বাসা করিতে পারে। যাহাতে মূষিককে আকৃষ্ট করিতে পারে এমন খাদ্যাদির পরিত্যক্ত অংশও নিকটে যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। ঘরে যাহাতে প্রচুর আলোক প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, মক্ষিকার পক্ষে পরিচ্ছন্নতা ও আলোক উভয়ই অসহ্য। মূষিক যাহাতে গৃহে বাস করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

---

# আলোচনা

নূতন মেডিক্যাল স্কুল।—বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের বিশেষ অভাব আছে। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে ৫।৭ ক্রোশের মধ্যে একজন ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল এবং ঢাকায় একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। বঙ্গের আর কোন সহরে মেডিক্যাল স্কুল নাই। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র এই কয়টি স্কুল কলেজে ভর্ত্তি হইতে না পাইয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। মেডিক্যাল স্কুলের সংখ্যা অধিক থাকিলে ছাত্রগণকে এরূপভাবে নিরাশ হইতে হইত না এবং দেশে সুচিকিৎ- সকের অভাবও পূরণ হইত।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ—"গবর্ণমেণ্ট রাজসাহী সহরে একটি নূতন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতেছেন তজ্জন্য বর্ত্তমান সরকারী হাঁসপাতালের উত্তর ধারে ৫০ বিঘা জমি গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ হইয়াছে।" আমরা এ সংবাদে বিশেষ সুখি হইয়াছি। প্রতি জেলায় না হইলেও বঙ্গের প্রতি বিভাগে অন্ততঃ একটা করিয়া মেডিক্যাল স্কুল যাহাতে স্থাপনের ব্যবস্থা হয়, আমরা সে জন্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সকল স্কুলে পাঠার্থীর যে অভাব হইবে না, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভারতে ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুত।—যুদ্ধের জন্য ডাক্তারী ঔষধাদির মূল বৃদ্ধি ও প্রাপ্তির বিশেষ অসুবিধা ঘটায় অনেকে ভারতে সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুতের কথার আলোচনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি সিমলায় সায়েণ্টিফিক্ এডভাইসারী বোর্ডের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে বিদেশাগত ঔষধ অপেক্ষা ভারতে সল্প ব্যয়ে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। বোর্ড গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয় উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিবেন। আশা করা যায় যে এ বিষয়ে অনেকটা সুফল ফলিবে।

**দেশীয় চিকিৎসার ব্যাঘাত।**—গত সংখ্যার স্বাস্থ্য-সমাচারে আমরা দেশীয় চিকিৎসার বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে সাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই সহায়তা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। সম্প্রতি ঢাকা সহরের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় সমূহের অসুবিধার কথা জানিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এতকাল যে সকল ঔষধ নির্ব্বিবাদে প্রস্তুত হইতেছিল এক্ষণে আবকারী বিভাগের দ্বারা তাহা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা সরকারের সাহায্যের আশা করিতেছিলাম কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি।

"ঢাকা প্রকাশ" লিখিয়াছেন—"আজ প্রায় দুই বৎসর যাবত এদেশের কবিরাজী ঔষধের উপর আবকারী বিভাগের তীব্রদৃষ্টি পড়িয়াছে; ইহার ফলে গত দুই বৎসর যাবত অনেক কবিরাজই 'মোদক' প্রস্তুত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এ বৎসর আবার আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'আশব' ও 'অরিষ্ট' প্রভৃতি লইয়া আবকারীর কর্ত্তারা টানা হেচ্‌ড়া আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিলাম, সহরের 'মুক্তি' ঔষধালয়ের সমস্ত 'আশব' ও অরিষ্টই আবকারী ইন্‌স্পেক্টর লইয়া গিয়াছেন এবং উক্ত ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে একদফা ফৌজদারী মামলাও উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 'শক্তি' ও 'শান্তি' প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধাগারের মালীকদিগকেও নাকি এই মোকর্দ্দমার বিচারকালে আদালতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, আবকারীকর্ত্তৃপক্ষ এই মামলায় সুফল লাভ করিতে পারিলে অন্য সকল ঔষধবিক্রেতাদিগের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হইবে। এ সকল সংবাদ শুনিয়া দেশবাসী মাত্রেই একটু চমকিত হইয়াছেন। কারণ, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের মধ্যে পাচন, দ্রাবক, আশব, অরিষ্ট, মোদক তৈল এবং ঘৃতই অধিক। কর্ত্তৃপক্ষের শাসনে এখন আর 'দ্রাবক' চোয়ান হয় না; মোদকও এক প্রকার বন্ধ;, তারপর আশব ও অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে না পারিলে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা যে একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আশা করি দেশের নেতৃবৃন্দ এখন সময় থাকিতে এ বিষয়ের যথাবিধি আলোচনা আন্দোলন করিয়া সকল বিষয় সদাশয় গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা রক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন।"

**কলিকাতা কর্পোরেসনের সাহায্য**—কলিকাতার "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন যে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্পোরেসন এ বৎসর আড়াই হাজার টাকা করিয়াছেন।" আমরা এজন্য কলিকাতা কর্পোরেসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।



# হৃদ্‌রোগ ও তাহার গৃহ-চিকিৎসা

"হৃদ্‌যন্ত্রের একটু গোলমাল আছে" ডাক্তারের মুখ হইতে একথা শুনিলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহাদের অচিরে মৃত্যু অনিবার্য্য এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়েন যেন অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের বিশেষ স্বাস্থ্যহানী ঘটিবে।

একটী যুবক সমস্ত দিন কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিত। নিজেকে বিশেষ স্বাস্থ্যবান মনে করিত, তাহার আকৃতিও সেইরূপ ছিল। জীবন বিমা করিবার জন্য শরীর পরীক্ষার সময়, হৃদযন্ত্রের অল্প দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া চিকিৎসক তাহার বিমা মঞ্জুর করিলেন না। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাহাকে পরিশ্রমের কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা না করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

যুবক মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যকর পরিশ্রমের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অফিসের কার্য্য গ্রহণ করিল। রোগের সংবাদেই তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই বলবান যুবক চিন্তান্বিত দুর্ব্বল রোগীতে পরিণত হইল। যদি সেই সময়ে, যিনি তাহাকে দুশ্চিন্তার দোষ বুঝাইয়া কিরূপে শরীরের যত্ন লইতে হয় বুঝাইয়া ছিলেন, এইরূপ সুচিকিৎসকের পরামর্শ লাভ হইত, তাহা হইলে যুবার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিত।

আর একটি যুবক বিশ বৎসর বয়সেই রোগ চিন্তায় বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে ঠিক করিয়া লইয়াছিল সে বাঁচিবে না। মনে এরূপ ধারণা থাকিলেও ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিতেও ছাড়িত না। পরে শরীর চর্চ্চার বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া সেই যুবকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সুগঠিত দেহ বলবান বলিয়াই বোধ হইবে।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে যান্ত্রিক হৃদ্‌রোগ থাকিলে কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না বরং নিজের রোগের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রোগ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

এই প্রবন্ধে আমরা যে সকল বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব, তাহা হইতে পাঠক পাঠিকা হৃদ্‌রোগের প্রকৃতি এবং কিরূপ রোগ মুক্তির উপায় অবলম্বন করিয়া লোকে স্বাস্থ্য সম্পন্ন ও সকল কার্য্যের উপযোগী হইতে পারেন, প্রভৃতি বিষয় জানিতে পারিবেন। একজনের কতটা রোগমুক্তি ঘটিবে তাহা তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা, অন্যান্য যন্ত্রাদির স্বাস্থ্য এবং শরীরের রোগ নিবারক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

আমরা প্রবন্ধে হৃদযন্ত্রের নানাবিধ অবস্থার নাম ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিব না। প্রধানতঃ সকলগুলিই এক কারণে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের চিকিৎসাও প্রায় এক ধরণের। "মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য" নামক ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে যে পরিচ্ছদে হৃদ্‌যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেইটী পাঠ করিয়া লইলেই পাঠক পাঠিকারা বিষয়টা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

**শ্রেণী বিভাগ**—হৃদ্‌রোগ সমূহকে ক্রিয়াগত ও যান্ত্রিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ক্রিয়াগত রোগের অধিকাংশই কতকগুলি লক্ষণমাত্র, তাহারা হৃদ্‌যন্ত্রের বাহিরে অপর কোন স্থানের কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এগুলির বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না।

যান্ত্রিক হৃদ্‌রোগ, হৃদ্‌যন্ত্রের তন্তু সমূহের বা গঠনের পরিবর্ত্তন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগকে আবার তরুণ এবং পুরাতন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্ফীতিই রোগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া অনেক সময় তাহাকে হৃদ্‌যন্ত্রের স্ফীতি বলা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের আবরণ (Pericardium) আক্রান্ত হইলে

তাহাকে Pericarditis বলে। যন্ত্রের পেশীময় গাত্র (Muscular wall) আক্রান্ত হইলে তাহাকে Myocardities এবং যন্ত্র সংলগ্ন আস্তরণ আক্রান্ত হইলে Endocardities নামে অভিহিত করা হয়। শেষোক্ত প্রকারই অধিক হইতে দেখা যায়।

**হৃদ্‌রোগের কারণ**—যে কোন কারণে শরীরে বিষ সঞ্চিত হয় তাহা হইতেই হৃদ্‌রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যান্ত্রিক হৃদ্‌রোগ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তরুণ Acute সংক্রামক রোগের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে এই দুইটীর মধ্যে কোন যোগ আছে। অনেকে মনে করেন যে Acute রোগে ঔষধ ও serums দ্বারা রোগ বন্ধের ফলে শরীরে বিষ সঞ্চিত থাকে এবং তাহা হইতে হৃদয় ও অন্যান্য প্রধান যন্ত্রের রোগ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ বাত, ডিপ্‌থিরিয়া, স্কার্লেটজ্বর, টন্‌সিলাইটিস্ এবং উপদংশ রোগ হইতে পরে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ ঘটে। অধিকাংশ স্থলে তরুণ রোগের পর হইতেই এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়া থাকে। এই কারণে মনে হয়, হৃদরোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, তরুণ রোগের আক্রমণ রোধ করিতে হইবে।

অন্যান্য কারণ সমূহ, যথা—খারাপ দন্ত, ফোড়া, ক্ষত, অত্যধিক ও অখাদ্য আহার, মদ্য, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবন, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগান, অতিশয় ক্লান্তি এবং কর্ম্মময় জীবনের অতিশয় ব্যস্ততা এবং উদ্বেগ।

পরিশ্রমী, কর্ম্মী, উৎসাহী, আমোদপ্রিয়, সাধারণ ও রাজনৈতিক কার্য্যেও যোগদান করেন, নিয়মিত তাম্রকূট ও মদ্য সেবী এইরূপ চৌকস কৃতি লোকই প্রায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়। এইরূপে জীবনে কৃতকার্য্যতা এবং সামাজিক মান লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। যদি কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই মধ্য বয়সে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ঘটিল, তাহা হইলে কঠিন পরিশ্রমে অর্থ উপায় করিয়া আর লাভ কি!

হৃদ্‌রোগের আর একটা প্রধান কারণ অপরিণত বয়সে অতি কঠিন পরিশ্রম করা। বর্দ্ধনশীল বালক বালিকাদিগকে অনেক সময় এত অধিক পরিশ্রম করিতে হয় যে তাহার ফলে তাহাদের হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ব্যায়াম রহিত প্রৌঢ় পালোয়ানদের মধ্যেও হৃদ্‌রোগের আক্রমণ নিতান্ত কম নহে। ব্যায়াম অনুশীলনের সময়ে তাহাদের হৃদ্‌যন্ত্র বর্দ্ধিত হইয়া যায় এবং শেষে হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী সমূহ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইয়া তাহাতে মেদের সঞ্চার হয়। পরে কোন সময়ে হঠাৎ ব্যায়াম বা পরিশ্রম করায় হৃদ্‌যন্ত্রের বৃদ্ধির ফলে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। অত্যধিক ব্যায়াম অভ্যস্থ ব্যক্তির একবারে ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

**হৃদযন্ত্রে কি পরিবর্ত্তন ঘটে**—শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত প্রবেশ ও নির্গম দ্বারের (Valve) ক্ষয় হওয়া সম্ভব। সহজেই valve আস্তরণের প্রদাহ হইতে পারে। পাম্প যন্ত্রে অন্য অংশ ঠিক থাকিলেও valve প্রায়ই খারাপ হইয়া এবং তাহা বদলাইতে হয়। শরীরের বেলা এই valve আর বদলাইবার উপায় নাই।

সংক্রামিত বিষ যখন রক্তের সহিত চালিত হৃদযন্ত্রে নীত হয় এবং আস্তরণ রোগাক্রান্ত হয় তখন তন্তু সমূহ শিথিল হইয়া পড়ে এবং শোণিত প্রবেশ (Valve) ছিন্ন বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিংবা তাহা হৃদয়ের গহ্বরের গাত্র সংলগ্ন হইয়া যায় অথবা গহ্বরের বিস্তার ঘটে। ইহাদের যে কোনটাই যথা সময়ে শোণিত প্রবেশ দ্বার বন্ধ হওয়া নিবারণ করে, ফলে শোণিত বিপরীত দিকে চালিত হয় বা উপরের সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রতি স্পন্দনে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত হৃদযন্ত্র হইতে শরীরের তন্তু সমূহে চালিত হয় কিন্তু যদি একটী (সাধারণতঃ হৃদ্‌যন্ত্রের বাম অংশের) কিয়ৎ পরিমাণ বিপরীত দিকে চালিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে এবং যে পর্য্যন্ত না এই ব্যা



হয় সে পর্য্যন্ত রোগী হৃদরোগের নানা প্রকার লক্ষণে পাইয়া থাকে।

দ্বার (Valve) কখনও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু হৃদ যন্ত্রের পেশীময় গাত্র দৃঢ় এবং স্থূল ইয়া থাকে। ইহার ফলে পূর্ব্বের মত সম পরিমাণ রক্ত চালিত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা এবং নিজের বিশেষ লইলে রোগী পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য লাভ করে। কিন্তু হৃদযন্ত্রের পেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বা গহ্বর পুনরায় ত হইয়া যায় তাহা হইলে লক্ষণ সমূহ পুনঃ প্রকাশ াইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

**হৃদ্‌রোগের লক্ষণ সমূহ**—অনেকে পাকস্থলীর বিস্তৃতি অথবা কোষ্ঠ বদ্ধতা, বদ্ হজম বা উদরে বায়ু ঞ্চিত হইলে, হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ আছে বলিয়া মনে রেন। হৃদরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে কখন ধনও অতিরিক্ত পরিশ্রমে শ্বাসের সামান্য কষ্ট ভিন্ন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এরূপ ক্ষেত্রে রীক্ষার দ্বারাই লক্ষণের কারণ জানা যাইবে। রোগীকে য় ও ভাবনার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য চিকিৎসকের াহার নিকট রোগের কারণ ব্যাক্ত করা উচিত নয়।

হৃদরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে নানারূপ ক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার মধ্যে অনেক লিরই হৃদয় যন্ত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া রোগীর মনে হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহার সামান্য কাসি আরম্ভ হইতে এবং কফের সঙ্গে রক্তের ছিট থাকিতে পারে। রোগী এজন্য ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাসনালীর রোগ হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকের রণাপন্ন হইতে পারে। এই কাসি, বিপরীত পথে চালিত রক্তের দ্বারা ফুস্‌ফুসের কোষ সমূহ ও শ্বাসনালি প্রকাপিত হওয়ায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রোগী অজীর্ণতা অথবা পাকস্থলীর অন্য গোলমালের ন্য চিকিৎসকের নিকট আসিতে পারে, ইহাও রক্তের কাপ জন্য হইয়া থাকে। মোটের উপর শরীরের ত্যেক যন্ত্রই হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতার জন্য নানারূপ লক্ষণ কাশ করিতে পারে। সিঁড়িতে উঠা কিংবা দৌড়াইলে বা জোরে চলিলে শ্বাসের কষ্ট হইতে পারে। নাড়ির গতি প্রথমে বলবান্ (strong) এবং দ্রুত হইয়া পরে দুর্ব্বল, অনিয়মিত ও দ্রুত হয়। রোগী বক্ষপ্রাচীরে হৃদ্‌যন্ত্রের আঘাত অনুভব করে। ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশের বর্ণ গাঢ় বা ফেকাশে হইয়া যায়। হস্ত ও পদদ্বয় শীতল থাকে। মাথা ধরা প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। কাণ ভোঁ ভোঁ করা, অনিদ্রা এবং বক্ষে হৃদয়ের নিকট অথবা স্কন্ধদেশ হইতে হাতের নীচে পর্য্যন্ত কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা বা অল্প বেদনার অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে বুক ধড়ফড় করে এবং মৃত্যু ভয় হইয়া থাকে। দেহের ওজন কমিয়া শরীর বিশেষ দুর্ব্বল হইতে পারে। রোগের শেষাশেষি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও উদরের স্ফীতি বা শোথ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পাঠকেরা উপরোক্ত লক্ষণ গুলির যে কোনটী প্রকাশ পাইলেই হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ হইয়াছে ভাবিয়া ভীত হইয়া যেন ডাক্তারের নিকট না ছুটেন, কারণ উহাদের যে কোনটী হৃদ্‌যন্ত্র নির্দ্দোষ থাকিলেও প্রকাশ পাইতে পারে। বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা তবে রোগ নির্দ্ধারণ করা উচিত। অনেক সময় চিকিৎসকও এ বিষয়ে ভুল করিয়া থাকেন।

উপরে যে সমস্ত লক্ষণগুলির কথা লিখিত হইল সেগুলি হৃদ্‌রোগের সাধারণ লক্ষণ, রোগীগণ নিজেরাই ইহা বুঝিতে পারে। এগুলি ব্যতীত আরও অনেক বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহা কেবল চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন। কোনরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য।

**হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা**—হৃদরোগের আক্রমণ হইয়াছে প্রকাশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ হইতে আরোগ্য লাভের চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত। রোগ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উপরই আরোগ্য হওয়া নির্ভর করে। পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রে একটু গোলমাল জানা যাইলেও যদি নিত্য কার্য্য সম্পাদনে কোন কষ্ট অনুভব না হয়, তাহা হইলে কেবল মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ

করিয়া সকল বিষয়ে মিতাচারী হইতে হইবে, যাহাতে হৃদযন্ত্রের অযথা পরিশ্রম না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে। ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধতা না জন্মে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহা সহ্য হয় এরূপ সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মোটের উপর শরীরে কোনরূপ বিষ সঞ্চিত হইতে দিবে না। মদ্য বা তাম্রকূট সেবনের অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, যথেষ্ট বিশ্রাম ও নিদ্রা গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে শরীরের উন্নতি হয় অথচ হৃদযন্ত্রের কোনরূপ পীড়ন না হয় এরূপ ব্যায়ামের অভ্যাস করিতে হইবে। মোট কথা নিজের শরীরের উপর বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

কিন্তু যদি কঠিন লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় তাহা হইলে চিকিৎসার বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) এক মুহূর্ত্তও নিজের রোগের জন্য দুশ্চিন্তা করিবে না। কিসে ভাল হইতে পার কেবল তাহাই করিবে। যথাসম্ভব নিজেকে আনন্দে রাখিবে। অমুক অমুক লোক হৃদরোগে কিরূপে মারা গিয়াছে ইত্যাদি বিষয় যে সকল আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতে ভালবাসে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। কেহ নিত্য নূতন চিকিৎসার পরামর্শ দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না। একটী আনন্দদায়ক আলোকপূর্ণ ঘর নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে এবং একজন বিচক্ষণ আত্মীয় বা বন্ধুকে তোমার পরিচর্য্যার ভার দিবে। স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে যাহাতে কোন বিঘ্ন ঘটিতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) নিজের সমস্ত মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে। যথাসম্ভব নিজ রোগের কারণ সমূহ দূর করিতে হইবে। সকল প্রকার সংক্রামণ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। খারাপ দাঁত তুলিয়া ফেলিতে বা তাহার চিকিৎসা করাইতে হইবে। স্ফোটকাদির পুঁয বাহির করাইতে এবং কোনরূপ ক্ষত থাকিলে তাহা পরিষ্কার রাখিতে ও সারাইতে হইবে। দেহের ভিতর ও বাহির যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। অর্থাৎ ত্বক, অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি এবং ফুসফুস দ্বারা যাহাতে শরীরের সমস্ত ক্লেদ বাহির হইয়া যায় তাহার সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) হৃদযন্ত্রকে বিশেষরূপ বিশ্রাম দিতে হইবে। শোথের আক্রমণ থাকিলে এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এজন্য নিজ শরীরের অবস্থানুযায়ী যতকাল আবশ্যক বিছানায় চিৎভাবে শুইয়া বিশ্রাম লইতে হইবে। শোথ থাকিলে, যতদিনে না ফুলা কমে ততদিন শয্যা গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে। ফুলা না থাকিলে কিছুকাল বিছানায় থাকিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইবে। এ সময়ে নিজে কোন কার্য্যই করিবে না এবং শোথ থাকিলে বালিস হইতে নিজে মাথা পর্য্যন্ত তুলিবে না।

(৪) শোথ থাকিলে, সত্বর শরীরের জল কমাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক উপায় উপবাস দেওয়া। হৃদরোগীকে উপবাস দেওয়াইতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। অবশ্য আমরা দীর্ঘ উপবাসের কথা বলিতেছি না। প্রথমে ২।৩ দিন উপবাস দিয়া কিছু আহার এবং করিবে। পরে ক্রমশঃ উপবাসের কাল বাড়াইবে। যতদিন না শোথ রোগ দূর হয় ততদিন এইরূপে চলিবে। শোথ থাকিতে যথাসম্ভব অল্প পানীয় গ্রহণ করিবে। তৃষ্ণা থাকিলে অল্প পরিমাণে জল বা কমলা লেবুর রস পান করা কর্ত্তব্য। শোথ দূর হইলেও জলপান সম্বন্ধে ধরাবাঁধা থাকা আবশ্যক। কারণ ইহা রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া হৃদযন্ত্রের কার্য্য বাড়াইয়া দেয়। শোথ দেখা দিলেই উপবাসই সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা।

(৫) পিচ্‌কারি ( Enema ) দিয়া প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। অনেকে লবণ জলের পিচ্‌কারি দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা পছন্দ করেন। কিন্তু এই পন্থা বিপদ জনক। শোথ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের যত অল্প পরিশ্রম হয় ততই মঙ্গল। রক্তাধার সমূহ ( vessels ) জলের চাপ সহ্য করিয়া লইবার পূর্ব্বে হঠাৎ জল বাহির করিয়া লইলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হইতে পারে। তাড়াতাড়িতে কার্য্য সারিতে গেলে অধিক সময় লাগিয়া হইয়া থাকে।



(৬) গৃহে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে ঠাণ্ডাবোধ বা অশোয়াস্তি না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সহজ ভাবে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে কিন্তু জোরে শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ করিতে হইবে।

(৭) শয্যায় শায়িত থাকার কালে প্রত্যহ অল্প-গরম জলে গামছা বা তোয়ালে ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিতে হইবে। শয্যা ত্যাগ করিলে ঠাণ্ডা না হয় এরূপ জল হইলেই চলিবে। ঠাণ্ডা জলে এবং ডুবদিয়া স্নান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৮) শরীর যাহাতে গরম থাকে এইরূপ পরিচ্ছদই পরিধান করিবে। ত্বকে শীতস্পর্শ হইলে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরিচ্ছদ হালকা অথচ উপযোগী হওয়া আবশ্যক। পশমী বস্ত্র ব্যবহার করা ভাল।

(৯) আহারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আহারের দোষেই অনেক অনিষ্ট ঘটে। এজন্য অনেকের আরোগ্য লাভে বিলম্ব হয়। অধিক আহারই বিশেষ ক্ষতি করে। শীঘ্র শরীর ভাল হইবে বলিয়া অধিক আহার দেওয়ায়, পরিপাক ও পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে এবং তাহার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। আহার অল্প হইলে বা উপবাসে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যের কোন অসুবিধা ঘটে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জলীয় পদার্থ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা করিতে হইবে। জল, ফলের রস, পাতলা ঘোল কিংবা দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন তরল পদার্থ দেওয়া হইবে না এবং ইহাও আট ঘণ্টা অন্তর দিনে তিনবার মাত্র। একবার খাদ্য গ্রহণের পর অপর খাদ্য গ্রহণের ঠিক মধ্য সময়ে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে শরীরে অধিক জল সঞ্চয়ের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া আসিবে। একবারে অধিক পরিমাণ তরল পদার্থ গ্রহণ করিবে না। দুগ্ধ পান করিলে আহারের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

সাধারণ খাদ্য তিন কি চার বারে অল্প পরিমাণ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তৃপ্তিকর, সুপাচ্য, সুপাক খাদ্য ভালরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া আবশ্যক। খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকিবে। অতিরিক্ত আহার অপেক্ষা অল্প আহার ভাল, তাহাতে ক্ষতি করিবে না।

আছাঁটা চাউলের অন্ন, সিদ্ধ আলু, পেঁপে, বিট্, ফুলকপি এবং এ সকলের ঝোল উপকারী। অল্প চাট্‌নী ও সুপক্ক ফল গ্রহণীয়। অল্পপরিমাণ মৎস্য মধ্যে মধ্যে খাওয়া যাইতে পারে। পশু ও পক্ষীর মাংসে উত্তেজনা আনয়ন করে। এজন্য রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রতি আহারে নানারূপ খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইবে। একবারের আহারে ২।১ প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করিয়া অন্যবারে অপর প্রকারের গ্রহণ করা যাইতে পারে। একবারে নানারূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে গচন হইতে পারে। রোগী ভাল হইলে আহারের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু রোগ লক্ষণের পুনঃ অবির্ভাব হইলে খাদ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের মত অল্প করিতে হইবে।

অনেক স্থলে কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকাও মন্দ নহে। কিন্তু যাহাতে খুব অধিক পরিমাণ গ্রহণ করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ অধিক পরিমাণ তরল খাদ্যে শীঘ্রই রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বস্তুতঃ অনেক রোগে দুগ্ধ এই কারণেই এত উপকারী।

যদি দিনে ১৬ ঘণ্টার মধ্যে দুই ঘণ্টা অন্তর এক গ্লাস করিয়া মোট ১৷৷০ কি ২ সের পরিমাণ দুগ্ধ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে হৃদ্‌রোগে অন্য খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা ইহাই উত্তম আহার। কিন্তু ইহার সহিত আর কোন খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত নয়।

যে সকল স্থলে উপবাস দেওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থলে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধগ্লাস করিয়া দুগ্ধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরও অল্প দিতে হইলে দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাটা তোলা দুগ্ধ, ঘোল বা ফলের রস এইরূপে গৃহীত হইতে পারে।

১০। পূর্ব্বে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যায়াম

করিতে নিষেধ করা হইত এবং এই নিষেধাজ্ঞায় বিনা পরিশ্রমে হৃদযন্ত্রে মেদ সঞ্চিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিত।

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে কোনরূপ বিশেষ উপায়ে ব্যায়াম করিলে হৃদরোগীর উপকারই হইয়া থাকে। ইহা রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। প্রত্যেক-স্থলে রোগীকে উপযুক্ত ব্যায়াম অনুশীলনের পর কিছুদিন আবার বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

শোথ থাকিলে যে পর্য্যন্ত না শোথের চিহ্ন একবারে দূর হয় সে পর্য্যন্ত বিশ্রাম করা উচিত, অপর পক্ষে অন্ততঃ দুই হইতে ছয় সপ্তাহ কাল বিশ্রাম আবশ্যক। বিশ্রামের পর যথাসময়ে অতি অল্প ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। প্রতি দিন কয়েক মিনিট-কাল শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থী (Joints) সকল দিকে সঞ্চালিত করিতে হইবে। এই ব্যায়ামে যাহাতে অশোয়াস্তি, শ্বাস বৃদ্ধি বা নাড়ির গতি দ্রুত না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ক্রমে সঞ্চালনের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই সময়ে মৃদু ভাবে গাত্র মর্দ্দন চলিতে পারে। কিন্তু শোথ থাকিতে ইহা কখনও করা উচিত নয়। বিছানায় শায়িত অবস্থায় যখন অঙ্গচালনা করিলেও শ্বাসে কষ্ট, নাড়ির গতি দ্রুত না হয় বা শোথের পুনরাক্রমণ না দেখা যায়, তখন রোগীকে কয়েক মিনিট কাল করিয়া বিছানায় বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। দিনে দিনে বৃদ্ধি করিয়া বসার সময় মিনিট হইতে ঘণ্টায় পরিণত করা যাইতে পারে। কোন কষ্ট না হইলে উঠিয়া শয্যার বাহিরে প্রত্যহ কিছুকাল কাটান যাইতে পারে কিন্তু যাহাতে কোনরূপ সামান্য পরিশ্রমও না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শয্যায় অঙ্গসঞ্চালন তখনও নিয়মিত চলিতে থাকিবে।

ক্রমে শয্যার বাহিরে ব্যায়ামের চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত সঞ্চালন অতি ধীর ভাবে করা আবশ্যক। একটি অঙ্গ বা এক শ্রেণীর পেশী একবার মাত্র একদিকে সঞ্চালিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—এক হস্ত ধীরে ধীরে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে নীচে যথাস্থানে আনিতে হইবে, এরূপ একবার মাত্র। পরে অপর হস্তে করিতে হইবে।

যদি শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়, নাড়ির গতি অতি দ্রুত হয়, তাহা হইলে ব্যায়ামের মাত্রা অল্প করিতে হইবে। ক্রমশঃ সঞ্চালনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া অল্প ভার ডাম্বেল ব্যবহার করা চলিতে পারে।

পরে ভ্রমণ বা ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ অভ্যাস করা যাইতে পারে। প্রথম দিন অতি অল্প চলিয়া কোন কষ্ট না হইলে পরদিন আরও একটু অধিক দূর যাওয়া, এইরূপে দূরত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবশ্যক অনুযায়ী ব্যায়ামের মাত্রা কম বা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত, শ্বাসে কষ্ট বা শোথ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ ব্যায়াম বন্ধ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) হৃদযন্ত্রের ব্যবস্থা—অবস্থানুযায়ী হৃদযন্ত্র নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ইহার কার্য্যের ভার যত কমান যায় ততই ভাল। শরীরে বিষ সঞ্চিত হইতে না দেওয়া এবং যতদিন না ইহা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়মিত করিতে পারে ততদিন অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। Digitalis অনেক দিন হইতে হৃদযন্ত্রের উত্তেজক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু হৃদয়ের কর্ম্মভার কমাইয়াই অধিক ফল লাভ করা যাইতে পারে। আহারের মাত্রা কমাইয়া উপবাস দ্বারা এবং শরীরের সর্ব্ব প্রকারের ক্লেদ নির্গমণের সুব্যবস্থা দ্বারা হৃদয়ের কর্ম্মভার কমান যায়। কোনরূপ উত্তেজক আবশ্যক হইলে, হৃদযন্ত্রের উপরে Ice Bag প্রয়োগ করা যথেষ্ট। আবশ্যক হইলে ইহা একঘণ্টা কাল বক্ষের উপর রাখিয়া একঘণ্টা কাল তুলিয়া লইয়া পুনরায় একঘণ্টা কাল রাখা, এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে। অধিক সুফল লাভ করিতে হইলে বরফ দিবার পূর্ব্বে দশ মিনিট কাল উত্তাপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বেদনার স্থলেও উত্তাপে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

উত্তাপের মাত্রাও বিশেষ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহাতে রক্তের চাপ কমিয়া যায়। নাড়ির গতি যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গরম কম্বল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের সময় রৌদ্র লাগানই সুবিধা জনক কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য করিতে হইবে।

নানা প্রকার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে এবং বিশেষ চিকিৎসার আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত যে প্রকৃতির কার্য্যের ব্যাঘাত দূর করিয়া সাহায্য করা আরোগ্য লাভের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অযথা তাড়াতাড়ি করাও অন্যায়। অধিকাংশ রোগে কুচিকিৎসা ও অতি ভোজনের ফলেই কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

অতি চিকিৎসা অপেক্ষা, ভালরূপ শুশ্রূষাই রোগীর পক্ষে মঙ্গল জনক। আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইলে সকল বিষয়ে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা হইলেই আরোগ্য স্থায়ী হইবে। অনিয়ম করিলেই পুনরায় রোগাক্রমণ ঘটিতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই আমাদিগকে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।



# বিবিধ সংগ্রহ।

ধূমপান নিবারক আইন—ভবনগর রাজ্যে আইন হইয়াছে যে ১৬ বৎসরের কম বয়সের কোন বালক ধূম পান করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

চিকিৎসকের সম্মান—সম্রাটের জন্মদিনে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি মহোদয় 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

কারাগারে কুইনাইন বটিকা প্রস্তুত ঃ—কুইনাইনের বটিকা প্রস্তুত এবং সেই গুলিকে সরু শিশিতে পূর্ণ করা বালকদের কারাগারের প্রধান কার্য্য। গত বর্ষে ৪ গ্রেন বিশুদ্ধ কুইনাইনের ২০টি বটিকা পূর্ণ ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯২২টা শিশি এই জেল হইতে বিক্রয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৫ গ্রেণের ৮॥ লক্ষ বটিকা বিক্রয় হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ—কাশীধামের হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের উন্নতি সাধনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা এবং তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করার জন্য মাননীয় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কিছুদিন কলিকাতায় কাটাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষার্থী দিগকে মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় সকল বিষয়েই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কারাগারের স্বাস্থ্য—গত কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গের কারাগার সমূহে কয়েদী বাড়িয়াছে। ১৯১৭ সালে কয়েদীর সংখ্যা ৮৪ সহস্র ৭১৬, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সংখ্যা ৮০ সহস্র ৮২৮ ছিল। ১৯১৭ সালের দৈনিক গড় কয়েদীর সংখ্যা ১৫ হাজার ৯২৯, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সংখ্যা ১৫ হাজার ৫৪৬ ছিল।

গত বর্ষে বঙ্গের জেলগুলিতে মোট ২৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ সহস্রের ১৫,৮ জন মরিয়াছে! ইহার পূর্ব্ব বৎসরের মোট মৃত্যু সংখ্যা ৩২৯ এবং দশ সহস্র মধ্যে ২২,৪ জন মরিয়াছিল। কারাগারের মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে। কিন্তু হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে অল্প নহে। তবে ১৯১৭ সালে মৃত্যু সংখ্যা যত অল্প হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই; ইতঃপূর্ব্বে ১৯১৩, সালে দশ সাহস্রিক মৃত্যুর হার ২০ হইয়াছিল।

১৮৮২ সালে কর্ণেল বুকানন যখন বঙ্গীয় জেল বিভাগের কার্য্যে প্রবেশ করেন তখন দশ সাহস্রিক মৃত্যু সংখ্যা ৪৩ ছিল। গত ২৫ বৎসর মধ্যে এই মৃত্যু সংখ্যা যেমন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কর্ম্মচারীর কার্য্য দক্ষতায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

বঙ্গীয় কারাগার সমূহে রোগীরা আমাশয় রোগেই অধিক সংখ্যক মরিয়া থাকে। কারাগার সমূহে এখন সুব্যবস্থা হওয়ায় রোগের সূচনা মাত্রে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। রংপুরে, দিনাজপুরে এবং জলপাইগুড়িতে নূতন কারাগার নির্ম্মিত হওয়ায় স্বাস্থোন্নতি হইয়াছে। ঐ তিন স্থানেরই কারাগার অস্বাস্থ্যকর ছিল।

মেদিনীপুর ভিন্ন অন্য সকল সেণ্ট্রাল জেলে মৃত্যুর হার প্রাদেশিক হার অপেক্ষা অল্প। মেদিনীপুরে ঐ সংখ্যা ২৬, উহা বড়ই শোচনীয় তবু উহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় সন্তোষজনক, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সংখ্যা ৪২ ছিল।

কুমিল্লা ও সিউড়ি কারাগারে এক এক জন সুশিক্ষিত সাবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের তত্ত্বাবধানে যক্ষ্মা রোগীর ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের জেল সমূহের যক্ষ্মারোগীরা সিউড়িতে, পূর্ব্ববঙ্গের রোগীরা কুমিল্লায় আশ্রয় পাইয়াছে।

---

**ঘৃতে ভেজাল ঃ**—কলিকাতা কর্পোরেশন সভায় মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন যে;—কলিকাতা কর্পোরেশন এযাবৎ ৯১৩ প্রকারের ঘৃত পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৩১ রকম ঘৃতের মধ্যে ভেজাল পাওয়া গিয়াছে।

ভেজাল মিশান ঘৃত বিক্রয় জন্য কর্পোরেশন ১২১ জনের নামে নালিশ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে ৭৭ জনের দণ্ড হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ১১০৭৫ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে।

দণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে ২৫ জন পাইকারী বিক্রেতা এবং ঘৃতের আমদানী করিয়া থাকে। ৮২ জন খুচরা দোকানদারের দণ্ড হইয়াছে।

এক খুচরা বিক্রেতা ইহা স্বীকার করিয়াছে যে সে স্বয়ং ঘৃতে ভেজাল মিশাইয়াছে।

ঘৃতে কোথায় বসিয়া কি ভাবে ভেজাল মিশান হয় তাহার তদন্তের জন্য সন্দেহ পূর্ব্বক ঘীর ইন্‌সপেক্টর তালতলার বস্তীর কতকগুলি ঘরে স্বয়ং তদন্ত করিয়াছেন কিন্তু অপরাধজনক কিছু পান নাই। ২নং ডিষ্ট্রিক্ট চর্ব্বির কারখানা গুলিতে অজ্ঞাতসারে আকস্মিক উপস্থিত হইয়া বহুবার তদন্ত করা হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কিয়ার-গুদামে এবং বাজ ঘাটে চালানার্থ যে ঘৃত আইসে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। দমদমার এক চর্ব্বির কারখানার স্বত্বাধিকারী কলিকাতায় থাকেন। তাহার বাড়ীতে তল্লাসী করিয়া ভেজাল ঘৃত পাওয়া যায় নাই। বাহির হইতে কলিকাতায় ঘৃত চালান আইসে হাওড়া ও অপর সকল স্থানের মালগুদাম হইতে উহার সংবাদ লওয়া হয়।

খাদ্যের ইন্‌স্পেক্টর এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন যে মিঠায়ের দোকানে যে ঘী রাখা হয় সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট! তবে মিঠাই তৈয়ারীর সময় জাল দেওয়া কালে উহার সহিত বাদামের তৈল মিশান হয়। মিঠাই ওয়ালাদের নিকট ঘৃত পক্ক জিনিষ চাহিয়া যখন ভেজাল ঘৃতে প্রস্তুত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তখন তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইন্‌স্পেক্টর মাসে একবার মিঠায়ের দোকান পরিদর্শন করেন। তবে যে সকল অঞ্চলে মিঠায়ের দোকান বেশী সেই অঞ্চলে মাসে ১ বার পরিদর্শন ঘটিয়া উঠে না। গত ১৯১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ৩০এ এপ্রিল পর্য্যন্ত কর্পোরেশন ১৯৬ প্রকারের ঘৃত পক্ক মিঠাই পরীক্ষা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ৮৬ প্রকার মিঠাই ভেজাল ঘৃতে তৈয়ারী প্রতিপন্ন হইয়াছে। ৭০ জন মিঠাইওয়ালা দণ্ডিত হইয়াছে। উহাদের নিকট হইতে ৪৪৭৪ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে।


# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩২৫ সাল | ৩য় সংখ্যা


## আলোচনা

**সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনগণের বেতন বৃদ্ধি।**—তদিন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন কে অতি অল্প বেতনে কর্ম্ম করিতে হইত। একারণে র্ণমেণ্ট আবশ্যক মত লোক পাইতেন না। বেশিকা পরীক্ষার পর চারি বৎসর কাল মেডিক্যাল লে শিক্ষালাভ করিয়া, মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে র্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অতি অল্প লোকেরই াগ্রহ দেখা যাইত। অধিক বেতনে বেসরকারী কর্ম্মে যুক্ত হওয়া বা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করাই অধিক াকে সুবিধাজনক বিবেচনা করিতেন। সব এসিষ্টাণ্ট র্জ্জেনগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেক দিন হইতেই ালোচনা চলিতেছিল, সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কতকটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে মাসিক ৩০৲ টাকায় আরম্ভ য়া ক্রমে ৪৫৲ ৫৫৲ ৬৫৲ হইয়া সিনিয়ার গ্রেডে ৮০৲ তে ১০০৲ পর্য্যন্ত হইবার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে সে স্থলে ৲ টাকায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ৬০৲ ৭০৲ ৮০৲ হইয়া নিয়ার গ্রেডে ১০০৲ হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিবার ন করা হইয়াছে। ১৯১৮ অব্দের জুন মাস হইতেই এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ এই হারে বেতন পাইবেন। আশা করা যায় এই নূতন নিয়মে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

**ঔষধ প্রস্তুতে বিপত্তি।**—আয়ুর্ব্বেদোক্ত আশব ও আরিষ্ট প্রস্তুতের জন্য ঢাকার মুক্তি ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজুর সংবাদ আমরা গত সংখ্যায় স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি ঢাকা জেলা সমিতির উদ্যোগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের রক্ষা কল্পে জনসাধারণের একটী সভা হইয়াছিল। সভার নির্দ্ধারণ মত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তত্রত্য এডিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান আমলা উঠাইয়া লওয়া হইবে না; তবে তিনি এই ডেপুটেশনের কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবেন।

"সঞ্জীবনী" পত্রে প্রকাশ যে, কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা বঙ্গের লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন।—

"রোহিতাকারিষ্টক বিক্রয় জন্য ঢাকার কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন জনৈক আবগারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগ এই যে ঐ অরিষ্ট মধ্যে মদ আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে কবিরাজগণ

রোগীদিগেকে ঐ সকল ঔষধ প্রদান করিতেছেন। ঐ সকল ঔষধ রোগীরা ভেষজ রূপেই ব্যবহার করে, মাতলামির জন্য কেহ খায় না। ঐ ঔষধের স্বাদ অতি বিকৃত, ব্যয়সাধ্য, আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্‌ভিজ্জ সহযোগে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ ঔষধ বিক্রয় জন্য যদি চিকিৎসক মহাশয়কে দণ্ডদান করা হয় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে। ভারতীয় জন সাধারণের অধিকাংশ লোকই এখনও কবিরাজী প্রণালীমতে চিকিৎসিত হইতেছেন। ব্রিটিশ শাসনে কোন কবিরাজ এখনও ঔষধ বিক্রয় জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং এই ব্যাপারে কবিরাজগণ ও লোক সাধারণ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আমরা লাট বাহাদুরকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া কবিরাজ সতীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলা তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।"

আবগারী বিভাগের কমিশনার সমীপেও উক্তরূপ তার প্রেরিত হইয়াছে। বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও গভর্ণমেণ্ট সমীপে তার পাঠাইয়াছেন। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা ভারতের সকল স্থানের কবিরাজ সমিতি সমূহের নিকট ইহার প্রতিবাদার্থ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য এক মহা সভার আয়োজন হইয়াছে।

**শুভ প্রচেষ্টা।**—কলিকাতার ১০নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে "ক্যাটেল প্রিজার্ভিং কোম্পানী লিমিটেড" নামক একটী গো-রক্ষার যৌথ কারবার সংস্থাপিত হইয়াছে। মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুর ও অনেক ধনকুবের এই মহদনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। এই কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য সস্তাদরে দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ করা, যাহাতে কলিকাতা সহরের লোকেরা খাঁটি দুগ্ধ পাইতে পারে তাহার জন্য এই কোম্পানী চেষ্টা করিবেন। যে গাভী গুলির দুধ ফুরাইবে তাহার পালকেরা ইচ্ছা করিলে ঐ কোম্পানী কলিকাতার নিকটস্থ জায়গায় যে গরু চরাইবার জমি গ্রহণ করিবেন তাহাতে রাখিয়া দিতে পারিবেন। ইহার জন্য যৎসামান্য খরচ করিতে চলিবে। এদেশের গো জাতির উন্নতির জন্য সুস্থ সবল বৃষও অন্য দেশ হইতে আনা হইবে।

এই কোম্পানীর চেষ্টায় কলিকাতায় বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইলেও সহরবাসীর উপকার হইবে।

**"চা" অনাবশ্যক দ্রব্য।**—চা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। চা পানে শরীরের কোন পুষ্টি হয় না। মাদকের ন্যায় ইহাতে সামান্য উত্তেজনা করে মাত্র। অথচ অনেকে অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াও চা-পান নিত্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন। চা পানও যে একটা অনাবশ্যকীয় নেশা, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

গত এপ্রিল মাসে বিলাতে অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য জনৈক মহিলা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। অপরাধ অতিরিক্ত চা সঞ্চয় করা। নিম্ন আদালতে তাঁহার ১০ পাউণ্ড জরিমানা ও ১০ পাউণ্ড মকদ্দমা খরচ দিতে আদেশ হয়। আপিলের ফলে উচ্চ আদালত উক্ত দণ্ড রহিত করিয়া দিয়াছেন। "চা পানে শরীরের কোন পুষ্টি সাধিত হয় না, সুতরাং উহা খাদ্য সামগ্রী বলিতে পারে না। শরীরের জন্য ইহার কোন আবশ্যক নাই, ইহা উত্তেজক মাত্র।" বিচারকগণের রায়ে ইহাই দণ্ড রহিতের কারণ বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

---



# সুরা ও স্বাস্থ্য

"অতিরিক্ত সুরাপান অনিষ্টকর—বিশেষ অনিষ্টকর" একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেও অল্প মাত্রায় নিয়মিত সেবনও যে অনিষ্টকর তাহা অনেকে মনে করেন না। এই তথাকথিত নিয়মিত মাত্রায় সুরা সেবনের কুফল সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ দেখা যায়। সুরা সেবনের সম্পূর্ণ বিরোধী সকলেই অবগত আছেন যে, যেরূপ ভাবে যে মাত্রায় সেবন করা যাক না কেন ইহা অনিষ্টকর। আমরা এই প্রবন্ধে সুরার কুফল, কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সুরার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যথেচ্ছা সুরা সেবনের বিষয় ছাড়িয়া ইহাতে প্রচলিত "পরিমিত মাত্রায়" সুরা সেবনের বিষয়ই আলোচিত হইবে।

সুরা সেবনে বল বা কর্ম্মশক্তি লাভ হয় না বরং সহজেই ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমী লোকে সুরা সেবনে সহজেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে কর্ম্মশক্তি শিথিল হইয়া যায়। ক্ষমতা ও কর্ম্ম একরূপ হইলেও সাধারণ লোক অপেক্ষা সুরাসেবীর কার্য্য সম্পাদনে অধিক কষ্ট বোধ হয়। সহজেই ক্লান্ত হওয়ায় নিজেকে কর্ম্মক্ষম রাখার জন্য তাহার শীঘ্রই আবার উত্তেজকের আবশ্যক হয়। সুরা সেবনে অপ্রকৃত উত্তেজনা আনয়নের ফলে প্রকৃত শারীরিক শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। কর্ম্মের পরে উপযুক্ত সময় বিশ্রাম করিয়া সাধারণ লোকে শরীরে আবার নব শক্তি লাভ করিয়া থাকে।

সুরা সেবনে পেশীর বল বৃদ্ধি না হইয়া বরং সহজেই ক্লান্তি আনিয়া দেয় একথা ক্রীড়ক ও পালোয়ান মাত্রেই স্বীকার করেন।

সুরা সেবনে শরীরের ক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি হয় এবং সেবন চলিতে থাকিলে সেই ক্ষয় পূরণ হওয়া বিশেষ কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থার সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহা বিশ্রাম, নিদ্রা ও আহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়া থাকে। কিন্তু শরীরের তন্তু সমূহের উপর সুরার ক্রিয়ায় ইহার ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত প্রথমে অল্প হইলেও কালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বয় পর্য্যন্ত হৃদযন্ত্র, মূত্রগ্রন্থী বা অন্যান্য যন্ত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ না পায় সে পর্য্যন্ত লোকে সুরা সেবনের এই কুফল উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন অভ্যাসও এমন বদ্ধমূল হইয়া যায় যে সংশোধনের আর আশা থাকে না।

সুরা শরীরের রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়, ফলে সহজেই রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা ঘটে। অতিরিক্ত ক্লান্তি ও শরীরের ক্ষয়ের জন্য স্বভাবতঃই রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া থাকে এবং নূতন রোগ সংক্রামণের সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত সুরা-সেবীরা সহজেই যক্ষ্মা বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। সুরা অতি অল্পমাত্রায় সেবন করিলেও দেহের উত্তাপের ব্যতিক্রম ঘটায়, বিশেষতঃ ঠাণ্ডার দিনে ইহার ফলে যকৃত, ফুসফুস বা অন্য কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুরা সেবনের ফলে মুখ, নাসিকা ও শ্বাসনালীর ভিতরের আস্তরণ শক্তিহীন হইয়া পড়ায় বীজাণু সংক্রামণ ও বৃদ্ধির রোধ করিতে পারে না। সহজেই বীজাণু বৃদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠে। দেহের রক্ষক রক্ত, সাধারণ অবস্থায় শরীরের রোগ রোধ করিতে বিশেষ উপযোগী থাকিলেও সুরার দ্বারা তাহার সে শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। মোটের উপর ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে সাধারণ লোক অপেক্ষা নিত্য সুরা সেবীর সংক্রামক রোগাক্রমণ রোধের ক্ষমতা অনেক অল্প।

সুরা এক বোতল বা মাত্র এক চুমুক হইলেও পাকস্থলীতে প্রবেশ মাত্র তাহা প্রায় তৎক্ষণাৎই শরীরে শোষিত হইয়া যায়। সুরা পাকস্থলীর পক্ষে উত্তেজক বিষ এবং সহজেই তাহা হইতে বিতাড়িত হইয়া

রক্ত স্রোতে মিশিয়া যায়। সুরা কোনরূপ পরিপাক বা পরিবর্ত্তিত না হইয়াই রক্তস্রোতে প্রবেশ লাভ করে। ইহা রক্তস্রোতের সহিত হৃদযন্ত্রে আনীত হইয়া তথা হইতে দেহের সকল যন্ত্রে চালিত হয়। ফুসফুসে চালিত হইয়া সুরা প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হয়। সুরারূপেই ইহা ঘর্ম্মে ও মূত্রগ্রন্থীর স্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। অতি অল্প পরিমাণ শরীরের মধ্যে দহিত হয়। মানব দেহের অনাবশ্যকীয় এই বিষকে সকল সময়েই দেহ হইতে দূর করিবার জন্য প্রকৃতির বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। সুরা সেবনে জননশক্তি ও আয়ু হ্রাস হইয়া যায়। সুরা দেহের তন্তু সমূহকে শুষ্ক ও কঠিন করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ "We thered Kidney,"Hobnailed" Liver ও Hardened Artaries প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফুস্‌ফুস্ ক্রমশঃ তাহার নমনীয়তা হারায়, এই কারণেই নিত্য সুরাসেবীর পক্ষে নিউমোনিয়া রোগ এত মারাত্মক হইয়া পড়ে। আমেরিকার ৪৩টী লাইফ্ ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানীর ২৫ বৎসর কালের রিপোর্ট পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে (১) যে লোক প্রতিদিনই নিয়মিত দুই গ্লাস বিয়ার বা এক গ্লাস হুইস্কি বা সেই অনুপাতে অন্য সুরা সেবন করে, সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার শত করা ১৮ অধিক হয়। (২) বীমার জন্য আবেদন করার পূর্ব্বে যাহারা মধ্যে মধ্যে অধিক মাত্রায় সুরা সেবন করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর হার সাধারণ অপেক্ষা শতকরা ৫০ অধিক হয়। (৩) যে সব লোক কতকটা যথেচ্ছা ভাবে মদ্য পান করে তথাপি জীবন বীমার জন্য মনোনীত হইয়াছিল, এরূপ লোকেদের মৃত্যুর হার সাধারণ অপেক্ষা শতকরা ৮৬ অধিক হইতে দেখা যায়।

সাধারণ লোকে পরিমিত সুরাপায়ী অপেক্ষা যে কেবল স্বাস্থ্য সুখভোগ করে তাহা নহে, তাহাদের পরমায়ুও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরমায়ু হানি জাতীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। কোন কারণেই সুরা সেবনের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।

---

# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## বিংশ পরিচ্ছেদ

### মস্তক ও গ্রীবা।

#### মস্তক ও গ্রীবার অস্থি।

মানুষের মস্তকটি "উত্তমাঙ্গ" বলিয়াই আমাদিগের দেশে যে সম্মান পাইয়া আসিতেছে, বিজ্ঞানও সে মর্য্যাদার অনুমোদন করিতেছেন। মস্তক চিন্তাশক্তি, চেতনা ও বুদ্ধির আধার মস্তিষ্কের আসন। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদনেন্দ্রিয়গুলিও ঐ মাথায় স্থান পাইয়াছে। ইহার উপরে যে নাসারন্ধ্রের সহায়তায় শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে প্রাণ বাঁচিতেছে তাহাও মস্তকে বিরাজিত। মুখ-গহ্বরটি এই মাথার এলেকায় থাকিয়া বিচিত্র আ বিবিধ ব্যঞ্জনের অমৃত রসে দেহের পুষ্টিসাধন ও বর্দ্ধন করিতেছে। সুতরাং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মধ্যে মাথার মহিমা ও উপযোগীতা খুব বে একাধারে এত গুণ না থাকিলে মাথার নাম কি "উত্তমাঙ্গ" হইত? এই মহীয়ান মনুষ্য মস্তক ভাগে বিভক্ত।



#### কপাল ও মুখমণ্ডল।

( Skull (caranium) and the Face )

মানুষের মাথাটি দুই ভাগে বিভক্ত, কপাল ও মুখমণ্ডল। কপাল, (Skull) অস্থিরচিত, পেটিকা, ইহার মধ্যে মস্তিষ্ক নিহিত থাকে। আটখানি দৃঢ়নিবদ্ধ অস্থি খণ্ড দ্বারা কপাল গঠিত। সেই আটখানি এই :—

| | |
|---|---|
| কপাল মূলাস্থি। | (The Occipital bone.) |
| প্রাচীরাস্থি দ্বয় | (2 Partietal bones.) |
| ললাটাস্থি ... | ( Frontal bone.) |
| কপাল পার্শ্বাস্থি দ্বয় | ( 2 Temporal bones.) |
| পক্ষাস্থি ... | ( Sphenoid.) |
| সচ্ছিদ্রাস্থি ... | ( Ethmoid.) |

কপাল মূলাস্থি—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ এবং আংশিক ভাবে কপালের নিম্ন পৃষ্ঠের তলদেশে অবস্থিত। ইহার সহিত নিম্নস্থ প্রথম কশেরুকার সংযোগ আছে, তাই ইহার মধ্যস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রটির ব্যাস দেড় ইঞ্চি। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া মজ্জারজ্জু (Oblong marrow) নামিয়া মেরুদণ্ড মধ্যবর্ত্তী মেরুদণ্ডরজ্জুর সহিত মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীরাস্থি—দুই মস্তকের উর্দ্ধকটাহের (Caranium) পার্শ্বদ্বয় রচনা করিয়াছে।

ললাটাস্থি—ললাটদেশ, ভ্রূযুগ প্ররোহ এবং অক্ষি-কোটর দ্বয় রচনা করিয়াছে। ললাটাস্থি মস্তিষ্কের সম্মুখভাগটিকে বর্ম্মের মত আবরণ করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্কের এই অংশই প্রজ্ঞা দেবীর আসন। এই জন্য লোকে কাহারও প্রসর ললাট দেখিলেই বলে, "এই লোকটি বড় বুদ্ধিমান, ইহার ললাট খুব প্রশস্ত।" ললাটের প্রসার অধিক হইলেই যে মানুষ বুদ্ধিমান হইবেই এমন ধরাবাঁধা আইন নাই। আসল কথা মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহারেই মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে। মানুষ বুদ্ধিমান বলিয়া সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

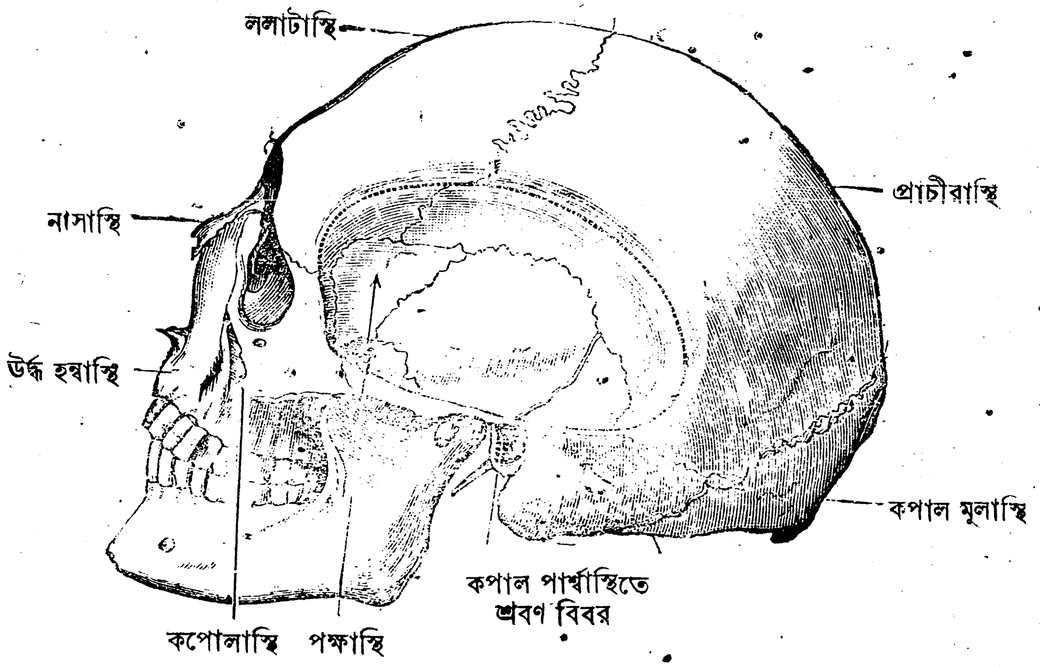


চিত্র ৫০—মস্তকের অস্থি সমূহ ( পার্শ্বদৃশ্য )

**পক্ষাস্থি** ( Sphenoid )—নেত্র-গোলক দুইটির পশ্চাতে থাকিয়া অক্ষিকোটর গড়িয়াছে, ইহার সহিত করোটির সমস্ত অস্থিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মস্তকের উপরি ভাগে ললাটের পার্শ্বে যেখান হইতে কেশজাল উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই কিছু নিকটে অর্থাৎ রগের কাছাকাছি পক্ষাস্থির স্থান।

**কপাল পার্শ্বাস্থি**—( Temporal )—মস্তকের সম্মুখভাগে এই অস্থি দুই খানির স্থান, ইহারা কর্ণদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরিভাগ হইতে উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রোত্র বা কর্ণেন্দ্রিয় দুইটি কপাল পার্শ্বাস্থির ভিতরেই নিহিত। এই অস্থিযুগলের মধ্যস্থ শ্রবণবিবর দুইটির পশ্চাদ্ভাগে Mastoid process নামে একটি ঈষদুন্নত পদ্ধতি আছে।

**সচ্ছিদ্রাস্থি** বা **বহুছিদ্রাস্থি**—( Ethmoid ) চালুনীর ন্যায় ছিদ্র বহুল। এই অস্থিখানি খুব লঘু এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার মূলদেশে সন্নিবিষ্ট। ইহাতে নানা আকারের বহু সংখ্যক নালী ও ছিদ্র আছে ঐ সকল পথে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু সকল নাসিকাতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এই সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুগুলি মস্তিষ্কে গন্ধানুভূতি বহিয়া লইয়া যায়।

মস্তকের অস্থিগুলি পরস্পর কিরূপ দৃঢ় সম্বদ্ধ তাহা উপরিস্থ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলগুলি বামহস্তের অঙ্গুলির অবকাশ বা ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দুই হাতের আঙ্গুলগুলি মুড়িয়া দুইখানি হাত জোরে আবদ্ধ করিলে যেরূপ হয়, মানব মস্তকের হাড়গুলি তেমনই কৌশলে খুব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত আছে। এই সংযোগ স্থলগুলিকে সচরাচর

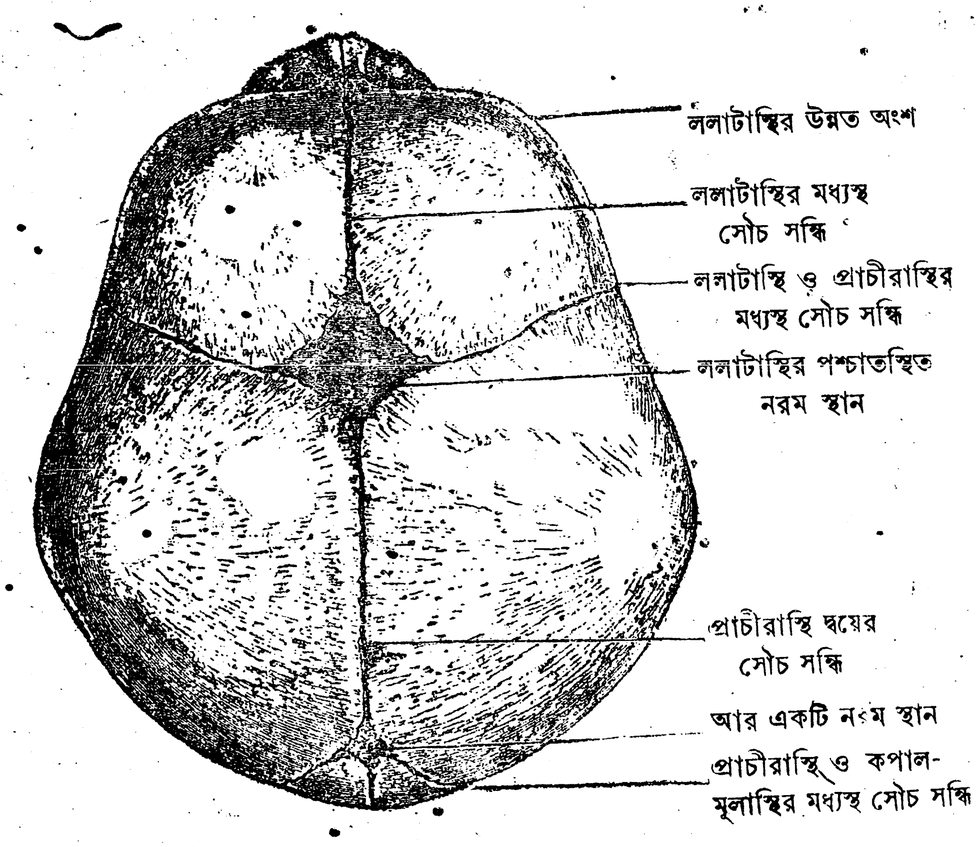


চিত্র ৫১—শিশুর মস্তক ( উপরি দৃশ্য )



## সৌচ সন্ধি

( Suture ) কহে। শিশুর মস্তকের অস্থিগুলি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মস্তকের অস্থি সকলের মত সৌচসন্ধি দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকিলে, তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি যথাযথ ভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। তাই শিশুদিগের মস্তকের অস্থি চর্ম্মাবৃত ও নমনশীল ঝিল্লী দ্বারা সংযুক্ত থাকে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মস্তকটি ধীরে ধীরে অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া দেখিলে ললাটাস্থির ঠিক পশ্চাতে অঙ্গুলী বসিয়া যায় ( ৫১ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য )। শিশুরা সপ্তম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে, উহাদিগের মস্তিষ্কের আধার বা করোটিকা কঠিন এবং উহাদিগের করোটিকার অস্থিগুলি পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ হয়। অল্প বয়স্ক শিশুদিগের মস্তকে আঘাত করা কিরূপ মূঢ়তা ও পশুর ন্যায় কার্য্য, পাঠক এই বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন। অল্প বয়স্ক শিশুদিগের মস্তকের অস্থিগুলি অতিশয় কোমল সুতরাং মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে অসমর্থ।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের করোটিকা সম্বন্ধে আরও একটা জানিবার কথা আছে। শিশুকে ক্রমাগত এক পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইয়া রাখা সঙ্গত নহে। কারণ তাহাতে মাথার কেবল একটা দিক বালিশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাতে মাথার একটা দিক অন্য দিক অপেক্ষা বড় হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে, মাথার ও মস্তিষ্কের গঠন চিরকালের জন্য কুৎসিত হইয়া যায়।

এইবার আমরা মুখমণ্ডলের কথা কহিব। মুখমণ্ডলে মোট ১৪ খানি অস্থি আছে। নিম্নে ঐ অস্থি সকলের তালিকা দেওয়া হইল :—

| | | |
|---|---|---|
| ২। | নাসাস্থি। | ( Nasal bones) |
| ২। | অশ্রুসেকাস্থি। | ( Lachrymal) |
| ২। | কপোলাস্থি। | ( Malar ) |
| ২। | ঊর্দ্ধহনুাস্থি। | ( Maxilla ) |
| ২। | তালব্যাস্থি। | ( Palate bones ) |
| ১। | নিম্নহনুাস্থি। | ( Mandible ) |
| ১। | সীতাস্থি। | ( Vomer bone ) |
| ২। | পত্রাস্থি। | ( Inferior turbinated) |
| মোট—— | | ১৪ |

পাঠক, এখন নিজ মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া এবং ৫১ সংখ্যক চিত্র ও নর কঙ্কাল চিত্র দেখিয়া এই অস্থিগুলির অবস্থান নির্ণয় করুন।

**নাসাস্থি**—সংখ্যায় দুইখানি, ইহারা মিলিয়া নাসিকার অস্থিময় অংশ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা ঠিক মাঝামাঝি স্থানে মিলিয়া নাসিকা সেতু ( Bridge of the nose ) সংগঠন করিয়াছে।

**অশ্রুসেকাস্থির** স্থান নির্ণয় করিতে হইলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা চক্ষুর ভিতর দিকটা খুব গভীর ভাবে টিপিয়া ধরিতে হয়। একটি নালিকার পথ-প্রদান করিবার জন্য এই অস্থিতে সুড়ঙ্গের ন্যায় সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে। এই রন্ধ্র মধ্যে নিবিষ্ট নালিকা যোগে চক্ষুর অশ্রু নাসিকা মধ্যে আসিয়া পড়ে। রোদনকালে চখের জল নাসারন্ধ্রে আসিতে থাকে বলিয়া অনেকে কাঁদিবার সময় ঘন ঘন নাক ঝাড়িয়া থাকে।

**কপোলাস্থি**—কপোলের উপরিস্থিত উচ্চস্থান এবং অক্ষি কোটরের বহিঃ প্রাচীর গড়িয়াছে। যাহারা বৃদ্ধ এবং শীর্ণ তাহাদিগের কপোলাস্থি খুব স্পষ্ট।

**ঊর্দ্ধ হনুাস্থি** ( Maxilla ) যুগল—তালু প্রদেশের সম্মুখভাগ সংগঠন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের সংযোগ স্থলের সন্নিধ্যে একটি অবকাশ বা ফাঁকা স্থান আছে। ঊর্দ্ধ মাড়ীর দন্তমূল কোটরগুলিও এই অস্থি দুইখানির মধ্যে নিহিত।

**তালব্যাস্থি** ( Palate bones ) দুইখানি—ঊর্দ্ধ হনুাস্থির পশ্চাদ্ভাগে তালু-প্রদেশে স্থাপিত। ইহারা মুখ কোটর ও নাসিকা কোটরকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদিগের তালুদেশ বিদীর্ণ বা বিভক্ত তাহাদিগের তালব্যাস্থি দুইখানি বিযুক্ত, তাহাদিগের মুখকোটরের ও নাসিকা কোটরের মধ্যে কোনরূপ প্রতিরোধ নাই।

**নিম্ন হনুাস্থির** ( Mandible )—আকার অশ্ব পাদুকার ন্যায়, উহার প্রান্তভাগ দুইটি বাঁকিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। এই অস্থিখানিতে নিম্ন দন্তপংক্তির কোটর

গুলি নিহিত। মস্তকের অস্থি সমূহের মধ্যে এই অস্থি-খানিই সচল। কোন বস্তু চিবাইবার সময় নিম্ন হনুাস্থি ক্রমাগত উপর ও নীচের দিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। এই হাড়খানি পাশের দিকেও চালিত হইতে পারে। এই অস্থিখানির সহিত কপাল পার্শ্বাস্থির সংযোগ আছে। অস্থিখানি সুস্পষ্ট সংযোজনী বন্ধনী দ্বারা কপালপার্শ্বাস্থির সহিত দৃঢ় সংলগ্ন। কর্ণ রন্ধ্রের ঠিক সম্মুখে এই অস্থি দুইখানির সন্ধি বা সংযোগ স্থান। এইজন্য কোন প্রকার গুরুতর কর্ণপীড়া উপস্থিত হইলে খাদ্য চর্ব্বণে এবং মুখ ব্যাদানে আমাদিগের মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়।

সীতাস্থির ( Vomer bone ) আকার লাঙ্গলের সীতা বা 'ফালের' ন্যায় বলিয়া উহা এই নামটি পাইয়াছে। সীতাস্থি সূক্ষ্ম অস্থি ফলক, ইহা নাসা কোটরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। এই অস্থির পরিপুষ্টির তারতম্য অনুসারে নাসিকা-সেতুর গঠন গত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগের সীতাস্থি পরিপুষ্ট তাহাদিগের নাসিকা বৃহৎ ও সুগঠিত।

পত্রাস্থি ( Inferior terbinated ) অতি সূক্ষ্ম অস্থি পরম্পরা, ইহারা অস্থির উপরিভাগে থাকে না। নাসিকা কোটরের বহির্দ্দেশে ইহাদিগের স্থিতি। নাসারন্ধ্র দ্বারা যে বায়ু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাকে ব্যাপক ভাবে সংস্পর্শের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য ইহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রহিয়াছে। নাসিকার আতপ্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত বায়ুর যতই সংস্পর্শ ঘটে ততই উহা উত্তপ্ত হয়, সুতরাং শীত বায়ুর সংস্পর্শে ফুসফুসের পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনাও দুর হয়।

মুখমণ্ডলের অস্থিগুলির পরিচয় দিলাম, ইহাদিগের আকার গত বৈচিত্র্য এরূপ যে কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই। তবে এক শ্রেণীর মানবের মুখমণ্ডলের অস্থি সমূহের গঠন গত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাদৃশ্য এরূপ যে, এ বিষয়ে যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা মুখমণ্ডলের গঠন দেখিয়া উহা কোন জাতীয় লোকের মস্তক তাহা বলিতে পারেন। চীন দেশীয়ের মুখ মণ্ডলের অস্থি সকলের ও আমাদের মুখমণ্ডলের অস্থি সকলের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান, আবার ইংরাজ ও নিগ্রো এই দুই জাতী মনুষ্যের মুখমণ্ডলের অস্থিগুলির মধ্যে গঠনগত পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট।

চিত্রে ও পাষাণ প্রতিমায় মানবমুখের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে দেখা যায়। তবে মুখের ভাব-ব্যঞ্জনায় মানবমুখের ও মনের বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়। মানব মুখের ভাব-ব্যঞ্জনা, ভিতরের মানুষটিরই প্রতিবিম্ব। মানব নয়নের সমুজ্জ্বল প্রভায় তাহার চরিত্রের তেজ ও ন্যায়নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যে কাপুরুষ ও অসাধু তাহার নয়নে ঐরূপ দীপ্তি নাই, তাহার মুখ দেখিবামাত্র হৃদয়ে অশ্রদ্ধা ও বিরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু মুখের সৌন্দর্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাও সঙ্গত নহে, কারণ কুসুম রাশির মধ্যেও কাল বিষধর লুকাইয়া থাকিতে পারে।

গ্রীবার "কাঠাম" মেরুদণ্ডের উপরিস্থিত বা উর্দ্ধ কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এই কশেরুকাগুলি গ্রীবাদেশে অবস্থিত বলিয়া গ্রীবা কশেরুকা ( Cervical Vertebræ ) বলে। প্রথম গ্রীবা কশেরুকার নাম, ( Atlas ) "এটলাস" বা শিরোবহ কশেরুকা।

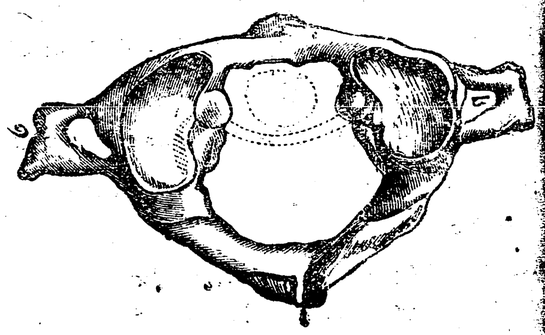

চিত্র ৫২—শিরাবহ কশেরুকা ( এটলাস্ )

এই কশেরুকা শিরোমণ্ডল বহন করে বলিয়া, পুরাণ কাহিনী বর্ণিত পৃথিবীবাহী এটলাসের অনুসারে উহাকে ঐরূপ নামে অভিহিত করা হইয়াছে





উপরিভাগ হইতে শিরোবহ কশেরুকার আকার যেমন দেখায়, ৫২ সংখ্যক চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার আকার অঙ্গুরীয় বা আংটির ন্যায়। এই অঙ্গুরীয়াকার শিরোকশেরুকার অভ্যন্তর ভাগটি তন্তুময় অনুপ্রস্থ বন্ধনী ( চিত্রে বিন্দুময় রেখা দ্বারা প্রদর্শিত ) দ্বারা দুইটি ভাগে বিভক্ত। এই কশেরুকার পশ্চাদ্ভাগের বৃহৎ অংশটিতে Oblong marrow নামক মজ্জা অবস্থিত, কিন্তু উহার সম্মুখের ক্ষুদ্র অংশমধ্যে দ্বিতীয় গ্রীবা কশেরুকার একটি অস্থিময় পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট (বিন্দু বিন্যাস দ্বারা চিত্রে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে )। দ্বিতীয় গ্রীবা কশেরুকার নাম :—

## কীলক-কশেরুকা।

৫৩ সংখ্যক চিত্রে কীলক কশেরুকার ( Pivot Vertibra ) পার্শ্বভাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কীলক-কশেরুকার উপর শিরোবহ কশেরুকার অঙ্গুরীয় এবং তৎসহ মস্তকটি ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু কীলক

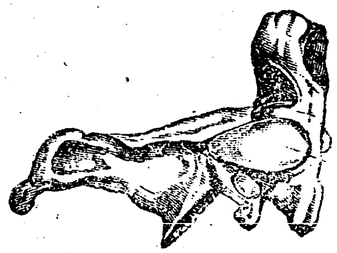

চিত্র ৫৩—কীলক কশেরুকা ( পার্শ্ব দৃশ্য )

কশেরুকা হইতে প্রসারিত দৃঢ় বন্ধনী সমূহ মস্তকের অতি ঘূর্ণন রোধ করিয়া থাকে। কীলক-কশেরুকা শিরোবহ অর্থাৎ এটলাস কশেরুকার অঙ্গুরীয়কের সম্মুখভাগের কক্ষটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুতরাং কীলকের স্থান Oblong marrow মজ্জার ঠিক সম্মুখে সংস্থিত। কিন্তু শিরো-কশেরুকার উভয় কক্ষ মধ্যে অনুপ্রস্থ বন্ধনীর বিন্যাস বশতঃ কীলক-কশেরুকার ক্রিয়া হেতু Oblong marrowর গায় একটুও চাপ লাগে না। অধুনা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে যে ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহাতে শিরোবহ কশেরুকার মধ্যস্থ তন্তুময় অনুপ্রস্থ বন্ধনী ছিঁড়িয়া যায় এবং কীলক কশেরুকা সর্ব্ব প্রকার জীবনীশক্তির আধার Oblong marrowতে আঘাত করে, সুতরাং দণ্ডিত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। অন্যান্য গ্রীবা কশেরুকার আকার প্রদর্শন করিবার জন্য ৫৪ সংখ্যক চিত্র প্রদত্ত হইল।

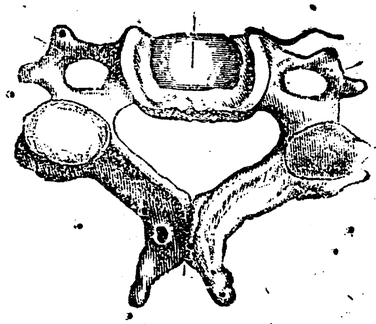

চিত্র ৫৪—একটী গ্রীবা কশেরুকা।

কশেরুকা সমূহ তন্তুময় বন্ধনী ( Ligament ) সমূহের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। গ্রীবাদেশে কশেরুকা খুব অবাধে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা ইচ্ছানুসারে গ্রীবা সঞ্চালন করিতে পারি।

ক্রমশঃ।

# বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা

লেখক—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

( ভারতবর্ষ হইতে উদ্ধৃত )

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে জনসংখ্যা প্রতিদিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, বঙ্গীয় পল্লীসমূহের জন সংখ্যা সেই অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। নগর গুলিকে দেশের মস্তক বলিয়া ধরিয়া লইলে পল্লীগুলিকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি শুষ্ক, বিকৃত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মস্তক যে দীর্ঘ কাল সবল, সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকিবে, এরূপ আশা করা দুরাশামাত্র। নানা কারণে আমাদের দেশের পল্লীসমূহ দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে; ইহার ফলে নগরগুলির অবস্থাও যে ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিবে, এ আশঙ্কা অমূলক নহে। কেবল কয়েকটি প্রধান নগর লইয়াই আমাদের দেশ নহে; অসংখ্য বঙ্গপল্লীর সমষ্টিই বঙ্গদেশ; সুতরাং পল্লীসমূহের উন্নতি ভিন্ন এদেশের উন্নতির আশা নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পল্লীর প্রতি পল্লীবাসী শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-গণের অনাদর ও উপেক্ষাই পল্লীসমূহের অবনতির প্রধান কারণ। যাঁহারা চেষ্টা করিলে স্ব স্ব গ্রামের উন্নতি করিতে পারেন, যাঁহাদের শক্তি সামর্থ আছে, পল্লীগ্রামস্থ ভূসম্পত্তির আয়ই যাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন; তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্ব স্ব বাস্তুভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে গিয়া বাস করেন। অনেকে বাণিজ্য-ব্যবসায় উপলক্ষে, বা অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সহরে বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা গ্রামের কথা চিন্তা করিবার অবসর পান না! কিন্তু অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি পল্লীগ্রামে বাস করা অসুবিধাজনক বা কষ্টকর ভাবিয়া, আমোদ-প্রমোদ বা আরাম বিরামের অনুরোধে পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া বারমাস সহরেই পড়িয়া থাকেন! তাঁহাদের নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা দরিদ্র প্রজার জীর্ণ অ নিষ্পেষিত করিয়া লাটখাজনা, মামলা-মোকর্দ্দমার খরচা এবং সহর-প্রবাসী জমিদার মহাশয়ের বিলাসিতার ব্য নির্ব্বাহ করেন। পৈতৃক জমিদারী হইতে যথানিয়মে টাকা আসিলে, তবে তাঁহাদের মুখে অন্ন উঠে রাজধানীর প্রাসাদ তুল্য প্রবাস-ভবনে বিদ্যুতের আলো ও পাখার সঙ্গে নাচগান আমোদের ফুয়ারা ছুটে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত পথে তাঁহাদের 'হাওয়াগাড়ীর' বাহা ফুটে; এবং ইচ্ছামত আজ দার্জ্জিলিং, কাল ওয়ালটেয়া পরশু শিলং বা রাঁচীতে হাওয়া বদ্‌লাইতে যাওয়া সুবিধা ঘটে। কিন্তু তাঁহাদের আরামবিরাম, বিলা ও ব্যসনের ব্যয় যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলি যথানিয়মে যোগাইয়া আসিতেছে, তাহাদের সুখ-স্বাস্থ্যে প্রতি, তাহাদের অভাব-অভিযোগে তাঁহাদের কয়জনে কতটুকু লক্ষ্য আছে? তাঁহারা মনে করেন, যাহা তাঁহাদের জমিদারীতে বাস করে ও চাষ করিয়া খা তাহারা যথারীতি খাজনা দিতে ও নানা প্রকার জু জবরদস্তী সহ্য করিতে বাধ্য। তাহারা বাঁচুক মরু তাহাদের ক্ষেতের ফসল হাজুক মজুক—তাহার স তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহাদের সন্তানতুল্য প্রজা মুখাপেক্ষী আত্মীয় স্বজনের সহিতই যে তাঁহাদের স বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এরূপ নহে; তাঁহাদের পিতৃপিতামহে কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্তপ্রায়; প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালি গুলি জীর্ণসংস্কারের অভাবে খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতে বৈঠকখানায় আর বাতি জ্বলে না, ভগ্নপ্রায় চণ্ডী জঞ্জালে—পারাবত ও চর্ম্মচটিকার বিষ্ঠায় পূর্ণ; সাপ, চামচিকা, বিছা ও আরশুলার স্থায়ী বাস



পরিণত হইয়াছে। যে সুপবিত্র দেবয়াতন একদিন সায়ং কালে শঙ্খঘণ্টা রবে মুখরিত হইত, সেখানে এখন "ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর!" যে মন্দির প্রাঙ্গণে সদাব্রতের মহিমা শতমুখে কীর্ত্তিত হইত, সমস্ত বৈশাখ মাস যেখানে সংকীর্ত্তনের সুস্বরে ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত—আজ সেখানে লাল ডোরঙ্গা ও কালকাসিন্দার নিবিড় জঙ্গল। জীর্ণ মন্দিরের ভগ্ন-চূড়ায় বসিয়া বসিয়া স্তব্ধ রাত্রে 'হুতুমপ্যাঁচা' বিকট আর্ত্তনাদে শ্মশানবিহারী প্রেতের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতেছে!

গ্রামের বাহিরের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় গুলি নরককুণ্ডে পরিণত হয়; তাহা ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা ও বসন্তের জীবাণুতে পূর্ণ থাকে। গ্রামের শত শত খানা, ডোবা, গর্ত্ত বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই; সুতরাং নানা প্রকার উদ্ভিদ সেই জলে পচিয়া দুষ্ট বাষ্প উদ্গত করিতে থাকে। তাহাতে পল্লীবাসীদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়; কর্দ্দমময়, দুর্গন্ধ-দূষিত গ্রাম্য পথগুলি বর্ষায় গমনাগমনের অযোগ্য হইয়া উঠে। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া সংবাদপত্রে আর্ত্তনাদ করে, অথবা লোকালবোর্ডে জেলাবোর্ডে প্রতিকার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে। সর্ব্বব্যাপী ক্ষতের প্রতিকার ক্ষমতা বোর্ডের নাই, সুতরাং তাহারা বিশেষ কোনও ফল না পাইয়া গভর্ণমেণ্টরূপ নন্দঘোষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে। শেষে সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে—গ্রামকে গ্রাম কাবার হইয়া যায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের শক্তি অধার-স্বরূপ পল্লীগুলি যে ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে—স্বাস্থ্যের অবনতিই ইহার মূল কারণ। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কেবল দরখাস্ত করিয়া বা সংবাদ পত্রে অভাব জ্ঞাপন করিয়া ও সংবাদ ছাপিয়া পল্লীস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিবার আশা নাই।

বাঙ্গালী ক্রমে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইতেছে। বঙ্গপল্লীসমূহের অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতেছে, এবং রোগে শোকে, অশান্তিতে আমাদের জীবন-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিলতর হইতেছে,—ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেছি, রাজনীতিক অধিকার লাভের আশায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছি, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়াছি; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, সমাজসংস্কার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, অধঃপতিত জাতিসমূহের উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন আলোচনায় সমগ্র দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু গোড়ায় যদি বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে না পারি, তাহা হইলে এ সকলই গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত সব নিষ্ফল হইবে।

আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা ও মা শীতলার প্রসাদে কি বিপুল জনক্ষয় হইতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয় আতঙ্কে ও নিরাশায় পূর্ণ হয়! এক ম্যালেরিয়াতেই কি সমগ্র বঙ্গে প্রতি বৎসর তিনলক্ষাধিক লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না? দশ বৎসরে গড়ে ৪০।৪৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু বাঙ্গালী জাতির কি শোচনীয় পরিণাম সূচনা করিতেছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

কিন্তু পল্লীবাসিগণের স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগ, দারিদ্র্য, গ্রামের ভিতর জঙ্গলের প্রাচুর্য্য, বর্ষার জল নিঃসারণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পয়ঃপ্রণালীর অভাব এবং অজ্ঞতানিবন্ধন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান যে আমাদের এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশের পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজ, ধনাঢ্য সম্প্রদায়, বণিক ও চাকুরীজিবিগণ জলস্রোতে ভাসমান শৈবালের মত বিশাল সমাজের

উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, সমাজের সুগভীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই; সমগ্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ বা এক ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে অর্থ আহরণ করেন বটে, কিন্তু অর্থ উৎপাদনের শক্তি তাঁহাদের নাই। পল্লীগ্রামের চিরসহিষ্ণু কৃষকগণ, নিরন্ন শ্রমজীবি-সম্প্রদায় অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া নিদাঘের দুঃসহ আতপতাপে ক্লিষ্ট হইয়া, বর্ষার অবিরল বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়া, শীত-নিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাবে পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে 'জানুভানু কৃশানু' মাত্র আশ্রয় করিয়া, আমাদের অন্নবস্ত্র এবং 'জীবন ধারণ কিংবা আরাম কারণ' যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই সংগ্রহ করিবার উপাদান উৎপাদন করিতেছে। এই অশিক্ষিত, অজ্ঞানান্ধ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন, অদৃষ্টবাদী, বিরাট, বিশাল জনসঙ্ঘই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। ইহাদের স্বাস্থ্য, সুখস্বচ্ছন্দতা, অর্থের সচ্ছলতা ও উন্নতির উপর সমাজের কল্যাণ ও জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য নানা রোগের আকরস্বরূপ পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য কিরূপে উন্নত হইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে পল্লীবাসী নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিবর্গের আর্থিক অবস্থা কি উপায়ে স্বচ্ছল হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষও নিশ্চেষ্ট নহেন। কিন্তু কোন উপায়েই এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে নদীয়া জেলার একজন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসনাধীন পল্লীসমূহে এ সম্বন্ধে যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সুফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে নদীয়া সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র জেলা কি না, তাহা ঠিক জানা না থাকিলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এরূপ দরিদ্র জেলা বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে। এই জেলায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমীদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, লক্ষপতি পর্য্যায়ভুক্ত জমিদার পরিবার দুই একটির অধিক আছেন কি না সন্দেহ; তেমন বিস্তৃত ব্যবসায়ের অধিকারীর সংখ্যাও অত্যন্ত বিরল। জন-সাধারণের অধিকাংশই নিঃস্ব কৃষিজীবি ও শ্রমজীবি, তাহাদের 'নুন আন্‌তে পান্তা ফুরায়, পান্তা আন্‌তে নুন [illegible]' —এই জেলার মধ্যে মেহেরপুর মহকুমা কেবল যে অতি দরিদ্র, ইহাই নহে, ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র বলিয়া বহুদিন হইতেই এই মহকুমার দুর্ণাম আছে। ম্যালেরিয়া প্রকোপে নদীয়ার যে সকল প্রাচীন ও সমৃদ্ধি পল্লী বহুদিন পুর্ব্বে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া বিরলবসতি ও বরাহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, মেহেরপুর তাহাদের অন্যতম।

এই মেহেরপুর মহকুমার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ফজলল্ করিম সাহেব মেহেরপুর মহকুমার শাসনভার গ্রহণের পর হইতেই, এই উপরিভাগের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বুঁঝিয়াছিলেন, নিবিড় জঙ্গলের ও দূষিত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খানা ডোবা-গর্ত্ত প্রভৃতির বাহুল্যই এখানে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের আতিশয্যের প্রধান কারণ। কিন্তু স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী [illegible] বোর্ডের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা এই সকল জঙ্গলের বা খানা ডোবা-গর্ত্তগুলির বিলোপ-সাধন সম্ভবপর নহে; এবং ভূ-স্বামীগণেরও আর্থিক অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল নহে যে তাঁহারা যথাযোগ্য অর্থব্যয়ে এই সকল জঙ্গল কাটাইয়া বা খানা ডোবাগুলি ভরাট করাইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাসের ব্যবস্থা করেন। মৌলবী সাহেব দেখিলেন, [illegible] কোন উপায়ে এই সকল জঙ্গল কাটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কিছুদিনেই তাহা সুপ্রশস্ত, উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। বড়-বড় খানা-ডোবাগুলি খনন করাইতে পারিলে নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হয় [illegible] তাহা নদীহীন বহুপল্লীর পানীয় জলের অভাব [illegible] করিবে।

মৌলবী সাহেব এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য [illegible] একটি সমৃদ্ধ গ্রামের উৎসাহশীল, পরিশ্রমী ও [illegible] যুবকগণের সাহায্যে এক একটি সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। এই সকল সমিতি স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে এক-একটা অব্যবহার্য্য জঙ্গল অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। পতিত জমি ও জঙ্গল বহু বৎসর আবাদের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় তাহা হইতে আয়ের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জমিদারেরা আগ্রহ সহকারে ঐ সকল জমি সামান্য খাজনাতেই গ্রাম্য-সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সমিতির চেষ্টায় যদি ঐ সকল জঙ্গলাকীর্ণ জমি কালে উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের স্থায়ী আয়ের একটা উপায় হইতে পারে।

জঙ্গল কাটাইবার জন্য বোর্ড কতক টাকা মঞ্জুর করেন। মৌলবী সাহেব সেই টাকা অংশানুযায়ী ঐ সকল সমিতির হস্তে প্রদান করিলে, সমিতি জঙ্গল কাটাইয়া সেখানে আবাদ আরম্ভ করিলেন। পাট ও বিবিধ শস্য এই সকল জমিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সকল জমীতে আবাদের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা প্রথমে উক্ত সমিতির দুই একজন অবস্থাপন্ন সদস্যই প্রদান করিয়া থাকেন; এই জমীতে যে পাট বা ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়, যাহা লাভ হয় তাহা সমিতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত অর্থই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধানের সম্বল। এই উদ্বৃত্ত অর্থে এবং লোক্যাল বোর্ড জঙ্গল কাটাইবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর করেন, তাহার সাহায্যে জঙ্গল কাটাইয়া চাষ আরম্ভ করায়, জঙ্গলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, চাষের উপযোগী কৃষিক্ষেত্রও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে।

বিভিন্ন গ্রামে যদি কয়েক বৎসর এইভাবে কাজ চলে, তাহা হইলে সেই সকল স্থানের অধিকাংশ জঙ্গল বিলুপ্ত হইবে; এবং যে সকল স্থান দীর্ঘকাল যাবৎ বন্য-বরাহ ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইয়া গ্রামবাসীদের ভীতি উৎপাদন করিতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া নয়নাভিরাম শ্যামল শস্যের শোভায় তাহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিবে। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, গ্রামবাসীদের অবস্থা উন্নত হইবে, জমিদারগণেরও অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে।



জঙ্গলগুলি এই ভাবে নষ্ট করায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কতকটা খর্ব্ব হইলেও গ্রামের অভ্যন্তরস্থিত খানা-ডোবা গর্ত্ত প্রভৃতি দুর্গন্ধ-দূষিত পঙ্কিল জলাশয়গুলি ভরাট করিতে বা তাহা সুপেয় জলপূর্ণ পরিষ্কৃত জলাশয়ে পরিণত করিতে না পারিলে, পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য উন্নত হইবার আশা নাই বুঝিয়া সহৃদয় মৌলবী সাহেব উক্ত সমিতিগুলির হস্তে আর একটি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতেছেন। যে সকল ডোবা ও গর্ত্ত নদীর অদূরে অবস্থিত, তাহাদের বদ্ধজল খাল কাটিয়া নদীতে প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এতদ্ভিন্ন অদূরবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রে সেই জল সেচন করিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও সরসতা সম্পাদন সম্ভব হইলে তাহাও ব্যবস্থা করা হইতেছে। যে সকল গ্রামে দূষিত জলপূর্ণ ডোবা বা গর্ত্তের সংখ্যা অধিক, সেখানে সেই সকল গর্ত্তের জল পয়ঃ-প্রণালী সংযোগে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গর্ত্তে নিঃসারিত করিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গর্ত্তগুলিকে শুষ্ক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; বৃহত্তর গর্ত্তে ক্ষুদ্র ডোবাগুলির জল সঞ্চিত হইলে তাহাতে রোদ-বাতাস খেলিবার সুবিধা হইবে। জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়ায় অন্ধকারে যে সকল পঙ্কিল জলাশয়ে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া, বা ম্যালেরিয়ার কারণস্বরূপ মশকাদি উৎপন্ন হইয়া, পল্লীগুলিতে ম্যালেরিয়ার আবাদ করিতে থাকে—তাহা শুষ্ক হইলে আর সেখান হইতে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইবে না, মশকও জন্মিবে না; অধিকন্তু যে সকল বৃহৎ গর্ত্তে ঐ সকল জল সঞ্চিত হইবে, তাহাতে কৈ, মাগুর প্রভৃতি মশকডিম্ব ভোজী মৎস্যের চাষ আরম্ভ করিলে, গ্রামে মশার উপদ্রব তিরোহিত হইবে এবং এই উপায়ে পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। এই সকল বৃহৎ গর্ত্ত কালে পুষ্করিণীতে পরিণত হইবার আশাও দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। নদীহীন স্থানসমূহের জলকষ্ট নিবারণের জন্য অল্প অর্থব্যয়েই এই

সকল বৃহৎ গর্ত্ত কাটাইয়া পুষ্করিণী করিবার ইচ্ছা অনেক সমৃদ্ধ গ্রামবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মৌলবী সাহেব তাঁহার এই মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিলে আশা হয়, যে সকল স্থানে প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, অল্পদিনেই নানা ভাবে সে সকল স্থানের উন্নতি লক্ষিত হইবে। ইহাতে গ্রামের জনসাধারণের আত্ম-নির্ভরের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং তাহারা দশজনে একত্র মিশিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ক্রমে আয়ত্ত করিতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের ইহাই প্রথম সোপান। ইহাতে গ্রামবাসিগণের পরস্পর মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে, এবং গ্রাম্য মণ্ডলেরা এই ভাবে গ্রামবসীদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভাজন হইবে। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা অলস লোকেরা এইরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া তাহার প্রভাবে ক্রমে মানুষ হইতে শিখিবে, ইহাও আশা করা যাইতে পারে।

কোন কোন সংশয়বাদী লোক মৌলবী সাহেবের এই চেষ্টাকে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাবের মত নিস্ফল ও হাস্যোদ্দীপক মনে করিয়া অবিশ্বাসভরে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িবেন। কিন্তু একস্থানে শয়ন করিয়া অক্লেশে পুচ্ছ আন্দোলন করাই যাহারা গোজন্মের চরম সার্থকতা মনে করে—তাহাদের বিজ্ঞতা দ্বারা দেশের বা সমাজের কোন কল্যাণ সাধনের আশা নাই; মৌলবী সাহেবও তাহাদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং বঙ্গের প্রজারঞ্জক গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে এই সুবিস্তীর্ণ দেশের অভিশাপ স্বরূপ ম্যালেরিয়ার দমনের জন্য সচেষ্ট হওয়ায় আমাদেরও আশা হইয়াছে—বর্ত্তমান সঙ্কটকালেও মৌলবী সাহেবের আবদ্ধ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার এই সাধু অনুষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভ করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে। মৌলবী সাহেব মেহেরপুর উপরিভাগের উত্তরাংশে সুন্দলপুর গ্রামে গত বৎসর এই শুভানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। পরীক্ষায় যে সকল ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ; এই ফুল সুন্দলপুর গ্রামের ভবিষ্যৎ কল্যাণের আভাস জ্ঞাপন করিতেছে। এইজন্য তিনি বর্ত্তমান বর্ষে অধিকতর উৎসাহের সহিত নারায়ণপুর, কুচুইডাঙ্গা, রায়নগর, বল্লভপুর, পিপুলখোলা, আরবপুর, কেচুয়াডাঙ্গা, নতিভাঙ্গা ও শ্যামনগর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে এই সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা সোৎসাহে ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এই সকল গ্রামের স্বাস্থ্য ও গ্রামবাসীগণের সমবায়-লব্ধ অর্থের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইবে। এই সকল গ্রামে কার্য্যদক্ষ, চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান, উৎসাহী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় সন্দেহ নাই; তাহাদের তেমন অর্থবলও নাই; কিন্তু কর্ম্মবীর মৌলবী সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টা ও অনন্য-সাধারণ উৎসাহে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি সংগঠিত করিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত সঙ্কল্পিত পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং দলাদলি, রেশারেশি ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও খলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব গ্রামের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছে—স্বদেশের দ্বারের বক্তৃতা ও রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আবেদন-নিবেদনের ঝুলি-ঝাড়া অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে বরণীয় ও অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, মেহেরপুর লোক্যাল বোর্ড মৌলবী সাহেবের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিতেছে এবং লোক্যাল বোর্ডের কার্য্যদক্ষ, উদ্যমশীল ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সান্যাল, বি-এল মহাশয় নানা ভাবে এই সকল গ্রামবাসীর সাধু অনুষ্ঠানের সহায়তা করিতেছেন, নিজের আরাম বিরাম তুচ্ছ করিয়া বাইশিকেল চাপিয়া গ্রামে গ্রামে অক্লান্ত ভাবে ঘুরিয়া তাহাদের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিতেছেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের ন্যায় নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তা এদেশে অনেক আছেন; কিন্তু পল্লীবাসিগণের সুখ, স্বাস্থ্য ও প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য এরূপ চেষ্টা শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিতান্ত বিরল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার অনুকরণে যদি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পল্লীসমূহের ম্যালেরিয়া-পীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, জীবন্মৃত অধিবাসিবর্গের সম্মুখে এইরূপ অভিনব কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকাণ্ড অভাব দূর হইতে পারে।



# গ্রামের স্বাস্থ্য

## ভারতীয় স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট।

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার মেজর নরম্যান হোয়াইট গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে।

"অনেক সময়ে ইহা দেখা গিয়াছে যে, গ্রামে যখন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করে তখন আর উহা নিবারণ করা যায় না। ভারতবর্ষের পল্লীবাসীরা যেমন ভাবে বাস করিতেছে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করাও সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বাস্থ্যসংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও সুদক্ষ শিক্ষিত লোকের অভাব দেখা যাইতেছে।

গোবীজ টীকার জন্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারী আছে, এবং প্লেগের জন্য সরকার হইতে অস্থায়ী লোক নিযুক্ত হয়, এতদ্ভিন্ন গ্রামের লোকসাধারণের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই। যদি পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে এখন যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলেও ঐ টাকা গ্রামের হিতার্থে ব্যয় করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

জেলার সিভিল সার্জ্জনকে নামতঃ সমগ্র জেলার কার্য্যকর্ম্মচারী বলা হয়। তিনি কর্ম্মভারে নিপীড়িত থাকেন, বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকতা নিরুদ্ধ করিতে হইলে যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক উহা তাঁহার নাই।

এইরূপ ব্যাধির প্রসার থামাইবার জন্য যেরূপ সামান্য চেষ্টা কখন কখন করা হয় উহা জেলার কালেক্টরেরা করিয়া থাকেন। তিনি তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইতে পারেন কিন্তু ঐ উপদেশ তিনি ইচ্ছা করিলে মানিতে বা ভঙ্গ করিতেও পারেন। এমন ব্যবস্থা যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয় তখন ইহা ক্ষমার্হ ছিল; কিন্তু রোগের হেতু ও প্রসারের প্রশমন উপায় এমন দ্রুতগতিতে নির্ণীত হইতেছে যে, এক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা চেষ্টা করিলে রোগের ব্যাপ্তি থামাইয়া দিতে পারেন। সে যাহা হউক এক্ষণে গ্রামের স্বাস্থ্য যেমনভাবে উপেক্ষিত হইতেছে উহা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। এই বিষয়ে নানারূপ সংস্কার পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল বলিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে।

আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি ব্যয়সাধ্য এবং এক্ষণে অর্থব্যয়ও অতীব ক্লেশকর। কিন্তু তথাপি বলিতেছি যে, সুচিন্তিত বিধি কার্য্যে পরিণত করা হইলে কদাচ লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের ৭টি বৃহৎ প্রদেশ গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে আমি উহা হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে শান্তিকালে কত ব্যয় হইত উহা দেখাইবার জন্য ১৯১৩-১৪ সালের জেলা বোর্ডের রিপোর্ট অবলম্বন করা হইয়াছে।

মাথাপিছু কর অসমান হইলেও সর্ব্বত্রই উহা অতি অল্প। সংখ্যাগুলি এই:—

| | মাথাপিছু |
|---|---|
| মান্দ্রাজ | ৵১০ পাই |
| বোম্বাই | ৵২ পাই |
| পঞ্জাব | ৵২ পাই |
| বঙ্গদেশ | ৵৩ " |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | ৵৭ " |
| যুক্তপ্রদেশ | ৵৩ " |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৵৩ " |

জেলাবোর্ড গুলির মাথাপিছু আয়।

| | |
|---|---|
| মান্দ্রাজ | ॥/৪ পাই |
| বোম্বাই | ।৶৭ „ |
| পঞ্জাব | ।৶০ |
| যুক্তপ্রদেশ | ।ঃ পাই |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ।০ আনা |
| বঙ্গদেশ | ৶৭ পাই |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | ৶৭ পাই। |

লোক সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে আয়ের কত অংশ ব্যয়িত হয় তাহার হিসাব এই:—

| | শতকরা |
|---|---|
| মান্দ্রাজ | ৫.১ |
| বোম্বাই | ৪.৮ |
| মধ্য প্রদেশ ও বেরার | ৩.৯ |
| বঙ্গদেশ | ৩.৫ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ১.৮ |
| যুক্ত প্রদেশ | ১.৮ |
| পঞ্জাব | ১.৩ |

আর সকল প্রদেশ হইতে মান্দ্রাজ বোম্বাই জন সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। মাথাপিছু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আনার কত ভগ্নাংশ ব্যয়িত হয় উহা দেখিলেই অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে:—

| | আনা |
|---|---|
| মান্দ্রাজ | ০.৫ |
| বোম্বাই | ০.৩৬ |
| মধ্য প্রদেশ ও বেরার | ০.১৫ |
| বঙ্গদেশ | ০.১২ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ০.০৯ |
| পঞ্জাব | ০.৯৯ |
| যুক্ত প্রদেশ | ০.০৭ |

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যখন ঐরূপ ব্যয় হইতেছিল তখ[illegible] গ্রামে প্রত্যেক দশ সহস্রে কত লোকের মৃত্যু হইতেছি[illegible] ১৯১৩ সালের হিসাব হইতে উহা দেখান হইল:—

| | প্রত্যেক দশ সহস্রে |
|---|---|
| মান্দ্রাজ | ২০.৮ |
| বোম্বাই | ২৫.৪১ |
| মধ্য প্রদেশ ও বেরার | ৩০.২[illegible] |
| বঙ্গদেশ | ২৯.৬[illegible] |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ২৯.২[illegible] |
| পঞ্জাব | ২৯.৬[illegible] |
| যুক্ত প্রদেশ | ৩৪.৪[illegible] |

উক্ত হিসাব দৃষ্টে বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই স্বাস্থ্যের জন্য অপেক্ষা কৃত অধিক অ[illegible] ব্যয় করায় উক্ত দুই প্রদেশেই পল্লীগ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে।

গো-বীজের টীকা।

বঙ্গদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় অনেক টাকা গো[illegible] বীজের টীকায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই টাকা অংশত[illegible] প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত [illegible] প্রদেশের জেলাবোর্ড স্বাস্থ্যের জন্য ৩২॥০ লক্ষ টাকা ব্য[illegible] করে, এতন্মধ্যে গো-বীজ টাকায় ৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হ[illegible] ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারে ১০ সহস্র ম[illegible] ২৮.৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তের মৃত্যু [illegible] ০.৪১। ইহা হইতে দেখা যায় যে রোগে সমগ্র [illegible] সংখ্যা $\frac{1}{৭০}$ অংশ মরিয়াছে, উহার জন্য স্বাস্থ্যের রক্ষা[illegible] নিমিত্ত মোট ব্যয়ের ষষ্ঠাংশ ব্যয়িত হইয়াছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

পূর্ব্বোক্ত ৭টি বড় প্রদেশের জিলাবোর্ডগুলি স্বাস্থ্য[illegible] রক্ষার জন্য ৩২॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। শিক্ষা[illegible] জন্য জিলাবোর্ড গুলি প্রায় দেড়কোটি টাকা [illegible] নিম্নশিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা হউক এমন কথা কেহ বলি[illegible] না। কিন্তু লোক সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য [illegible] অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা হয় তাহা হইলে শি[illegible]ক্ষা এবং সর্ব্ব প্রকার ব্যাপারই ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবে। সাধারণতঃ ইহা শুনা যায় যে, শিক্ষা অপেক্ষা স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয়েরই কেন উন্নতি সাধন করা হইবে না আমরা তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা শিক্ষাদান করিলে উহার ফল সম্যক পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয়।

ইহা দেখান হইয়াছে যে, উক্ত ৭টা বড় প্রদেশে নিম্নে ০·১ হইতে উর্দ্ধে ০·৫ আনা মাথাপিছু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। এই অধীবাসীদের মোট সংখ্যা ২০ কোটির উপর। ইহাদের উপার্জ্জন শক্তি বৃদ্ধি করা স্বাস্থ্যবিধির উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক দশ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যের জন্য বৎসর ১ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হওয়া উচিত। ইহাতে মাথাপিছু ব্যয় ১·৬ আনা হয়। উহা কিছুতেই অতিরিক্ত হইতে পারে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিষ্ঠান।

স্বাস্থ্য বিধির জন্য কিরূপ প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত স্বাস্থ্য বিভাগীয় কন্‌ফারেন্সে উহা আলোচিত হইয়াছে। উপযুক্ত লোকদ্বারা প্রত্যেক জেলায় স্বাস্থ্যরক্ষার তত্ত্বাবধান জন্য প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জেলার প্রতিষ্ঠানই অপর প্রতিষ্ঠান হইতে উৎকৃষ্টতর কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। যাহাতে মহামারী লাগে এমন কোন ব্যাধি কোন জেলায় দেখা দিলে উহা জেলা কমিটির পক্ষে নিন্দনীয় হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের যদি কার্য্য করিবার যথোচিত স্বাধীনতা থাকে তাহা হইলে তাহারা রোগ নিবারণের মৌলিক গবেষণার ফল নিঃসন্দেহ কার্য্যে চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

মহাসমর মধ্যে এই ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কার্য্য করা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কিন্তু ইহার প্রারম্ভ আয়োজন সত্বর হওয়া উচিত।

---

# সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা

সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও অনেক সময় তাহা হইতে বিশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রোগ আরম্ভের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ্মা রোগীগণের মধ্যে অনেকে বলিবে—‘প্রথমে ঠাণ্ডা লাগিয়া বক্ষে সর্দ্দি বসে। কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারি নাই। ক্রমে সন্ধ্যায় অল্প করিয়া জ্বর হইতে আরম্ভ হইল। শরীরের ওজন কমিয়া গেল এবং রাত্রে ঘাম হইতে লাগিল।’

ঠাণ্ডা লাগা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার সামান্য আক্রমণ অধিকাংশ সময় ভবিষ্যত মারাত্মক ব্যাধির দূত স্বরূপ অগ্রে উপস্থিত হয়। মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিয়া টন্‌সিলাইটিস এবং তাহা হইতে বিষ উৎপাদক বীজাণুর উৎপত্তি হইয়া গ্রন্থী সমূহে বিষম বাত বেদনা, এমন কি হৃদ্‌যন্ত্রের স্থায়ী অনিষ্টও হইতে পারে।

বীজাণুর প্রভাব বৃদ্ধি।

যে বীজাণুর দ্বারা ভয়ানক সর্দ্দি বা বিষম টন্‌সিলাইটিস্ রোগ উৎপন্ন হয় তাহারা সকল সময়েই আমাদের দেহে আছে। এই সকল বীজাণু অল্পাধিক পরিমাণে নাসিকা এবং গল নলির মধ্যে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হয় না।

যখন আমাদের শরীর তেজহীন হয় এবং রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায় সেই সময় ঐ সকল বীজাণুর সংখ্যা ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

## শরীরের তেজ হানির কারণ।

অত্যন্ত শোক দুঃখ বা ভাবনায় শরীর তেজহীন হইলেও অধিকাংশ স্থলে নিদ্রার অভাবেই আমাদের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পরিশ্রম ক্লান্ত শরীরে নিদ্রার সময়েই আমাদের নব শক্তি লাভ হয়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় শরীরের তেজ ক্ষয় করিয়া থাকি।

সমস্ত দিন ভিজা পায়ে থাকা বা অন্য কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগাইলে আমাদের শরীরের তেজহানি হয় এবং রোগপ্রতিষেধ শক্তি কমিয়া যায়, ফলে বীজাণুগণের মধ্যেও বিদ্রোহ ভাব জাগিয়া উঠে। তাহারা বিষ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে এবং একারণে ঠাণ্ডা লাগার নানারূপ খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনেক নির্ব্বোধ লোকে ফ্যাসানের খাতিরে ঠাণ্ডার সময়েও উপযুক্ত ভাবে শরীর আবৃত হয় এইরূপ পোষাক পরিধানে বিরত থাকে। অনাবৃত অঙ্গে ঠাণ্ডা লাগায় তথায় রক্ত চলাচলের হ্রাস এবং ফুস্‌ফুস্ ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তের আধিক্য হয়। এইরূপ অবস্থায় বীজাণু সমূহের কার্য্য বৃদ্ধিরও বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। অনেকে শীতের সময় গাত্র ও মস্তক গরম বস্ত্রে উত্তমরূপে আবৃত রাখিলেও পদদ্বয় একবারে আবরণহীন করিয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়।

## দূষিত বায়ু সেবন।

অনেকে বায়ু চলাচল হীন বদ্ধ ঘরে বাস করার জন্য সহজেই ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। গ্লাসের জলে দু এক ফোঁটা অপরের ঘাম পড়িলে তাহা পান করিতে যাহারা আপত্তি করে তাহাদের অনেকেই অপরের নিশ্বাস পরিত্যক্ত দূষিত বায়ু সেবন করিতে কোনই অসুবিধা ভোগ করে না।

উত্তরমেরু আবিষ্কারক লেফ্‌টনাণ্ট পিয়ারী অনেক দিন মেরু প্রদেশে দারুণ শীতে সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াই আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরের এক হোটেলের বায়ু চলাচল হীন ঘরে বাস করায় বিষম সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। শীতের ভয়ে কিছুতেই নিদ্রার সময় দূষিত বায়ু সেবন করা উচিত নয়। যাহাতে প্রচুর নির্ম্মল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতে পারে সে জন্য জানালা খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জোর বাতাসে বিশেষ অসোয়াস্তি বোধ হইলে জানলার সামনে পরদা ঝুলাইয়া তাহার জোর কমান যায়। আবশ্যক বোধ হইলে গাত্রের ন্যায় মস্তকও আবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। মোট কথা সকল সময়েই ইহা মনে রাখা উচিত যে নিদ্রা এবং অক্সিজেন পূর্ণ বায়ু স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে।

জ্বর-রোগীর ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। যতক্ষণ দেহের তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে ততক্ষণ ঠাণ্ডা লাগার কোনই ভয় নাই। এসময়ে অনেকেরই অজ্ঞতা দেখা যায় এমন কি চিকিৎসকেরাও অনেক সময় ইহা ভুলিয়া যান।

## আহারের দোষ।

অতিরিক্ত আহার, গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ ও আহারের অন্যান্য দোষে দেহ মধ্যে বিষ উৎপন্ন হইয়াও সর্দ্দি এবং এই ধরণের অন্য বীজাণুর সংক্রামণ হইয়া থাকে।

অধিক মাংস ও মৎস্য আহার পরিত্যাগ করা উচিত! কারণ ঐ সকল খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে সহজেই অন্ত্রমধ্যে পচন আরম্ভ হয়। পচনোৎপন্ন বিষ শরীরকে তেজহীন করায় সর্দ্দি বীজাণু বৃদ্ধির সুবিধা হইয়া থাকে।

আহারের দোষে যখন শরীরের অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা যায় তখন ২।১ দিন কেবল ফলাহার করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অন্ত্র নালী পরিস্কার হয়। ফলের রসে অন্ত্রস্থিত বীজাণু শক্তি হীন হয়, তাহার লবণ উপাদান দুষিত রক্তকে নির্দ্দোষ করিয়া থাকে।



## কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা আবশ্যক।

কোষ্ঠবদ্ধতায় অধিক দিন স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না। যাহাতে সূচনার প্রারম্ভেই এই দোষ দূরীকৃত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কার্য্য সাধনের জন্য আহার্য্যের মধ্যে অধিক পরিমাণ শাক সব্জি তরকারী গ্রহণ করিতে বা আহারের ঘণ্টা খানেক পরে এক কি দুই চামচ করিয়া প্যারাফিন তৈল (Medicinal Paraffin) গ্রহণ করিতে হইবে। এই খনিজ তৈল জোলাপ নহে এবং শরীরে শোষিত হয় না, কেবল ইহাতে অন্ত্রস্থিত মল নিঃসরণের সুবিধা করিয়া থাকে।

## ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা নিবারণ।

যাহাদের সহজেই মাথায় ঠাণ্ডা লাগে, তাহারা শয়নের পূর্ব্বে মুখ, ঘাড় এবং বক্ষের উপরভাগে ঠাণ্ডা জল দিয়া গামছা দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। এইরূপ করিলে পর যদি বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহাতে উপকারের স্থলে অনিষ্টই হইতেছে। এ স্থলে ঠাণ্ডা জলে গা মুছিবার সময় গরম জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

## এক দিনে সর্দ্দি নিবারণ।

প্রারম্ভে উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এক দিনেই সর্দ্দি আরোগ্য করা যায়। সাধারণত লোকে সর্দ্দিকে রোগ বলিয়াই গ্রাহ্য করে না। কোনরূপ আরোগ্য চেষ্টা না করায় অনেক সময় ইহা হইতে অন্য কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক বার সর্দ্দির আক্রমণেই শরীরের তেজহানি হয় এবং ফলে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। যখন সর্দ্দি রোগকে অবহেলা করা হয় তখন যে পর্য্যন্ত না শরীর ইহার বিষকে বিনষ্ট না করিতে পারে সে পর্য্যন্ত আরোগ্য হয় না। অনেক সময় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে এক হইতে তিন সপ্তাহ বা আরও অধিক সময় লাগিয়া থাকে।

সর্দ্দি আরোগ্যের জন্য যে সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ ("Sure Cure") বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশতেই হয়, এলকোহল, মরফিন, কোকেন বা অন্য বিষাক্ত দ্রব্য থাকে। এই সকল দ্রব্য রোগ আরোগ্য কল্পে প্রকৃতির সহায়তা করা অপেক্ষা শরীরের শক্তির অবসাদ ঘটাইয়া থাকে।

## প্রথমে কি করা উচিত।

সর্দ্দির আক্রমণের প্রারম্ভে অধিকাংশ স্থলেই মাথা ভার এবং নাসিকা ও গলার মধ্যে শুষ্কতা অনুভূত হয়। এই সময়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে গরম পাদ-স্নান (Hot foot Bath) গ্রহণ করা উচিত। বক্ষে চাপ ভাব বোধ হইলে গরম সেক দেওয়ার আবশ্যক হয়।

সমপরিমাণ—অয়েল অফ্ ইউক্যালিপ্‌টস্
অয়েল অফ্ থাইমল

মিশাইয়া তাহার দু তিন ফোঁটা এক ঘটি ফুটন্ত জলে দিতে হইবে। কাগজের একটি ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঔষধ মিশ্রিত ফুটন্ত জলের বাষ্প ১০।১৫ মিনিট কাল শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে। গলার মধ্যে বেদনা যুক্ত স্ফিতী থাকিলে 'Ten pertent Solution of Argyrol' ঔষধ তুলি করিয়া লাগাইলে সত্বর আরাম বোধ হইবে। ইহাতে ভিতরস্থিত তন্তুর কোন ক্ষতি না হইয়া বীজাণু সমূহের শক্তির হানি ঘটে। মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু স্ফিত ও বেদনাযুক্ত হইলে এই ঔষধ দু এক ফোঁটা দেওয়ায় উপকার পাওয়া যায়।

সুবিধা থাকিলে এনিমা দিয়া কিম্বা দু তিন চামচ Medicinal paraffin তৈল গ্রহণ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া এই তৈল নাসিকা দিয়া টানিয়া লইতে হইবে। নাসিকার আভ্যন্তরিক আস্তরণে তৈল লাগিয়া থাকায়

বীজাণুর শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। দুই তিন গ্লাস গরম জল বা ফলের রস গ্রহণ করিলে মূত্রগ্রন্থির সাহায্যে শরীরের বিষ বাহির হইবার সুবিধা হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করার পর নিদ্রা যাইলে প্রভাতে উঠিয়া রোগের আর কোন চিহ্ন দেখা যাইবে না। তখন মনে হইবে যে পূর্ব্বেকার আক্রমণের সময় কেন এই উপায় অবলম্বন করি নাই।

## বিপদজনক হাঁচি।

বিষম সর্দ্দিতে যে লোক যেখানে সেখানে হাঁচিতেছে বা কাসিতেছে তাহাদের নিকটে সাবধানে থাকিবে। প্রতি বারেই সে অসংখ্য বীজাণু ছড়াইতেছে। এইরূপ লোকের সম্মুখে কখনই থাকা উচিত নয়। রোগীরও নিজে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের তেজ হানী হইলেই লোকের এইরূপ রোগী হইতে সর্দ্দির আক্রমণ ঘটিবে।

---

# আকন্দ

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

আকন্দ গাছ সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্ত। এই গাছ মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকে। পত্র মনুষ্যের করতলের ন্যায়—তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র ও অণ্ডাকার। পত্রে এক প্রকার সাদা সাদা রেণু লাগিয়া থাকে, ঘষিলে আঠার ন্যায় চট্‌চটে বোধ হয়। পুষ্প শ্বেত ও বেগুনিয়া বর্ণ এবং গুচ্ছাকারে অবস্থিত থাকে। রক্তবর্ণ পুষ্প বিশিষ্ট আকন্দ কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার বোধ হয় এই বেগুনিয়া পুষ্প বিশিষ্ট আকন্দই রক্ত আকন্দ। ফল গোশৃঙ্গ সদৃশ; ইহার মধ্যে এক প্রকার তুলা জন্মে। এই তুলার বালিশ স্নিগ্ধকারী, রেশমের ন্যায় সুখস্পর্শ ও কফ্‌বাত নাশক। এই জন্য পল্লীগ্রামে শিশু ও রোগীর ব্যবহারের নিমিত্ত বঙ্গীয় গৃহিণীগণ আকন্দ তুলার বালিস প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন।

আকন্দ তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে তবে সূত্র প্রস্তুতের তুলা যেরূপ "আঁইস" বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক তদ্রূপ নহে, তজ্জন্য সাবধানে প্রস্তুত করিতে হয়। যদি রীতিমত চাষ করা যায়, তাহা হইলে এই "অসুবিধা" দূর হইতে পারে। ইহার চাষে কোনরূপ কষ্ট নাই, পতিত জমিতে বীজ ছড়াইলে গাছ জন্মে। যত্নের সহিত চাষ করিলে এই তুলা রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে। সূতা প্রস্তুত হউক আর নাই হউক, বালিশ ও গদির তুলার জন্য বিলাসীগণ যে ইহা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রীতিমত চালান দিতে পারিলে ইহা একটা বিশেষ লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে। উদ্যোগী পুরুষ একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন! আমি একেবারেই চাষ করিতে বলিতেছি না, প্রথমে তাঁহারা কিছু আকন্দ তুলা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা Whiteaway Laidlaw, Francis Harrison Hathaway প্রভৃতি সাহেবদের দোকানে নমুনা পাঠাইয়া দর যাচাই করিতে পারেন। পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই চলিবে। এতদ্ভিন্ন ইহার আঠা হইতে গটাপার্চ্চা প্রস্তুত ও চামড়া ট্যান (Tan) করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালায় ইহাকে আকন্দ, হিন্দিতে মান্দার, ইংরাজী ভাষায় ক্যালোট্রপিশ্ (Calotropis) বলে। এই গাছ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আকন্দের সাধারণ গুণ—

অর্কদ্বয়ং সরং বাত কুষ্ঠ কণ্ডুবিষ ব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ শ্লেষ্মোদর যকৃৎ ক্রিমীন্॥
অলর্ক কুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপন পাচনম্।
অরোচক প্রসেকার্শঃ কাস শ্বাস নিবারণম্॥
ক্ষীর মর্কস্য তিক্তোষ্ণ স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠ গুল্মোদর হরং শ্রেষ্ঠ মেতদ্ বিরেচনম্॥

অর্থাৎ উভয় আকন্দই তিক্ত লবণ রস, কটু বিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও কফঘ্ন এবং বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণ নাশক; প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ ও ক্রিমি বিনাশক এবং অর্শো-নিবারক ও সারক। আকন্দ পুষ্প—লঘু; দীপক ও পাচক; অরুচি, মুখস্রাব, কাস ও শ্বাস নাশক এবং অর্শোঘ্ন ও বৃষ্য। আকন্দ দুগ্ধ—তিক্ত লবণ রস, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ ও কুষ্ঠহর (বাহ্যপ্রয়োগে চর্ম্মরোগ নাশক) গুল্ম ও উদর রোগ নাশক এবং শ্রেষ্ঠ বিরেচন।

মতান্তরেক্ত আকন্দের গুণ—

রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং
কফনাশনঞ্চ।
অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং সংগ্রাহি গুল্মে
শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥

রক্ত আকন্দের কেবল পুষ্পই ব্যবহার যোগ্য—ইহা মধুর তিক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ ও বিষ নাশক; রক্তপিত্তঘ্ন, সংকোচক, গুল্ম ও শোথ রোগে উপকারী।

অর্থাৎ শ্বেত আকন্দ অপেক্ষা রক্ত আকন্দ কিঞ্চিৎ হীন গুণ, কিন্তু শ্বেত আকন্দের পুষ্প অপেক্ষা রক্ত আকন্দের পুষ্প অধিক গুণশালী, যেহেতু ইহা ধারক এবং রক্তপিত্ত নাশক (শ্বেত আকন্দের পুষ্প সারক) শ্বাসরোগের সহিত রক্তপিত্ত থাকিলে রক্ত আকন্দের পুষ্পের রসে বিশেষ উপকার হয়।

এলোপ্যাথিক মতে আকন্দ মূলের ছাল পরিবর্ত্তক (Alterative) বলকারক (Tonic) স্বেদজনক (Diaphoretic) আমরস পাচক ও জ্বরঘ্ন (Antipyretic) অধিক মাত্রায় বমন কারক (Emetics) অর্থাৎ বিলাতী ইপিকাকুয়ানহ্ন (Ipecacaunaha) নামক ঔষধের তুল্য গুণ বিশিষ্ট। এই জন্য ইহাকে Indian Ipecacaunaha বলেন।

ব্যবহার—(বাহ্য-প্রয়োগ) বাতরোগে আকন্দ আঠা মালিশে বাতের ফোলা আরোগ্য হয় অথবা তেকাঁটা সিজের শাখা মধ্যস্থ শস্য বাটিয়া প্রলেপ দিয়া তদুপরি আকন্দের পাতা আগুণে সেঁকিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। কোষ বৃদ্ধিতে ঐরূপ আকন্দ পাতা সেঁকিয়া কোষে বন্ধন পূর্ব্বক শয়ন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় অথবা শ্বেত আকন্দের মূল আমানির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়। বাত রোগে গ্রন্থি স্ফীতিতে আকন্দ পাতা, আদা ও সৈন্ধব লবণ সমানাংশে পুটলীর মধ্যে রাখিয়া গরম করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। ধবল (Leucoderma) আকন্দ আঠা, বুচকি দানা ও হরিতাল চূর্ণ মাড়িয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। অর্শোরোগে আকন্দ দুগ্ধে আফিম গুলিয়া, অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। কোন স্থান মচ্‌কাইয়া গেলে ঐ স্থানে আকন্দ আঠার প্রলেপে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। উপদংশ জনিত পুরাতন বাতে আকন্দ গাছ টুকরা টুকরা করিয়া সিদ্ধ পূর্ব্বক স্বেদ গ্রহণ করিলে উপকার হয়। শোথে, আকন্দ পাতা, পুনর্নবা ও নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ ক্বাথ শোথের উপর সেচনে শোথের উপশম হয়। অর্ব্বুদে (আব) দন্তীমূল, চিতামূল, মনসা আঠা, আকন্দ আঠা, গুড়, ভেলা ও হীরাকস চূর্ণ এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়। শ্লীপদে আকন্দ মূলের ছাল ও বাসক ছাল একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য শ্লীপদও নষ্ট হয়। কুষ্ঠ প্রভৃতি দুঃসাধ্য চর্ম্মরোগে, আকন্দ ফুল বা আকন্দ মূলের ছাল চূর্ণ থুলকুড়ীর রসে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ভগন্দর ও নালিক্ষতে, আকন্দ আঠা, মনসা আঠা ও দারু হরিদ্রা চূর্ণ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালী মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ভগন্দর ও

নালি-ঘা বিনষ্ট হয়। কর্ণশূলে আকন্দ পত্রের পুটে মনসা সীজের পত্র ঝলসাইয়া তাহার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। আকন্দ আঠার সহিত সাজিমাটি ও চুণ মাড়িয়া প্রলেপ দিলে স্ফোটক বিদীর্ণ হয়, এমনকি অনেক সময়ে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগে সমপরিমিত আকন্দ ও সিজের আঠা দ্বারা বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া শুষ্ক হইলে আবশ্যক মত মাখন ও গন্ধকচূর্ণ মাখাইয়া লৌহদণ্ডে জড়াইয়া প্রদীপের শিখায় ধারণ করিলে যে তৈল বিন্দু সকল পতিত হইবে, এই তৈল খোস, পাঁচড়া, চুলকনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগে মহোপকারক। অথবা এক ছটাক সূক্ষ্ম গন্ধক চূর্ণ, আধ ছটাক আকন্দ আঠা, এক ছটাক খাটি সরিষার তৈল একত্রে মিশাইয়া এক খণ্ড ব্লটিং কাগজে মাখাইয়া শুকাইয়া প্রদীপের শিখায় ভস্ম করিবে। সেই ভস্ম গুলি একপোয়া খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া তিন দিন রৌদ্রপক্ক করিয়া মালিস করিলে খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ৩।৪ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, অথচ জ্বালা যন্ত্রণা নাই।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আকন্দ বমনকারক কিন্তু "সমঃ সমং শময়তি" বা "Similia Similibus"* অর্থাৎ আকন্দ একটী উৎকৃষ্ট বমন নিবারক; যথা, আকন্দ মূলের সূক্ষ্ম চূর্ণ, রস সিন্দুর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক সমানাংশে স্তন দুগ্ধে মাড়িয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অবস্থা বিশেষে মৌরির জল, ডাবের জল বা আলতা ভিজান জলের সহিত প্রয়োগ করিলে তদ্দণ্ডে উপকার পাওয়া যায়। দুই দিন অন্তর জ্বরে শ্বেত আকন্দের মূল এক আনা মাত্রায় আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবনে জ্বর বিনষ্ট হয়। শ্বাস কাসে আকন্দ ছাল চূর্ণ এক আনা, ২ তোলা অজশৃঙ্গী পাতার রসের সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া দধির মাতের সহিত ৵০ আনা মাত্রায় সেবনে প্লীহাজ্বর প্রশমিত হয়। শিরোরোগে আপাং বীজ, সজিনা বীজ প্রত্যেক ২ ভাগ, বচ চূর্ণ এক ভা আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া শুকাইয়া নস্য গ্র আধকপালি মাথা কামড়ানি, মাথায় সর্দ্দি বসা, মা ভার দূরীভূত হয়। বন্ধ্যাদোষে শ্বেত আকন্দের দুই আনা মাত্রায় গাভীদুগ্ধ সহ সেবনে বন্ধ্যাদোষ ন হয়। (ঔষধ সেবনের পর শীতল পথ্য দিবে) সর্প দংশ শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল চারি আনা হইতে আনা মাত্রায় বাসি জলের সহিত বাটিয়া সেবনে সর্প নষ্ট হয়। "ডাক্তার উমেগদিয়ান বলেন, আ পত্রের উপরে যে সাদা সাদা রেণু থাকে, উহার স আকন্দের আঠা মিশাইয়া ছোট সুপারির মত ব করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইবে। সেব পর যদি বমি হয় তাহা হইলে উপকার হইতে পা পরে রোগী সবল হইলে লঘু পুষ্টিকর পথ্য দি জোলাপ দিবে।"

মন্তব্য—এলোপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বগ্রন্থে আছে, বিরাম জ্বরে পাকা আকন্দ পাতার রস কয়েক ফোঁ সেবনে রোগাক্রান্ত দমিত হয়। অতঃপর আকন্দের জ্বর নাশক শক্তি পরীক্ষা করি। প্রথ একটী প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রো পরীক্ষার্থ নির্ব্বাচন করি। ৫ ফোঁটা হইতে আরম্ভ ক ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সপ্তাহ সেবন করান হয় কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না, অষ্টাহে আ পাতার রস ৫ ফোঁটা ও কাঁচা পেঁপের আটা ১০ ফো মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার ব্যবস্থা করি। একটি রো পর জ্বরাবেশ কিছু মন্দীভূত দেখা গেল এবং সপ্তাহ এইভাবে ঔষধ সেবন করাইয়া জ্বর অনেক কমিল কিন্তু একেবারে দূর হইল না ও কোষ্ঠবদ্ধ দেখা দি দুই দিন ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিয়া, আকন্দ পা রসের পরিবর্ত্তে আকন্দ আঠা ৪ ফোঁটা, পেঁপের ১০ ফোঁটা, কালমেঘের রস ১৫ ফোঁটা মাত্রায় এ তিনবার ও প্রাতে গরুর চোনা এক আউন্স ম করি। তিনদিন ঔষধ সেবনের পর জ্বর আসা এ বন্ধ হয় ও সপ্তাহ কাল এইভাবে ঔষধ সেবন ও

* "হিন্দুর স্বাস্থ্য বিজ্ঞান" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হইবে।



* সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

ইহার পর হইতে আমি যকৃৎ ও প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে ও কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিলে, আকন্দ পাতার রস ৫ ফোটা কালমেঘের রস ১৫ ফোটা, পেঁপের আটা ১০ ফোটা মাত্রায় সেবন করাইয়া বহুতর রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি। আমার প্রার্থনা যাঁহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা সপ্তাহকাল পরীক্ষা করুন গুণে মুগ্ধ হইবেন।

---

# বিজ তাড়ক।

( প্রাপ্ত )

পরিচয়।—ইহা বন্য উদ্ভিদ—লতা জাতীয় ভেষজ। তাগুলি স্থূল-কলমী বা ডোল-কলমী পাতার লতার । একপৃষ্ঠে শুভ্র কুড়াবৎ পদার্থ থাকে। জঙ্গলে তরু আশ্রয় করিয়া ইহা জন্মে। ইহার লোহিতাভ ফুল হয়। লতা দ্বারা কৃষকে রজ্জুর কার্য্য করে। া জমিতেই শীত বর্ষায় ইহার উৎপত্তি হয়।

নাম।—সংস্কৃতে—জীর্ণদারু, অজরা, জীর্ণা ও বিথরা রাষ্ট্রে—শ্বেতবর ধারী। গুজরাটে—বরধারী। কর্ণাটে রডুমুল্ল। তৈলঙ্গে—চন্দ্রপুডি। ল্যাটিনে—Desh । ইংলণ্ডে ইহা নাই। মূলতঃ ইহা দুই প্রকার, আর সবুজ।

ক্রিয়া।—কফনাশক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, মেধা- ক এবং অগ্নিবর্দ্ধক! পত্র আর ফুলই অভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। ইহার পাতা অতি সারক আর মেধাজনক এবং ক্ষত শুষ্ক কারক।

ব্যবহার।—পাণ্ডু, ক্ষয়কাসী, প্রমেহ, আমরক্ত ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহার হয়। ইহার পাতার ক্ষত আরোগ্য শক্তি বহু স্থানে দেখিয়াছি। যে পৃষ্ঠে কুড়াবৎ পদার্থ থাকে সেই পৃষ্ঠ লাগাইতে হয়। অপর পৃষ্ঠ লাগাইলে ক্ষত বৃদ্ধি হয়।

অপরাজিতার পাতার রস অল্পচুন সহ ক্ষতে দিয়া এই বিজতাড়ক পত্র দিয়া ব্যাণ্ডিজ বান্ধিলে ক্ষত নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহার ফুল রগড়াইয়া শুকিলে শীতলতা জন্য সরর্দ্দিজ্বর উপশম হয়। ইহা ব্যতীত এই লতার আর অধিক গুণ জানা নাই।

## বিবিধ সংগ্রহ।

**নাটোরে জলের কল**—নাটোরে জলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমাধা হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। জলের কলে মোট ৮৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ২০০০০৲ টাকা ও রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড ১৫০০০৲ টাকা দিবেন। বাকি চাঁদা আদায় করিয়া সংগ্রহ হইতেছে।

---

**মেডিকেল কলেজ**—বঙ্গে বর্ত্তমানে দুইটী মেডিকেল কলেজ আছে;—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। ১৯১৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে উক্ত দুই কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৬৪। গত ৫ বৎসরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা ২২৬ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১৬—১৭ সনে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ব্যয় হইয়াছিল ২৯৩১২৯ টাকা।

---

**ধূমপান নিবারণ আইন**—১৯১৬ সালের ১৯এ এপ্রিল পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় বালকগণের ধূমপান নিবারণ বিল পাশ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে জুনমাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা অনুমোদন করিয়াছেন।

---

**কলিকাতায় মাছের আমদানি**—১৯১৬-১৭ সালে কলিকাতায় ৩,১৭,০০০ মণ মাছ আমদানি হইয়াছিল কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে ৩,০১,০০০ মণ আমদানি হইয়াছে। যত মাছ আসিয়াছে, তাহার শতকর ৫২ ভাগ ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের যোগে এবং ২৭ ভাগ লোকে বহন করিয়া আনিয়াছে।

**কলিকাতা মাদক নিবারণ সঙ্ঘ।**—কলিকাত "টেম্পারেন্স ফেডারেসন" নামক জনহিতক প্রতিষ্ঠানটি গত ১৪ বৎসর যাবৎ এই নগরে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন।

গত বড়দিনের সময় এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের প্রয কলিকাতা নগরে ভারতীয় মাদকনিবারণী সভার ১৪ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত মহাসভায় রা বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয় সভাপতি এবং মিঃ গুপ্ত অভ্যর্থনা সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ঐ সভায় এ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে যে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা একেবারে তুলিয়া দেওয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের লক্ষ তাঁহারা এই নীতি গ্রহণ করুন।

এই সমিতি গত বৎসর কলিকাতা লাইসেন্সি বোর্ডের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে ৫, ৬, ৮ ও ২ মিউনিসিপাল ওয়ার্ড হইতে মাদক দ্রব্যে দোকানগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। উক্ত স্থান দৈর্ ১॥০ এবং প্রস্থে ১ মাইল। ১৯১৮ সালের ১লা এপ্রি হইতে ১৯১৯ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর জন্য দোকান তুলিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষা করি সম্মত হইয়াছেন।

কলিকাতা লাইসেন্সিং বোর্ডের প্রস্তাব মতে গ বৎসর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট মদের দোকানগুলি অপরা সকাল সকাল বন্ধ করিয়া দিয়া মদের কাটতি কমাই আগ্রহ দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে রাত্রি ১টা নাগাত দোকা খোলা থাকিত। এখন ১১ টায় সকল দোকান ব হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘের কাউন্সিল ৭ বার বসিয়া ছি ১৩টি অনুমোদিত সমিতির রিপোর্টে ইহাই প্রক পাইয়াছে যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ধীরভাবে মাদক দ্র ব্যবহার বর্জ্জন জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

---

# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২৫ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

## আলোচনা

**কলিকাতায় সমর-জ্বর।**—বোম্বাই সহরে এক প্রকার নূতন সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, এই সংবাদ বাহির হইবার কয়েক দিন পরেই কলিকাতায় নূতন জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল। গত মাসের মাঝামাঝি হইতে বহু লোক এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। সহরে এমন বাটী অতি অল্পই ছিল যাহাতে এরোগে কেহ আক্রান্ত হয় নাই। জ্বরের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ও সরকারী কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিসের শতকরা ৫০ জন কর্ম্মচারী জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় জরুরী ভিন্ন অপর টেলিগ্রাম না করার জন্য সাধারণকে সরকার হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এ অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ অসম্ভব দেখিয়া এম্, এ, ও এম্ এস্-সি, পরীক্ষা এক মাসের জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। ইহা সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর। কোন কোন ডাক্তারের মতে ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু জ্বরের সংমিশ্রন। এই জ্বর সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ দিনের পরে কমিয়া আসে। জ্বর ছাড়িলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত শরীর দুর্ব্বল রাখে। শিরঃপীড়া, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সর্দ্দি-কাসি, বমন ভাব ও ক্ষুধাহীনতা এই জ্বরের সাধারণ লক্ষণ। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক সর্ব্বসাধারণকে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন,

"জ্বরের লক্ষণ দেখিবা মাত্র সতর্ক হওয়া উচিত। আক্রান্ত হওয়া মাত্র শয্যায় শয়ন করা ও ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত শয্যা ত্যাগ না করাই কর্ত্তব্য। গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগান, ক্লান্তি বা অবসাদজনক কার্য্য করা, জনপূর্ণ ট্রাম গাড়ীতে কিম্বা জনবহুল থিয়েটার প্রভৃতিতে গমন করা উচিত নহে। রোগীকে পৃথক্ গৃহে রাখা, তাহার থুথু ইত্যাদি কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা নির্দ্দোষ করা, রোগীর গামছা, রুমাল ও বস্ত্রাদি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া এবং রোগীকে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতে না দেওয়া বিধেয়। রোগী যে গ্লাসে জল খায় ও যে পাত্রে আহার করে, সে সকল দ্রব্য অন্যের ব্যবহার করা উচিত নয়।"

এই রোগ মারাত্মক নহে প্রথমে সকলেই এইরূপ মনে করিয়াছিলেন কিন্তু পুনরাক্রমণের পর অনেক স্থলে মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। পরে স্বাস্থ্যরক্ষক মহোদয় প্রচার করিয়াছিলেন,—

"প্রথম আক্রমণের পর পুনরায় যাহাদিগকে এই

জ্বরে আক্রমণ করিতেছে, তাহাদের নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ হইতেছে ও অনেকে মারা যাইতেছে। এই জ্বরে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল করে এবং পুনরাক্রমণ প্রায়ই হয়। কলিকাতা সহরে ইহাতে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

এই নূতন ব্যাধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিন হইতে চারি শত লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মাস খানেক ধরিয়া প্রভাব বিস্তারের পর এই জ্বরের উগ্রতা অনেক কমিয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও নগরের সকল অংশে রোগের প্রকোপ আছে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সহরে এই জ্বরের আক্রমণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বারের আক্রমণেই লোকের প্রাণ-হানী ঘটিতেছে। যাহারা ঠাণ্ডা করে, দেহে শীতল বাতাস লাগায় তাহাদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হয়। সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

মোকদ্দমা প্রত্যাহার।—কবিরাজি অরিষ্ট প্রস্তুত করার জন্য ঢাকা "মুক্তি" ঔষধালয়ের সত্বাধিকারী ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হওয়ার বিষয় আমরা গত দুই সংখ্যার স্বাস্থ্য-সমাচারে আলোচনা করিয়াছি। কবিরাজ মহাশয়েরা মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট সমীপে এই অন্যায়ের প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ও এসম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমরা জানিয়া সুখি হইলাম যে সম্প্রতি বাদী সরকার পক্ষ কবিরাজ মহাশয়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন। আমরা এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ব্রজেন্দ্রবাবু এবং আর আর যাঁহারা এজন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

---

# বঙ্গের স্বাস্থ্য

## ( সরকারী রির্পোট )

গত বর্ষে (১৯১৭) বঙ্গের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল। মৃত্যুর অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা ৪৪০৩৬৪ অধিক হইয়াছিল। মোটামুটি হিসাবে জন সংখ্যা ইহাতে শত-করা একজন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**জন্মহার**—জন্মহার মাইল প্রতি ৩১·৮৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫·৯১ হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ১৮২২৮১ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় সকল জেলাতেই জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কেবল হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলায় মাইল প্রতি জন্ম সংখ্যার ১·২ হ্রাস দেখা গিয়াছে।

**মৃত্যুহার**—মৃত্যুহার মাইল প্রতি ২৭·৩৭ স্থলে কমিয়া ২৬·১৯ হইয়াছিল। মোট মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০০০০০০ ছিল। এই সংখ্যা অন্যান্য বর্ষের সংখ্যা অপেক্ষা কম। সহর ও পল্লীগ্রাম উভয় স্থলেই কেবল ফুস্‌ফুসের পীড়া ব্যতীত অন্য সকল সাধারণ রোগেই মৃত্যু কম হইয়াছিল।

**শিশু মৃত্যু**—এক বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত শিশুর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৮·৫ হইয়াছিল। গত চার বৎসরকাল শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব্বে শিশু মৃত্যুর হার ২২·১৪ ছিল। কলিকাতা সহরেই শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (২৩·৯২) হইয়াছে। যাহা হউক কয়েক বৎসরে এ বিষয়ের অনেকটা উন্নতি দেখা যাইতেছে।

**জ্বর**—জ্বর রোগে ৮৮২৭৬৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৫তে ১০৬৪১৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯১৬তে এই সংখ্যা ১৫৪২৭৯ কম ছিল। পল্লীগ্রামেই



মৃত্যুর সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল। সহরের তালিকায় অল্প বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। সেনিটারি কমিশনারের মতে সহরে মৃত্যু রেজেষ্টারী ব্যবস্থার উন্নতি হওয়াই এই বৃদ্ধির কারণ।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক বড় নদী আছে এবং বৃষ্টিপাতও অধিক হয়। বর্ষাকালে স্থলের অনেক অংশ বানের ও বৃষ্টির জলে ভরিয়া থাকে। ইহাতে যে কেবল জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, ম্যালেরিয়া দমনেরও সুবিধা হয়। এই কারণে এ অংশে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস দেখা গিয়াছিল। উত্তর বঙ্গে শুষ্ক ও স্রোতহীন নদীর জন্য ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থা নাই, দেশের এই অংশেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজসাহী বিভাগের চারিটি জেলা অধিক ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত।

**ম্যালেরিয়া নিবারক ব্যবস্থা**—ডাক্তার বেণ্টলি সাহেবের অনুমোদিত চারিটি ম্যালেরিয়া নিবারক ব্যবস্থার তিনটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। একটী পরীক্ষায় পর্ব্বত নিঃসৃত সাধারণ জলস্রোত জমির নিম্ন দিয়া চালিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯১৭ বর্ষাকালে ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়, কিন্তু পরীক্ষিত সীমানার মধ্যের সমস্ত স্রোতকে আয়ত্তে আনা যায় নাই। এজন্য গভর্ণমেণ্ট আবার নূতন ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। সেনিটারি কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বর্ষের পরীক্ষার পর ম্যালেরিয়ার প্রকোপের অল্প হ্রাস দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮ বর্ষাকালের পর না দেখিয়া কিছু স্থির করিয়া বলা যায় না। জমির উপর দিয়া জল নিকাশের পরীক্ষায় সুবিধা জনক ফল পাওয়া যায় নাই। বর্দ্ধমানের সিঙ্গারাম কয়লার খনির পরীক্ষার ফলও ভাল হয় নাই। জঙ্গীপুরের জল নিকাশের ব্যবস্থারও সময়ে শেষ করিতে পারা যায় নাই। বর্দ্ধমানের বাঁকা নদীর তীরস্থ কতক স্থান জল প্লাবিত করার ব্যবস্থাও সম্পন্ন করা যায় নাই। এক্ষণে ক্রমে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। ৩৮ খানি গ্রামের ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। জন্ম মৃত্যু ও রোগের তালিকা রাখার জন্য দুই জন সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। মিদ্নাপুর, সিঙ্গারাম এবং জঙ্গী-পুরেও পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করা এবং কুইনাইন ইত্যাদি বিতরনের জন্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করা হইয়াছে।

সরকারী খরচে যথারীতি কুইনাইন বিতরণ ব্যতীত বহুস্থলে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। বসিরহাট এবং দক্ষিণ দম্-দম্ মিউনিসিপালিটি, অনেকগুলি গ্রাম এবং খিদিরপুর ডক্ ও শিবপুর কলেজে ম্যালেরিয়া নিবারক ব্যবস্থার প্রচলন জন্য তথ্য সংগ্রহ ও মাপ ইত্যাদি করা হইয়াছে। পাঁচটী সহর ও পাঁচটী জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিনামূল্যে কুইনাইন দেওয়া হইয়াছে। তেরটী সহর ও দুইটী জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক প্লীহা পরীক্ষা ও তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

স্যার লিওনার্ড রজার্স সাহেব ম্যালেরিয়া নিবারক এক বিশেষ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এখন সেনিটারি কমিশনারের বিচারাধীন আছে। ডুয়ার্সে কুইনাইন প্রতিষেধক রূপে নিয়মিত ব্যবহারে ইউরোপীয়গণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জন্য এত অস্বাস্থ্যকর ছিল যে ইহাকে "The white man's grave" নাম দেওয়া হইয়াছিল।

১৯০৬ সনে ২০০ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ প্রতিষেধক রূপে প্রত্যহ নিয়মিত মাত্রায় কুইনাইন সেবন করায় কালাজ্বর তাহাদের মধ্য হইতে একবারে দূর হইয়াছে, প্লীহার বৃদ্ধিও প্রায় দেখা যায় না। ইউরোপীয়গণ স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতেছেন এবং এক্ষণে ডুয়ার্সকে "A fairly healthy district" বলা হইতেছে।

এদেশবাসীরাও প্রতিষেধকরূপে কুইনাইন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সকল স্থলে কুইনাইনে ম্যালেরিয়া একবারে আরোগ্য না হইলেও, কুইনাইনের ন্যায় ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক আর কোন ঔষধ যে

আবিষ্কৃত হয় নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে কুইনাইন খাদ্যের ন্যায় নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য।

বসন্ত—গত তিন বৎসর হইতে বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। ১৯১৫ সনে বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা ৩২৭৮৫ ছিল। ১৯১৬তে ১৩৮৯০ এবং গত বর্ষে ৭০১০ হইয়াছে।

টিকা—গত বর্ষে ১৬১৪৬০১ টিকা দেওয়া হইয়াছিল, গত পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা ১২৯৪৮ অধিক ছিল। রোগের অল্পতা জন্যই অনেক জেলায় টিকার সংখ্যা কম হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা এবং বাখরগঞ্জের এক মহকুমায় বিনা মূল্যে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জলপাইগুড়িতে জেলাবোর্ড টিকার ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। আসানসোলের খনি বসতি সমূহেও জেলাবোর্ডের খরচে টিকা দেওয়া হইয়াছিল। লাইসেন্স প্রাপ্ত টিকাদারগণকে ফি দিতে অস্বীকার করায় ফরিদপুরের একটি থানার অন্তর্গত স্থানে টিকা দেওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

কলেরা—কলেরায় মৃতুর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। মাত্র ৪৫০২১ জনের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ২৫৮১৫ অধিক ছিল। ১৯১২ সনে নূতন প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর ইহাই কলেরায় মৃত্যুর সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যা। জুন এবং অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, এইরূপ সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

প্লেগ—প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি সামান্যই ছিল। গত বর্ষে মাত্র ১৬৩ জনের প্লেগে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। মৃতগণের সকলেই সহর বাসী। পল্লীতে এই রোগে মৃত্যু একটিও ঘটে নাই! কলিকাতায় ৮১, চব্বিশ পরগণায় ৪৮, হুগলীতে ২৪ এবং হাওড়ায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বঙ্গের অন্যান্য স্থান একবারে প্লেগশূন্য ছিল।

স্বাস্থ্য-বিভাগ—মিউনিসিপালিটি সমূহে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সেনিটারি কমিশনার রিপোর্টে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপ দমনের জন্য প্রতি জেলায় একজন ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এবং তাহার কতিপয় সহকারী নিয়োগের আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রতি জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকর কার্য্য সাধিত হইবে না। জেলাবোর্ড সমূহ স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে রোগ আরোগ্যের সুবিধা হইতেছে বটে কিন্তু রোগ প্রতিষেধের কিছুই হইতেছে না। অধিকাংশ জেলাবোর্ডই অল্প শিক্ষা প্রাপ্ত সেনিটারী ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া এবং রোগের প্রকোপের সময় ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু জেলাবোর্ডের সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য আরও অধিক করা আবশ্যক। প্রতি জেলাবোর্ডে একজন দায়ীত্বপূর্ণ শিক্ষিত ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ্ আফিসার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর রোগ প্রতিষেধের, টিকা দিবার এবং পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারের সমস্ত ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।



# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় স্তবক।

### মস্তক ও গ্রীবা—পেশীমালা।

মানুষের মস্তক ও গ্রীবার পেশী সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাং এই প্রবন্ধের পাঠকের পক্ষে তৎসমুদয়ের সম্যক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তবে কটি বিশিষ্ট পেশীর পরিচয় পাঠকের পক্ষে আবশ্যক, তরা সেগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

| | |
|---|---|
| হনু কণ্ঠ ও কর্ণ প্রদেশীয় পেশী (The Sterno-cleido-mastoid) | গ্রীবাদেশে স্থিত। |
| হীরকাকার পেশী। (The Trapezius) | |
| মুখ বেষ্টক পেশী। (Orbicularis oris) | মুখমণ্ডলে স্থিত। |
| নেত্র বেষ্টক পেশী। (Orbicularis oculi) | |
| চর্ব্বনপেশী। (The Masseter) | |
| ললাট প্রান্তিক পেশী (The Temporalis) | ললাট প্রান্ত প্রদেশে স্থিত। |

হনু কণ্ঠ ও কর্ণ প্রদেশীয় পেশী। (The Sterno-cleido-mastoid) এই পেশীর নামটি খুব বড়। পেশীটীর নাম এত বড় কেন হইল তাহার কারণ আমরা পরে দিব। আগে ইহার স্থানটি ভাল করে চিনাইয়া দিতেছি। মাথাটি স্কন্ধের যে দিকে ফিরিবে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে গ্রীবার উপর এই পেশী বাহিরের দিকে ঠেলিয়া উচ্চ হইয়া উঠিবে, এই উচ্চতা গ্রীবার মূলদেশের নিম্ন স্থান হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পেশীর এই উচ্চতা ও ইহা দ্বারা উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। হনু ও কর্ণ প্রদেশীয় পেশী হৃদয়াস্থির ( Sternum ) সম্মুখ ভাগ ও কণ্ঠাস্থি হইতে উঠিয়াছে এবং কর্ণের পৃষ্ঠদেশে ললাট প্রান্ত প্রদেশীয় অস্থির উচ্চতা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পেশী দ্বারা গ্রীবার নমন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হীরকাকার পেশী ( Trapezius ) গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্বের দুইটি পেশী ঠিক উহার মধ্যস্থলে মিলিত হইয়া চতুরস্র হীরকের আকার ধারণ করিয়াছে। এই পেশীর দুইটি কোন্ দুইটি স্কন্ধের সহিত, তৃতীয়টি অকসিপিট্যাল ( Occipital ) অস্থির উচ্চাংশের সহিত এবং চতুর্থটি বক্ষঃ প্রদেশের শেষ কশেরুকাস্থির মেরুদণ্ডীয় পদ্ধতির সহিত মিলিয়াছে। হীরকাকার পেশীর একটির ক্রিয়া বশতঃ গ্রীবা পশ্চাদ্ভাগে এক দিকে অবনমিত হয়। যুগপৎ দুইটি পেশীর ক্রিয়া হইলে গ্রীবা সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদ্ভাগে নত হইয়া পড়ে।

মুখ বেষ্টক পেশী (Orbicularis oris) ইহা মুখবিবর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অধরৌষ্ঠ গঠন করিয়াছে। মুখমণ্ডলের আরও অনেক পেশী মুখ বেষ্টক পেশীর তন্তুজালের সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং যখন এই পেশী সঞ্চালিত হয় তখন উপরে সন্নিহিত অন্যান্য পেশীগুলিতে চাপ লাগে। মুখ বন্ধ করাই এই পেশীর কাজ।

নেত্র বেষ্টক পেশী। (Orbicularis oculi) এইটি উন্মীলন ও নিমীলন কারী পেশী। ইহা নেত্র গোলক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক পেশী তন্তুর সমবায়ে ইহা নির্ম্মিত। এই পেশীর যে অংশ নেত্র পল্লব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্বারা মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয়ন পল্লব নিমীলিত হইয়া থাকে। পেশীর

অন্যান্য অংশের সঞ্চালন কালে ললাট, ললাটপ্রান্তদেশ ও কপোলের চর্ম্ম আকুঞ্চিত এবং সবলে নেত্র মুদিত হয়।

চর্ব্বণ পেশী। ( The Masseter ) কর্ণের কিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে এই চতুর্ভুজ পেশীর স্থান। কোন কঠিন দ্রব্য চিবাইবার সময় আমরা যেরূপ সবলে দন্ত

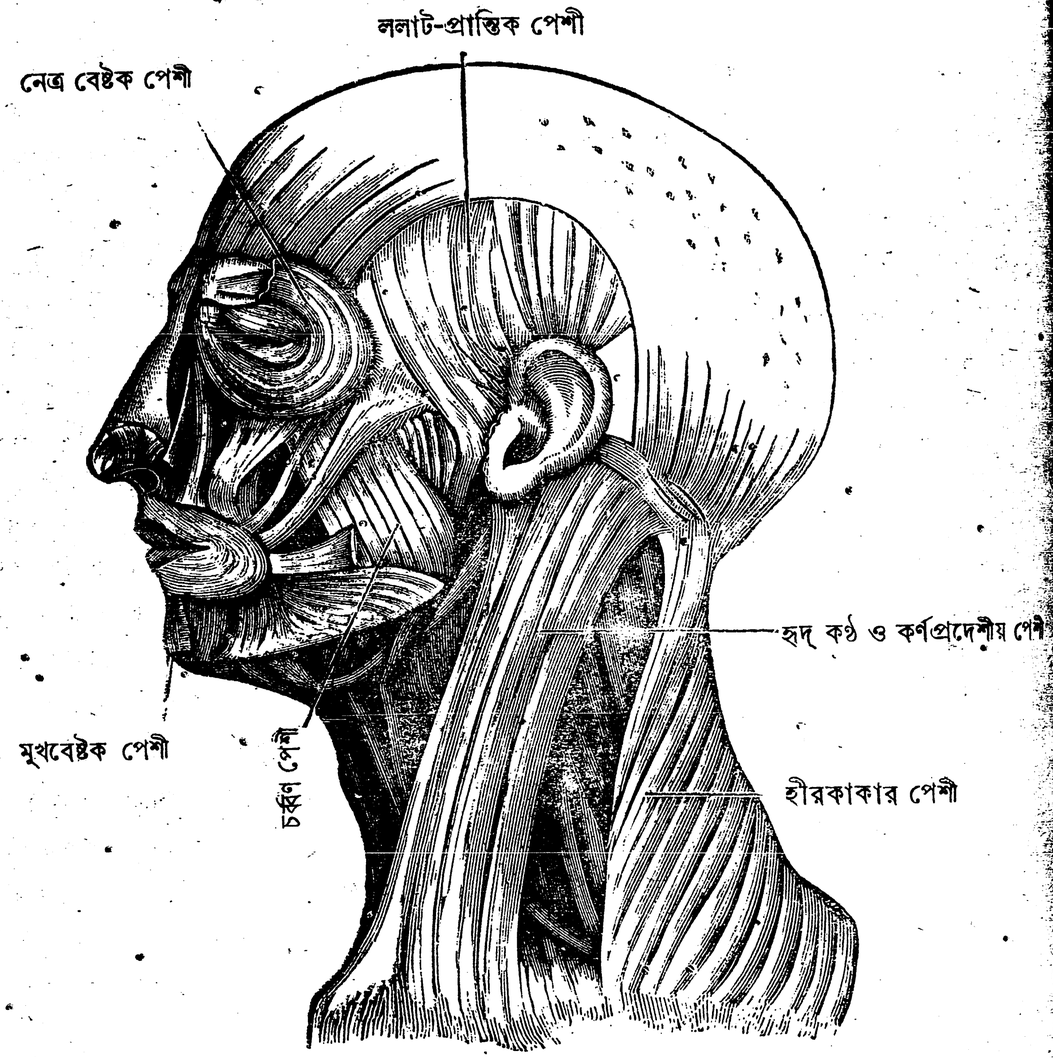


চিত্র ৫৫—মস্তক ও গ্রীবার পেশী সমূহ।

পংক্তির উপর দন্তপংক্তি চাপিয়া থাকি, সেইরূপ জোরে দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ধরিলে কর্ণের ঈষৎ সম্মুখের দিকে নিম্ন হনুাস্থির উপর একটি চতুর্ভুজাকার উচ্চতা পরিলক্ষিত হইবে। এই উচ্চতা চর্ব্বণ পেশীর আকুঞ্চনের ফল। এই পেশী দ্বারা চর্ব্বণ ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে।



ললাট পার্শ্ব দেশীয় পেশী। ( The Temporalis ) এই পেশীটিও চর্ব্বণ কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে, ললাট প্রান্তদেশের ( Temporal area ) অধিস্থান ব্যাপিয়া এই পেশীটি রহিয়াছে। ললাট-প্রান্ত দেশ একটি অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া ধরিয়া চর্ব্বণ কালের ন্যায় দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিতে থাকিলে প্রতিবার দন্তে দন্ত স্পর্শের সময় অঙ্গুলীতে ঈষৎ উচ্চতা অনুভব হইবে। ললাট প্রান্তদেশীয় পেশীর প্রসারণ ও আকুঞ্চন বশতঃ এরূপ উচ্চতা অনুভূত হইয়া থাকে।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

## স্নায়ুতন্ত্র।

### প্রথম স্তবক।

#### সাধারণ বিবরণ—মস্তিষ্কের আবরণ।

এখন আমরা মানব দেহের স্নায়ুতন্ত্র ( Nervous System) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দেশের শাসনতন্ত্র যেমন সমগ্র দেশের সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালনা করেন, স্নায়ুতন্ত্রও সেইরূপ নরশরীরের সমস্ত ক্রিয়ার পরিচালনা করিয়া থাকে। এই স্নায়ুতন্ত্র মানবদেহে এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণিদেহে যেরূপ পরিপুষ্ট, নিকৃষ্ট প্রাণিদেহে সেরূপ নহে, আবার অতি নিকৃষ্ট প্রাণি-শরীরে স্নায়ুতন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বন্য বর্ব্বর মানবের মস্তিষ্কে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে হইয়া থাকে, সভ্য সমাজের মানবের মস্তিষ্কে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে না হইয়া যাহাতে প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে সুচারুরূপে উহার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যেই সভ্য সমাজে শিক্ষার প্রবর্ত্তন।

মেরুদণ্ডশালী প্রাণীদিগের দেহে দুইটি স্নায়ুতন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়। এই দুই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত স্নায়ুতন্ত্রই প্রধান। এই প্রধান স্নায়ুতন্ত্র মস্তকের করোটি কোটরে এবং মেরুদণ্ড মধ্যে অতি যত্নে সুরক্ষিত রহিয়াছে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড রজ্জু হইতে যে স্নায়ুতন্তু-মালা ( Nerves ) মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কের সহিত সমস্ত মানব শরীরের সংবাদের আদান প্রদান ক্রিয়া চলিতেছে।

দ্বিতীয় স্নায়ুতন্ত্রের নাম—Sympathetic System—সমবেদন-তন্ত্র। এই সমবেদন তন্ত্রের দুইটি বেণী। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুই বেণীর স্থান। পুঞ্জীকৃত বা গুচ্ছবদ্ধ স্নায়ুতন্তু সমূহের দ্বারা এক একটি রচিত। এই দ্বিতীয় স্নায়ুতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র হইলেও মস্তিষ্কগত স্নায়ুতন্ত্রের সহিত স্থানে স্থানে ইহার সংযোগ আছে।

এই দুইটি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, শ্রমবিভাগ পূর্ব্বক মানব শরীরের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য দেহের শিল্পী এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরীরের যে সকল ক্রিয়ার সহিত যথেচ্ছ বিচরণ ও ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মস্তিষ্কগত স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা সেই সকল ক্রিয়ার পরিচালনা হইয়া থাকে। মোটকথা, আমাদিগের মস্তিষ্কগত স্নায়ুতন্ত্র, আমাদিগের স্বাধীন কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র বা আসন। মস্তিষ্ক যে আজ্ঞা করে, তাহার স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ামকশক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তাহা সম্পন্ন করে। আবার এই শক্তির প্রভাবে মানবের ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের যে সব বার্ত্তা ভিতরে পাঠাইয়া দেয় সেগুলিও যথাযথভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তখন প্রয়োজনানুসারে শরীরের ক্রিয়াও হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। মনে কর একটী বিষধর সর্প তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে, তোমার দর্শনেন্দ্রিয় ঐ সংবাদটা মস্তিষ্কে পাঠাইয়া দিল। অমনই মস্তিষ্ক হইতে শরীরের সমস্ত পেশীর নিকট সে সংবাদ

গেল, আর তুমি তৎক্ষণাৎ জোরে দৌড়িয়া তথা হইতে পলাইয়া গেলে।

কিন্তু সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র মানুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে, সে হিসাবে উহাকে স্বতন্ত্র বা আত্মতন্ত্র (Involuntary) বলা যায়। কিন্তু এই স্নায়ুতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে মানবের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় পরিচালিত না হইলেও পরোক্ষভাবে উহার প্রভাবাধীন হইয়া থাকে। তুমি কিছু আহার করিলে পাকস্থলীতে সেই ভুক্ত দ্রব্য সঞ্চিত হইবে, অমনই পাকস্থলীর পেশী আকুঞ্চিত ও সচল হইবে। পাকস্থলীর পেশীর এই সঞ্চালন, সমবেদন স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা পরে সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব।

স্নায়ুতন্ত্র যেমন সূক্ষ্ম তেমনই কোমল। এই তন্ত্রটি কিরূপ কৌশলে বাহিরের আঘাত হইতে সুরক্ষিত তাহা এইবার বলিব। মস্তিষ্কটি একটি কঠিন অস্থিময় মণ্ডন দ্বারা মণ্ডিত, আর মেরুদণ্ড নাড়ী বা রজ্জু (Spinal Cord) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ প্রণালী মধ্যে নিহিত। মানুষের করোটির উপর পেশী ও চর্ম্ম স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকাতে করোটির গায় আঘাত সহজে লাগিতে পারে না। তাহার উপর মানুষের মস্তকের চর্ম্ম সুচিক্কণ কেশ কলাপে পরিশোভিত। ইহা শুধু মস্তকের শোভা নহে, মস্তক রক্ষার আর একটি উপায়।

করোটির ভিতর তিনটি আস্তরণ আছে। এই আস্তরণ তিনটি মস্তিষ্কটিকে আবৃত ও রক্ষা করিতেছে। আস্তারণ ত্রয়ের নাম:—

১। ডুরা মেটার (The Dnra Mater)
২। আরাক্‌নয়েড মেটার (The Arachnoid Mater)
৩। পায়া মেটার (The Pia Mater)

আমরা এই আবরণ ত্রয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

The Dura Mater—এই আস্তরণটি অতি দৃঢ়, ইহার দুইটি পিঠ দুই রকম। আস্তরণের যে পিঠ করোটিকে স্পর্শ করিয়া থাকে সে দিকটা কর্কশ ও উচ্চাবচ। করোটির ভিতর-পিঠে এই আস্তরণটি উহার আবরণ-পটের ন্যায় সংলগ্ন থাকে। এই আস্তরণের যে পিঠ মস্তিষ্কের দিকে থাকে সে পিঠটি মসৃণ ও চাকচিক্যশালী। এই ডুরা মেটার আস্তরণটি মস্তিষ্কের উভয় অংশের মধ্যে এবং উহার অন্যান্য বিভাগের খাঁজের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। ইহাতে মস্তিষ্কটির স্বস্থানে অবস্থিতি করিবার খুব সুবিধা আছে।

The Arachnoid Mater—এই আস্তরণটি সংযোজক তন্তুসমূহ দ্বারা রচিত জালের মত একটী সূক্ষ্ম কোমল ছদ। মাকড়সার জালের ন্যায় ইহা শিথিলভাবে মস্তিষ্কের উপরিভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার নীচে শোণিত রসের (Serum) ন্যায় এক প্রকার রস আছে। ইহা মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডরস (Cerebo-spinal fluid) দৈবাৎ মস্তকে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে আঘাতের তাড়না যাহাতে মস্তিষ্কে পৌঁছিতে না পারে তজ্জন্য এই রস উক্ত আস্তরণের নিম্নে রহিয়াছে। "মেনিন্‌জাইটিস" (Meningitis) বা মস্তিষ্কচ্ছদ প্রদাহ রোগে, প্রদাহযুক্ত মস্তিষ্কচ্ছদ হইতে মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডরস এরূপ অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়াতে সঞ্চিত মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড রসের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় সুতরাং মস্তিষ্কে সঞ্চিত রসের চাপ খুব বেশী লাগে। এই চাপের জন্য রোগের কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। আরাক্‌নয়েড মেটার নামক এই মস্তিষ্কচ্ছদের নিম্নে আর একটি ছদ বা আস্তরণ আছে, তাহার নাম

পায়া মেটার—Pia Mater.

পায়ামেটার আস্তরণটি ঠিক মস্তিষ্কের উপর থাকে, ইহা মস্তিষ্কের উপরিভাগটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্কের উপরিভাগটি সমতল নহে, গভীর উপরিভাগের ন্যায় টোপতোলা। এই টোপ গুলির মধ্যে ফাঁক বা খাঁজ থাকাতে প্রত্যেক টোপই পৃথক পৃথক রহিয়াছে। মস্তিষ্কের স্তূপাকার ও উচ্চ অংশ গুলিকে—Convolutions of the brain—অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভাঁজ বলে। পায়ামেটার ছদ মস্তিষ্কের টোপের খাঁজের নিম্ন পর্য্যন্ত নামিয়া প্রত্যেক টোপকে সম্পূর্ণরূপে



করিয়া রাখিয়াছে। পায়ামেটার আস্তরণটি সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্কের উপরে আস্তৃত হইয়া আছে বলিয়া মস্তিষ্কের জন্য শোণিত কোষসমূহ উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

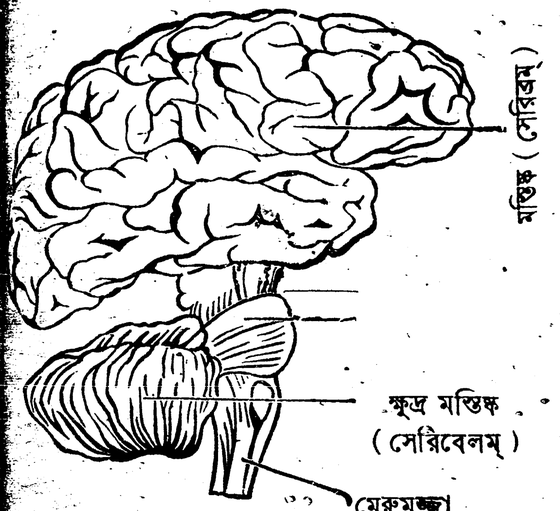


চিত্র ৫৬—মস্তিষ্ক (পার্শ্ব দৃশ্য)।

মেরুদণ্ডপ্রণালী মধ্যে নিহিত মেরুদণ্ড নাড়ী বা রজ্জুটিও ঐরূপ তিনটি আস্তরণ পরম্পরা দ্বারা আবৃত। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড নাড়ী হইতে যে স্নায়ুমালা বাহির হইয়াছে তাহার এই তিনটি আস্তরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। স্নায়ুগুলি ঐরূপে আস্তরণ ভেদ করিয়া বাহির হওয়াতে তাহাদিগের উপর আস্তরণ-সঞ্জাত এক প্রকার আবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে।

## দ্বিতীয় স্তবক।

## স্নায়ু ও স্নায়ুকা।

সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র কোষপুঞ্জের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু স্নায়ুকোষগুলির কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি আছে। অতি বিচিত্র ও জটিল কৌশলময় স্নায়ুতন্ত্রের কোষ সকল দেখিতে শরীরের অন্যান্য সূক্ষ্ম কোষ সমূহের ন্যায়, ইহাদিগের ভিতরও অন্যান্য কোষের ন্যায় জীববস্তু (Protoplasm) ও অঙ্কুর বস্তু (Nucleus) আছে।



কিন্তু সাধারণ কোষ ও স্নায়ু কোষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্নায়ু কোষ সমূহ হইতে অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতি সমূহ বাহির হয়। এই পদ্ধতিগুলি দেখিতে বৃক্ষের পত্রশূন্য শাখা প্রশাখা বা 'ফিকড়ির' মত।

চিত্র ৫৭—দুইটী স্নায়ুকোষ ও তাহা হইতে নির্গত বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ন্যায় পদ্ধতি সমূহ।

উপরে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দুইটি স্নায়ুকোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ স্নায়ু-কোষগুলি হইতে বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ন্যায় কতকগুলি পদ্ধতি বাহির হইয়াছে। শাখান্বিত স্নায়ু কোষগুলি স্নায়ু তন্ত্রের উপাদান। উহাদিগের একটা স্বতন্ত্র নাম আছে। শারীর বিজ্ঞান এই শাখান্বিত স্নায়ু কোষকে Neuron বলেন। বাঙ্গালায় ইহাকে "স্নায়ুকা" বলিলে মন্দ হয় না।

### স্নায়ুকা।

স্নায়ুকার দুইটি অংশ, কোষ ও শাখাবলী। শাখাবলীর মধ্যে একটি শাখা দীর্ঘ হয়, বাকি সমস্ত শাখাই খর্ব্বাকৃতি। খর্ব্ব পদ্ধতি গুলি গুল্মশাখা সমূহের ন্যায়,

তজ্জন্য ইহার নাম Dendrons বা গুল্মাকার পদ্ধতি। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে গুল্মিকা নাম দিলে অসঙ্গত হয় না। স্থতরাং আমরা স্নায়ুকোষের খর্ব্ব পদ্ধতি গুলিকে গুল্মিকা নামে অভিহিত করিব।

একটি স্নায়ুকার গুল্মিকা আর একটি স্নায়ুকার গুল্মিকার সহিত মিশামিশি করিয়া থাকে, সেই মিশামিশি বা বুনাট অতি বিচিত্র এবং কারুকৌশলময়। কিন্তু বিশেষ যত্নে শবদেহের স্নায়ুকাগুলি রঞ্জিত না করিলে, চর্ম্মচক্ষে গুল্মিকার বুনাট আমরা দেখিতে পাই না। সন্নিহিত স্নায়ুকা সমূহের গুল্মিকাগুলি ঝোঁপঝাড়ের ডাল পালার মত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কখনই সংযুক্ত হয় না। স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুকা হইতে দীর্ঘ পদ্ধতি বা শাখা বাহির হয়, তাহার নাম ( Axon ) এক্সন। বাঙ্গালায় ইহাকে "উদ্ভেদনক"—বলা যাইতে পারে। এই উদ্ভেদনক ( axon ) অতি দীর্ঘ, ইহারি দ্বারা স্নায়ুতন্তুর অনেকাংশ গঠিত। আমরা পরে স্নায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

স্নায়ুকা ( Neuron ) স্নায়বিক শক্তি পরিচালনার যন্ত্র। টেলিগ্রাফের তার যেমন তড়িৎপ্রবাহ চালনা করে, এই স্নায়ুকামালাও সেইরূপ স্নায়বিক শক্তি পরিচালনা করিয়া থাকে। টেলিগ্রাফের 'পাউয়ার হাউসে' "Power house" বা তাড়িতাগারে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। আর স্নায়ুকা নামধারী আগার সমূহে স্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বেশ বুঝা যাইবে। মনে কর, তুমি বাহু দুইটি সঞ্চালন করিতে চাও। তোমার মনে এই ইচ্ছার সঞ্চার মাত্রেই তোমার মস্তিষ্কে স্নায়ুকাগত এক প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক হইতে একটি স্নায়বিক শক্তিধারা ( Nerve impulse ) নীচের দিকে নামিয়া আসিল। স্নায়ু বাহিয়াই এই স্নায়বিক শক্তিধারা নামিয়া মেরুদণ্ড নাড়ী পর্য্যন্ত আসে, সেখানে অবস্থিত আর একটি স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুকার গুল্মিকার ( dendrons ) সহিত উহার সংস্পর্শ ঘটে। এই গুল্মিকাগুলি তখন পূর্ব্বোক্ত স্নায়বিক শক্তিধারাকে গ্রহণ করিয়া, মেরুদণ্ড-নাড়ীর মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুকাভুজে পৌছিয়া দেয়; তখন স্নায়ুকাভুজ ( axon ) বহিয়া স্নায়বিক শক্তিধারা বাহু সংলগ্ন স্নায়ুতে প্রবেশ করে, কারণ মেরুদণ্ড নাড়ীর স্নায়বিক কোষটির স্নায়ুকাভুজের ( axon ) সহিত বাহুমধ্যে বিস্তৃত স্নায়ুপুঞ্জের সংস্রব রহিয়াছে। স্থতরাং স্নায়ুকাপুঞ্জের বিচিত্র সমাবেশের ফলে উহাদিগের সাহায্যে মস্তিষ্ক সঞ্জাত স্নায়বিক শক্তি বাহু যুগলের পেশীমালায় নীত হয়। স্নায়বিক শক্তি এইরূপে পলক মধ্যে মস্তিষ্ক হইতে বাহু যুগলের পেশীমালায় সংক্রামিত হইবামাত্র উহারা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনানুসারে আকুঞ্চিত হইয়া বাহু দুইটিকে তুলিয়া ধরে।

স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়বিক শক্তি প্রবহনে যাহাতে কোন বিভ্রাট না ঘটে তাহার জন্য, স্নায়ুকার কোন্ দিকে শক্তি বহিয়া যাইবে তাহা ঠিক করা আছে। প্রথমে স্নায়বিক শক্তি গুল্মিকা বহিয়া কোষ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার পর কোষ হইতে স্নায়ুকা বাহু বহিয়া চলে। স্থতরাং সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন স্নায়ুকার গুল্মিকাগুলি স্নায়ুশক্তি আহরণ এবং স্নায়ুকাভুজ বিক্ষেপন কার্য্য করিয়া থাকে। স্থতরাং গুল্মিকাগুলি টেলিগ্রাফ অফিসের "Receivers" বা "গ্রহণিকা" সমূহ এবং স্নায়ুকাভুজ "Transmitters" বা "বিক্ষেপনিকা" সমূহের কাজ করে। এস্থলে স্নায়ুকোষের সহিত টেলিগ্রাফ আফিসের তুলনা করা যাইতে পারে। টেলিগ্রাফ আফিসে সংবাদের আদান প্রদান চলে, স্নায়ুকাতেও স্নায়বিক শক্তির আদান প্রদান চলিয়া থাকে। গুল্মিকা শক্তি আহরণ করে, স্নায়ুকাভুজ ( axon ) ইহা বিতরণ বা বিক্ষেপ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্নায়ুকোষের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়া চলে, উহাতে কি কৌশলে স্নায়বিক শক্তির উন্মেষ ঘটে, কি উপায়ে গুল্মিকা দ্বারা আহৃত শক্তি স্নায়ুকাভুজ বহিয়া চলিয়া যায়, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। মোট কথা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্নায়বিক শক্তির জটিল ক্রিয়া সম্বন্ধে একটু আভাস দিবার জন্য আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছি।

আমরা স্নায়ু সম্বন্ধে বারংবার উল্লেখ করিয়াছি।



...খন উহার আরও কিছু পরিচয় দিব। স্নায়ু অতি সূক্ষ্ম, ...কোমল ও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ তন্তুগুচ্ছ। ইহা কার্পাস ...সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। খুব সরু কাচের নলে তৈল পুরিলে ...যেরূপ দেখায় স্নায়ুও দেখিতে সেইরূপ। যাহারা কোন ...বড় বন্দরে গিয়াছেন, তাঁহারই দেখিয়াছেন, খুব মোটা ...কাছি দিয়া বড় বড় ষ্টীমার ও জাহাজ তীরস্থ অতিস্থূল ...স্তির সহিত বাঁধা আছে। এই জাহাজ বাঁধা কাছির ...সহিত স্নায়ুর উপমা চলে, কেননা ঐ কাছি যেমন সরু ...সরু দড়ির সমষ্টি, তেমনই স্নায়ু অতি সূক্ষ্ম তন্তুপুঞ্জের ...সমষ্টি। টেলিগ্রাফের Cable বা দড়ার সহিত স্নায়ুর ...র সাদৃশ্য আছে। টেলিগ্রাফের "কেবল" সমুদ্র গর্ভে ...প্রসারিত থাকিয়া পৃথিবীর এক মহাদেশ হইতে অন্য ...মহাদেশে সংবাদ বহিয়া লইয়া যাইতেছে। স্নায়ুর মত ...হা গুচ্ছবদ্ধ তন্তুসমূহের সমবায়ে রচিত। কিন্তু ...টেলিগ্রাফের তন্তু কেবল তন্তুপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র নহে। ...হার ভিতর একটি ধাতুময় তার আছে, উহার দ্বারা ...সংবাদের আদান প্রদান চলে। এই তারটি সম্পূর্ণরূপে ...তন্তুপুঞ্জের দ্বারা আবৃত। স্নায়ুতন্তুরও ঐরূপ একটা ...মধ্যতন্তু বা "মাজ" আছে, উহা মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু-শক্তি ...সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং বাহিরের খবর ...ভিতরে লইয়া আইসে। স্নায়ুর 'মাজের' বহিরাবরণ ...সংবাদবহ মাজটিকে পোষণ ও রক্ষণ করিয়া থাকে। ...ত স্নায়ুতন্তুর বহিরাবরণ বা খাপ বেশ সুগঠিত, এই ...আবরণের আবার দুইটি স্তর। সুতরাং স্নায়ু তন্তু তিন ...অংশে বিভক্ত।

১। মধ্যতন্তু বা 'মাজ'। ( Axis cylinder ).

২। শ্বেতোপাদান। ইহা 'মাজ'কে বেষ্টন করিয়া ...আছে।

৩। প্রচ্ছদ। ( Sheath of Swann ).

মধ্যতন্তুই স্নায়ুতন্তুর সর্ব্বপ্রধান অংশ, ইহা স্নায়ু-...কোষের সুদীর্ঘ কোষপদ্ধতি মালার সমবায়ে সৃষ্ট। স্নায়ু...র মধ্যে যে স্নায়বিক শক্তির উদ্দীপনা হয় তাহা ...সম্ভূত স্নায়ুতন্তুর 'মধ্যতন্তু' বা 'মাজ' বহিয়া গন্তব্য ...স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। জীবনের প্রত্যেক নিমেষে স্নায়ুবিক শক্তি শরীরের এক অংশ হইতে অন্য অন্য অংশে স্নায়ুতন্তু যোগে বহিয়া যাইতেছে। যেন সমস্ত শরীর জুড়িয়া টেলিগ্রাফ চলিতেছে।

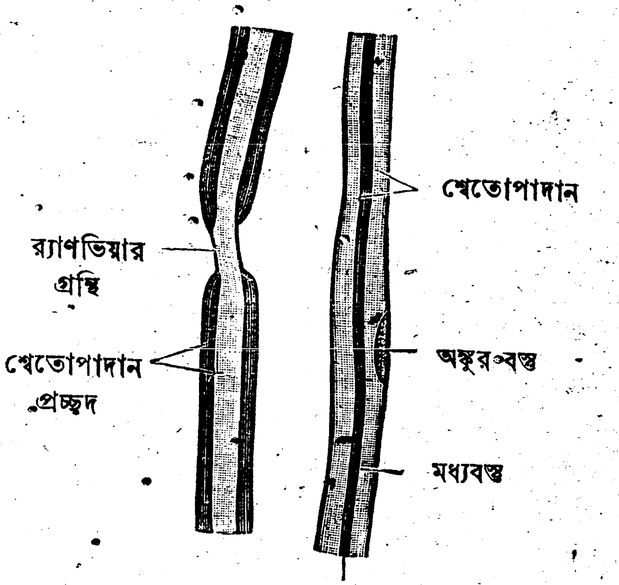




চিত্র ৫৮—লম্বালম্বি ভাবে ছেদিত স্নায়ু তন্তু।

সভ্যদেশের টেলিগ্রাফ বিভাগের সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারিরা যেমন সদর বা শীর্ষ-কার্য্যালয়ের উপদেশ অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে, তেমনই শরীরের যে কোন অংশে পেশী, গ্রন্থি বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, স্নায়বিক শক্তি ( Nerve impulse ) দ্বারা তাহা প্রকৃষ্টভাবে, সুসৃঙ্খলাক্রমে সম্পন্ন হইতেছে, স্নায়ুতন্তু যোগে ঐ শক্তিধারা প্রবহন কালে তিল মাত্র গোলযোগ হইতেছে না। স্নায়ুতন্তুর মধ্যতন্তু ( axis cylinder ) দ্বারাই স্নায়ুশক্তি প্রবাহিত বা নীত হইয়া থাকে।

স্নায়ুর শ্বেতোপাদান কোমল নালিকাকার প্রচ্ছদ। এই শ্বেতোপাদানই সাধারণ স্নায়ু সমূহের ধবল বর্ণের মূলীভূত কারণ। কিন্তু স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুকাসমূহ এবং সেগুলির পদ্ধতিসমূহ ধূসরবর্ণ। শ্বেতোপাদান স্নায়ুকার মধ্যতন্তু বা মাজকে (central axis cylinder) রক্ষা

করিতেছে। মধ্যতন্তু ও শ্বেতোপাদানের উপর সোয়ান প্রচ্ছদ বিন্যস্ত।

এই প্রচ্ছদটি শ্বেতোপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্ম বা পাতলা, সোয়ান সাহেব সর্ব্বাগ্রে এই প্রচ্ছদটি আবিষ্কার পূর্ব্বক উহার স্বরূপ বর্ণন করাতে উহা সোয়ান প্রচ্ছদ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

সোয়ান প্রচ্ছদটি অনবচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত কিন্তু শ্বেতোপাদানপ্রচ্ছদটি মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন। উহার যে সব স্থানে ছেদ আছে সেগুলিকে র‍্যাণভিয়ার গ্রন্থি ( Nodes of Ranvier ) বলে। ঐ সকল স্থলে মধ্য তন্তুর সহিত সোয়ান প্রচ্ছদের প্রত্যক্ষভাবে সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থিতে স্নায়ুতন্তু সমূহ শাখা বিস্তার করিয়াছে।

কোন দৈব দুর্ঘটনাবশে স্নায়ুকানিহিত মধ্যতন্তু ছিন্ন বা আহত হইলে স্নায়ু-শক্তি ঐ স্নায়ুতন্তু বহিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। আর যদি ঐ স্নায়ুতন্তু চর্ম্মের কিয়দংশে ব্যাপ্ত থাকে তাহা হইলে চর্ম্মের ঐ অংশের অনুভব শক্তি লোপ পায়, ঐরূপ স্নায়ু কোন পেশীকে স্নায়ুশক্তি প্রদানার্থ প্রসারিত থাকিলে মানবের ইচ্ছানুসারে পেশীটি আর আকুঞ্চিত হয় না। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে মানবের ইচ্ছাশক্তি ব্যাহত হইয়া থাকে।

স্নায়ুর যে অংশটি উহার উৎপাদক স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুকা হইতে দূরবর্ত্তী তাহাই আহত হইলে দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়ে কিন্তু স্নায়ুর যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে উহার উৎপাদক স্নায়ুকোষের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহা অক্ষুণ্ণ ও তেজস্বী থাকে। স্নায়ুতন্তুর অবনতি সংক্রান্ত তথ্য দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে স্নায়ুর পুষ্টি প্রত্যক্ষভাবে উহার উৎপাদক স্নায়ুকোষের ( Cell of origin ) উপর নির্ভর করিতেছে। স্নায়ুর যেরূপ অবনতি বা দৌর্ব্বল্য জনক ক্রিয়া ( Process of digenaration ) আছে, সেইরূপ উহার উন্নতি বা অভ্যুদয়াত্মিকা ক্রিয়া ( Process of regenaration ) আছে। স্নায়ুর অভ্যুদয়াত্মিকা ক্রিয়া প্রভাবে Axis Cylinder বা মধ্য তন্তুর পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে।

সাধারণতঃ পুনরুপচিত মধ্যতন্তুটি বিকল স্নায়ুতন্তুভাগের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং একটি স্নায়ু-তন্তু আঘাত পাইয়া পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইবার কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে উহা আবার পূর্ব্বের ন্যায় সবল, সুস্থ ও কর্ম্মপটু হইয়া উঠে। কোন প্রত্য… বা কোন বিশিষ্ট পেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে তাহাতে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিবার ব্যবস্থা আছে। ঐরূ… ব্যবস্থার হেতু এই যে, যে পেশী স্নায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্নায়বিক শক্তি লাভে বঞ্চিত হয় তাহার চলচ্ছক্তি ও কর্ম্মপটুতা দীর্ঘকালের জন্য লোপ পায়, তখন স্নায়ু অবসাদে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, উহার সহিত স্নায়ু… সংযোগ ঘটিলেও পূর্ব্বের ন্যায় আকুঞ্চিত হইতে পারে না। তড়িৎ স্নায়ুশক্তির উদ্দীপক, সুতরাং তড়িৎ শক্তির সংযোগে নষ্টশক্তি পেশীকে নবশক্তি সম্পন্ন এবং কার্য্যক্ষম করে। সুতরাং পেশী পরিচালক স্নায়ু… পুনরুপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে পেশীতে তড়িৎ প্রবাহ বহাই… উহার বিকলতা দূর হইয়া যায় এবং উহা স্বাভাবিক স্না… শক্তির প্রেরণায় পরিচালিত হইতে থাকে!

স্নায়ু সকল সংবাদবহ দূতের কাজ করিয়া থাকে… কেবল দেহের সকল অবয়ব, অর্থাৎ মুখমণ্ডল, গ্রীবা… কর, চরণ, বক্ষ, পৃষ্ঠ, স্কন্ধদেশ প্রভৃতিতে স্নায়ু সমূহ ব্যা… রহিয়াছে, তাহা নহে, দেহের গ্রন্থি সমূহ ( Glands ), হৃদ্‌যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র—এক কথায় দেহের সমস্ত যন্ত্রে… ইহারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং মানবদেহের প্রত্যেক যন্ত্রেরই কতকগুলি করিয়া বার্ত্তাবহ আছে।

এই বার্ত্তাবহগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বার্ত্তাবহ দেহের কোন বিশিষ্ট অংশে কি ঘটিতেছে তাহার সংবাদ মস্তিষ্ককে প্রদান করিতেছে, আর এক শ্রেণীর বার্ত্তাবহ মস্তিষ্কের হুকুম গুলি শরীরের যন্ত্র-… গুলিকে প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই দুই প্রকারের স্নায়ুসমূহের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত নাম দুইটি উহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে :—

১। বার্ত্তাবহ স্নায়ু। ( Afferent nerves)।

২। আজ্ঞাবহ স্নায়ু। ( Efferent nerves)।



বার্ত্তাবহ স্নায়ুগুলি ( Afferent nerves ) দেহের ঘটনা জ্ঞাপক শক্তি প্রবাহ ( impulses ) বা সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়, আর আজ্ঞাবহ স্নায়ু সকল (Efferent nerves) মস্তিষ্কের প্রদত্ত সংবাদ বা আদেশ শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র-সমূহে বহিয়া লইয়া যায়।

কোন ব্যক্তি তোমার পায়ের অঙ্গুলি জুতা-সমেত পা দিয়া চাপিয়া ধরিল বা পদ-দলিত করিল, আর অমনই তুমি পা সরাইয়া লইলে। তুমি পা সরাইলে কেন? কারণ তুমি বুঝিলে তোমার পদপল্লব পদ-দলিত হইয়াছে, তুমি ব্যথাবোধ করিতেছ। তোমার নিদ্রিত অবস্থায় কেহ তোমার পদপল্লব চরণে দলিত করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ পা সরাইয়া লও কেন?

কারণ তোমার পদপল্লবলগ্ন বার্ত্তাবহ স্নায়ুপুঞ্জ বেদনার অনুভূতি তোমার মস্তিষ্কে বহিয়া লইয়া যায় এবং তোমার মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয়—"পা সরাইয়া লও"। অমনই পলকমধ্যে হুকুম তামিল হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়াস্থলী ( Motor region ) হইতে একটি আজ্ঞাবহ স্নায়ু ( Efferent nerve ) নামিয়া আসিয়াছে। ইহা আজ্ঞা বহন করে, আজ্ঞাটি ঐ স্নায়ুযোগে মেরুদণ্ড-নাড়ী মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তারপর মেরুদণ্ড-নাড়ী হইতে প্রসারিত স্নায়ু বহিয়া তোমার পদপল্লবের পেশীমালায় গিয়া পৌঁছে। এই পেশীপুঞ্জ মস্তিষ্কের অনুগত, তাহারা হুকুম পাইবা মাত্র তাহা তামিল করে, সুতরাং পা খানি সচল হইয়া সরিয়া যায়।

সাধারণতঃ বার্ত্তাবহ ও আজ্ঞাবহ স্নায়ুপুঞ্জ একই স্নায়ুগুচ্ছ মধ্যে থাকে। যে সব স্নায়ুগুচ্ছে এইরূপ দুই প্রকারের স্নায়ু থাকে তাহাদিগকে ( Mixed nerve) "মিশ্র-স্নায়ু" বলে। আমাদিগের দেহের প্রায় সকল স্নায়ুই মিশ্র-স্নায়ু পর্য্যায় ভুক্ত।

---

# শরীর চর্চ্চা

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

লেখক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'খালি হাতে' ( Free-hand ) ব্যায়াম নূতন অথবা পুরাতন উভয় প্রকার ব্যায়ামকারীর জন্য অতি প্রয়োজনীয়। খালি হাতের ব্যায়ামের সুবিধা এই যে উহা অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত, কোন নির্দ্দিষ্ট পেশী অথবা পেশীসমষ্টিকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা চালিত করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গোপন মন্ত্র। আধুনিক ব্যায়াম চর্চ্চায় পূর্ব্বেকার মত একসঙ্গে শরীরের সমস্ত পেশীদ্বারা কার্য্য লওয়া হয় না। অধুনা যখন একটি কোন পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ করা হয়, শরীরের অন্যান্য সকল পেশীগুলিকে অত্যন্ত শিথিল অবস্থার রাখা হয়। পুরাতনের সহিত নূতন পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিলে এই জানা যায় যে পুরাতন নিয়মানুসারে সবল পেশীগুলিই একসঙ্গে চালিত হয় ফলে শরীরের সমস্ত পেশীগুলি সমানভাবে পুষ্ট হয় না; অপরন্তু নূতন নিয়মে প্রত্যেক পেশীকে বিভিন্ন ভাবে পরিচালনা করায় শরীরের সমস্ত পেশীগুলিই সমান উৎকর্ষ লাভ করিয়া দৃঢ় হয়, পুরাতন পদ্ধতির মত কোন পেশী দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। শরীরের বড় বড় পেশীগুলি সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়, সেজন্য সেগুলি যে অনুপাতে দৃঢ় হয় ছোট পেশীগুলির সেইরূপ ব্যায়াম

না হইলে সেগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিয়া যায়, ফলে এরূপ অর্দ্ধপরিপুষ্ট শরীর কখনও পূর্ণ উৎকর্ষ অথবা বল লাভ করিতে পারে না।

অধ্যবসায় ব্যায়ামচর্চ্চার মূল মন্ত্র। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে শরীর গঠন করার জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন। অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে অতি অল্প সময় ব্যায়ামচর্চ্চায় নিয়োজিত করিয়া ফল-লাভের বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাঁহারা চর্চ্চা ত্যাগ করেন। নূতন ব্যায়ামাভ্যাসের সময় শরীর প্রথমে রোগা হইতে আরম্ভ করে, ইহাতেও অনেকে নিরাশ হইয়া শরীর-চর্চ্চা ত্যাগ করেন। কিন্তু আসল কথা এই যে নূতন ব্যায়ামাভাস কালে পেশীগুলি নূতন করিয়া গঠিত হয়, শরীরের মধ্যে যাহা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ও শিথিল পেশী থাকে তাহা ক্ষয়িত অংশরূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে নূতন সবল পেশী উৎপন্ন হয়। ব্যায়ামাভ্যাসের সময় প্রকৃতি যেন সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন শরীরের জন্য নূতন ভিত্তি স্থাপন করে।

ইহা মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য যে ব্যায়ামকারী আপনার শরীরকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত নিজের অধীনে আনিবে এবং কোন বলসাপেক্ষ কার্য্য করিবার সময় যতটুকু বল প্রয়োগের প্রয়োজন ইচ্ছা করিবামাত্র সংশ্লিষ্ট পেশীগুলিতে ততটুকু বল আনিতে সক্ষম হইবে। এক কথায়, শরীরের উপর ব্যায়ামকারীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব হওয়া প্রয়োজন। ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার ও তাহা শরীর-চর্চ্চায় প্রয়োগের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ব্যায়ামাভ্যাসের জন্য কতটুকু সময়ের প্রয়োজন ইহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কারণ ব্যায়ামাভ্যাসে ব্যক্তিগত বল (Stamina) হিসাবে কম বা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখিবার জন্য ১৫ হইতে ২০ মিনিট সময় যথেষ্ট। যাহারা অধিকতর শক্তি লাভেচ্ছু তাহাদের ধীরে ধীরে সময় বৃদ্ধি করা উচিত। কোন কোন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ শরীরের সমস্ত পেশীগুলি শ্রান্ত হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়ামাভ্যাস করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু এই প্রথায় পেশীগুলির সময়ে এমন অবস্থা আসে, যখন তাহারা আর বৃদ্ধি পায় না এবং শরীর পর্য্যুষিত (Stale) এবং পেশীগুলি Muscle-bound হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। এই জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পেশীগুলিতে বিশেষ স্ফূর্ত্তি আসে ততক্ষণ ব্যায়ামাভাস করা উচিত। পেশীর স্বাস্থ্য নির্ণয় করিবার সহজ উপায় এই যে ব্যায়ামাভ্যাস কালেই সেগুলি দৃঢ় এবং শক্ত বলিয়া বোধ হয় অন্যথা পেশীগুলি অত্যন্ত নরম থাকে। যাহাদের পেশী সকল সময়েই অযথা শক্ত তাহাদের জানা উচিত যে পেশীগুলি অবনতির পথে যাইয়া পর্য্যুষিত (Stale) অথবা Muscle bound হইয়া গিয়াছে, এই রোগ ব্যায়ামকারীর উৎকর্ষলাভের পথে বিশেষ বাধা প্রদান করে সুতরাং পেশী অসুস্থ হইয়াছে এই আশঙ্কা জন্মিলে কিছুদিনের মত শরীর চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া পেশীগুলির প্রাকৃতিক চিকিৎসা করা উচিত।

পেশীর অসুস্থতা নির্ণয় ও পর্য্যুষিত পেশীর চিকিৎসা এক কষ্টকর ব্যাপার। ব্যায়ামকারীর যখন পেশীর স্বাস্থ্যের বিষয় সন্দেহ হইবে তখন ব্যায়ামাভ্যাস ও সর্ব্বপ্রকার বলসাপেক্ষ কার্য্য পরিহার করিয়া শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে। পেশীগুলির নিয়মিত মালিশ (Massage) ও সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করাও এই সময়ে একান্ত আবশ্যক। কারণ এই সময়ে অজীর্ণতা রোগ হইলে পেশীর চির অসুস্থতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। সাধারণতঃ অনুপযুক্ত আহার ও অত্যধিক পৈশিক শ্রম পর্য্যুষিত পেশীর সৃষ্টি করে।

ব্যায়ামের সময় ঢিলা কাপড় ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে শরীরের কোনখানে ত্বকের ক্ষুদ্র শিরাসমষ্টি গুলিও রক্তচলাচলের বাধা না পায়। হেকেন্সমিথ (G. Hackenschmidt) উলঙ্গ অবস্থায় ব্যায়ামাভ্যাস করিবার পক্ষপাতী। লাঙ্গোট্ প্রভৃতি হইতে ফুটবল শর্টস্ (পায়জামা) অধিক উপকারী।

আহারের অব্যবহিত পরে বা পূর্ব্বে ব্যায়াম করা একান্ত অনুচিত। আহারের সময় হইতে অন্ততঃ দুই



ঘণ্টা পরে বা পূর্ব্বে ব্যায়ামাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহার কারণ পাঠকবর্গকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

আমরা আরসির সম্মুখে ব্যায়াম করা হিতকারী ও প্রয়োজনীয় মনে করি, কারণ ইহাতে শরীরের সমস্ত পেশীগুলির আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করিবার সুবিধা হয় এবং ব্যায়াম ঠিক পদ্ধতি অনুসারে হইতেছে কিনা জানা যায়। এতদ্ব্যতীত আরসির সম্মুখে ব্যায়াম করিলে ব্যায়ামে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সুবিধা হয়। এই পুস্তকে লিখিত ব্যায়াম পদ্ধতি অতীত পেশী আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ করিয়া বিভিন্ন ভঙ্গীতে (Pose) দাঁড়ান অভ্যাস করা উচিত, কারণ এই দাঁড়াইবার অভ্যাস করা উৎকৃষ্ট ব্যায়ামচর্চ্চার কার্য্য করে। পাঠকবর্গকে ব্যায়ামকারী অথবা বিখ্যাত পালোয়ানদিগের ছবি Posing অভ্যাস করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে।

শরীরের ভার যাহাতে অযথা বাড়িয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ ভারী ওজনের শরীর কখনও মনোমুগ্ধকর হয় না। মধ্যম ওজনেই পেশীর উৎকর্ষ জনিত শারিরীক সৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকাশলাভ করে। ব্যায়ামকারীদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য গ্রীক এবং ইংরাজ আদর্শ পুরুষের মাপ প্রদত্ত হইল :—

গ্রীক পুরুষের আদর্শ—

| দৈর্ঘ্য | ওজন (সের) | ঘাড় | বুক* | কোমর | উরু | বাহু | পায়ের ডিম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫′ | ৫২½ | ১১⅝″ | ৩২″–৩৩″ | ২৯″ | ১৫″ | | |
| ৫′২″ | ৫৮ | ১২″ | ৩৪″–৩৫″ | ৩০″ | ১৭″ | | |
| ৫′৪″ | ৬৩½ | ১৩″ | ৩৬″–৩৭″ | ৩১″ | ১৯″ | | |
| ৫′৬″ | ৭০ | ১৪″ | ৩৮″–৩৯″ | ৩২″ | ২১″ | | |
| ৫′৮″ | ৭৭½ | ১৫″ | ৪০″–৪১″ | ৩৩″ | ২৩″ | | |
| ৫′১০″ | ৮৭ | ১৬″ | ৪২″–৪৩″ | ৩৪″ | ২৫″ | | |
| ৬′ | ৯৮ | ১৭″ | ৪৫″–৫৬″ | ৩৫″ | ২৭″ | | |

* সাধারণ (Normal) অবস্থার মাপ।

রাজ পুরুষের আদর্শ—

| দৈর্ঘ্য | ওজন | ঘাড় | বুক | কোমর | উরু | বাহু | ডিম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫′ | ৫৬½ | ১৩″ | ৩৪½″ | ২৬″ | ১৭⅝″ | ১২″ | ১৩″ |
| ৫′২″ | ৬০½ | ১৩½″ | ৩৫½″ | ২৬½″ | ১৭⅝ | ১২½ | ১৩½″ |
| ৫′৪″ | ৬৪½ | ১৪″ | ৩৬½″ | ২৭″ | ১৮⅝″ | ১৩″ | ১৪″ |
| ৫′৬″ | ৬৯½ | ১৪½″ | ৩৭⅝″ | ২৮½″ | ১৯⅝″ | ১৩⅝ | ১৪½″ |
| ৫′৮″ | ৭৫½ | ১৫″ | ৩৯½″ | ৩০″ | ২১″ | ১৪½″ | ১৫″ |
| ৫′১০ | ৮১ | ১৫½″ | ৪৩⅝″ | ৩২″ | ২২½″ | ১৫″ | ১৬″ |
| ৬′ | ৯২½ | ১৬″ | ৪৫″ | ৩৪½″ | ২৪″ | ১৬″ | ১৭″ |

† বারনার ম্যাকফাডেনের Encyclopoedia of Physical Culture হইতে গৃহীত।

## নবম পরিচ্ছেদ

### ব্যায়াম পদ্ধতি।

নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি সাধারণতঃ শরীরের সমস্ত পেশীগুলিকে দৃঢ় করিবে। বড় পেশীগুলি স্বতঃই শীঘ্র উৎকর্ষ লাভ করে ও অধিকতর শক্তি সম্পন্ন হয়। যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন পেশীগুলিও উৎকর্ষ লাভ করে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ব্যায়ামগুলি যে সমস্ত প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হইবে তাহা নহে। ইহার মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যায়াম নির্ব্বাচনের ভার ব্যায়ামকারীর উপরেই দেওয়া গেল। অবশ্য নির্ব্বাচন এমন ভাবে করা কর্ত্তব্য যাহাতে সমস্ত পেশীগুলিই ব্যায়ামে নিযুক্ত হয়।

যেখানে দাড়াইবার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা নাই, সেখানে পদদ্বয় ১৮ ইঞ্চি বিযুক্ত কবিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ শরীরের ভার দুই পায়ের উপর সমান ভাবে দিতে হইবে।

১। পা জোড় করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। হাত দুটি উপরে তোল। পরে ধীরে ধীরে নীচু হইয়া ভূমি স্পর্শ করিবার চেষ্টা কর। এই প্রক্রিয়ায় মাথা বাহুর ভিতর থাকিবে ও হাঁটু একেবারে সোজা রাখিতে হইবে।

২। ১ম প্রক্রিয়ার মত হাত উপরে তুলিয়া দাঁড়াও ও যতদূর সম্ভব পিছনে হেলিয়া পড়িয়া ১ নং ব্যায়ামের মত পরে সম্মুখে ঝুঁকিয়া ভূমি স্পর্শ করিবার চেষ্টা কর।

৩। মস্তকের উপর হাত রাখ। হাতের গুলির (Biceps) উপর জোর দিয়া পেশী আকুঞ্চিত কর।

৪। সাধারণ অবস্থায় যেমন হাত ঝুলিয়া থাকে সেইরূপ রাখ, পরে স্কন্ধদ্বয় টানিয়া উপরে তুলিয়া হাতের পশ্চাদ্দিকের পেশীর (Triceps) উপর জোর দাও।

৫। মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুষ্টি ভিতরের দিকে টান ও বাহিরে প্রসারণ কর। এই প্রক্রিয়ায় পুরোবাহুর পেশীগুলির উপর জোর পড়িবে।

৬। কোমর ঝুঁকাইয়া দাঁড়াও। হাত পিঠের উপর তুলিয়া অঙ্গুলি সম্বদ্ধ কর ও যতদূর সম্ভব হাত সোজা রাখিয়া মাথার দিকে উঠাও। হাত মাথার দিকে উঠাইবার সময় ঘাড় সম্মুখে ঝুঁকাইতে হইবে।

৭। উপুড় হইয়া শোও। হাঁটু পর্য্যন্ত ভূমি হইতে উঠাইয়া রাখ, বুকও যথাসম্ভব ভূমি হইতে উপরে তুলিতে হইবে। পরে হাত পিঠের উপর রাখিয়া ৫ নং ব্যায়ামের প্রক্রিয়া কর।

৮। হাত সম্মুখে আনিয়া অঙ্গুলিসম্বদ্ধ কর। বুকের পেশীর পার্শ্বে বাহুদুটি চাপিয়া উক্ত পেশীর উপর জোর দাও।

৯। পার্শ্বে হাত ঝুলাইয়া দাঁড়াও। পরে স্কন্ধদুটি যতদূর সম্ভব উপরের দিকে, পশ্চাতে ও সম্মুখে টান অর্থাৎ স্কন্ধদুটিকে বৃত্তাকারে ঘুরাইবার চেষ্টা কর।

১০। কোমরের উপর (পার্শ্বের দিকে) হাত রাখ ও পিঠের পাখ্না (Shoulder blades) দুটিকে বাহিরের দিকে টান। এই প্রক্রিয়ার সময় সম্মুখে একটু ঝুঁকিতে হইবে।

১১। চিৎ হইয়া শোও। পা না তুলিয়া ও হাঁটু সোজা রাখিয়া বস। এই ব্যায়ামে হাত দুটি কোমরের উপর থাকিবে।

১২। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত নিশ্বাস বাহির করিয়া দাও এবং পেট ধীরে ধীরে ভিতরে টানিয়া লও। ইহা প্রথমতঃ দুঃসাধ্য হইলেও একটু অভ্যাসে অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠে। বাহিরের বায়ুর চাপ পেট ভিতরে টানিয়া লইতে সাহায্য করিবে।

১৩। দুই পায়ের উপর সমান ভার দিয়া দাঁড়াও। পা ভূমি হইতে না সরাইয়া উরুর পেশী বাহিরের দিকে টান (এমন করিয়া পেশীগুলিকে আকুঞ্চিত করিতে হইবে, যেন অন্য কেহ উরু দুটি বাহিরের দিকে টানিতেছে)।



১৪। ১৩ নং প্রক্রিয়ার মত পেশীগুলি ভিতরের দিকে টান।

১৫। পা সোজা করিয়া ভূমি হইতে কিছু উপরে উঠাও। পরে উরুর পেশীগুলি নিজের দিকে আকুঞ্চিত কর। এই প্রক্রিয়া দুই পায়ের জন্য সমান ভাবে করিতে হইবে।

১৬। কিছু একটা ধরিয়া দাঁড়াও। হাঁটু পর্য্যন্ত সোজা রাখিয়া পা পিছনের দিকে উঠাও। এই প্রক্রিয়ায় উরুর পিছনের পেশী (Biceps femoris) আকুঞ্চিত হইবে। দুই পায়ে সমান অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন।

১৭। একখানি ইটের উপর পায়ের পাতা দুটি রাখিয়া দাঁড়াও। গোড়ালি যেন বাহিরেই থাকে। (ক) পরে শরীরের সমস্ত ভার পায়ের উপর দিয়া গোড়ালি নামাইয়া দাও; (খ) এবং পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া যতদূর সম্ভব উপরে উঠ।

এই ব্যায়াম পদ্ধতিকে আদর্শ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার সবগুলিই স্যাণ্ডো, অ্যাষ্টন, মাক্সিক, ফ্রেড্ ওল্ফ ও বিখ্যাত আমেরিকান ব্যায়াম বিশেষজ্ঞের পদ্ধতি হইতে গৃহীত। এই ব্যায়ামগুলির সহিত পাঠকবর্গকে 'ডন' ফেলা অভ্যাস করিতে বলি। কারণ 'ডনের' মত সুন্দর ব্যায়াম আর কোন দেশেই নাই।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### ভারোত্তলন।

শারীরিক শক্তি পরীক্ষা করিতে গেলে আমাদের মনে স্বভাবতই ভারোত্তলনের দ্বারা শারীরিক শক্তির তারতম্য পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ভারোত্তলনের দ্বারা শারীরিক শক্তির উৎকর্ষলাভ এবং পরীক্ষা করা চলিয়া আসিতেছে, কেননা ভারোত্তলন স্বাভাবিক ব্যায়াম। অধুনা মানুষের মার্জ্জিত বুদ্ধি ও শিক্ষা অন্য নানাপ্রকার উচ্চ অঙ্গের ব্যায়ামের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির বল আপনার শরীরের উপর বুদ্ধিমত্তার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং অধুনা যে সকল উপায়ের দ্বারা আমরা শরীরের উৎকর্ষ লাভ করি তাহাও মানসিক শক্তি হইতে উদ্ভূত।

পুরাকালের ভারোত্তলন প্রভৃতি ব্যায়াম ইদানী বুদ্ধিমত্তার যুগে বিজ্ঞান সম্মত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব ভারোত্তলনও মানসিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অধিকতর উপকারী ও কার্য্যকরী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ভারোত্তলন করিবার জন্য অন্যান্য কারণ শক্তির প্রয়োজন হইত, কেননা তখন কোন উপযুক্ত যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় নাই। আর আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যে সকল ভারোত্তলনের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিও অনায়াসে তুলিতে পারে। পাঁচ সাত বৎসরের শিশু হইতে রামমূর্ত্তির মত পরম ক্ষমতাশালী লোকেও একই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ব্যায়ামের অনির্ব্বচনীয় সুখ আস্বাদ করে।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত আদর্শের ব্যায়াম দৈহিক সুস্থতা ও সাধারণ শক্তিলাভ করিতে সাহায্য করিবে। কিন্তু যাহারা অধিকতর শক্তিকামী অথবা শক্তির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক ভারোত্তলনই তাহাদের পক্ষে একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ ভারোত্তলনের দ্বারা শরীর দ্রুত উৎকর্ষ লাভ করে এবং শক্তিও বিস্ময়জনকরূপে বর্দ্ধিত হয়। ভারোত্তলন অভ্যাসের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অনেক ব্যক্তি জনসাধারনের নিকট আপনাদের শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। ৮০০০ পাউণ্ড ওজনের পাথর বুকের উপর রক্ষা করা অথবা ৯৮৫ পাউণ্ডের বারবেল তোলা একমাত্র ভারোত্তলন অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব।

বাংলা দেশে ভারোত্তলনের চর্চ্চা বিশেষ নাই। উত্তর ভারতে এই কলা অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বাংলা দেশে পরলোকগত ক্ষেতুবাবু (ক্ষেত্রমোহন গুহ)

ভারোত্তলনকারীদিগের অগ্রণী ছিলেন, অধুনা এই বংশের বিখ্যাত পালোয়ান গোবর ( যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ ) ভারোত্তলনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আধুনিক শক্তি লাভ করিতে গেলে ভারোত্তলন অভ্যাস করা একমাত্র উপায়। ভারোত্তলনের য়ুরোপীয় পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত ও সহজ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং তাহা অন্য কোন ব্যায়ামাভ্যাস ব্যতিরেকেও অভ্যাস করা যাইতে পারে। তবে সাধারণ ব্যায়ামের দ্বারা শরীর প্রথমে পুষ্ট হইলে ভারোত্তলনে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যায়, এই জন্য ভারোত্তলনের সহিত সাধারণ ব্যায়ামের নিকট সম্বন্ধ আছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভারোত্তলন অথবা অন্য যে কোনও প্রকারের ব্যায়াম শরীর গঠন করিতে সক্ষম। কেবল অধ্যবসায়, উৎসাহ, বুদ্ধি প্রয়োগ, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন। যিনি অনায়াসে এই সকল শক্তিগুলি ব্যায়ামচর্চ্চায় নিয়োজিত করিতে পারিবেন তাহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক ব্যায়ামকারীরই দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করিবার একটী ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। ইচ্ছা দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়, ইচ্ছার প্রভাবে যে শরীর গঠিত হইবে এ আশা আমরা কায়মনোবাক্যে করি।

যদি ব্যায়াম সম্বন্ধে কাহারও কিছু আমাদের নিকট জানিবার ইচ্ছা থাকে—Student's Sporting Club, 5A Stanley Road অথবা 112 Luker Road, Allahabad এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা সানন্দে যথাশক্তি সাহায্য করিব। ( সমাপ্ত )

---

# দেহের আবর্জ্জনা ও জল

দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে, সমস্ত আবর্জ্জনা যাহাতে শীঘ্র দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। অধিকাংশ স্থলে ঐ সকল দূষিত পদার্থ দেহে সঞ্চিত থাকাই অসুস্থতার একমাত্র কারণ। যে সকল দূষিত পদার্থ প্রত্যহ দূরীভূত হওয়া আবশ্যক, সঞ্চিত থাকিলে তাহারা রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, সমস্ত দেহযন্ত্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

অধিকাংশ স্থলেই আহারের দিকে লক্ষ্য রাখিলে এই বিঘ্ন দূর করা যায়। দেহের চার ভাগের তিন ভাগই যে জল, আহারের সময় তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কোন রোগ বা সামান্য অসুস্থতায়, সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথম দেহের কতকটা জলীয় উপাদানেরই হানী ঘটে। ইহার পূরণ করাই প্রথম আবশ্যক।

অধিকাংশ লোকই হয় অধিক পরিমান না হয় অত্যল্প আহার করিয়া থাকে। লোকে যাহা পুষ্টিকর মনে করে সেইরূপ খাদ্যই পছন্দ করে, কিন্তু অন্যান্য খাদ্যের ন্যায় জলও যে শরীরের পুষ্টির জন্য আবশ্যক সে কথা ভুলিয়া যায়। অধিক পরিমাণ কঠিন খাদ্য গ্রহণ করিলে, রক্ত গাঢ় এবং শরীরের তন্তু শুষ্ক হইয়া যায়। দেহকে ঠিক রাখিতে হইলে প্রচুর পরিমাণ জল প্রধান আবশ্যক।

রক্তেস্থিত জল যে কেবল তন্তুতে পুষ্টিকর উপাদান বহন করে তাহা নহে, ইহা তন্তুর পরিত্যক্ত উপাদানও দূরীভূত করিয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক জলের সর্ব্বত্র আবশ্যক। রক্তের অন্যান্য উপাদানের সহিত মিলিত ভাবে ইহা দেহের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করে। জলের অভাব ঘটিলে সমস্ত কার্য্যেরই ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

দেহের আবশ্যক মত জল গ্রহণ করা আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে প্রচুর জল পান করিলে অধিক ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় এবং ঘর্ম্ম শুকাইয়া শরীরকে ঠাণ্ডা করে। ফল মূল ও শাকশব্জিতে জলীয় ভাগ অধিক থাকে এবং এই সকল অধিক পরিমাণ আহারে জলের অভাব অনেক পূরণ হয়।



গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরমে যখন অনবরত ঘর্ম্ম হইয়া দেহের জল শুকাইয়া যায় সেই সময়ে খাদ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণ ফল মূল গ্রহণ আবশ্যক হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সময়ে ফল মূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ক্ষয় পূরণ ও দেহ গঠনের জন্য কিরূপ আহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। জল বায়ু এবং ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে খাদ্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতা অভ্যাসের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। যাহারা অধিক পরিশ্রম করে ও অধিক ঘর্ম্মাক্ত হয়, অপর সকলের অপেক্ষা তাহাদের দেহের জল শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীর লোকের উপযোগী খাদ্যও বিভিন্ন হইবে।

খাদ্যে জলীয় উপাদান কম থাকিলে অন্য উপায়ে তাহার পূরণ হওয়া আবশ্যক। আহারের মধ্যবর্ত্তি সময়ে অধিক পরিমাণে বা আহারের সঙ্গে অল্প অল্প পরিমাণে জল পান করিতে হইবে। একেবারে শুষ্ক খাদ্য ভাল নহে, ইহার সঙ্গে জলীয় খাদ্য থাকা আবশ্যক।

জ্বরে যখন খুব তৃষ্ণা থাকে, তখন লিমনেড বা নেবু দেওয়া মিছিরির জল প্রভৃতি অল্প টক্ পানীয় গ্রহনে অনেকটা শান্তি হয়। সময়ে সময়ে অল্প গরম জল পান করিলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। গরম জল পানে অল্প তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং অনেক স্থলে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, ফলে দেহের ত্বক শীতল হওয়ায় উত্তাপ কমিয়া আসে। যখন রোগীর উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন আভ্যন্তরিক আবর্জ্জনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে। রক্ত ও শরীরের অন্যান্য রস অধিক তপ্ত হইয়া পড়ে এবং স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। জলের সাহায্যে এই উত্তাপ কমান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। জল-পটি দেওয়া বা দেহ ভিজা কাপড়ে মুছান ইত্যাদি বাহিরের জন্য ব্যবস্থা। পান করিলে ইহা পাকস্থলীকে শীতল করে। অন্ত্রে প্রবেশ করাইলে তন্মধ্যস্থ উত্তাপ দূর হয়। সকল প্রকারে ব্যবহারেই ইহা রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া উত্তাপকে হ্রাস করিয়া থাকে।

জলের সাহায্যে রক্ত তরল হওয়ায় চলাচলের সুবিধা হয় এবং দেহের পরিত্যক্ত অংশ সহজে বিদূরিত হইয়া থাকে। রক্ত ঘন থাকিলে চলাচলের অসুবিধা হয় এবং আবর্জ্জনা দূরিকরণ কার্য্যও সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

যে জ্বর-রোগী অত্যধিক ঔষধ সেবন করিয়াছে কিন্তু চিকিৎসায় জল অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার আরোগ্যের আশা অনেক কমিয়া যায়। জ্বর রোগে, যে স্থলে দেহ আবর্জ্জনা পূর্ণ থাকে, সেখানে দেহকে মলমুক্ত করায় অবহেলা করা মঙ্গল নহে। সর্প দংশন বা ক্ষিপ্ত পশুর দংশনে যেখানে রক্তে বিষ প্রবেশ করিয়াছে সেখানে অতিরিক্ত জল ব্যবহারই বিষ দূরিকরণের পক্ষে উত্তম উপায়। ভিতরে বা বাহিরে উভয় প্রকারেই জলের ব্যবহার চলিতে পারে।

ত্বকের উত্তাপ থাকিলে ভিজা কাপড় উপরে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যাইতে পারে। মূত্রগ্রন্থীকেও অধিক ক্রিয়াশীল করা আবশ্যক। এই সব ক্ষেত্রে রক্তের বিষকে অধিকতর তরল করিয়া দিয়া তীব্রতা হ্রাস করা প্রথম কর্ত্তব্য এবং পরে দেহ হইতে বহিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকল সময় রোগীর মনকে স্থির রাখা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

কেহ কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে কষ্ট পাইলে চিকিৎসক প্রত্যহ ডুস দ্বারা অন্ত্র ধৌতি করার আদেশ দিয়া থাকেন। অনেকে গরম জল পান করিয়াও উপকার লাভ করেন। অন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে ঘটিলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পাকস্থলী ধৌত করা কদাচিৎ আবশ্যক হইয়া থাকে, সাধারণ অবস্থায় ইহার কোন আবশ্যক হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে পাকস্থলীর পরিষ্করণ কার্য্য আপনই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

# ভারত নারী ও যক্ষ্মা

গতবর্ষে দিল্লীর লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতায় লেডি চেমস্‌ফোর্ড মহোদয়া বলিয়াছিলেন—"কতকগুলি হাঁসপাতালে আমি অল্প বয়স্কা যুবতী যক্ষ্মারোগী দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় যে ভারতে যক্ষ্মা একটী সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় নারীগণ বিশেষতঃ শিক্ষিতারা এ বিষয়ে অনেক কার্য্য করিতে পারেন। মুক্ত বায়ু যক্ষ্মারোগের প্রধান প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক। যদি নারীগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া রাখিয়া বা বারণ্ডায় বা ছাদে নিদ্রা যাইতে অভ্যস্ত করেন তাহা হইলে তাঁহারা সহজে ঠাণ্ডা লাগা বা এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এইরূপ করিলে যক্ষ্মা দূরীকরণের পক্ষে অনেকই করা হইবে। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি ভারতীয় নারীগণকে একান্ত অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

যক্ষ্মাকে সহরবাসী ভদ্র নারীগণেরই রোগ বলা যাইতে পারে। ছোট, অধিক জনপূর্ণ গৃহ বা বাটীতে বাসে, দুষিত বায়ু সেবনে তাহাদের দেহ বিষাক্ত হইয়া পড়ে। সবল পেশীসমূহ উপযুক্ত ব্যায়াম বা পরিশ্রমের অভাবে দুর্ব্বল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের উপযুক্ত ব্যায়াম হয় না। দেহের সমস্ত বিষ, মল ও দুষিত পদার্থ দূর করিয়া দিতে রক্তসঞ্চালক যন্ত্রাদির দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। এইরূপে যক্ষ্মা বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে দেহের প্রতিষেধ ক্ষমতাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে।

রৌদ্র কিরণ, মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া পল্লীবাসিনী নারীগণ, সুলভ চাল, ডাল বা গম হইতে নিজেদের উপযোগী পুষ্টি গ্রহণে সক্ষম হন। কিন্তু সহরে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া নারীগণের পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে আহারে মৎস্য, মাংস, ঘৃত বা দুগ্ধ প্রভৃতি অধিক মূল্যের সামগ্রী সংযোগ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধনীগণের পক্ষেই এরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

যুবতী নারীগণের সময়ে সময়ে অধিক শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায়, মাতার গৃহীত খাদ্যে, মাতা ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। এইরূপ অবস্থায় দুইজনের পুষ্টির উপযোগী আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতি জাতিকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক। গর্ভাবস্থায় মাতার রক্তে, মাতা ও সন্তান উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। দুগ্ধ মাতৃ রক্তের রূপান্তর মাত্র। দুর্ব্বল, অজীর্ণগ্রস্ত, রুগ্ন নারীগণ গর্ভাবস্থায় আরও শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং সে সময় তাহাদের রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়।

কিরূপে এই মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ইহাই চিন্তার বিষয়। যেখানে সেখানে থুতুফেলা বন্ধ করিয়া, সংক্রামন প্রতিষেধের নিয়মগুলি প্রচার করিয়া অনেকটা সুফল আশা করা যাইতে পারে। জনপূর্ণ সহরের বায়ু সকল সময়েই দুষিত থাকে। বায়ুতে ভাসমান ধূলি যক্ষ্মা বীজাণু বহন করিয়া ইতঃস্তত চালিত হয়। প্রত্যেক জনপূর্ণ সহরেই আমাদিগকে সকল সময়ে মারাত্মক শত্রুর মধ্যে বাস করিতে হয়। এই সকল শত্রুরা আমাদের দেহ মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া মৃত্যুর দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।

দেহকে সর্ব্বদা রোগ প্রতিষেধের উপযোগী শক্তি সম্পন্ন রাখাই যক্ষ্মার আক্রমণ নিবারণের প্রধান এবং প্রকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক মানব দেহই বিভিন্ন প্রকারের



লক্ষ লক্ষ কোষে গঠিত এক একটি সুপরিচালিত সমাজের মত। ভিতরের বাহিরের সমস্ত শত্রু হইতে আত্মরক্ষার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত। দেহের রোগ প্রতিষেধ শক্তি সর্ব্বদা অক্ষুন্ন রাখা সহরবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। সহরের যুবতী নারীরাই যে কেবল যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় তাহা নহে পুরুষেরাও অনুরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আধুনিক সময়ে সহরের বৃদ্ধি নিবারণ করা যাইতে পারে না। সহর উঠাইয়া দিয়া প্রাচীন কালের মানবের মত বনে বাস করাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু সহর প্রস্তুত ও বাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থার আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি। দিবাভাগে ব্যবসায় কেন্দ্রে জনতা নিবারণ করা যাইতে পারে না কিন্তু সহর গঠণের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত খেয়াল অনুযায়ী সহর গঠিত হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। লোকের স্বাস্থ্য ও সুখ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া আদর্শ সহর স্থাপনে সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্তরূপ সূর্য্যকিরণ ও বায়ু চলাচলের জন্য প্রত্যেক বাটীতে আবশ্যকমত খোলা জায়গা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সহর কেবল কতকগুলি অট্টালিকার সৃষ্টি মাত্র না হইয়া তাহাতে প্রসস্ত রাস্তা, সুদৃশ্য উদ্যান ও খালি জমি সংযুক্ত আবাস বাটী থাকিবে। প্রতি সহর এরূপে গঠন করিতে হইবে যে প্রত্যেক সহরবাসী নরনারী প্রচুর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে।

ভদ্র সমাজের নরনারীর পরিশ্রম বা ব্যায়ামের প্রতি অনাবশ্যক ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরিশ্রমী লোকই সকলের নিকট সম্মানের পাত্র। উচ্চ আশা লইয়া, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত কঠিন পরিশ্রমী কৃষকের উৎপন্ন খাদ্যেই সমস্ত মনুষ্যজাতি জীবন ধারণ করে। ধনী অলস নরনারীগণকে ইহাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পরিশ্রমে সম্মান আছে। পরিশ্রম পবিত্র ও পুণ্যময়। পরিশ্রমই খাদ্য লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনার স্বরূপ। মনুষ্যকে প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনা ভিন্ন কিছুই লাভ হয় না। প্রাচীন ঋষিরাও জমি কর্ষণ করিতেন। পরিশ্রমের সহিত কৃষিকার্য্য করিলে তবে প্রকৃতি আমাদিগকে খাদ্য দান করেন। প্রত্যেক পেশীই উপযুক্তরূপ ব্যায়াম করিবে, ইহাই দেহের ধর্ম্ম কর্ম্ম। পরিশ্রম ঘৃণা করাই পাপ। পরিশ্রমে ঘৃণা করা আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ঘৃণা করা উভয়ই সমান। শ্রমজীবিকে ঘৃণা করা আর প্রকৃতির প্রধান পূজারীকে ঘৃণা করা একই কথা।

আমাদের মধ্যবিত্ত ও ধনী উভয় শ্রেণীর নারীগণকেই পরিশ্রম করিতে হইবে। ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ধান ভাঙ্গা, যাঁতায় গম-কড়াই পেষা, রন্ধন করিয়া পরিবারবর্গকে ভোজন করান প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম সকল নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাতে শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হইবে, অর্থের সাশ্রয় হইবে এবং পরিবারবর্গও সুখাদ্য আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। পরিশ্রমের সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদও যে আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ভালবাসা ও স্নেহের বশে পরিশ্রম করাতেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। পরিশ্রম পুণ্যকার্য্য, নিজ পরিজনের সুখ সুবিধার জন্য পরিশ্রম করিয়া নারীগণ ভগবানেরই প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। গৃহ কর্ম্মে অবসর কালে পল্লীগ্রামে পুরনারীগণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্য ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিতে পারেন।

গৃহস্থ ঘরে অনেক স্থলেই দারিদ্রতা নারীগণের যক্ষ্মা রোগের কারণ। দারিদ্রতার সমাধান করা সহজে সম্ভবপর নহে। দরিদ্র গৃহস্থের যতদূর সম্ভব সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করা উচিত। অন্ততঃ স্ত্রীলোকগণকে পল্লীর মুক্তবায়ু ও আলোকে রাখিতে পারিলেও অনেকটা মঙ্গল।

প্রফুল্লতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগহীনতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনার অভাব প্রভৃতি সুস্থদেহ ও মনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অলস, বিলাসী ও মানসিক উত্তেজনা পূর্ণ হইয়া থাকিলে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, ফলে সহজেই যক্ষ্মারোগ আক্রমণের সুবিধা ঘটে।

উপন্যাস পাঠ সহরে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। সহরে অনেক অবস্থাপন্ন গৃহের নারীগণ বাজে গল্প, তাস খেলা এবং উপন্যাস পাঠে সময় অতিবাহিত করেন। ইহাতে মনের অবনতি ঘটে এবং শরীরের পেশী সমূহও অপব্যবহারের ফলে শিথিল হইয়া যায়। এইরূপ অলস জীবন যাপন করা যে কেবল সংসার ও সমাজের পক্ষে পাপ তাহা নহে ইহা নিজ দেহ ও মন উভয়ের নাসের উপায়। ভগবানের নিকটও ইহা পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য। দরিদ্র নারীগণ ধনী গৃহের নারীগণের উদাহরণ দেখিয়া ক্রমে তাহাদের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। ফলে সকলেরই অবনতির পথ প্রশস্ত হয়।

আমরা সহরবাসী ধনী, শিক্ষিতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন দরিদ্র ভগ্নীগণের স্বাস্থ্য ও সুখের দিকে দৃষ্টি রাখেন। তাহারা যেন শারীরিক পরিশ্রমকারিনীগণকে সম্মান করেন এবং অলসতা, বিলাসতা, অত্যধিক অলঙ্কার-প্রিয়তা, উপন্যাস প্রিয়তা প্রভৃতি দোষ পরিত্যাগ করেন। সহরের ধনী সুখি নারীগণ শারীরিক পরিশ্রম, ও গৃহকর্ম্মে আনন্দতার প্রদর্শন এবং অলসতা ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিলে তাহাদের উদাহরণে অনেক সুফল হইবে। আমরা এজন্য শিক্ষিত পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্র যোগে নারীগণকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

---

# মাংসাহারের ফল

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সভ্যজগতে খাদ্যের জন্য পশু হত্যায় মানবের যে কতকটা অবনতি ঘটিতেছে তাহা আমরা অতি অল্পই ধারণা করিতে পারি। পশুমাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করাই, মানবের পাশব আচরণের প্রধান কারণ। মানবজাতি স্নেহপরায়ণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহাদের অবনতি ঘটিয়া থাকে।

মানবের অন্তরের পশুভাব সমূহ সকল সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, কেবল জাগ্রত হইলেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই ভাব হইতেই দুষ্কর্ম্ম ও নরহত্যা ইত্যাদির ইচ্ছার উদ্রেক হয়। পৃথিবীতে মাংসাহারী লোকগণকেই অধিক দুষ্কর্ম্মান্বিত হইতে দেখা যায়।

অনবরত পশুমাংস ভক্ষণ করিলে নিকৃষ্ট পশুভাব সমূহের উদয় হইয়া থাকে এবং রক্তও দূষিত হয়। বহুকাল হইতেই মানবজাতি কেবল নিজের ভোজনতৃপ্তির জন্যই পশুহত্যা করিয়া আসিতেছে।

মাংসাহারের ফলে মানব ক্রমশঃ অধিক অশান্ত হইয়া উঠিতেছে! ইহাতে মানবের ধীরতা গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং মনে কুচিন্তার উদ্রেক হইয়া থাকে। মাংসাহারে বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে গ্রহণের ফলে সভ্যসমাজের অবনতি ঘটিতেছে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিবার, নরহত্যা এবং অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম সংঘটনের ইহা একটি বিশেষ কারণ।

মাংসাহারের ফলে কলহভাব, স্নায়বিক উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং শরীরে বিষ সঞ্চিত হওয়ায় অধিক লোকের জীবন নাশ ঘটে। পশুরক্ত দুর্দ্দমনীয় পশুভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। অধিক মাংসাহারী লোকে দীর্ঘজীবী হয় না এবং এরূপ আহারেই অকাল বার্দ্ধক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বধের জন্য গৃহীত পশু করুণ চীৎকারে মানবের নিকট দয়া ভিক্ষা করে। এইরূপ বধের দৃশ্য দেখিতে কাহার না হৃদয় কম্পিত হয়? কাহার না সমস্ত দেহ



কণ্টকিত হইয়া উঠে? তথাপিও সময়ে সময়ে পশুর আক্রমণে মানবের মৃত্যু ঘটিতে দেখিলে লোকে আশ্চর্য্য বোধ করে।

মানবের ন্যায় পশুও রোগযুক্ত থাকে। কিরূপ মাংস গ্রহণ করিতেছে লোকে সকল সময় তাহা জানিতে পারে না। পশুচিকিৎসকেরা পরীক্ষার সময় পশু রুগ্ন কি না তাহা ঠিক করিতে পারেন কিন্তু পরে সে বিষয় জানিতে পারা অসম্ভব। কেবল সুস্থ পশুই গ্রহণ করিলে দেশে যথেষ্ট মাংস পাওয়াও দুরূহ হইবে।

আমরা পশুমাংস গ্রহণ করি বটে কিন্তু সেই সকল পশুরা শাকসব্জির উপরই জীবন ধারণ করে। মানবের পক্ষেও শাকসব্জী ও ফল মূলের উপর জীবন ধারণ করাই ভাল। কুকুর বিড়াল মাংসাহারের উপর জীবন ধারণ করে, তাহাদের স্বভাব উগ্র হইয়া থাকে। মানবের পক্ষেও এইরূপ কুফল ফলে।

মাংসাহারে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে এবং অনেক সময় 'এপেণ্ডিসাইটিস্' রোগের উৎপত্তি হয়। স্বাস্থ্যের জন্য লোকের মাংসাহার পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। মাংসাহারের অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে ইহার কুফলের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। রন্ধন করা মাংসের তীব্র গন্ধই লোককে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করার প্রধান কারণ।

রক্তের গুনানুসারে বুদ্ধি শক্তির উৎকর্ষ হইয়া থাকে। অনবরত মাংসাহার করিলে রক্ত ও বুদ্ধি শক্তি গঠনের ব্যতিক্রম ঘটে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভীষণ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় রাজনীতিজ্ঞগণ একমত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে আর যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইবে না কারণ সভ্যতা ও শিক্ষা লোককে উন্নত করিয়াছে, লোকের পশুভাব সমূহ দূরীভূত হইয়াছে।

কিন্তু এক্ষণে আমরা জগদ্ব্যাপি ভীষণ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মানব পশুহত্যার সমর্থন করিতেছে বলিয়া এই অশান্তি। পশুহত্যা নিবারিত হইলে যুদ্ধের একটি কারণও নিবারিত হইবে। এই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভের শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে যদি মাংসাহার নিবারিত হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধের সংঘটনও অসম্ভব হইত। যথেচ্ছা পশুহননকে ইউরোপীয় যুদ্ধের আংশিক কারণ বলা যাইতে পারে।

পশুহত্যার সমর্থন দ্বারা কিরূপে আমরা যুদ্ধ নিবারণ করিয়া শান্তির আশা করিতে পারি? অতিরিক্ত মাংসপ্রিয় সৈন্যগণকে মাংসাহার দিয়া প্রতিহিংসা ও অত্যাচার পরায়ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের এই স্বভাব পূর্ব্বে অনেকটা নিদ্রিত ছিল এক্ষণে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সৈন্যগনকে মাংসাহার দিয়া তাহাদের রক্ত পিপাসা বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। মাংসাহারের ফলে কিরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইউরোপের রণক্ষেত্রেস্থিত সৈন্যগণকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। গভর্ণমেণ্ট সৈন্যগণকে রক্তপিপাসু ও রণোন্মত্ত রাখার জন্য যথেষ্ট মাংস সরবরাহ করিতেছেন। যাহারা নিজেদের রসনার তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা ও মাংসাহার করে, তাহাদের নরহত্যা করিতে কোনই কষ্ট অনুভব হয় না। মাংসাহারীর পাশবভাব পশুগণের অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে।

মাংসাহারের ফলে এবং কালচক্রে যুদ্ধেরত জাতিগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মানীতে যুদ্ধে নির্লিপ্ত জনগণ কেবল শান্তির জন্য চীৎকার করিতেছে। সাধারণকে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া শস্য ও শাক-সব্জির উপর জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। ইহা পরিত্যাগ করায় তাহাদের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অনবরত মাংস সরবরাহ দ্বারা জার্ম্মাণ সৈন্যগণকে দুর্দ্ধর্ষ ও জয়োৎফুল্ল করিয়া রাখা হইতেছে। নিরামিষাহারী জনসাধারণ কেবল শান্তি চাহিতেছে।

ইংলণ্ড ও যুদ্ধেরত অন্যান্য জাতিগণেরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সৈন্যগণ অপেক্ষা সাধারণ জনগণ যেন যুদ্ধের ফলে অধিকতর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জার্ম্মনী ও ইংলণ্ডই পৃথিবীর মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাংসাহারী দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। এই দুই দেশ মাংসাহার অধিক সমর্থন করিত। তাহার ফলে আজ সমস্ত ইউরোপ বিধ্বস্ত হইতেছে।

মাংসাহার পাশব উত্তেজনা বৃদ্ধি করে কিন্তু নিরামিষ আহারে প্রাকৃতিক যথানিয়মে শরীর গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অস্বাভাবিক খাদ্য ভোজনের ফলেই অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তাহা হইলে পরে আর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না।

ইউরোপ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করায় কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছে। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। দূষিত খাদ্য পরিত্যাগ করিলেই লোকের মন ও স্বাস্থ্য বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারে। এইরূপ হইলে মানবে মানবে এবং জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকে না বরং ইহার পরিবর্ত্তে ভালবাসা এবং সাহানুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

## প্রাপ্তি স্বীকার

ভৈষজ্যমনি মালিকা।—(অর্থাৎ যাবতীয় পাচন মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার সরল পদ্য অনুবাদ।) প্রথম খণ্ড—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৮ নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন, বাণী প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা।

মূল শ্লোক এবং তন্নিম্নে পদ্য অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আরও দুইটী খণ্ডে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইবে। গ্রন্থকার অনুবাদ সহজ ও সুললিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ছাপা ও কাগজ ভাল।

বালিকার পদ্য শিক্ষা।—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। পুস্তকখানি মহাকালী পাঠশালায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। মূল্য ৵০ আনা।

কেরাণী বাবু।—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত—সামাজিক প্রহসন। মূল্য ।০ আনা।

পুস্তকগুলি গ্রন্থকারের নিকট, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।


# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | ভাদ্র ১৩২৫ সাল | ৫ম সংখ্যা


## আলোচনা

**মিউনিসিপালিটির সৎকার্য্য**—ভারতের সকল স্থানেই শিশু মৃত্যুর হার অধিক। ইংলণ্ডের তুলনায় সংখ্যা স্থান বিশেষে দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ। আবার কলিকাতা সহরে শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্য কেহ কেহ কলিকাতাকে শিশু-হন্তা নগর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সূতিকাগার ও সাবধানের অভাবে জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই শিশুর মৃত্যু ঘটে। অনেক স্থলে এই কারণে সূতিকেও ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে—"কলিকাতা মিউনিসিপালিটি এক সূতিকাগার নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন, এখানে ১২ জন আসন্নপ্রসবা অবস্থান করিতে পারিবেন। ৩ জন শুশ্রূষাকারিণী ও একজন লেডি ডাক্তার থাকিবেন। লেডি ডাক্তারকে মাসে ৩ শত টাকা বেতন দিতে হইবে। শুশ্রূষাকারিণী সূতির জন্য মাসে ২৭২৷৷, ঔষধের জন্য ১০০ ও আসবাবাদির জন্য বৎসরে ২০০০ টাকা ব্যয় হইবে।"

কলিকাতার জন সংখ্যার তুলনায় ইহা অপেক্ষা বৃহৎ স্থানের আবশ্যক হইলেও উপরিলিখিত প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে অল্প সুফল লাভ হইবে না। আশা করা যায় যে এই সদনুষ্ঠানের ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়া ভবিষ্যতে কলিকাতার প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস করিয়া দিবে।

আমরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য অন্যান্য মিউনিসিপালিটিসমূহকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

**শিশু প্রদর্শনী**—এই মাসের প্রথমে হাওড়ায় একটী শিশু প্রদর্শনী হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ প্রদর্শনীর প্রচলন থাকিলেও এদেশে ইহা একেবারে নূতন। "সঞ্জীবনী" পত্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ইংলণ্ডে শিশু প্রদর্শনী হয়; যে মাতা শিশুকে হৃষ্ট-পুষ্ট করেন, তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদ্বারা এই সামাজিক অবস্থার পরিচয় হয় যে ইংলণ্ডের গরীব দুঃখীরা সন্তানের যত্ন করিতে সকল সময়ে সক্ষম হয় না। পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মাতার কর্ত্তব্য শিখাইতে হয়।

ভারতের অতি দরিদ্রেরাও সন্তানকে সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু কল কারখানা স্থাপনের পর হাজার হাজার মা সন্তানকে ঘরে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে গমন

করে, ইহাতে সন্তানের লালন-পালনে ব্যাঘাত হইতেছে। তাই হাওড়ার কতিপয় জনহিতৈষী শিশুপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রায় ১০০০ শিশু লইয়া তাহাদের মাতারা আসিয়াছিলেন। পঞ্চানন তলা রোড নিবাসী এক কলের মজুরের সন্তানকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহার নধর কান্তি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সকলের প্রাণেই আনন্দ হইয়াছিল। নগদ টাকা ও খেলনা ২০ জনকে দেওয়া হইয়াছিল। ৬০০ শিশুকে কিছু না কিছু তাহাদের হাতে দিয়া আনন্দিত করা হইয়াছিল। মিষ্টান্ন হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং সকলেই প্রসন্ন মনে গৃহে গিয়াছিল।

অবস্থানুসারেই ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল স্থানে কল কারখানা আছে, সে সমস্ত স্থানেই শিশু প্রদর্শনীর প্রয়োজন হইয়াছে। চা-বাগানেও ইহার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে।

**তীর্থস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি**—সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, "বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের তীর্থস্থানগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য ভারত গভর্মেণ্ট একলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।" এ সংবাদে সর্ব্বসাধারণে আনন্দিত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের অধিকাংশ তীর্থস্থানেরই স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। তীর্থস্থানে উপযুক্ত পানীয় জল, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। সময়ে সময়ে সংক্রামক মহামারী আরম্ভ হইয়া তীর্থযাত্রীর প্রাণনাশও ঘটে। তীর্থ স্থানের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে যাত্রীগণের কষ্টের লাঘব ও মৃত্যুর হারও বিশেষ কম হইবে। উপরোক্ত প্রদেশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে যাহাতে ভারতের সকল প্রদেশের তীর্থস্থানগুলিরই স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য আমরা ভারত-গভর্মেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

**কো-অপারেটিভ ম্যালেরিয়া নিবারনী সোসাইটী**—"ভাণ্ডার" লিখিয়াছেন—২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটি ও সুখচর গ্রামে সম্প্রতি দুইটী "কো-অপারেটিভ ম্যালেরিয়া-নিবারনী সোসাইটি" খোলা হইয়াছে।

সোসাইটির কাজ—মেম্বরদের আঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর ডোবা ইত্যাদি বোজান, জঙ্গল কাটা, যাহাতে রৌদ্র আসিতে পারে। সকল মেম্বরদের নিকট হইতে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা লওয়া হইতেছে। ১০০ শত জন মেম্বর হইলে ১০০৲ টাকা মাসে সোসাটির তহবিলে জমিবে। তাহার ৭০৲ টাকা স্থানীয় মেডিকেল কলেজের পাশকরা একজন ডাক্তারকে দেওয়া হইবে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেম্বরগণকে বিনা ভিজিটে দেখিতে স্বীকার পাইয়াছেন এবং ঔষধ বিনা দামে দিবেন। বাকী ৩০৲ টাকা হইতে মেম্বরদের বাসার অঙ্গিনার ভিতর অস্বাস্থ্যকর বনজঙ্গল দূর করা ও ডোবা বোজান হয়। সকলে এক হইয়া মাসে মাসে সভা করিয়া উপায় ঠিক করিতেছেন। কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। ফলাফল এক বৎসর পরে জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ সভা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে হওয়া উচিত, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার উপায় হইবে। যদি এই সম্বন্ধে কেহ জানিতে চান, এই সোসাইটিকে লিখিলে, তাঁহারা সাদরে সব জানাইবেন ও নূতন সভা স্থাপনের জন্য সহায়তা করিবেন।

---



# জার্ম্মাণীতে ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা

( "ভারতবর্ষে" ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল্, এম, এস লিখিত "বাঙ্গালীর শিক্ষা" প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশ )

"বর্ত্তমান কালে, পৃথিবীতে যত জাতি শ্রেষ্ঠত্ব ...ভ করিয়াছে, জার্ম্মাণ জাতি তাহাদের মধ্যে ...তম। এই জার্ম্মানী, আজ যে অতি-কুরুক্ষেত্র ...রণে লিপ্ত, তাহার জন্য, নিঃশব্দে বিগত ৪০ বৎসর ...ং অপর যে কোনও উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকুক, ...তঃ মানুষ-গড়া কাজটা সে সকলেরই সমক্ষে ...রিয়াছে। বর্ত্তমান কালে, যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ...মানুষ নিজে। সেই মানুষকে মনের মত করিয়া ...ড়িয়া লইতে হয়। জার্ম্মাণী দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিল ..., যদি বিশ্ববিজয়ে লিপ্ত হইতে হয়, তবে সমস্ত দেশটি ...ত মানুষে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। এই বুদ্ধির ...রণায় জার্ম্মাণী বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, ...ব হইতে যত্ন না করিলে যৌবনে বা বেশী বয়সে ...র ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাহাকেও ঠিক মত মানুষ গড়া ...না। এই সকল আন্তরিক বিশ্বাসের বশে, ১৮৯৮ ...ব্দে জার্ম্মাণ রাজ্যে দুইটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, ...র অবসম্ভাবী ফল—মানুষ তৈয়ারি করা। প্রথমটি ...র প্রত্যেক স্কুল-বালকের রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ...; দ্বিতীয়টি, ছাত্রদিগকে ভাল করিয়া খাইতে দেওয়া ...দুইটি জিনিষই আবশ্যক বলিয়া, এতদ্‌সম্বন্ধে দু'চারিটি ...এইখানেই বিশদ করিয়া বলিব।

...আমাদের দেশে, পিতামাতা মনে মনে বিদ্যালয় স্থির ...রিয়া, নিজ-নিজ বালকগণকে সেই বিদ্যালয়ে লইয়া ...য়া প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। প্রবেশ-কালে, বড় জোর ...টা মৌখিক এবং লোক-দেখান বিদ্যার পরীক্ষা করা মাত্র,—প্রায়শঃই অভিভাবক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতেই ...টিকে গ্রহণ করা হয়। তাহার পর, যথাক্রমে সেই ...টি পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষার স্রোতে গা ভাসাইয়া ...দিয়া "কৃতবিদ্য" হইতে থাকে। এক বার বায়স্কোপে ...টি চিত্র দেখিয়াছিলাম; সেটি এই:—একটি বিরাট কলের পার্শ্বে তাহার একমাত্র কর্ণধার দাঁড়াইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে একটা চাকা ঘুরাইতেছেন; সেই কলটার পিছন দিকে জীবন্ত একটা বিড়াল পুরিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং পর মুহূর্ত্তেই সেই কলটার সম্মুখ দিক্ হইতে সেই বিড়ালটা সসেজ ( sausage ) নামক ইংরেজদিগের খাদ্য আকারে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে। আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিটি ঠিক উহারই অনুরূপ। আমাদের দেশে, সকলেই ধরিয়া লন যে, মস্তিষ্ক মানুষের সর্ব্বস্ব এবং সেই মস্তিষ্কের ঔৎকর্ষ্য-সাধন করাই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া। জার্ম্মাণ-বাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে জগৎকে দেখাইয়া দেন যে, মস্তিষ্ক ভাল রাখিতে হইলে, দেহকে ভাল রাখিতে হয়; এবং দেহকে ভাল রাখিতে হইলে, রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান প্রয়োজন। এতদুদ্দেশে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে:—ছাত্রগণ যখন প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হইবে, তখনই তাহাদিগের স্বাস্থ্য রীতিমত পরীক্ষিত হইবে! ঐ পরীক্ষা-কালে যে ছাত্রের কোনও অঙ্গ-বিশেষের বৈকল্য লক্ষিত হইবে, তদনুযায়ীক-বিদ্যালয়ে তাহাকে লওয়া হইবে; যেমন, যে ছাত্রের দৃষ্টি অতীব ক্ষীণ, তাহাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে না দিয়া, কোনও স্কুল শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এইরূপ করার ফলে, দেশে একাধারে শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় এবং যে-যে ছাত্রের দেহের যে-যে অংশ দুষ্ট বা দুর্ব্বল, সেই-সেই অংশকে আরো দুষ্ট বা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া হয় না। তাহার পর, যে ছাত্রটি সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেটির ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও হইয়া থাকে। একখানি মোটা ও সুপ্রশস্ত কার্ডে ঐ সকল পরীক্ষার ফল লিখিত হয়—এবং ছাত্রটি বিদ্যালয় হইতে বিদ্যালয়ান্তরে গেলে,

স্কুল হইতে কলেজে গেলে, এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে গেলে, ঐ কার্ডখানি ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করে। এইরূপ একখানি কার্ডে একই ছাত্রের পাঠারম্ভের সময় হইতে অধ্যয়ন সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষগুণের উল্লেখ থাকায় ফলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সেই ছাত্রটির দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোনও কায না করা হয়, তদ্বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখিতে পারেন; কোনও ছাত্রের শ্রবণ শক্তি কম হইতেছে বুঝা গেলে, অমনি তাহাকে সকল ছাত্রের সম্মুখে, শিক্ষকের নিকটে বসিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ক্ষীণদৃষ্টি ছাত্রগণকেও সকলের সম্মুখে বসিবার অনুমতি দেওয়া হয়। যে ছাত্রটির বুকের দোষ দাঁড়াইয়াছে বুঝা যায়, তাহাকে খোলা মাঠে গাছের তলায় বসাইয়া পাঠ দেওয়া হয়; অথবা, তাহাকে পাঠ হইতে বিরত করাইয়া, হাওয়া খাইতে পল্লীগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শুধু এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্কুলের ব্যয়ে মাসে বা দুই মাস অন্তর একবার সমুদ্রের ধারে, পর্ব্বতের উপরে বা পল্লীগ্রামের মুক্ত প্রান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, যে ছেলের শরীরে বিশেষ কোনও রোগ নাই, অথচ সে দুর্ব্বল, এবং যাহার পক্ষে নিয়তই মুক্ত বায়ু সেবন উপকারী—এমন ছাত্রকে ট্রামওয়ে বা রেলওয়ে বা ষ্টীমারে "ফ্রি পাশ" দেওয়া হয়—যাহাতে বিনাব্যয়ে সে প্রত্যহই কিছু কিছু হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে পারে! শুধু বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগের চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থই স্বতন্ত্র চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ-নালীর রোগ-চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত আছে; বিদ্যালয় হইতে টিকিট দেওয়া হয়,—যাহাতে ছাত্রেরা তথায় বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসিত হইতে পারে। যাহার পক্ষে হাঁসপাতালে থাকা প্রয়োজন, বিদ্যালয় হইতে তাহাকে একখানি টিকিট দেওয়ার ফলে, সে ছাত্রটি তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হয়। যে-যে ছাত্র ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য কয়েক মাস বা বৎসর আপততঃ পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির ও নৈতিক উন্নতির সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মাঝে-মাঝে রীতিমত তদন্ত করা হয়। এই তদন্ত গোয়েন্দার মত করা হয় না, এই তদন্ত পরমাত্মীয়ের মতই করা হয়। যে ছাত্রের শারীরিক যে দোষটুকু ঘটে, তৎক্ষণাৎ তাহার অভিভাবককে তাহা জ্ঞাপন করা হয়; এবং যদি সেই দোষের অপনোদন করা অভিভাবকের পক্ষে অর্থে বা সামর্থ্যে সম্ভবপর হয়, তবে অভিভাবকে ঐ দোষাপনোদনের জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়; অভিভাবক অবহেলা করিলে, আইনানুসারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন। ফল কথা, এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-ব্যপদেশে, ছাত্রের সর্ব্বাঙ্গীন দৈহিক উন্নতিকল্পে সমাজ, শিক্ষাবিভাগ, অভিভাবক ও নরপতি—সককেই সজাগ ও সচেষ্ট থাকিতে হয়।

কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই সুব করা হয় না; কথামালার ভাষায়, "ভাই হে, শুধু মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিলেই সুশ্রী হইব না, দুইবেলা পেট ভরিয়া খাওয়াও চাই।" ছাত্রদিগের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র উভয়বিধ ছাত্র আছে। ধনীর সন্তানেরা ভাল খাইতে পায়, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানেরা আদৌ ভাল খাইতে পায় না। বিদ্যালয়ে দুপুরবেলা ধনীর সন্তানেরা দুধ-সর খাইবে, আর দরিদ্রের সন্তানেরা তাহাদের মুখের দিকে ছল-ছল নেত্রে তাকাইয়া থাকিবে,—এই করুণার প্রেরণায় য়ুরোপে ছাত্রদিগের জন্য বাধ্যতামূলক টিফিন ভোজনের আয়োজন করা হয় নাই; সে দেশে আইন আছে যে, প্রত্যেক ছাত্রকে টিফিন ভোজন করিতেই হইবে; যেহেতু, প্রথমতঃ ছাত্রদিগের দেহ সদা বর্দ্ধমান এবং দ্বিতীয়তঃ, পাঠকালে শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে। তাই আজ য়ুরোপের প্রায় সকল সভ্যদেশেই এই আইন হইয়াছে যে ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে, প্রত্যেক ছাত্রকেই বিদ্যালয় হইতে দুপুরবেলা বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করিতেই হইবে;—সে ব্যয় আংশিকভাবে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দিবেন, আংশিকভাবে মিউনিসিপালিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দিবেন। এই প্রবর্ত্তনার মূল জার্ম্মাণরাজ্য।"



# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## একবিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় স্তবক।

### স্নায়ু-তন্ত্র।

মেরুদণ্ডনাড়ী—প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া।

কেহ অন্যের চরণ পদদলিত করিলে সে কিরূপে পা সরাইয়া লয় তাহা আমরা দ্বিতীয় স্তবকে বলিয়াছি। পাদুকা-মণ্ডিত-চরণের নিষ্পেশন জাত বেদনার অনুভূতি বার্ত্তাবহ-স্নায়ু-পুঞ্জের দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হওয়াতেও ঐ ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। ফলতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভূতি এবং বাহিরের বস্তু বা ব্যাপারের অনুভূতিগুলি বহিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়াগুলিতে লইয়া যাওয়াই ইহাদিগের কাজ। কিন্তু এই কাজটা সোজাসুজি হয় না, উহা একেবারেই মস্তিষ্কে পৌছায় না। প্রথমে অনুভূতিটা স্নায়ু সংযোগে মেরুদণ্ডনাড়ীতে নীত হয়, তাহার পর মেরুদণ্ড নাড়ী বাহিয়া উপরে উঠে, তাহার পর উহা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশেষে মহা-মস্তিষ্কে গিয়া থাকে। বার্ত্তাবহ স্নায়ুর প্রেরণায় অনুভূতি মহামস্তিষ্কে পৌছিলে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদনা বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু বেদনার অনুভূতি এত দ্রুত হইয়া থাকে যে, অনুভূতিটা যে স্নায়বিক শক্তির প্রেরণায় জটিল পথ ঘুরিয়া মস্তিষ্কে পৌছায় তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্নায়বীক প্রেরণ—অনুভূতি পরিচালনায় এবং আজ্ঞা প্রচারে কিরূপ দ্রুতগতিতে কাজ করে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলে এবিষয়ে মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। শরীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে উষ্ণশোণিত সম্পন্ন জীবদেহ স্নায়বিক প্রেরণ (Nerve impulse) প্রতি সেকেণ্ডে দুইশত ফিট বেগে চলিয়া যায়। অবশ্য স্নায়বিক প্রেরণার এই গতিবেগ, বিদ্যুৎ ও আলোকের গতির ক্ষিপ্রতার তুলনায় মন্থর, কারণ তড়িৎ ও আলোক আকাশে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। তথাপি স্নায়বিক প্রেরণা যেরূপ দ্রুতবেগে স্নায়ুতন্ত্র বাহিয়া গমনাগমন করে, সেই বেগ দেহের কার্য্য পরিচালনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

বেদনা বা যন্ত্রণার অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছিলেই মস্তিষ্কের নিয়ামক শক্তি তৎক্ষণাৎ তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন পেশী সমূহের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেয়, তাহার ফলে আহত ব্যক্তির চরণ সচল হইয়া সরিয়া যায় এবং লোকে "উহু" বলিয়া এমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে যে, যে অতর্কিত ভাবে তাহার চরণ পাদুকা-মর্দ্দিত করিয়াছে সেই চমকিয়া লাফাইয়া উঠে। এখানে পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, মস্তিষ্কের হুকুমগুলা কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পেশী সমূহে নীত হয়? বলা বাহুল্য, আজ্ঞাবহ স্নায়ুগুলা এক্ষেত্রে দূতের কাজ করে। কিন্তু বার্ত্তাবহ স্নায়ুর প্রেরণা পেশীপুঞ্জে পৌছিবার পূর্ব্বে উহা মেরুদণ্ডনাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেরুদণ্ডনাড়ী বাহিয়া নীচে নামিয়া যায়, তাহার প্রেরণাটি পেশী সমূহে পৌছিবামাত্র পেশীগুলি আকুঞ্চিত হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে মেরুদণ্ডনাড়ীটি (Spinal Cord) স্নায়ুপুঞ্জের গুচ্ছমাত্র। এই স্নায়ুপুঞ্জের মধ্যে কতিপয় স্নায়ুকোষ আছে। Oblong marrowর কাছাকাছি মস্তিষ্কে অন্তিক প্রদেশ হইতে ইহার আরম্ভ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি এবং ওজন তিন আউন্স। অবশ্য আমরা পূর্ণবয়স্ক নরনারীর মেরুদণ্ডনাড়ীর কথাই বলিলাম।

মস্তিষ্কের ন্যায় মেরুদণ্ডনাড়ীও ত্রিবিধ প্রচ্ছদ দ্বারা আবৃত এবং উহা কশেরুকা-প্রণালী ( Canal of vertibral column ) মধ্যে নিহিত। প্রত্যেক কশেরুকার মধ্যে একটি করিয়া ছিদ্র আছে, এ কথা বোধ করি,

পাঠকের স্মরণ আছে। সুতরাং কশেরুকাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইলে এই ছিদ্র পরম্পরার সন্নিবেশে মেরুদণ্ড-স্তম্ভ মধ্যে

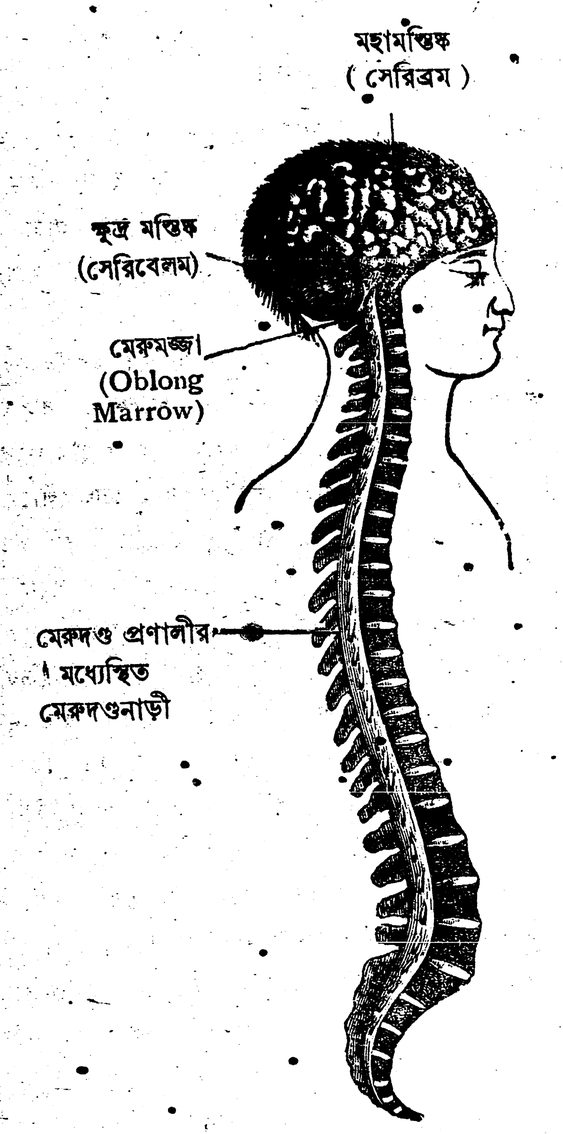


চিত্র ৫৯ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড নাড়ী।

যে একটি প্রণালী উৎপন্ন হয়, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। কশেরুকা-পরম্পরার বিন্যাস ফলে মেরুদণ্ড মধ্যে একটি প্রণালী উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ প্রণালী মধ্যে মেরুদণ্ডনাড়ী বিন্যস্ত।

৫৯ সংখ্যক চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মেরুদণ্ডনাড়ীর একপার্শ্ব হইতে ৩১টি স্নায়ু নির্গত হইয়াছে। মোটের উপর মেরুদণ্ডস্নায়ুর সংখ্যা ৬২, তন্মধ্যে ৩১টি দক্ষিণ পার্শ্বে এবং ৩১টি বামপার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক কশেরুকার সন্ধি স্থলে স্নায়ু যুগল সন্নিবিষ্ট।

প্রত্যেক মেরুদণ্ড-স্নায়ু এই দুই প্রকার মূল দ্বারা মেরুদণ্ডনাড়ীর সহিত সংযুক্ত।

অগ্রমূল ( Anterior root )
পশ্চাৎ মূল ( Posterior root )

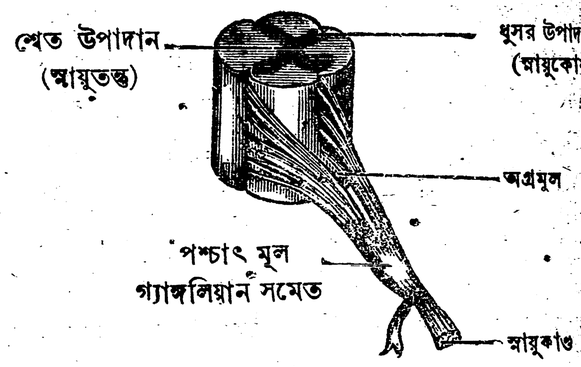


চিত্র ৬০ — মেরুদণ্ডনাড়ীর একটী খণ্ড।

উপরে প্রদত্ত চিত্রে মেরুদণ্ড নাড়ীর একটি খণ্ড প্রদর্শিত হইয়াছে। মেরুদণ্ডনাড়ী দুই প্রকারের মূলদ্বারা কিরূপে মেরুদণ্ডনাড়ীতে সংযুক্ত থাকে, ইহাতে তাহাও দেখান হইয়াছে। এই মূলটি মেরুদণ্ডনাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটু অগ্রসর হইবার পরেই উভয়ে মিলিয়া একটি "স্নায়ু কাণ্ড" ( Nerve trunk ) সৃষ্টি করিয়াছে।

মেরুদণ্ডস্নায়ুর দুই প্রকার মূলের উপাদান দুই প্রকার। অগ্র মূলের উপাদান বার্ত্তাবহ-স্নায়ু-তন্তুমালা, আর পশ্চাৎ মূলের উপাদান আজ্ঞাবহ স্নায়ু-তন্তুমালা। কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি—অগ্রমূল মস্তিষ্কের আদেশ Peripheryতে বাহিয়া লইয়া যায়, আর পশ্চাৎমূল Peripheryর সংবাদ মস্তিষ্ককে প্রদান করে।



স্নায়ুমূলের এই ক্রিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ অন্যভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে অগ্রমূল ক্রিয়া-সম্পাদক তন্তু ( Motor fibers ) সমূহের সমবায়ে গঠিত এবং পশ্চাৎমূল অনুভবাত্মক তন্তু ( Sensory fibers ) দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু এই উভয় বর্ণনার অর্থ এক।

এইবার আমরা মেরুদণ্ড স্নায়ু ও উহার মূল দুইটির ক্রিয়া প্রণালী বিবৃত করিব। মনে করুন, একটি ক্ষুদ্র শিশু অতর্কিত ভাবে একটি অত্যুষ্ণজলপূর্ণ পাত্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিল। উত্তপ্ত পাত্রের সুপ্রখর উত্তাপে তাহার হাতে যে কেবল ফোস্কা পড়িবে, তাহা নহে, ঐ উত্তাপের দ্বারা তাহার হাতের বার্ত্তাবহ স্নায়ু সকলের প্রান্তগুলি এরূপ উত্তেজিত করিবে যে স্নায়ুর যোগে ঐ সংবাদ তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে প্রেরিত হইবে। যে স্নায়ুপুঞ্জের সমবায়ে পশ্চাৎমূলটি সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলি মেরুদণ্ড নাড়ীর কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত পশ্চাৎমূল মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ কোষ-পুঞ্জ হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই প্রকারের কোষ-পুঞ্জকে ( Ganglion ) "গ্যাঙ্গলীয়ন" বলে। এই পশ্চাৎমূলের গ্যাঙ্গলীয়ন কোষপুঞ্জ বিপদের সংবাদটি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে চালনা করে। মস্তিষ্কের কোষপুঞ্জ যে আদেশ প্রদান করে তাহা স্নায়বিক শক্তির প্রেরণায় মেরুদণ্ডনাড়ী-স্নায়ুর অগ্রমূল বহিয়া নামিয়া আসে, তখন শিশুটি চীৎকার ও ছুটাছুটি করিতে থাকে। অঙ্গ-সঞ্চালনের আদেশটি অগ্রমূল বহিয়া আসে বলিয়া তাহার উপাদান আদেশবহ স্নায়ুতন্তু-সঞ্জাত বলা হয়। আর পশ্চাৎমূল শীত, আতপ, যন্ত্রণা, স্পর্শ প্রভৃতির অনুভূতি বহন করে বলিয়া উহার উপাদান অনুভবাত্মক বা অনুভূতিবহ স্নায়ুতন্তু সঞ্জাত বলা হয়।

প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া। ( Reflex action )।

'প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া' এই কথাটি শুনিলেই স্বভাবতঃ লোকের মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, এ আবার কি প্রকার ক্রিয়া? আমরা বালকের হস্ত উত্তপ্ত পাত্রের সংস্পর্শে লইয়া যাওয়ার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহার দ্বারা পাঠক বুঝিতে ও মস্তিষ্ক হইতে দেহের সর্ব্বত্র সংবাদের আদান প্রদান বিষয়ে মেরুদণ্ড নাড়ীর উপযোগিতা ও ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই "প্রতিক্ষেপ" ক্রিয়া এরূপ যে, মস্তিষ্কের নিয়ামক শক্তির উপর এই ক্রিয়া নির্ভর করে না। এক কথায় মানবের চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তির উদ্দীপন ব্যতিরেকে শরীরে স্বতঃই যে সব ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহার নাম "প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া"—Reflex action.

এই প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া কিরূপে চলে তাহা জানিবার জন্য পাঠকের মনে স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা এবারে উহার পরিচয় পাঠককে দিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্নায়ু কোষ বা স্নায়ুগুলি স্নায়ুতন্ত্রের শক্তির অধিষ্ঠান-স্থান সমূহরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল স্থানে এই শ্রেণীর স্নায়ুকোষ সমূহের সমবায় ঘটিয়াছে সেই স্থান সমূহ স্নায়বিক শক্তির কেন্দ্র-মালা। মানবের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মহামস্তিষ্কের ( Cerebrum ) যে কোষ-সমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, এই স্নায়বিকশক্তি কেন্দ্রগুলি তাহাদিগের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। যখন বার্ত্তা প্রেরণা শক্তি, ( Afferent impulse ) কোন স্বাধীন স্নায়বিকশক্তি-কেন্দ্রে পৌঁছে, তখন আজ্ঞা-প্রেরণা শক্তির প্রবাহ পথ দ্বারা ঐ বার্ত্তা প্রেরণাশক্তি দর্পণে প্রতিবিম্বিত আলোক রশ্মির ন্যায় Peripheryতে প্রতিক্ষিপ্ত বা প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

মনে কর, কেহ একটি লোষ্ট্র হাতে তুলিয়া লইয়া তোমার অঙ্গে ঐটী নিক্ষেপ করিবে এইরূপ ভঙ্গী করিল, অমনই তোমার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইল। কেন এমন হইল? তোমার চক্ষু দুইটি তোমার মস্তিষ্কের কয়েকটি স্নায়ুকেন্দ্রে ঐ সংবাদটি পাঠাইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বার্ত্তা-প্রেরণা-শক্তি তোমার অক্ষি পরিবেষ্ট পেশীপুঞ্জে প্রতিফলিত হইল, আর তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বে, চোখ দুইটি মুদ্রিত হইল। এখানে "অনিচ্ছাসত্ত্বে" এই শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে নয়ন যুগল হইতে যে বার্ত্তাপ্রেরণা শক্তি, স্বাধীন স্নায়বিক শক্তি গিয়াছে, তাহা জটিল পথ অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া মস্তিষ্কের

অনুভূতি কেন্দ্রে যায় নাই, একেবারেই মস্তিষ্কের স্বাধীন স্নায়বিক শক্তি কেন্দ্র কয়েকটিতে গিয়াছে এবং ঐ কেন্দ্র মস্তিষ্কের কোন পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়াই আবশ্যক আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই ক্রিয়াটি (Simple reflex) "সামান্য বা সরল প্রতিক্ষেপ" ক্রিয়া কারণ এই কার্য্যে একাধিক পেশীর পরিচালনা হয় নাই।

কিন্তু যে ছেলেটির অত্যন্ত উত্তপ্ত পাত্রের সংস্পর্শে হাত পুড়াইয়া যন্ত্রণায় চীৎকার ও লাফালাফি করিয়া বেড়াইবার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, তাঁহার আচরণও প্রতিক্ষেপ ক্রিয়াজাত, কিন্তু আচরণ অভিপ্রায়াত্মকা (Purposeful act). সে জননীর সাহায্য লাভের আশায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছে এবং উত্তপ্ত পাত্রের সন্নিধান হইতে দূরে যাইবার জন্য যন্ত্রণার আতিশয্যে লাফালাফি করিয়া দৌড়াইয়াছে। সুতরাং ছেলেটির সব কাজের মধ্যে একটি অভিসন্ধি নিহিত ছিল।

মনে কর, কেহ তোমাকে সুড়সুড়ি দিল; যদি সুড়সুড়ি দিলে সুড়সুড়ি লাগা তোমার ধাতু হয়, তাহা হইলে সুড়সুড়িতে লাফাইয়া উঠিবে, স্কন্ধদ্বয় আকুঞ্চিত করিবে, এক কথায় তোমার শরীরের সমস্ত পেশীরই ক্রিয়া হইবে। সুড়সুড়িটা শরীরের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের চর্ম্মে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রভাব এত বেশী যে শরীরের সমস্ত পেশী আকুঞ্চিত হইতেছে। এই ক্রিয়াকে Convulsive reflex অর্থাৎ "আক্ষেপাত্মক প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া" বলে। শরীরে সেঁকো বিষ-সংক্রমণে এবং জলাতঙ্ক রোগের আক্রমণে এই প্রকার আক্ষেপাত্মক প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া খুব সাধারণ। সামান্য শব্দে, বাতাসের মর্ম্মর সর সর শব্দে সেঁকো বিষদুষ্ট রোগীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুড়শুড়ি যাহাদিগের সহে না, তাহারা একটু শুড়শুড়িতে লাফাইয়া উঠে এবং অঙ্গ-সঙ্কোচ করিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত দিবার একটা উদ্দেশ্য আছে। এমন লোক ঢের আছে, যাহাদিগকে খুব শুড়শুড়ি দিলেও টলে না, কারণ তাহার পেশীপুঞ্জ স্বাভাবিক প্রতিক্ষেপাত্মক উত্তেজনা দমন করিতে পারে; তাহাদের এই সংযমন শক্তি মস্তিষ্ক প্রেরিত। এই মস্তিষ্ক প্রসূত সংযমন শক্তি মেরুদণ্ড নাড়ীর সাধারণ ক্রিয়া সমূহ সংযত করিয়া থাকে। দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে, উহার অভ্যন্তরস্থিত মেরুদণ্ড-নাড়ী আহত হয়, তখন মেরুদণ্ড নাড়ীর ক্রিয়াগুলিকে সংযত শৃঙ্খলানুগামী করিবার জন্য মস্তিষ্ক হইতে যে প্রেরণাশক্তি (Impulses) নামিয়া আইসে, তাহা আর কার্য্যকরী হয় না, সুতরাং মেরুদণ্ড নাড়ী সংযমনী প্রেরণা শক্তির প্রভাব মুক্ত হওয়াতে উহার ক্রিয়াগুলি অত্যধিক প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার আকারে প্রকাশ পায়। কোন সুস্থ লোকের পদতলে শুড়শুড়ি দিলে, তাঁহার আঙ্গুলী গুলিই সম্ভবতঃ ঈষৎ বাঁকিয়া যাইবে। কিন্তু কেহ উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া, ভগ্ন-মেরুদণ্ড হইলে, যদি তাহার পদতলে শুড়শুড়ি দাও সে জোরে পদাঘাত করিবে, বলা বাহুল্য মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আহত ব্যক্তির মেরুদণ্ড-নাড়ী মস্তিষ্কের সংযমনী প্রেরণাশক্তির শাসনমুক্ত হওয়াতে উহার ক্রিয়াগুলি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে মানুষের মেরুদণ্ড নাড়ীর ক্রিয়াগুলি অনেক স্থলেই মস্তিষ্কের শাসনাধীন।



# সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র

সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের অর্থ আজকাল কেবল নানাবিধ বিলাতী অথবা দেশী প্রলেপ ও পাউডার ব্যবহারে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আসলে সৌন্দর্য্য জিনিষটা যে কি তাহা সৌন্দর্য্যপ্রিয়গণের মধ্যেও খুব অল্প লোকে তলাইয়া দেখিয়াছেন। সেই জন্য এ বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

প্রলেপ বা পাউডার দিয়া সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক এবং দূষনীয়। প্রকৃতি স্বয়ং যে নিয়ম আমাদের জন্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহা এক প্রকার তাহার বিরুদ্ধেই কাজ করা; আসল সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন এ প্রথায় কখনই হইতে পারে না। যাঁহারা এ প্রথার অনুমোদন করেন তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে এরূপ সৌন্দর্য্য কখনও চিরস্থায়ী হয় না; ... এরূপ সৌন্দর্য্য প্রশংসিত হইবার যোগ্য নহে। ... কেহ কাহাকেও ক্ষণকালের জন্য একটি সুন্দর ... পরাইয়া দিয়াছে; মুখস খুলিয়া লইলেই 'তুমি সে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

আসল সৌন্দর্য্য যাহা স্বর্গীয় এবং মহান্ তাহা ... অন্তর হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে; বাহ্যিক ... কেবল মরুভূমে মরীচিকা। শারীরিক সৌন্দর্য্য ... পবিত্রতার জ্যোতি মাত্র। আর কিছুই নহে। ... বলিয়াছেন The fountain of beauty is in the heart—'সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা অন্তরে।' কেহ কেহ বলিবেন সৌন্দর্য্য যদি মানসিক হয় তবে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা কি? অপরিষ্কার আরসিতে ... প্রতিবিম্ব পড়ে সেটিও অপরিষ্কার। অনেক উচ্চ ... আলোক তাঁহাদের রোগজীর্ণ শরীরের মধ্য দিয়া ... আসিতে আসিতে ক্ষীণ মলিন হইয়া পড়ে। উচ্চ মনের ... হৃদয়ের যোগ্য হইতে পারে এরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য আমরা কিরূপে পাইব? ইহা কঠিন সমস্যা, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের মূল। জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, সুন্দর মুখশ্রী, ইহাই মহান্ হৃদয়ের চিহ্ন। প্রকৃতি ভিতরের সহিত বাহিরের সম্বন্ধ কতদূর তাহা বলিয়া দেন নাই? অপরিষ্কার জিহ্বা, খাদ্যে অরুচি, হজমশক্তির অল্পতা, যকৃতের দুর্ব্বলতা অনেক স্থলেই মানুষের কুৎসিৎ হইবার মূল। অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতি আপনার রঙ্গীন জয়পতাকা কখনই উড়াইতে পারে না।

## সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের পন্থা।

আপনাকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ভোজনের কিছু পরে তৃপ্তিপূর্ব্বক স্বচ্ছ শীতল জল পান করায় অনেক উপকার হয়; যেমন জলের স্রোত সমস্ত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই স্বচ্ছ শীতল জল শরীরের যত কিছু আবর্জ্জনা দূর করিয়া দেয়। শীতল-জলে রীতিমত প্রাতঃস্নান শুধু বাহিরের আবর্জ্জনা দূর করে না পরন্তু রক্ত সঞ্চালনে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যাহাতে সুচারুরূপে কর্ম্ম করে সে বিষয়েও সাহায্য করে;—এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করে। আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; নিয়মিতভাবে এবং স্বাস্থ্যানুমোদিত রীতিতে সকলেরই আহার করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি থাকিলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অলস হইয়া পড়ে; জীবনের উচ্চ লক্ষ্য অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়া যায়। মানসিক শক্তির বিকাশ পূর্ণরূপে হয় না।

শীতল জল দিয়া যত অধিক বার মুখ ধুইয়া ফেলা যায় ততই ভাল। অনেকের মত রাত্রে মুখের উপর

কোনও শীতল প্রলেপ লাগাইয়া নিদ্রা যাওয়া। ইহাতে কোনও বিশেষ বাধা নাই, কিন্তু তৎপর দিবস প্রভাতে উঠিয়াই মুখ খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত; তাহা না করিলে স্বেদগ্রন্থি হইতে স্বেদ নির্গমের পথ রুদ্ধ হইয়া অনেক অনর্থ ঘটিতে পারে। হস্ত পদাদি প্রক্ষালনের জন্য যে সাধারণ জল ব্যবহার করা হয় তাহাতে কিছু তীব্র Ammonia, ($NH_3$) মিশাইয়া লইলে অনেক উপকার হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হজমশক্তির প্রখরতা সৌন্দর্য্যের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ, কোষ্ঠ এবং যকৃতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। অত্যধিক মশল্লাযুক্ত দ্রব্য না আহার করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্বাদু মুখরোচক অথচ লঘু দ্রব্য আহার করিবে। ফল ইত্যাদি অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে আহার করা উচিত।

সৌন্দর্য্যের সহিত ব্যায়ামের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা সকলেই জানেন। স্বাস্থ্য না হইলে সৌন্দর্য্য হয় না, ব্যায়াম না করিলে স্বাস্থ্য হয় না; অতএব সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যায়াম যে আবশ্যকীয় তাহা বলাই বাহুল্য। উন্মুক্ত স্থানে দুই তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করিলেই যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। অশ্বারোহণ অথবা cycling যদি অল্প পরিমাণে করা হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ অনিষ্টকর।

### প্রকৃতির শিক্ষা।

প্রকৃতির উপাসনা করিতে জানিলেই আন্তরিক পবিত্রতা বর্দ্ধিত হয়। উন্মুক্ত প্রান্তর, স্বচ্ছ কুলকুল-নাদিনী তরঙ্গিণী, মনোহর সুগন্ধযুক্ত পুষ্প, ইহাতে সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। প্রকৃতির উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মনের তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা দূর হইয়া যায়। (A thing of beauty is a joy for ever,) যে ভাবেই হউক সৌন্দর্য্যের উপাসনা যে না করিতে পারে সে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। প্রকৃতির যে উপাসনা করিবে প্রকৃতি তাহাকে সৌন্দর্য্যের বাস পরাইয়া দিবেন। Wordsworth আদর্শ বালিকার বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

The stars of midnight shall be dear
To her; and she shall lean her ear
In many a secret place
Where rivulets dance their wayward round
*And beauty born of murmuring sound*
*Shall pass into her face.*
And vital feelings of delight
Shall rear her form to stately height,
Her virgin bosom swell."

বিশ্বরচয়িতা দয়া করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যসায়রে স্থান দিয়াছেন; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, বর্ষার কলকল্লোলময়ী তটিনী, শরতের মধুরিমা, বসন্তের প্রস্ফুটিত পুষ্প, আমাদের এই সৌন্দর্য্যের উপাসক হইতে বলেন নাই?

যাহারা সর্ব্বদাই নবীন এবং প্রফুল্ল থাকিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রত্যহ প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই শয্যাতাগ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে অথবা যাহারা প্রাতঃরুত্থানে অভ্যস্ত নহে তাহাদের জীবন অচিরেই নিরানন্দময় হইয়া যায়; জরা তাহার দুঃখপূর্ণ লক্ষণ লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। Early to bed, early to rise makes a man healthy wealthy and wise. রক্ত পরিষ্কার থাকিলেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উন্নতি প্রতিদিনই হইয়া থাকে। অতএব আমাদের প্রধান দৃষ্টি রক্তের উপর রাখা কর্ত্তব্য। নিশাবসানের পর যে [illegible] সৌন্দর্য্য মানুষের চক্ষের সম্মুখে আপনার মহিম মণ্ডিত মুখখানি প্রকাশ করিয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য, তাহারই সাহায্যে মনপ্রাণ আরও উদার আরও মহান্ করিবার জন্য সকলেরই প্রাতঃভ্রমণ কর্ত্তব্য

বিশ্বের এই অনাবিল সীমাহীন সৌন্দর্য্যের [illegible] আপনাকে বিভোর করিয়া দিবার জন্য আত্মসংযম শিক্ষা করা উচিত। চরিত্রই মানুষের যথাসর্ব্বস্ব ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতে চরিত্রবান মহাত্মার অভাব নাই। সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য আমাদের এরূপ চরিত্র হওয়া উচিত যাহার দ্বারা পাপ অথবা কুচিন্তার কালিমাময় মূর্ত্তি চিরজীবনের তরে অপসৃত হইয়া যায়। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে [illegible] জগতে প্রকাশ হইবার জন্য বিধাতা আমাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তা মুখের উপর প্রতিবিম্বিত করিয়া [illegible]ন।

কখনও নিরাশ হওয়া উচিত নহে। যাহারা [illegible]মায়াময়ী' আশাকে একেবারে অতলজলে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহাদের উন্নতির কোনও আশা নাই। যাহারা আপনার লক্ষ্য উচ্চে রাখিয়া নীরব সাধনায় মগ্ন থাকে তাহারা আপনাপন ঈপ্সিত ফললাভ হইতে বঞ্চিত হয় না। যাঁহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যকে সেই অনাদি অনন্ত সীমাহীন বিশ্বনিয়ন্তার এক অংশ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, ইহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবেন তাঁহারা যথাকালে দেখিতে পাইবেন, যে তাঁহাদের

.........নব জনমের
উদয়শৈল উজল করি
শিশির ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি!

---



# কফি

চা ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রবলভাবে প্রচলিত হইয়াছে সেরূপ না হইলেও কফির প্রচলন এদেশে একেবারে অল্প নহে। সকল প্রদেশেই কফি অল্পাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেহ ও স্বাস্থ্যের উপর কফির ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটী ভাবে বলা যাইতে পারে যে—

(১) কফি কোন মতেই খাদ্য নহে, ইহাতে শরীর পোষকের উপাদান বিন্দুমাত্রও নাই।

(২) কফি একটি ভেষজ ও বিষ। ইহা আফিম, গাঁজা ও তামাকের ন্যায় একটি নেশার দ্রব্য। সাধারণতঃ যাহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইলে, সেবনের ব্যাঘাত ঘটিলেই বিশেষ অসোয়াস্তি অনুভব করিয়া থাকে। সেবন করিতে না পারায় অভ্যাসীকে অনেক সময় মাথাধরা বা অন্য বেদনা এবং অসুখবোধ করিতেও দেখা যায়।

(৩) অনেকে যেরূপ মনে করিয়া থাকেন, কফি সেরূপ নির্দ্দোষ পানীয় নহে। ইহাতে পাকযন্ত্র, হৃদয়, স্নায়ুগুলী ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হইয়া থাকে। কফিকে উত্তেজক বিষাক্ত দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। স্বাস্থ্যকামী মানবের ইহা পানীয় হিসাবে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

### কফির উপাদান।

ক্যাফিন্ নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ এবং ট্যানিন্ নামক একটি রোধক ভেষজ ইহার প্রধান উপাদান। এই ক্যাফিনের জন্যই কফির বিশেষত্ব। সকল "ফার্ম্মাকোপিয়া" পুস্তকেই ক্যাফিনের উল্লেখ আছে। সাধারণ এক কাপ্ কফিতে, পূর্ণ এক ঔষধ-মাত্রায় ইহা বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যহ সেবনে সমস্ত দেহকে বৃথা ঔষধাক্ত করা হয়। চায়ে থিইন্ নামক এরূপ একটী উপাদান আছে, রাসায়নিক হিসাবে এবং শরীরের উপর ক্রিয়ায় ইহা ক্যাফিনেরই অনুরূপ। সাধারণ এক কাপ চায়ে থিইন্ও পূর্ণ এক ঔষধ-মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

কফি সেবনে স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্কেরই অধিক ক্ষতি হইতে দেখা যায়। স্নায়ুসমূহ প্রদাহযুক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া পড়ে। সেবনে প্রথমে উত্তেজকের কার্য্য করিলেও

পরে অবসাদ আনিয়া ... এই অবসাদকে স্নায়ু সমূহের মৃদু পক্ষঘাত বলা যাইতে পারে। কফি সেবনে প্রথমে সাময়িক একটু স্ফূর্ত্তি অনুভব হয় সত্য কিন্তু তাহা স্নায়ুকোষ ও মস্তিষ্ক কোষের ব্যয়ে লাভ হইয়া থাকে। অনিদ্রা রোগ-ভোগী কফি সেবীর মধ্যে অল্প নহে। হিষ্টিরিয়া, Neurasthenia এবং এই ধরণের নানারূপ স্নায়বিক ব্যাধি ইহা সেবনে উৎপন্ন হইতে পারে। অত্যধিক কফি সেবনে কোন কোন স্থলে এক প্রকার মত্ততা ভাব অনুভূত হইয়া থাকে।

ট্যানিন্ রোধক ঔষধ। ইহা লালা ও পাক রসের পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায় এবং অন্ত্রনালির আভ্যন্তরিকছদের উত্তেজনাও সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার উপস্থিতিতে খাদ্য পরিপাক করা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়ে। ফল কথা ট্যানিন্ পাকযন্ত্র-তন্ত্রেরই ক্ষতি করিয়া থাকে।

## কফি সেবনের কুফল

কফি সেবন অজীর্ণ রোগের একটী প্রধান কারণ, বিশেষতঃ দুরারোগ্য স্নায়বিক-অজীর্ণতা রোগও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। কফি সেবন একবারে পরিত্যাগ না করিলে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। বমনভাব, শরীর ভারবোধ, মাথা বেদনা, মূর্চ্ছা ভাব, পাকস্থলীতে বেদনা এবং সাময়িক উদরাময় প্রভৃতি কফি সেবন জনিত অজীর্ণতার লক্ষণ।

অনবরত কফি সেবনের ফলে হৃদযন্ত্রের উপরও উত্তেজনা ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং ইহার ফলে বুক ধড় ফড় করা ও অন্যান্য লক্ষণের উৎপত্তি হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে দিন দুই এক কাপ সেবন করিলে আর কি বিশেষ ক্ষতি হইবে, অধিক হইলে তবে দোষ। লোক বিশেষে ক্ষতির তারতম্য দেখা যায়। দুর্ব্বলস্নায়ুগ্রস্ত লোকের উপরই কফির ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। তামাক ও সুরার ন্যায় কফি মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করিয়া, বুদ্ধি শক্তির তীক্ষ্নতা হ্রাস করিয়া দেয়। সেবনকারী পূর্ব্বের ন্যায় আর সহজভাবে মস্তিষ্ক চালনা করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত না শরীর হইতে এই বিষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় সে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থার মত কার্য্যের আশা করা যায় না।

যাহাদের স্বাস্থ্য ও বলের দিকে লক্ষ্য আছে এবং মনের ও শরীরের ক্ষমতাকে যাহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কফি বা এইরূপ দ্রব্য সেবনে অভ্যস্থ হওয়া উচিত নয়। যাহারা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা যেন কফি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার পর স্বাস্থ্যহানিকর এই বিষ সেবনের অভ্যাস চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন।

---

# বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের অবনতি

পৃথিবীতে নারী জীবনের ব্রত কি? সমাজে তাহার ...ান কোথায়? সমাজ রক্ষায় তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ...? মানব জাতির স্বাস্থ্য ও সুখ রক্ষা কল্পে তাহার ...শ্য কর্ত্তব্য কি?

এ সকলের উত্তর অতি সহজ নারী— মানবজাতির ...ননী। জননার কর্ত্তব্য সাধনই তাহার জীবনের ব্রত। ...ালবাসা, স্বার্থত্যাগ, অপরের সেবা নারীর পক্ষে ...াদর্শ বা স্বপ্ন নহে কিন্তু ইহা লইয়াই তাহার জীবন ...িত, ইহাই তাহার প্রকৃত নারীত্ব।

শ্রেষ্ঠ নারী কে? সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব কাহাতে ...র্ত্তমান? যাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকল সময়েই ...হিত হয়, যাহার সেবার বিরাম নাই, সেই নারীই ...ষ্ঠ, তাহাতেই মহত্ত্ব বর্ত্তমান। ভালবাসার সেবা ...াসীত্ব নহে। সেবায় কাহাকেও দাসীতে পরিণত ...রে না। স্বার্থপর, নীচ, সঙ্কীর্ণ হৃদয় হইতেই দাসত্বের ...ৎপত্তি হয়। স্বার্থপর হৃদয়ই সেবা বিক্রয় করে বা বাধ্য ...ইয়া সেবা করিয়া থাকে। এরূপ হৃদয়ের সেবা দাসের ...্য। স্বার্থহীন হৃদয় হইতে যে সেবার উৎপত্তি হয় ...হা স্বাধীন, আর অর্থের দ্বারা যে সেবা পাওয়া যায় ...াহাই দাসত্ব। নারীর জননীরূপে সেবা প্রকৃতির ...ার ন্যায় স্বাধীন। প্রকৃতি দেবী ধনী, দরিদ্র, বলবান ...ল, রাজা, কৃষক, সাধু, পাপী সকলেরই সেবা করিয়া ...কেন। নারী জীবন দাসীত্ব নহে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ...্যময় পবিত্র জীবন।

মানবজাতির জননীরূপে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ...্য অতীত জাতির দেহ ও মনের গৌরবের বস্তু দান ...িবার জন্য নারীরই দায়ীত্ব অধিক। লক্ষ লক্ষ ...র ধরিয়া নারীই শক্তিরূপে জাতীয় সম্পদ রক্ষা ...িয়া আসিতেছে। বীজ রূপে আরম্ভ হইয়া মানব শিশু নারী দেহেই বৃদ্ধি লাভ করে এবং এই বৃদ্ধিকালে জননী দেহ হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। মাতা নিজ রক্ত দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে পোষণ করেন এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুগ্ধের আকারে পরিবর্ত্তিত মাতৃরক্তই সেই কার্য্যসাধন করিয়াথাকে। রক্তের পবিত্রতা ও উৎকর্ষতার উপরেই ভবিষ্যৎ জাতির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত খাদ্য। মাতাই শিশুর প্রকৃত ধাত্রী। মাতৃস্তন্যপায়ী, মাতৃস্নেহে লালিত পালিত শিশুই প্রকৃত সুখলাভ করে। দুর্ব্বল মাতা শিশু পালন রূপ দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। স্বাস্থ্যবান করিয়া সন্তানকে বর্দ্ধিত করার জ্ঞান জননীর থাকা আবশ্যক। জননীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা না থাকিলে কোনই সুফলের আশা করা যায় না।

শৈশব পার হইলেও মানব শিশু অক্ষম। উপযুক্ত বয়স না হইলে সভ্য জগতে মানব শিশু পূর্ণ-মানব বলিয়া পরিগণিত হয় না। মানব-শিশুর পূর্ণতা লাভের পক্ষে সংসারই উপযুক্ত ক্ষেত্র। সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্নের জন্য কার্য্যের বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। গৃহকর্ত্রী জননীকেই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। নারীই পত্নী, মাতা এবং সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী। পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য এবং সুখ উপযুক্ত আহার্য্য নির্ব্বাচন ও উপযুক্ত রন্ধনের উপর নির্ভর করে। নারী পুরুষের সাহায্যে বা বিনা সাহায্যেই প্রতি সংসারে খাদ্য নির্ব্বাচন; খাদ্য প্রস্তুত করণ, হিসাব রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম। নারীই পুরুষের বিনা সাহায্যে সন্তানের উপযুক্ত ধাত্রী ও অভিভাবিকা। নারী সন্তান প্রতিপালন বা

গৃহকর্ম্ম সাধনে অপারগ হইলে বা রোগ শয্যায় শায়িত থাকিলে পুরুষের তাহার কার্য্য সাধন করা আবশ্যক হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মে উপরোক্ত কার্য্য সমূহ সাধনে নারীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

নারী মানবজাতির জননী, গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী, পরিবার বর্গের স্বাস্থ্য রক্ষা কারিণী এবং রোগীর স্নেহময়ী সেবিকা। এই সকল প্রধান কার্য্য সাধনের জন্য তাহার উপযুক্ত শিক্ষা থাকা আবশ্যক। এই কার্য্য সাধনের পর সময় থাকিলে তবে তিনি অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম। সাধারণত নারীগণ এইরূপ পন্থাই অবলম্বন করিবেন। তবে যে নারী সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ হইবেন না তিনি সমাজের মঙ্গলকর সৎকার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে পারিবারিক জীবনের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, এবং স্বাতন্ত্রতা বিনাশ পাইয়াছে। পরিবারের মঙ্গলের জন্যই সকলে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতেছে। মুসলমান রাজত্ব কালেও যুক্ত পরিবারের প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে ক্রমে স্বাতন্ত্রতার ইচ্ছা জাগরিত হইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই ইচ্ছার প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে স্বাতন্ত্রতায় সুখ থাকিলেও এদেশের অবস্থা অন্যরূপ। ভারতে পারিবারিক জীবনেই অধিক সুখ।

বর্ত্তমানে মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালী নারীগণ ক্রমশঃ অধিক স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজের লইয়াই সকলে ব্যস্ত। বেশভূষা ও অলঙ্কার প্রিয়তার ভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সৌখিন ও অলস জীবন যাপন করিবার ইচ্ছাই প্রবল দেখা যাইতেছে। গৃহ-কর্ম্মের ও সন্তান রক্ষণের ভার দাস দাসীর উপর দিয়া এবং রন্ধনাদির ভার পাচকের উপর দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইতেছে। পরিবারে কাহারও সেবা শুশ্রূষা করা অনেকের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতেছে। অলস ক্রীড়া ও গল্পে সময় নষ্ট করিতে এবং স্থল বিশেষে মধ্যে মধ্যে থিয়েটার আদি দেখিতে না পাইলে তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ মনের ভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল নারীর না হইলেও ক্রমশ অনেকের ভিতর বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশের পল্লীসমূহ ছারখার হইতেছে এবং পল্লীগ্রাম সমূহ হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আসিয়া সহরের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে, মল মূত্র ত্যাগ, স্নান এবং জল আনয়নের জন্য তাহাদিগকে দূরে যাইতে হয়। পল্লীবাসিনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ রন্ধন করা, বাসন মাজা, জল আনা প্রভৃতি নিজেরা করিয়া থাকে। তাহারা নিজেরাই ধান ভাঙ্গিয়া চাল প্রস্তুত করে। মুক্ত বায়ুতে কঠিন পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। শরীরের পেশী সমূহ ঠিক ভাবে থাকায় সন্তান প্রসবের সময় তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকায় সন্তান ও পরিবারবর্গের জন্য পরিশ্রম করিতে তাহাদের আনন্দই হইয়া থাকে। পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সকল সময় পরিশ্রম ও লোকের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

সহরবাসিনী নারীগণ ক্ষুদ্র বাটীতে, অন্দর মহলে আবদ্ধ থাকে এবং উপযুক্ত ব্যায়াম ও নির্ম্মল বায়ুর অভাব ভোগ করে। পেশী সমূহ সুপুষ্ট না হওয়ায় তাহারা দুর্ব্বল হয় এবং প্রত্যেক বার প্রসবের সময় তাহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়ে। এই সকল নারীর পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা না হয় উদরাময় বা উভয় রোগই জন্মিয়া থাকে। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ লাল রক্ত কণিকা থাকে না। অক্সিজেন গ্রহণ কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। অঙ্গোৎপন্ন বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। গর্ভস্থ ভ্রূণ সুপুষ্ট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ এবং নির্দ্দোষ রক্ত প্রাপ্ত হয় না। প্রসবের সময় দুর্ব্বল সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইবার উপযোগী মাতৃ দুগ্ধ পায় না। মাতা নিজেই সন্তান প্রসবের পর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আপন সন্তান পালনে তাহার শক্তি থাকে না।



সহরবাসিনীগণ অলসভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা দুর্ব্বল শরীরে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে কিছুতেই সক্ষম হয় না। অলস মনে নানাপ্রকার কুচিন্তার উদয় হয়। শরীরের দুর্ব্বলতা বা সৌখিনতার জন্য পরিশ্রমের কার্য্য হইতে বিরত থাকায় মনেরও অবনতি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নারীগণ কাজ কর্ম্মে মন না দিয়া, নভেল পড়িয়া, তাস খেলিয়া, বার বার পান বা দোক্তা চর্ব্বণ করিয়া এবং থিয়েটার আদি আমোদে যোগ দিয়া সময় নষ্ট করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

মানসিক অলসতা ও অনুন্নতা হইতে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে। মানসিক অবনতি ঘটিলে স্বার্থপরতার ভাব জন্মে। সন্তানের স্বাস্থ্য গঠন এবং নৈতিক উৎকর্ষতার দিকেও মাতার দৃষ্টি থাকে না। নারীগণ আত্মসুখী, ধর্ম্মে বিরাগী এবং স্বার্থপর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বঙ্গীয় নারীগণ নিজেরাই সমগ্র দেশবাসীর উপযোগী বস্ত্র বয়নের সুতা প্রস্তুত করিতেন। এক্ষণে সহরবাসিনী নারীগণকে কাপড় সুতা প্রস্তুত করিতে না হইলেও তাহারা কঠিন পরিশ্রমের অভিযোগ করিয়া থাকে। সকলেই যে এরূপ তাহা নহে, তবে বর্ত্তমানে সহরবাসিনী অধিকাংশেরই বিশেষ অবনতি ঘটিতেছে। সহর বাসে সৌখিনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মসুখিতা প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। নারীরা বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতিতে অধিক ব্যয় করিতে থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহের নারীগণ ধনী গৃহের নারীগণের অনুকরণ করিতে শিখে। স্বামীর দরিদ্র আত্মীয়গণের কোনরূপ সাহায্যে না লাগাইয়া স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে সখ মিটাইতে ভাল বাসে। কিন্তু এইরূপ সৌখিনতা, স্বেচ্ছাচারিতায় সহরের নারীগণকে অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে হয় না। অনেক স্থলে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ায় তাহার মৃত্যুর দ্বার হয় উন্মুক্ত হইয়া যায়। ক্রমে পরিবারের অপর লোকেরও রোগের আক্রমণ সম্ভাবনা ঘটে।

স্ত্রীর অবনতিতে স্বামীরও অবনতির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে পরিশ্রমী ও পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়। সামাজিক শাসন প্রত্যেকের উপরেই কার্য্য করিয়া থাকে। সহরে অপবিত্রতারই রাজত্ব দেখা যায়। এখানে সামাজিক শাসনের সেরূপ মূল্য নাই। স্বামীর চরিত্র দোষে কুৎসিৎ রোগ ঘটিলে তাহা নির্দ্দোষী স্ত্রীতেও সংক্রামিত হয়। ইহাতে যে কেবল স্ত্রীর স্বাস্থ্য হানি হয় তাহা নহে, গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্যও একেবারে বিনষ্ট হয়। বড় বড় সহরে ভীষণ উপদংশ রোগ অনেক পরিবারের জীবন ও শক্তি একবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে।

বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণের অন্তরাত্মা কষিত কাঞ্চন সদৃশ। তাহারা দেবী ভাবাপন্ন হইলেও বর্ত্তমান সভ্যতা, অবস্থা এবং আদর্শ তাহাদিগকে বিপথগামী করিতেছে। তাহার নৈতিক জীবনের অবনতি ঘটিলে বর্ত্তমান কালের প্রভাবকেই দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য। নারীগণকে এখনই এই অবনতি হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তাহাদের মনে যাহাতে স্বাতন্ত্রতার ভাব আসিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। জননীগণের স্বাস্থ্য হীনতার কারণ সমূহ দূর করিতে হইবে। ইহাতে জননীর ও তৎসঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বিশেষ মঙ্গল হইবে। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবি স্ত্রীলোকগণের স্বাস্থ্যের এখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের স্বাস্থ্যের ন্যায় অবনতি ঘটে নাই।

উক্ত দোষ সকল দূর করা সহজ নহে। আমাদিগকে পাশ্চাত্য দেশের স্বাতন্ত্রতার ভাব ত্যাগ করিয়া তাহাদের গুণ সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সহরের বৃদ্ধি নিবারণ করা যাইবেনা কিন্তু সহর বাসে যে শারীরিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে তাহা দূর করিতে হইবে। অবস্থাপন্ন গৃহ হইতে প্রথমে সংস্কার আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। তাহাদের আদর্শই ক্রমে সকলে গ্রহণ করিবে। কিরূপ ভাবে সংস্কার কার্য্য সাধিত হইবে তাহা সমাজের নেতা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্দ্ধারিত করিবেন। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের অবনতি ঘটিয়াছে ইহা ধ্রুব সত্য এবং শীঘ্রই এবিষয়ের উপযুক্ত প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

# মাংস কি অস্বাভাবিক খাদ্য ?

লেখক—ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত

গত মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত 'মাংসাহারের ফল' প্রবন্ধটী পড়িয়া অনেক আমিষ ভোজীর মনেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'মাংস কি অস্বাভাবিক খাদ্য ?'

শরীর রক্ষার্থে পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্য মধ্যে অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ আছে কিন্তু আমরা মোটের উপর আমিষ ও নিরামিষ এই দুইটী কথায়ই খাদ্যের একটা যেন ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছি। কেহ বলেন আমিষ ভোজন ভাল কেহ বলেন নিরামিষ ভোজন ভাল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমিষ ও নিরামিষ উভয় দিকেই পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহার করার জিনিষের অভাব নাই। আজ আমাদের কথা হইতেছে আমিষ ভোজন লইয়া সুতরাং এস্থলে নিরামিষ খাদ্যের কোন উল্লেখ অনাবশ্যক।

আমিষ ভোজীর নিকট মাছ ও মাংস এই দুইটী জিনিষই পরম উপাদেয় খাদ্য, তবে কোন আমিষ ভোজী মাছ খান বটে কিন্তু মাংস খান না। দুই এক জন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন মাংসের গুনীগুন হিসাব করিয়া যে তাঁহারা মাংস ভোজনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ তাহা বড় দেখা যায় না কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় কম।

কোন কোন হৃদয়বান ব্যক্তি পশুহত্যার বিরোধী বটে তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের দেশে অতি অল্প সংখ্যক লোকই রীতিমত মাংসাহারী। একে মাংস তত সুলভ নহে তাহাতে জাতি-ধর্ম্ম হিসাবে অনেক বাছাবাছিও আছে। অতি সহজ সুলভ কুকুট মাংস ভক্ষণ হিন্দুর শাস্ত্র বিরুদ্ধ আবার কতকগুলা মাছ—যেমন শাল, পাঙ্গাশ প্রভৃতি অনেক হিন্দুকে খাইতে দেখি না।

নরেন বাবু অতিরিক্ত মাংসাহারেরই ফল দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন বটে কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যেই আমিষ ভোজীদের কাছে কয়েকটী কথায় যেন একটু সন্দেহই অসিতে পারে।

আমাদের দেহ রক্ষার জন্য শাস্ত্রমতে নাইট্রোজিনাস্ খাদ্য দরকার। মাংস নাইট্রোজিনাস্ খাদ্য। অতএব যাহা দেহের ভিতরই আছে এবং যাহার প্রত্যাহিক ক্ষয়ে পুনঃ ক্ষতি পূরণ আবশ্যক সেই জিনিষটী খাদ্যরূপে ব্যবহার করা কেহ কেহ হয়তো 'অস্বাভাবিক খাদ্য' মনে না করিতেও পারেন। বিশেষতঃ অনেক চিকিৎসকই নিতান্ত দুর্ব্বল রোগীর পথ্য জন্যও মাংসের যুষ বা সুপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

আর একটী আপত্তির কারণ এই হইতে পারে, নরেন বাবু বলিতেছেন "কুঁকুর বিড়াল মাংসাহারের উপর জীবন ধারণ করে, তাহাদের স্বভাব উগ্র হইয়া থাকে। মানবের পক্ষেও এই কুফল ফলে।" ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, অনেক নিরামিষ ভোজী, অনেক বৈষ্ণব বাবাজীও কুকুর বিড়াল পুষিয়া থাকেন তাহাদের কুকুর বিড়ালগুলাকেও একপ্রকার নিরামিষ ভোজী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তবে উহারা যে মাংস প্রিয় একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বভাবের উগ্রতার মাংসাহারের সঙ্গে কতকটা আংশিক সম্বন্ধ বলিলে বলিতে পারা যায় না কি ? আমাদের দেশীয় কুকুর বিড়ালগুলা স্বভাবতঃই খুব শান্ত, কোন কোনটা নিতান্তই যেন 'ভাল মানুষ' গোছের! ইহারা বিবাহাদি নিমন্ত্রণ বাটীতে মাংসের হাড় চিবাইয়া আরো যেন বেশী ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া নেয়।

স্বভাবের উগ্রতা শুধু মাংসাহারেই বেশী হয় কিনা তাহাতেও মতভেদ হইতে পারে। শুধু মনুষ্য বলিয়া নয়, মনুষ্যেতর জীবমধ্যেও উগ্র স্বভাব অনেকটা যেন জাতি ও বংশ গত।

মাংসাহারী সিংহ ব্যাঘ্র বিশেষ উগ্র স্বভাবান্বিত



লেও তৃণভোজী হস্তি গণ্ডার মহিষাদিরও উগ্রতা কম নহে। লোকালয়ে থাকিয়াও এক একটা কে কি ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হইতে দেখা যায়। শকুনি নী মাংসাহারী বটে কিন্তু গৃহ পালিত হংস পারাবত প্রভৃতি গুলারও স্বভাব কম উগ্র নয়—লড়ায়ে দের কে মরে কে বাঁচে সে জ্ঞান থাকে না।

রামায়ণের যুগেও রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির স্বভাবের তার সহিত বিভীষণের কত পার্থক্য দেখা যায়। লে অনেক নিরামিষ ভোজীর স্বভাবের পরিচয় রা জানি কিন্তু নামোল্লেখে আবার মানহানির মায় পড়িব। পক্ষান্তরে এমন অনেক আমিষভোজী ছেন তাঁহাদের কোমল-উদার সুন্দর চরিত্রের কথা মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

আর একটী কথা যে মাংসাহারের ফলে এই দ্যাপি ভীষণ যুদ্ধ" ও সৈন্যগণ সম্বন্ধে যে কয়টী কথা হইয়াছে তাহাও সকলের পক্ষে নয়, ইহা আমাদিগকে কার করিতেই হইবে। কারণ এই ইউরোপীয় সময়ে সকল দেশেরই বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বলম্বী সৈন্যগণ যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই াহারী কিম্বা অত্যাচার পরায়ণ নহেন।

কিন্তু যাহাই হোক কেন না, অতিরিক্ত মাংসাহারের যে বিষময় তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। কোন 'খাদ্যই অতিরিক্ত ব্যবহারে স্বাস্থ্যের বিষম সাধিত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য, পেটেরপীড়া arrhœa ) প্রভৃতি অতিরিক্ত আহারেরই ফল। দের দেশের অনেক বড় লোকের ঘরে কতকগুলা ার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অতিরিক্ত ারেরই ফল।

মাংসাহারের ফলে যে সব রোগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিরামিষ ভোজনে কদাচ হয় না।

পচা মাংস ভক্ষণে কলেরার মত এক প্রকার রোগ হয় তাহাকে 'টোমন বিষাক্ত' ( Ptomaine Poisoning ) হওয়া বলে, অনেক সময়ে ইহাতে রোগীর মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ফিতাকৃমি ( Tape worm ) মাংসাহারেরই ফল। যাহারা শূকরের মাংস খায় তাহাদের পেটে যে ফিতাকৃমি জন্মে তাহা দীর্ঘে ১০।১২ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গরুর মাংস ভক্ষণে এক প্রকার ফিতাকৃমি জন্মে তাহাও দীর্ঘে প্রায় ৮।১০ হাত হয়।

সুইজারল্যাণ্ড ও মধ্য ইউরোপের কোন কোন অংশে এক প্রকার মাছ আছে সে সব মাছ খাইলে ১৭ হইতে ২৬ ফিট লম্বা এক প্রকার ফিতাকৃমি জন্মিয়া থাকে।

শুট্‌কী মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, কচ্ছপ মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি যাহারা অতিরিক্ত খাইয়া থাকেন তাহাদের মধ্যেই আমবাত (Urticaria) রোগটা যেন বেশী দেখা যায়।

এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আর উল্লেখ করিলাম না।

সর্ব্বশেষে কথা এই, আমরা যতই না কেন লোককে নিরামিষ ভোজী হইতে বলি, যতই না কেন মাংসাহারের ফল দেখাইতে প্রয়াসী হই কিন্তু তাহাতে যদি বা ২।১ জন 'বাবাজীর' সংখ্যা বাড়ে তথাপিও পাঁঠার সংখ্যা বাড়িতে পারিবে এমন বিশ্বাস হয় না। আমাদের কাছে কচি পাঁঠার মাংস বড়ই লোভনীয় জিনিষ। কবি কি সাধে বলিয়াছেন—

"সাদা কটা কালা রূপ বলিহারি গুণে—
সাত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুণে"

# বর্ণ চিকিৎসা

লেখক—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী

কিয়দ্দিন যাবৎ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বর্ণ চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। আমরা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, এ বিষয়েও আমাদের সেই সনাতন প্রথার কোনই ত্রুটি হয় নাই। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত ঝালা প্রসাদ ঝা মহোদয় বাবিট্ সাহেব প্রচলিত বর্ণ চিকিৎসার আলোচনা করিয়া মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন "এই চিকিৎসা সকল চিকিৎসাকে দূরে নিক্ষেপ্ত করিবে।" তাঁহার সেই স্বপ্ন কতদূর সত্যে পরিণত হইয়াছে তাহা জানি না, তবে এ কথা জানি অন্তত বাঙ্গালা দেশে অনেকে এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ এবং কেহ কেহ ইহাকে একটি হাসির জিনিষ বলিয়াই উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

চিকিৎসা শাস্ত্রের এই প্রবল উন্নতির যুগে হোমিও-প্যাথির ফোঁটা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের ঝাড়া ফুকা তাবিজ কবচ যেমন করুণার যোগ্য, এই বর্ণ চিকিৎসা প্রণালি তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। যে হাইপোডার্মিক পিচকারী (Hypodermic syrenge) রূপ মহাস্ত্র সাহায্যে আমরা আমাদের চিরন্তন ঘোর শত্রু রোগবীজাণুর সহিত সর্ব্বদা সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, তাহার কাছে এই সকলের তুলনা করিতে গেলে কামানের মুখে ধূলি মুষ্টি লইয়া দাঁড়াইবার মতই হাস্যকর বলিয়া অনুমিত হয়।

কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিনা জড় জগৎ ও অন্তর্জগতে কত প্রভেদ। যে শক্তিতে ইন্দ্রের বজ্র স্তম্ভিত হইত, পিনাকপাণির অব্যর্থ শূলের ক্ষমতা লোপ হইত, জানি না সে শক্তি কবি কল্পনা কিনা, কিন্তু ইহা জানি আজও ইচ্ছাশক্তির প্রবল চালনায় আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্র লম্প প্রদানে বিরত হইয়াছে, উন্নত ফণা মহোরগ মাথা নামাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

হয়ত এই বর্ণ সমূহের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত রহিয়াছে যাহার প্রভাব আমরা চক্ষে দেখি না বটে, কিন্তু উহা বহু ঔষধাদি অপেক্ষা কার্য্যকরী ও বিশ্বস্ত।

এই যে বর্ণ, তাহা আমরা পাই কোথা হইতে? অনেকেই হয়ত জানেন, সূর্য্য মণ্ডল হইতে যে রশ্মি পৃথিবীতে আগমন করে তাহা দৃশ্যতঃ সাদা বর্ণের হইলেও তাহার মধ্যে সাতটি প্রচ্ছন্ন বর্ণ নিহিত রহিয়াছে। জীব জগতে এই সূর্য্য রশ্মির একটী খুব আবশ্যকীয় ক্রিয়া রহিয়াছে। এই রশ্মিটুকু না হইলে বৃক্ষলতা, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, মানব কেহই জীবিত থাকিতে পারিত না। এই সূর্য্যালোকের মধ্যে যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটীর ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের। সকল গুলির সহিত আমাদের ততটা প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র গুটি চারেক বর্ণের কথা আমাদের আলোচ্য। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

সোলার স্পেক্ট্রামে (Solar Spectrum) যে সাত বর্ণের রশ্মি পতিত হয় তাহা যথাক্রমে বেগুনে গভীর নীল, নীল সবুজ, হরিদ্রা, কমলালেবু এবং লাল। ইংরাজিতে যথাক্রমে violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. এই বেগুনে বর্ণ, লাল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বর্ণ অপেক্ষা রাসায়নিক ক্রিয়া অধিক পরিমাণে হয়। ফটোগ্রাফিতে স্বাভাবিক সাদা রংকে এই ভাওলেট রশ্মি কাল রঙ্গে পরিণত করে। ক্লোরিন (Chlorin) ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) গ্যাস দ্বয়কে একত্র করিয়া সূর্য্যালোকে ধরিলে প্রচণ্ড বেগে, সশব্দে জ্বলিয়া উঠে। লাল বর্ণে আবার সর্ব্ব প্রকার বর্ণের রশ্মি অপেক্ষা



তাপ অধিক। একটী থারমোমিটার দ্বারা সহজেই ইহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এই সাত প্রকার বর্ণ ছাড়া এক প্রকার কাল বর্ণও এই স্পেক্ট্রামে দেখা যায়।

এই বেগুনে রশ্মির, বিশেষত তদতিরিক্ত Ultra violet rays এর আরও অনেক প্রকার ক্রিয়া জীব-শরীরে পরিলক্ষিত হয়। আমরা সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিব। কয়েক মিনিট কাল এই বেগুনে রশ্মি অথবা ultra violet-rays রক্তের উপর পাতিত করিলে রক্তের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যথা, রক্তের Oxyhæmoglobin পরিবর্ত্তিত হইয়া Methæmoglobinএ পরিণত হয়। পিত্তের (bileএর Biliverdine, Bilirubineএ পরিণত হয়। মানবের চর্ম্মে পতিত হইয়া এক প্রকার এরিথিমা (Erythema) নামক চর্ম্মরোগ ও চুলকানি উৎপন্ন করে। আবার পরিমিত প্রয়োগে এই রশ্মিটি জীবনী শক্তি এবং তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মহাত্মা ফিন্‌সেন (Finsen) সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে নীল ও বেগুনে বর্ণের রশ্মি হংস জাতির ডিম খুব শীঘ্র শীঘ্র ফুটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সবুজ রশ্মিতে তত তাড়াতাড়ি হয় না। বেঙ্গাচিও বেগুনে এবং নীল বর্ণের রশ্মিতে শীঘ্র শীঘ্র বৰ্দ্ধিত হইয়া ভেকে পরিণত হয়।

যাহার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বেগুনে বা Ultra violet rays এর আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহা ইহার জীবাণু নাশক শক্তি (Bactericidal properties). আজকাল জলকে জীবাণুশূন্য করিয়া পরিশোধন করিবার জন্য (Sterilization of water) এই বর্ণের রশ্মির বিশেষ খ্যাতি ও আবশ্যকতা দেখা যায়।

উপরি উক্ত কথা কয়টির আলোচনা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমার আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে এই নানা প্রকারের বর্ণ আমাদের কত কাজ করিয়া দিতেছে। মানবের স্বাস্থ্য, জীবন ও শক্তি ইহাদের নিকট কত দূর পরিমাণে ঋণী। ইহারা যে কাজ করিতেছে তাহা মানব চক্ষুর অগোচরে নীরবে স্থির ভাবে ও নিশ্চিতরূপে সর্ব্বদা অবিচলিত ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। ইহার শক্তি আধুনিক আবিষ্কৃত কোন শক্তি অপেক্ষাই কম নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সকল বর্ণের ক্রিয়া কি জগতে আজ নূতন আবিষ্কার হইল? না, ইহা বহুপূর্ব্বে আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অবগত ছিলেন? সকলেই বোধ হয় বলিবেন এই বর্ণ তত্ত্ব আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

কেহ কেহ হয়ত জানেন আমেরিকার কোন বিখ্যাত মনীষী ডাক্তার উইলিয়াম বেট্‌স্ সম্প্রতি, মানব স্বাস্থ্যের উপর অন্ধকারের অথবা কাল বর্ণের কি ক্রিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। এই মহাত্মা বলিয়াছেন অন্ধকার গৃহে চক্ষু বুজিয়া যদি কিছুক্ষণ কাল বর্ণ ধ্যান করা যায়, তবে অনেক প্রকার স্নায়বীয় ব্যারাম ও বেদনাদির উপশম হয়। তিনি বলিয়াছেন চক্ষু বুজিয়া কালর ধ্যান করিবার পূর্ব্বে যদি খুব গভীর কাল পদার্থ যথা কালীক্রস জুতা বা কাল হাণ্ডেল প্রভৃতির দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকা যায় তবে এই ধ্যান ক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজে হইতে পারে। নিউরেলজিয়া (Neuralgia) ব্যথায় এই প্রকার ধ্যান দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ কালর ধ্যানে মনের বোধ শক্তির যে অবসাদ জন্মে তাহাতে কতকগুলি ছোট রকমের অস্ত্রোপচার, যেমন দাঁত তোলা প্রভৃতি অনায়াসে ও বিনা কষ্টে করা যায়। এ সম্বন্ধে বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে কিছু আলোচনা আছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

যাহা হউক জুতা ও কাল হাণ্ডল প্রভৃতি কৃষ্ণ বর্ণ পদার্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পাশ্চাত্য দেশে কালর ধ্যান হইতে পারে, আমাদের দেশে কিন্তু বহুকাল হইতেই এই সকল ধ্যান হইয়া আসিতেছে। অবশ্য সেটি অন্য প্রণালীতে। আমাদের দেশে প্রায় গৃহে গৃহে এই কালর মূর্ত্তি, মাসে মাসে এই কালর পূজা ও উৎসব

লাগিয়াই আছে। কাল কৃষ্ণ ও কালীকে লইয়া দুইটি খুব বড় উপাসক সম্প্রদায় বহুকাল হইতে এ দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য মূর্ত্তিরও উপাসক আছে। কেহ সাদার উপাসক তাঁহারা শৈব, কেহ লালের উপাসক তাহারা গাণপত্য। নানা বর্ণের দেব দেবীর উপাসক সম্প্রদায়ে এই ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। মন্ত্র গ্রহণকারী ও দ্বিজাতিরা ত্রিসন্ধ্যায় তিন প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রাতে বহ্নি রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণা, এবং সায়াহ্নে শ্বেতবর্ণা, এই তিন প্রকারের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন। জুতা বা হাণ্ডেলের সাহায্য অপেক্ষা এই সকলের সাহায্য কি অধিকতর ফলপ্রদ নহে। ধর্ম্মের দিক দিয়া না-ই ধরিলাম, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ধরিলেও আমাদের সেই প্রাচীন কালের মনীষীগণের নিকট চিরকালের জন্য মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়।

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যদি কিছু বুঝিয়া থাকি তবেই আমরা বর্ণ চিকিৎসা প্রণালিতে যে তত্ত্বটুকু নিহিত আছে তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইব।

প্রথমেই বলিয়াছি, বাবিট্ সাহেব প্রচলিত বর্ণ চিকিৎসা প্রণালি অবলম্বনেই আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রথমে ইহা প্রচলিত হইবার সুযোগ হয়। বাবিট্ সাহেবের মতে বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে বিভিন্ন বর্ণের কাচের প্রয়োজন হয়। সাধারণত চার প্রকারের বর্ণ দ্বারাই প্রায় সমস্ত রোগের চিকিৎসা হইতে পারে। লাল, বেগুনে, নীল ও হরিদ্রা বর্ণযুক্ত চারি প্রকারের কাচ দ্বারা একটি লণ্ঠন প্রস্তুত করাইয়া রাত্রে রোগীর পীড়িত স্থানে যথোপযুক্ত বর্ণের আলোক প্রদান করিয়া রোগ আরোগ্য করা যায়। ঐ ঐ বর্ণ বিশিষ্ট চারিটি বোতল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে পরিষ্কার জল পুরিয়া প্রখর রৌদ্রে কিছু কালের জন্য রাখিয়া দিলে ঐ জল, ঐ ঐ বর্ণের শক্তি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই জল এক আউন্স পরিমাণে সেবন করাইয়াও তুল্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে এই বর্ণ সকলের মোটামুটী গুণ বর্ণনা করিয়াছি। ইহাদের ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি লাল বর্ণে উত্তাপ ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার ক্রিয়াও প্রায় তদ্রূপ। ইহা উত্তেজক, শরীরের জড়তা নাশক এবং স্নায়বীয় রোগ বিশেষে ও পক্ষাঘাতে (Paralysis) ব্যবহৃত হয়। বেগুনে বর্ণ সর্দ্দি কাসি, যাবতীয় ফুসফুস (Lungs) সংক্রান্ত ব্যারামে এবং অজীর্ণে বিশেষ উপকারী। হরিদ্রা বা পীতবর্ণ কোষ্ঠ বদ্ধের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বসিয়া থাকা অভ্যাস গ্রস্ত (Sedentary habit) লোকের যথা আপিসের কেরানি, দোকানদার প্রভৃতি লোকের পক্ষে ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে খুব ভাল ঔষধ। নীলবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরকারী। অধিকাংশ রোগের চিকিৎসাতেই ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। রক্ত বর্ণের ব্রহ্মাই সৃজন করেন বটে কিন্তু নীল বর্ণের বিষ্ণুই পালন কর্ত্তা। কথাটী ঠিক। নীলবর্ণ না হইলে জীবগণ বোধ হয় তাঁহাদের জীবনী শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইত না। আকাশ নীল, এই পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে যে বৃহৎ জলরাশি তাহা নীল। এই নীলই জীবন—জীবের জীবন, বৃক্ষলতাদি, স্থাবর জঙ্গম, সকলের জীবন। জীবের দেহের স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া সর্ব্বদা জীবকে রক্ষা ও পালন করিতেছে। বলিয়াছি রোগের মধ্যে অধিকাংশই ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। কলেরা (Cholera) প্লেগ, ও ক্যান্সার রোগে নীল আলো খুব ভাল ঔষধ। পাগলের মাথায় নীল আলো কিছু কালের জন্য প্রয়োগ করিতে পারিলে সে আরোগ্য লাভ করে দেখা গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি রোগ বিশেষে ঐ লাল, নীল, পীত, সাদা অথবা কাল বর্ণের ধ্যান দ্বারাও আরোগ্য লাভ করা যায়। অবশ্য শুধু বিনা অবলম্বনে ধ্যান করা অপেক্ষা ঐ ঐ বর্ণ রোগীর শরীরে পাতিত করিয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকায় ঐ বর্ণের ধ্যান অনেকটা সহজ হইয়া আসে। হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ও কালী প্রভৃতি দেব দেবীর চিন্তায় হৃদয় ও মন মগ্ন এবং প্লাবিত করিতে পারিলে, ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্ততঃ



রাম অবস্থায় অনেক রোগ হইতে বিনা ঔষধের সাহায্যে ও বিনা পয়সায় সহজে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে দেখা যাইতেছে। এ প্রকারের চিকিৎসা আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। বাবিট্ সাহেব বা উইলিয়ম বেটস্ এই সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজকাল আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিতেছেন।

# টাইফয়েড জ্বর ও তাহার প্রতিকার

পূর্ব্বে ডাক্তারেরা মনে করিতেন যে টাইফয়েড জ্বর হইতে কখনও ছিল না। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে রোগ নির্দ্ধারণের নানা নূতন উপায় আবিষ্কার হওয়ায় প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারতে যে কেবল এই রোগের অভাব আছে তাহা নহে, বড় বড় সহরে রোগের প্রভাবও খুব বেশী। পূর্ব্বের তথা কথিত রেমিটেণ্ট, প্রাচীন চিকিৎসকেরা যাহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না তাহা এক্ষণে টাইফয়েড বীজাণুর সংক্রামণে হইয়া বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কোন বাড়িতে টাইফয়েড আক্রমণ ঘটিলে অপর কোন লোক যদি সেই রোগীর সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে তাহারও সংক্রমণের সম্ভাবনা ঘটে। রোগীর সেবাকারী ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী প্রতিষেধক উপায় সমূহ অবলম্বন না করাতেই এইরূপ বিপদ হইতে পারে।

কিরূপে টাইফয়েডের আক্রমণ রোধ করা যায় তাহা আলোচনার পূর্ব্বে, কিরূপে রোগের বিস্তৃতি ঘটে সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিৎ। এক প্রকার বীজাণুই টাইফয়েড জ্বরের কারণ। এই বীজাণু দুগ্ধে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় এবং কাহার কাহারও মতে নির্ম্মল জলেও কিছু কালের জন্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শুষ্কাবস্থাও কয় মাস বাঁচিয়া থাকে এবং বরফের মধ্যে অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মৃত্তিকার উপরকার ইহার শক্তি অনেক কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।

সংক্রামণের রীতি—সংক্রামণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ সংক্রামণ—সেবাকারী রোগীর গৃহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিষেধক দ্বারা হস্তাদি ভালরূপে ধৌত না করে তাহা হইলে তাহার রোগাক্রমণ হইতে পারে। টাইফয়েড বীজাণু মল মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে এবং রোগীর শয্যাতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। রোগীর শয্যা ব্যবহারে সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

পরোক্ষ সংক্রামণ—সংক্রামিত জল ও খাদ্যের দ্বারা টাইফয়েড জ্বর এক সঙ্গে বহু লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। টাইফয়েড রোগীর মল-দূষিত জল ব্যবহারই অনেক স্থলে টাইফয়েড বিস্তৃতির কারণ বলিয়া অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রধানত দুগ্ধ এবং জল দ্বারাই এই রোগের সংক্রামণ ঘটিয়া থাকে।

দুগ্ধে অনেক সময় দূষিত পুষ্করিণী বা কূপের জল মিশ্রিত করায় টাইফয়েড বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। আমেরিকায় 'আইস্ ক্রিমের' প্রচলন অধিক, সেখানে দূষিত 'আইস্ ক্রিম' সেবনে অনেক স্থলে টাইফয়েডের আক্রমণ ঘটিতে দেখা যায়।

খাদ্য দ্বারাও সহজে সংক্রামণ ঘটিয়া থাকে। রোগীর সেবাকারীর অপরিষ্কৃত হস্ত স্পর্শে বা মক্ষিকার দ্বারা খাদ্য দূষিত হইতে পারে। যে জমিতে দূষিত মল সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উৎপন্ন ফল মূল বা শাক সব্জি ব্যবহারও বিপদ জনক।

উপরোক্ত কারণ সমূহ ব্যতীত, সংক্রামণের আরও একটি কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অল্পদিন হইল আবিষ্কার করিয়াছেন। রোগ সংক্রামণ অনেক তথা-

কথিত স্বাস্থ্যবান্ লোক হইতেও ঘটিয়া থাকে। এই সকল লোকের দেহের কোন অংশে টাইফয়েড বীজাণু বসতি করিয়া থাকে এবং বহুদিন ধরিয়া মল ও মূত্রের সহিত নির্গত হয়। এই সকল লোককে 'টাইফয়েড বাহক' বলা হয়। যাহার কখনও এণ্টারিক জ্বর হয় নাই এরূপ স্বাস্থ্যবান লোকও 'টাইফয়েড বাহক' হইতে পারে। যাহারা পূর্ব্বে টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়াছিল তাহাদের অন্ত্র হইতে টাইফয়েড বীজাণু পিত্ত কোষে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুবিধা জনক স্থান পাওয়ায় বহু দিনের জন্য তথায় থাকিয়া যায়। পিত্ত নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে বীজাণু বাহির হইয়া মল মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই সকল 'টাইফয়েড বাহক' দ্বারাই বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কিরূপে ইহাদের হইতে সংক্রামণ নিবারিত হইতে পারে বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যবিদ্-গণের তাহারই উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহ হইতে আমাদের টাইফয়েড সংক্রামণ হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

(১) কাঁচা শাক সব্জি ও ফলমূল
(২) দূষিত দুগ্ধ
(৩) দূষিত জল
(৪) সংস্পর্শ
(৫) মক্ষিকা
(৬) Shell মৎস্য
(৭) রোগ বাহক

তিন প্রকার উপায় অবলম্বনে আমরা রোগ প্রতিষেধ করিতে পারি।

প্রথম উপায়—যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং রোগীর মল মূত্রাদিতে পরিশোধক ঔষধ দেওয়া। এজন্য চিকিৎসকেরই দায়িত্ব অধিক। মূত্র পরিশোধন করিতে, কার্ব্বলিক এসিড সলিউসন (1 in 20) এবং পার-ক্লোরাইড অফ্ মারকারি সলিউসন (1 in 1000) এই দুইটীর যে কোনটি মূত্রের পরিমাণের $\frac{1}{10}$ অংশ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত সলিউসন মিশ্রিত মূত্র রক্ষা করা যাইতে পারে।

মল শোধন করিতে উত্তাপই প্রকৃষ্ট উপায়। মল পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, সুবিধা না হইলে বাটী পুষ্করিণী বা কূপ হইতে দূরে, মাটির অন্ততঃ ২।৩ ফিট নীয়ে প্রোথিত করিতে হইবে। মলে তিন গুণ পরিমাণ শোধক সলিউসন মিশ্রিত করিয়া ৫।৬ ঘণ্টা কাল রাখা যাইতে পারে।

জল চিকিৎসার (Hydrotherapy) দ্বারা টাইফয়েড রোগের উত্তাপ কমাইতে হইলে, রোগীর স্নানের জল শোধনের পক্ষে Chloride of lime বা Bleaching powder ব্যবহার করা উত্তম। অর্দ্ধসের পরিমাণ Chloride of lime পাঁচ মন স্নানের জলকে দূষিত হইলেও অর্দ্ধ ঘণ্টারমধ্যে পরিশুদ্ধ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় উপায়—রোগীর গৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। চিকিৎসকের আদেশ মত কার্য্য করার দায়িত্ব গৃহস্থের উপর থাকে। গৃহের পরিচ্ছন্নতার মধ্যে, রোগীর মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি শোধন সকল বিষয়ই ধরিতে হইবে। রোগীর থুতু কফ প্রভৃতি সম্বন্ধে যক্ষ্মা রোগীর মতই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ছোট ছোট নেকড়ায় থুতু সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা ভাল।

রোগীর পরিহিত বস্ত্রাদি ও শয্যার আস্তরণ প্রভৃতি দুই ঘণ্টাকাল কার্ব্বলিক এসিড সলিউসনে (1 in 20) ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ফুটাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। রোগীর ব্যবহৃত সমস্ত পাত্র ফুটাইয়া লইতে হইবে। রোগীর সেবাকারীর পরিশোধক জল দিয়া হস্ত পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে প্রত্যক্ষ সংক্রামণ নিবারিত হইবে।

বাটীর অন্যান্য লোকের সংক্রামণ নিবারণ জন্য কতকটা পৃথক ভাবে থাকা আবশ্যক। রোগীর গৃহের দরজা জানলায় পাতলা পরদা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে, ইহাতে মক্ষিকা দ্বারা রোগ বিস্তৃতি নিবারিত হইবে।

তৃতীয় উপায়—সহর ও পল্লীতে সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষাকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা। সংগৃহীত মল দূরী করণের সুব্যবস্থা ইহার অন্তর্গত ধরিতে হইবে।



উপরি উক্ত উপায় গুলি অবলম্বিত হইলে টাইফয়েড বীজাণুর মানব দেহ আক্রমণ সহজে সম্ভবপর হইবে না।

কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য বিভাগই রোগ নিবারণের জন্য প্রথমত দায়ী। সমস্ত আবর্জ্জনা দূরীকরণ, সাধারণের পানীয় জলের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং খাদ্যাদি বিশুদ্ধ রক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়ত—সমস্ত বাটীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহস্থ দায়ী। নিম্নলিখিত বিষয়ে গৃহস্থের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১) রন্ধন গৃহের পরিচ্ছন্নতা—মক্ষিকা যাহাতে দূষিত না করে সেজন্য সমস্ত খাদ্য আবৃত রাখিতে হইবে।

(২) জল ফুটাইয়া লইতে হইবে।

(৩) দুধ খুব ভালরূপে ফুটাইয়া লইতে হইবে।

(৪) বাটীর কূপ বা সঞ্চিত জলের চৌবাচ্ছা যাহাতে দূষিত না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয়ত—ব্যক্তিগত দায়িত্ব সমূহ।

(১) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা।

(২) স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালন দ্বারা নিজ স্বাস্থ্য ও বল রক্ষা করা।

(৩) টাইফয়েডের টীকা লওয়া।

টাইফয়েড বীজের টীকা লইলে যে রোগ প্রতিষেধ শক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হয়, সার এ, ই, রাইট সার্হেব তাহা দেখাইবার পর সাধারণের মধ্যে টীকা লওয়ার আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশদিন অন্তর করিয়া তিনবার এই টীকা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বার টিকা দেওয়ার পর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় কিন্তু আসলে টীকা গৃহীত ব্যক্তির রক্তের টাইফয়েড বীজাণু নষ্ট করার শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, টীকা গৃহীত বৃটিশ সৈন্য অপেক্ষা সাধারণ বৃটিশ সেনার মধ্যে টাইফয়েডের প্রভাব ছয় গুণ অধিক। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ আধিক্য দশগুণ। যে সকল টীকা গ্রহণ কারী রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকে তাহাদের মধ্যে সুফলই দেখা যায়। টীকা লওয়ার দুই বৎসর পর পর্য্যন্ত রোগ প্রতিষেধ শক্তি অক্ষুন্ন থাকে। যাহাদের সংক্রামণের সম্ভাবনা আছে—বিশেষত সেবক সেবিকা মাত্রেরই টিকা লওয়া উচিৎ।

"রোগবাহক" নির্দ্ধারণ করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। পাচক পাচিকা 'রোগবাহক' হইলে গৃহস্থের বিশেষ ভয়ের কথা। এক স্থানে একজন নিরীহ নূতন পাচক ৩৯ জনের মৃত্যুর কারণ বলিয়া চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইয়াছিল। এক জন লোক দশ বৎসর কাল "রোগ বাহক" ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েক বৎসর কাল জার্ম্মনিতে টাইফয়েড জ্বর একেবারে দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছিল। টাইফয়েডের বিশেষ প্রভাব-যুক্ত এক স্থানে বিখ্যাত কক্ (Koch) সাহেব অনেক গুলি সহযোগী লইয়া একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি ৭২ জন লোককে টাইফয়েড বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত দেখিয়াছিলেন। আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বিশেষ প্রতিষেধক উপায় সমূহ অবলম্বন করা হইয়াছিল। ফলে তিন মাসের মধ্যে টাইফয়েড বীজাণু দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল এবং রোগিগণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কাহারও আর নূতন আক্রমণ ঘটে নাই এবং সেই স্থান হইতে টাইফয়েড জ্বর দূরীভূত হইয়াছিল।

## বিবিধ সংগ্রহ।

**জলের কলে দান**—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মেদিনীপুর সহরে জলের কল স্থাপনে সাহায্য স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

**বঙ্গে অন্ধের সংখ্যা**—বঙ্গদেশে অন্ধ নরনারীর মোট সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার। ৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক অন্ধের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার হইবে।

---

**যুক্ত রাষ্ট্রে মাদক বন্ধ**—আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সিনেটে এই মর্ম্মে এক বিল পাশ হইয়া গিয়াছে যে ১৯১৯ সনের ৩০শে জুনের পর কেহ তথায় কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

---

**ধূমপান নিবারণ বিল**—গতবর্ষে ডাক্তার সারওয়ার্দি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে ধূমপান নিবারণ বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার বিচারভার এক সিলেক্ট কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। কমিটি দুই মাস মধ্যে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

**বঙ্গে মাদক দ্রব্যের কাটতি**—বঙ্গে ১৯১৫ সনে গাঁজার কাটতি হইয়াছে ৯২০১৬ সের, ১৯১৬ সনে ৭৩২৯৮ সের, ১৯১৭ সনে ৭৫৬৯৩ সের। আফিং এর কাটতি ১৯১৫ সনে ৫২৮২৩ সের, ১৯১৬ সনে ৪৩৪৭৭ সের, ১৯১৭ সনে ৩৮১১৮ সের, মদের কাটতি ১৯১৫ সনে ৩১৩৯৫০০ সের, ১৯১৬ সনে ৩০১০০০০ সের, এবং ১৯১৭ সনে ৩১৮৫০০০ সের। বঙ্গে আফিং ও গাঁজা সেবনকারীর সংখ্যা কমিতেছে, কিন্তু মদ্যপায়ীর সংখ্যা প্রায় একরূপই আছে।

---

**মিউনিসিপালিটির কুকুর হত্যা**—বঙ্গের সমস্ত মিউনিসিপালিটিতেই অতি নৃশংস ভাবে কুকুর বধ করার প্রথা আছে, ইহা বড় নির্দ্দয় প্রথা। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কুকুর বধের এক সভ্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কুকুর গুলিকে একটা লোহার দ্বারহীন বায়ুহীন পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে উদ্বায়ী হাইড্রো-কার্ব্বন ঢালিয়া দিয়া নিঃশ্বাস রোধপূর্ব্বক কুকুর গুলিকে মারিয়া ফেলা হইবে।

---

# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | আশ্বিন ১৩২৫ সাল | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## আলোচনা

**গঙ্গার জলে স্বাস্থ্যহানী**—বঙ্গের সেনিটারি কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী সাহেব গঙ্গাজল পরীক্ষা করিয়া তাহাতে বিষ্টার পোকা পাওয়ায় গঙ্গা তীরস্থ মিউনিসিপালিটি সমূহকে সতর্ক করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, ভাগীরথীর জল মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুষিত থাকে। সে জল পান করিলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

তাঁহার মতে গঙ্গাজলে যাহাতে কেহ মল মূত্র ত্যাগ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গঙ্গাতীরে বহু কল কারখানা আছে, সেই সকল কারখানার কুলিদের মল তরলীকৃত করিয়া নিত্য গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বেণ্টলী সাহেব কলওয়ালাদিগকে নিজ ব্যয়ে কোন দূরবর্ত্তী জনপদ বিহীন প্রান্তরে মল মূত্রাদি প্রোথিত করার প্রস্তাব জানাইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বাহাদুর গঙ্গাজলে কারখানার মল নিক্ষেপের স্বাস্থ্যহানীকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই। যাহা হউক, গঙ্গার জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া পান করার জন্য আমরা সাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

**ভেজাল নিবারক বিল**—বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম সচিব বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজা বাহাদুর বাঙ্গালা দেশে আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ নিবারণার্থ এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, বঙ্গদেশে দুধ, ঘি, সরিষার তৈল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রন সকল স্থলেই চলিতেছে। প্রচলিত বিধির দ্বারা এই দুষ্কার্য্য নিবারণ করা যাইতে পারিতেছে না। প্রস্তাবিত বিল দ্বারা কেবল ঘৃত নহে, অপর আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল নিবারিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

এই বিলপাশ হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হইবে আশা করা যায়। আমরা সর্ব্বান্তকরণে ইহার সমর্থন করিতেছি।

**মেডিকেল কলেজ বৃত্তি**—'শিক্ষা-সমাচার' লিখিয়াছেন:—অন্যান্য সরকারি কলেজের ন্যায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও কতকগুলি বৃত্তি প্রদান

করা হয়। বেলগাছিয়া কলেজ স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বে সমস্ত বৃত্তি কলিকাতা মেডিকেল কলেজেই প্রদত্ত হইত। এখন বঙ্গে আর একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তও হইয়াছে। কিন্তু বেলগাছিয়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও এখন পর্য্যন্তও ডাক্তারী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিগুলি কেবল কলিকাতা মেডিকেল কলেজেই প্রদত্ত হইতেছে। এই কারণে অনেক প্রতিভাশালী ছাত্র বেলগাছিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হয় না। আই, এ কিংবা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রকাশ করিলে যেমন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কলেজের বা স্কুলের ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়, মেডিকেল বিভাগের বৃত্তির সম্বন্ধের তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বেলগাছিয়া কলেজের ছাত্রেরাও যাহাতে সরকারি বৃত্তি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা বিহিত না হইলে এই কলেজের ভবিষ্যত উজ্জল হইবে আশা করা যায় না। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল বিভাগের বৃত্তিগুলি বেলগাছিয়া কলেজের ছাত্রগণও যাহাতে সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পাইবার অধিকারী হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন অথবা বৃত্তিগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ ক্রমে দুই কলেজে ভাগ করিয়া দিবেন।

প্রস্তাবটী অতি যুক্তি সঙ্গত। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে শীঘ্র আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

**রেজেষ্ট্রিভুক্ত ডাক্তার**—পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারদের নাম এখন সরকার হইতে রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা হয়। যাহাদের নাম তালিকাভুক্ত নহে তাঁহারা চিকিৎসাক্ষেত্রে পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের অধিকার প্রাপ্ত হন না।

কলিকাতা মেডিকেল স্কুল এবং কলেজ অফ ফিজিসিয়ান ও সার্জ্জন হইতে যাহারা ডাক্তারী পাশ হইয়াছেন তাহাদিগকে ঐ তালিকা ভুক্ত করা হয় না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় উক্ত দুই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে তালিকা ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। সরকার হইতে সার হেনরি হুইলার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল। অতঃপর ভোট গৃহীত হইল। ইহার পক্ষে ২১ এবং বিপক্ষে ১৭ জনে মত দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমরা এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

**আয়ুর্ব্বেদ ও মান্দ্রাজ লাট**—মান্দ্রাজ লাট কৌন্সিলে আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসায় সরকারী সাহায্য প্রার্থনার এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সেকেলে অসভ্যজনোচিত অপ্রচলিত চিকিৎসা। ইহার অবলম্বনে সভ্য দেশের চক্ষে গবর্ণমেণ্টকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।" অনেকেই মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ধারণায় বিস্মিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সাহায্যকল্পে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক ২৷৷০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন, আর মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহাকে প্রাচীন অসভ্যজনোচিত বলিয়া উপেক্ষা করিলেন!

---



# সভ্যতা ও সংক্রামকতা

লেখক—শ্রীবিমলেন্দু মিত্র।

আমরা আজকাল সভ্য হইয়াছি, আমরা এখন হোটেলে খাই, মেসে থাকি, রেল গাড়ীতে 'ট্রাভেল' করি, সভাসমিতি ও ক্লাবে যোগদান করি। এই সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি সংক্রামক রোগ আমাদিগের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিবার সুবিধা পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী কর্ত্তৃক কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, যাঁহারা উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারেন যে কিরূপে আধুনিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক রোগ সকলেরও প্রসার প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। মানুষ চিরদিনই সমাজ প্রিয়, সমাজবদ্ধ ও একত্র হইয়া থাকিতে ভালবাসে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একত্র সম্মিলন, একত্র শয়নোপবেশন ও পান ভোজনাদিও বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছি বলিয়া দশজনে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের মনভাব ব্যক্ত করি এবং দশজনে মিলিয়া উৎসব আনন্দ করি। এই সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আমরা সভ্যতাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, কিন্তু যাহাতে সভ্যতা সংশ্লিষ্ট সংক্রামক রোগগুলির আর প্রসার প্রতিপত্তি না ঘটে তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমরা সভ্যতা চাই কিন্তু তাহার যে কণ্টক অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল সংক্রামক রোগ সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা চাহি না। সুতরাং সভ্যতা মূলক অনুষ্ঠানগুলিকে আমাদিগকে এরূপভাবে সংশোধিত ও নিয়মিত করিতে হইবে যে তাহাতে সংক্রামক রোগোৎপত্তির আর কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা না থাকে। কিরূপে সভ্যতাকে আশ্রয় করিলে সংক্রামক রোগ সকল নিবারণ করা যাইতে পারে যে বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

বর্ত্তমান হোটেলে বা ঐরূপ যে কোনও সাধারণ ভোজনালয়ে যেরূপ ব্যবস্থা তাহাতে অনেক স্থলেই সংক্রামক রোগোৎপত্তির বিশেষ সুবিধা ও সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক হোটেলেই একটা সাধারণ অপরিষ্কৃতি ও সুব্যবস্থার অভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে আমরা সচরাচর যে সকল হোটেল দেখিতে পাই সেই সকলের বিষয়ই বলা হইতেছে, তবে যদি কোথাও কোনও সুপরিচালিত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ হোটেলাদি থাকে তাহা এই মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। হোটেল বা মেসে সাধারণতঃ অনেক লোক এক ঘরে অবস্থান করে। তাহাতে সকলেরই পরস্পরের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং তাহার মধ্যে যদি কাহারও কোনওরূপ সংক্রামক ব্যাধি থাকে তাহা হইলে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে উহা বিস্তৃত হওয়া খুব সহজ ও স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ হোটেল বা মেসে বাসন ভালরূপ পরিষ্কার করা হয় না। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবেই প্রধাণতঃ এইটী ঘটে। তদ্ভিন্ন অনেক সময় খুব তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিতে হয় সেই জন্যও ভালরূপ পরিষ্কারের সময় হয় না এবং কোনও কোনও স্থলে ভোজন পাত্রাদির অল্পতা বশতঃও এইরূপ ত্রুটী ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে একের উচ্ছিষ্ট অন্য লোককে ভোজন করিতে হয়। একজন যে পাত্রে আহার করিল তাহা যদি উত্তমরূপে প্রক্ষালিত না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে পূর্ব্ব ভোজনকারীর সংশ্রব রহিয়া যায়, সুতরাং একজন সংক্রামক রোগযুক্ত লোক যে পাত্রে ভোজন করিল তাহার পরে আর যে কেহ সেই পাত্রে ভোজন করিবে তাঁহারই ঐ রোগ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বসিবার আসনাদি হইতেও এই সংক্রামক রোগ বিস্তৃত হইতে পারে। সুতরাং আসনাদি প্রত্যহ বিশেষরূপে পরিষ্কৃত রাখা উচিত।

বাহিরের সাধারণ লোক এ সকল অপরিচ্ছন্নতি সম্বন্ধে তত লক্ষ্য করে না। অথবা তাঁহাদের সে অবসর বা ইচ্ছাও থাকে না। হয়তো তাঁহারা খুব ব্যস্ত থাকেন আর তাহা না হইলে লোভ আসিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে আশ্রয় করে, তখন তাহারা আহার্য্য পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য করেন না। রসনাই তখন অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কবি যথার্থই কহিয়াছেন—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। তবে যাঁহারা হোটেল বা মেসের পরিচালক তাঁহারা এই বিষয়ের সত্যতা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকেই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। মেসে, হোটেলে বা অন্যান্য সাধারণ ভোজনালয়ে যাহাতে এই সকল অপরিচ্ছন্নতি নিবারিত হয়, যাহাতে নিয়মিত শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং যাহাতে স্বাস্থ্যকর বিধান প্রবর্ত্তিত হয় সত্বাধিকারী বা পরিচালকগণের সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

মেস বা হোটেলই যে সংক্রামক রোগের একমাত্র হেতু বা জন্মস্থান তাহা নহে। নানা কারণে ও নানা স্থানে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে। রোগের গতি বড়ই সূক্ষ্ম, কোন ছিদ্রে বা কোন অবসরে রোগ যে কাহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া আর কি উপায়ে সংক্রামক রোগ আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে।

আজকাল চা পান ও সিগারেটের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। নিজের বাড়ীতে চা পান বিশেষ দোষের না হইলেও চায়ের দোকানে বা চা খানায় চা পান করা অনেক সময় আপত্তি ও বিপজ্জনক। হোটেলের বাসনাদিতে আহার করায় যে আপত্তি চা-খানার পেয়ালায় চা পান করারও সেই আপত্তি। চায়ের পেয়ালা ও ডিস্ অনেক সময় ভালরূপ ধৌত হয় না, সুতরাং একের উচ্ছিষ্ট অন্যকে পান করিতে হয়। সুতরাং এখানেও সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পরিচালকগণের এই সকল ত্রুটী নিবারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। সিগারেট প্রভৃতি খাওয়াও এইরূপ কারণে আপত্তিজনক। অনেক সময় একটী সিগারেট ২।৩ জন বা ততোধিক লোকে পান করেন। ইহাতে একের মুখের লালা অন্যের মুখে সহজেই প্রবেশ করে। সুতরাং একের কোন সংক্রামক রোগ থাকিলে অন্যের মধ্যে তাহা সংক্রামিত হওয়া অত্যন্ত সহজ। হুঁকায় তামাক খাওয়ায়ও অনেক স্থলে এইরূপ দোষ ঘটে। এক হুঁকায় অনেক লোকে তামাক খান, তাহাতে উপরোক্ত ভাবে রোগ জন্মিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যেখানে সেখানে যখন তখন সিগারেট তামাক খাওয়া উচিত নহে। তাহা হইলেও অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়। তদ্ভিন্ন নিতান্ত যখন খাইতে হইবে তখন উচ্ছিষ্ট অংশ বাদ দিয়া বা একটু পরিমার্জ্জিত করিয়া খাওয়া উচিত। এই সকল বিষয়ে একটু দৃষ্টি থাকিলেই সহজে আমরা অনেকটা নিরাপদ থাকিতে পারি। ট্রাম ও রেলগাড়িতে ভ্রমণ করা, যাত্রা বা থিয়েটার দেখা ও সভা সমিতিতে যোগদান করা ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য উপরোক্ত কারণে আপত্তি জনক, তবে সাবধানে ও সংযতভাবে আমাদিগকে এ সকল কার্য্য করিতে হইবে।

---



# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## একবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্থ স্তবক।

### মস্তিষ্ক ও তাহার বিভিন্ন বিভাগ।

করোটি কোটর মধ্যে স্নায়ু তন্ত্রের যে কেন্দ্রীয় অংশ নিহিত, তাহার নাম "ব্রেণ" (Brain) অর্থাৎ মস্তিষ্ক। নিম্নতর কশেরুকা সমূহের মধ্যে যে মস্তিষ্কের অংশটি নিহিত রহিয়াছে, শক্তি ও ক্রিয়া হিসাবে তাহা অতি নিকৃষ্ট। মৎস্য, ভেক, গিরগিটি ও পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীতেও মস্তিষ্কের এই অংশ আছে। গো-মেষাদি স্তন্যপায়ী প্রাণীতে নিম্নতর কেশেরুকা মধ্যে নিহিত মস্তিষ্কাংশ কিছু পরিপুষ্ট, কিন্তু উহা পরিণতিতে মানব-মস্তিষ্কের সমকক্ষ নহে। তবে উচ্চশ্রেণীর বানর ও বনমানুষ প্রভৃতির মস্তিষ্কের সহিত মনুষ্য মস্তিষ্কের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবের মস্তিষ্ক উচ্চশ্রেণীর বানরদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বিশিষ্টভাবে পরিপুষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া-কৌশল সম্পন্ন। মস্তিষ্কের এই অসাধারণ পরিণতি ঘটাতে মানুষ সৃষ্ট জীব সকলের অগ্রণী হইয়াছে।

সাধারণ মানবের মস্তিষ্কের ওজন ৪০—৪৫ আউন্স। কিন্তু যাঁহারা খুব চিন্তাশীল—মস্তিষ্কের চালনা যাঁহারা সম্যক প্রকারে করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের ওজন ৬০—৬৫ আউন্স পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। টোপ (Convolution) সকল সহ সুসজ্জিত মহা মস্তিষ্কেই (Cerebrum) মস্তিষ্কোপাদানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মস্তিষ্কের অপরাংশগুলি উপাদান প্রাচুর্য্যে মহামস্তিষ্কের সমতুল্য না হইলেও প্রয়োজনীয়তায় তদপেক্ষা হীন নহে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগগুলির মর্য্যাদা বুঝাইবার পূর্ব্বে ভ্রূণের পরিণতি ও পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দুই তিন সপ্তাহের শিশু বা ভ্রূণের মস্তিষ্কের সন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে অতি কোমল ও সূক্ষ্ম নালিকার (tube) আকারে উহার অপুষ্ট মস্তিষ্কের সূচনা রহিয়াছে। এই নালিকার যে অংশ মস্তিষ্কের দিকে প্রসারিত, তাহাই ফুলিয়া উঠে; তাহার পর এই স্ফীত অংশটি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিনটি শূন্যগর্ভ গোলকের আকার ধারণ করে। এই তিনটি ফাঁপা গোলক (Vesicles) মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান বিভাগের নিদর্শনাত্মক। যে গোলকটি সর্ব্বাগ্রে থাকে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া অগ্র-মস্তিষ্ক The fore-brain) রূপে পরিণত হয়। আর মাঝখানে যে গোলকটি থাকে পরিপুষ্ট হইয়া মধ্য-মস্তিষ্ক (The mid brain) গঠন করে। আর এই দুই গোলকের পশ্চাতে অবস্থিত গোলকটি পুষ্টি লাভ করিয়া পশ্চাদ্মস্তিষ্ক (The hind-brain) রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

পশ্চাদ্মস্তিষ্কটি নিম্নে প্রসারিত হইয়া মেরুদণ্ড নাড়ীর সহিত নীচের দিকে অনেকটা নামিয়া যায়। সুতরাং পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্ক নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়:—

১। পুরোমস্তিষ্ক বা মহামস্তিষ্ক, (The Fore Brain or Cerebrum.)

২। মধ্য মস্তিষ্ক (The Mid Brain.)

৩। পশ্চাদ্মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক বেণী (The Hind Brain or Cerebellum and Oblong marrow.)

সুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল যে ভ্রূণের পশ্চাদ্মস্তিষ্ক হইতেই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মস্তিষ্কের দুইটি সতন্ত্র অংশের উৎপত্তি হইয়াছে। অগ্র মস্তিষ্ক বা মহা মস্তিষ্ক (Cerebrum) মানব মস্তিষ্কের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল অংশ

এবং ইহার ক্রিয়াও বহুবিধ সুতরাং আমরা স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয় আলোচনা করিব।

মধ্য-মস্তিষ্কটি মহামস্তিষ্ক ও পশ্চাম্মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আবার মধ্য-মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক বেণীর (Oblong marrow) মধ্যে "মস্তিষ্ক সেতুর" (pons varolli) স্থান। নিম্নে মস্তিষ্কের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, তাহা দেখিয়া পাঠক মধ্যমস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের স্থান-সংস্থান সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

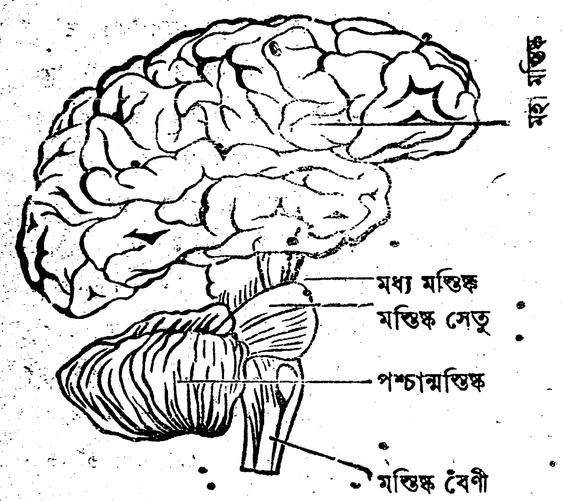


চিত্র ৬১—মস্তিষ্ক ( পার্শ্ব দৃশ্য )।
মধ্যে মস্তিষ্ক দেখাইবার জন্য পশ্চাম্মস্তিষ্ক হইতে অগ্র মস্তিষ্ক পৃথক করা হইয়াছে।

যে ভাবে মস্তিষ্কের অংশ সমূহ সভাবতঃ বিন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতে মধ্য মস্তিষ্কটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সব দিক হইতে এই মধ্যমস্তিষ্ককে দেখাইতে হইলে পশ্চাম্মস্তিষ্ককে মহামস্তিষ্কের নিকট হইতে খানিকটা তফাতে সরাইয়া লইতে হয়।

মধ্য-মস্তিষ্কের কাজ কি? দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পাদন, কেননা শ্রুতি কেন্দ্র ও দৃষ্টি কেন্দ্র এই মস্তিষ্কে নিহিত। যে স্নায়ু-মালা চক্ষুর বিভিন্ন পেশী গুলিকে পরিচালিত করে তাহাদিগের উৎপত্তি কেন্দ্রগুলিও এই মস্তিষ্কে রহিয়াছে। সুতরাং দৃষ্টি যন্ত্র বা দর্শেনেন্দ্রিয়ের সহিত মধ্য-মস্তিষ্কের সংস্রব খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দর্শন ও শ্রবণ সংক্রান্ত কার্য্য ব্যতীত আরও কয়েকটী কার্য্য এই মধ্য-মস্তিষ্ক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মস্তিষ্কে বহু সংখ্যক তন্তু আছে, এই তন্তুগুলি বৃত্তচ্ছদ ( Periphery ) হইতে সংবাদ আনিতেছে অথবা অগ্রমস্তিষ্ক বা মহামস্তিষ্কের হুকুমগুলি দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র সমূহের কাছে জারি করিতেছে। সুতরাং মধ্য-মস্তিষ্কটা মধ্যস্থের মত এক দিকে মহামস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং অন্য দিকের দেহের যন্ত্র সমূহের তন্তুমালার (Tissues) মাঝে কাজ করিতেছে। মধ্য মস্তিষ্কের মধ্যে যে তন্তুমালা প্রসারিত আছে, তাহার কতগুলি বৃত্তচ্ছদ (Periphery) হইতে আসিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে এবং কতকগুলি মস্তিষ্ক হইতে বৃত্তচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, অর্থাৎ তন্তুপুঞ্জ মস্তিষ্ক মধ্যে বিন্যস্ত থাকিলেও তাহাদিগের কতকগুলির মূল মস্তিষ্কে এবং কতকগুলির মূল বৃত্তচ্ছদে নিহিত। কিন্তু এই দুই প্রকার তন্তুকেই মস্তিষ্ক-সেতুর (Brain Bridge বা Pons Varolii) ভিতর দিয়া প্রসারিত হইতে হইয়াছে। মানব মস্তিষ্কের অন্তর্গত এই

## মস্তিষ্ক—সেতু

গঠনের বিশিষ্টতায় সহজেই দ্রষ্টার চিত্ত আকর্ষণ করে, মস্তিষ্কের অধোভাগে ইহার স্থান্। ইহার "মস্তিষ্ক-সেতু" (Pons Varolli) নামটি সার্থক, কারণ এই সেতুটি মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যোগ স্থাপনার অবলম্বন স্বরূপ। "মেডুলা অবলঙ্গেটা" অর্থাৎ মস্তিষ্ক-বেণীর তন্তুমালা মস্তিষ্ক-সেতু অবলম্বনে মধ্য মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শেষে মহামস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে, একথাটী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার যে সকল তন্তু পশ্চাম্মস্তিষ্কের (Cerebellum) উভয় ভাগকে সংযুক্ত করিয়াছে তাহাদিগের অবলম্বনও এই মস্তিষ্ক-সেতু। মস্তিষ্ক-সেতুর মধ্যে এক ধূসর উপাদান আছে। এই ধূসরোপাদান হইতে মস্তিষ্কের স্নায়ুমালা (Cranial nerves) উৎপন্ন হইয়াছে।



## পশ্চাম্মস্তিষ্ক---Cerebellum.

এইবার আমরা "পশ্চাম্মস্তিষ্কের" কথা কহিব। আকারের পরিমাণ ধরিলে, বস্তু-গৌরবে ইহার স্থান ঠিক মহামস্তিষ্কের নিম্নে। পশ্চাম্মস্তিষ্কের অবস্থান ঠিক মহা-মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে, ইহা প্রাচীরাস্থি (occipital bone) দ্বারা পিছন হইতে সুরক্ষিত। এই মস্তিষ্ক কর্ণ হইতে কর্ণান্তর পর্য্যন্ত ব্যপ্ত এবং আকারে মধ্যমাকৃতি কমলা-লেবুর মত।

আমরা অদ্যাপি পশ্চাম্মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপ এবং শক্তির সম্যক পরিচয় পাই নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ধাবন্, কুর্দ্দন, লম্ফন প্রভৃতি ক্রিয়া-গুলি পশ্চাম্মস্তিষ্কের প্রেরণা বা শক্তি পরিচালনার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সরলভাবে দাঁড়ান অনায়াস সাধ্য কার্য্য। ঐ কাজটা আপততঃ লোকের নিকট বড় অনায়াস-ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ভাহা হইলে বোধ হয় করিয়াছেন, অধিকাংশ প্রাণীই চারিটি প্রত্যঙ্গের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণী সকলের মধ্যে কেবল এক মানুষই পশ্চাৎ প্রত্যঙ্গের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিয়া অনেক অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া থাকে।

যাঁহারা পশ্চাম্মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্ত অথবা পশ্চাম্মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সোজা হইয়া দাঁড়ান ও চলিয়া যাওয়ার ন্যায় দুই অতি সাধারণ কার্য্য সম্পাদনে এই ক্ষুদ্র পশ্চাম্মস্তিষ্কের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা বুঝিয়াছেন। ঐ প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চলিতে দেখিলে, আপনার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইবে। কারণ ঐ পীড়াগ্রস্ত বা আহত ব্যক্তি মাতালের মত টলিতে টলিতে অতি কষ্টে পথ চলিয়া থাকে। এই শ্রেণীর দুর্ভাগ্য লোক নিজের গতি-সংযমে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে যে গৃহ প্রাচীর এবং গৃহের আসবাব পত্রের গায়ে পর্য্যন্ত ধাক্কা খাইয়া থাকে। তাহার শরীরের এবং অঙ্গ-চালনার অবস্থাটা ঠিক ঠাহর করিতে পারে না। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবে এক-দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা কিরূপে ঋজু হইয়া দাঁড়াই, চলা ফিরা করি এবং দৌড়িয়া যাই? আমরা যখন পেশী সঞ্চালন করি অথবা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকার সময় আমাদিগের পেশীগুলি নিশ্চেষ্ট থাকে তখন আমাদিগের পেশীপুঞ্জ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধি সকল হইতে অনুভবাত্মক প্রেরণা (Sensory impul-ses) ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া পশ্চাম্মস্তিষ্কে পৌছিতে থাকে। আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে, চলাফিরা করিতে ও দৌড়াইতে পারিব বলিয়া অনুভবাত্মক প্রেরণা ঐ ভাবে পশ্চাম্মস্তিষ্কে উঠিয়া থাকে। এই প্রেরণাগুলি পশ্চাম্মস্তিষ্কে না পৌছিলে আমাদিগের দশাটা উক্ত মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত কিংবা পশ্চাম্মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মত হইবে। এক প্রকার রোগ আছে, যাহাতে রোগীর অনুভবাত্মক স্নায়ু-মূলগুলির কিংবা মেরুদণ্ড-নাড়ীর গমন পথের অবনতি বা দৌর্ব্বল্য ঘটে, এই রোগে রোগী হেলিয়া দুলিয়া টলিয়া টলিয়া এবং মাটীর উপর পদাঘাত করিয়া চলে, তাহার গমনভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় তাহার পা যে মাটিতে পড়িতেছে তাহা সে ঠিক ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এইবারে আমরা "মস্তিষ্কবেণী" (Oblong marrow) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মস্তিষ্কবেনী মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ বা শিখর দেশে সংস্থিত। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া মেরুদণ্ড নাড়ী (Spinal Cord) চলিয়া গিয়াছে। "মস্তিষ্ক-বেণী" প্রকৃত প্রস্তাবে মেরুনাড়ীর শিখাভাগ, মস্তকে প্রবেশ করিয়াই উহা গা ছড়াইয়া বিস্তৃত হইয়াছে।

মানব-মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে কার্য্য-কারিতায় মস্তিষ্ক-বেণী সর্ব্ব প্রধান; কারণ কোনক্রমে ইহা আহত হইলে মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। পশ্চাম্মস্তিষ্ক (Cerebellum) যেমন দেহের পেশী পুঞ্জের নিয়ামক, সেইরূপ "মস্তিষ্কবেণী" (Medulla oblon-gata) শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীগুলির এবং গলাধঃকরণ

কার্য্য পরিচালক পেশী সমূহের বিধাতা ও নিয়ন্তা। এই মস্তিষ্কবেণী মধ্যে শ্বসন কেন্দ্র, (Respiratory centre,) দেহনিয়মন কেন্দ্র (Vaso-motor-Centre) ও হৃদ্‌যন্ত্র নিয়মন কেন্দ্র সংস্থিত। শ্বসন-কেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালন. করে, দেহনিয়মন কেন্দ্র দ্বারা সর্ব্বশরীরের আধার সমূহ (Vessels) নিয়মিত হয়। এই দেহ নিয়মন কেন্দ্রের (Vaso-motor centre) প্রভাবে শরীরের শিরা সমূহ (Artaries) সর্ব্বদা আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। এই কেন্দ্রটি কোনক্রমে বিনষ্ট হইলে শিরাসমূহ প্রসারিত হয় শোণিতের সঞ্চাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়, ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। হৃদযন্ত্র নিয়মন-কেন্দ্র হৃদ্‌পিণ্ডের পরিচালনা করে। যে হৃন্নিয়মন-স্নায়ু (Vagus nerve) হৃদ্‌পিণ্ডে শক্তি-সঞ্চার করে তাহা হৃদয় পেশীর নিয়ানক বা সংযমনকারী। তাই যখন হৃন্নিয়ামক স্নায়ু কেন্দ্র উত্তেজিত হয় হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়। বিষময় ঔষধ খাইলে মানুষের প্রাণ বিয়োগ হয়। কারণ ঐ প্রকার বিষ শ্বসন-কেন্দ্র বা দেহনিয়ামক কেন্দ্রের শক্তি ক্ষয় করিয়া অথবা হৃন্নিয়ামক স্নায়ু কেন্দ্রের উত্তেজনা উৎপাদন পূর্ব্বক হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন রোধ করিয়া মৃত্যু ঘটায়। অধুনা প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য, প্রাণনশক্তি সম্পন্ন কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্ক-বেণীতে আছে সেই গুলিকে নষ্ট করা হয়। মোট কথা আমাদিগের দেহরাজ্য পরিচালনে এই দেড় ইঞ্চি মস্তিষ্ক বেণীর মহিমা অতি বিশাল।

## পঞ্চম স্তবক।

### স্নায়ু-তন্ত্র—মহামস্তিষ্ক।

অগ্রমস্তিষ্ক বা মহামস্তিষ্ক যে মস্তিষ্কের অংশসমূহের মধ্যে আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহামস্তিষ্ক করোটি কটাহটি (the vault of the skull) অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং করোটীর গঠন ও আয়তন দেখিয়া মানুষের মস্তিষ্কের পরিণতি-গত পার্থক্য ও তারতম্য বিচার করিতে পারা যায়। সাধারণ লোকদিগের মস্তিষ্ক আকারে সাধারণ তরমুজের মত। মহামস্তিষ্ক দুইটি অর্দ্ধগোলকে বিভক্ত। এই দুইটী অর্দ্ধগোলক স্নায়ু-তন্তু রচিত একটি স্থূল স্তর দ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেক অর্দ্ধগোলক আবার আমাদিগের শরীরের বিপরীত দিগের সহিত সংলগ্ন। দক্ষিণহস্তের ব্যবহার পটু সাধারণ লোকদিগের মহামস্তিষ্কের বামার্দ্ধ গোলক দক্ষিণার্দ্ধাগোলক অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট; কারণ দেহের দক্ষিণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনার আধিক্য বশতঃ বামার্দ্ধগোলকের পরিচালনাটা অধিক হইয়াছে। কিন্তু বামহস্ত চালনায় নিপুণ ব্যক্তির অবস্থাটা ঠিক উহার উল্‌টা, তাহাদিগের মহামস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধ গোলক অধিক পরিপুষ্ট।

মানুষের মস্তিষ্কের উপরিভাগটা পার্ব্বত্য প্রদেশের "চড়াই উৎরাই" সমন্বিত ভূমির মত তরঙ্গায়িত ও খাঁজ কাটা। মস্তিষ্কের এই তরঙ্গায়িত অংশগুলি সুস্পষ্ট, ইহার প্রত্যেক অংশকে Convolution অর্থাৎ টোপ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্য মস্তিষ্কে এই টোপগুলির বিন্যাসপদ্ধতি একই প্রকার। এক মস্তিষ্কের টোপের সহিত মস্তিষ্কের গঠন গত সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন মস্তিষ্কের টোপগুলির শরীর বিজ্ঞান সম্মত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মহামস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রণালীর অনুশীলনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন টোপের বিভিন্ন নাম করণ করিয়াছেন। আবার করোটির অস্থি গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মস্তিষ্কের উপরিভাগটা বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাই ঐ সকল প্রদেশকে "ললাটিকা প্রদেশ" (frontal region) "পার্শ্বিক প্রদেশ" (parital region), 'ললাট পার্শ্বিক প্রদেশ" (temporal region) এবং "প্রাচীরী প্রদেশ" (occiptal region) নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, মেরুদণ্ডনাড়ীর "মাজ" বা মধ্য বস্তু ধূসর উপাদানময়, এই 'মাজ'কে পরিবেষ্টন করিয়া পরিধিপ্রসারগত (peripherial) শ্বেতবস্তু রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কে ঐ ব্যবস্থাটা ঠিক উল্‌টা। মস্তিষ্কের উপরিভাগে ধূসর-বস্তু রচিত একটা পুরু স্তর, ঐ স্তরের ভিতর শ্বেতোপাদানময় একটা মাজ বা মধ্যবস্তু। মহামস্তিষ্কের একটা অংশ কাটিয়া তফাৎ করিলে দেখা যায় উহার ধূসর বস্তু মস্তিষ্ককোষিকা পুঞ্জের সমবায়ে রচিত এবং ঐ ধূসর বস্তু মস্তিষ্কের টোপগুলির ভাঁজের নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, মসৃণ মস্তিষ্কে যে পরিমাণে কোষময় উপাদান (Cell-material) থাকিবার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অনেক বেশী উপাদানের স্থান-সংকুলান হইয়াছে। ধূসর-বস্তুর মধ্যে যে শ্বেতোপাদান নিহিত আছে তাহা স্নায়ু তন্তু সমূহের দ্বারা রচিত; এই স্নায়ু-তন্তু রাজির সহায়তায় মস্তিষ্কের কোষগুলির সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ কার্য্য চলিয়া থাকে। মস্তিষ্ক কোষগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে, ইহারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহ সৃষ্টি করিয়াছে। মস্তিষ্ককোষ রচিত এই কেন্দ্রগুলিই মানব দেহের নিয়ামক। তবে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, মহামস্তিষ্কের বহিঃস্তরে যে কোষিকরাজি বিন্যস্ত সেইগুলির কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মস্তিষ্কের ঐ সব কোষের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। অনেক অবেক্ষণ হিসাবের পর পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ক কোষিকা গুলির সংখ্যা ৮০,০০০০০০০। তবুও এটা সূক্ষ্ম হিসাব নয়। মহামস্তিষ্কের অন্তস্থলে, প্রায় উহার কেন্দ্রের কাছাকাছি, একটা ধূসরবর্ণ পিণ্ডিকা আছে, উহার নাম মধ্য গ্যাংলিয়া (Central Ganglia). মস্তিষ্কের এই অংশের এবং আরও কতকগুলি অংশের ক্রিয়া আজিও মানব বুদ্ধির দ্বারা ঠিক আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে আমরা ইহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মী হিসাবে ধরিয়া লইয়াছি, ইহারা মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যখানে থাকিয়া আবশ্যক কাজ করিয়া থাকে। মধ্য গ্যাংলিয়ার একটি বিশিষ্ট অংশ (Corpus Striatum) "সংবাদ পরিমার্জ্জনাগার" বলিয়াই অনেকের ধারণা। এখানে সংবাদগুলি বাছাই করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাগুলিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উহার আর একটি অংশ সংবাদ গ্রহণাগার (Optic Thalamas) নামে পরিচিত, শরীর হইতে যে সব





সংবাদ মহামস্তিষ্কে প্রেরিত হয় সে গুলি সর্ব্বাগ্রে ঐখানে গৃহীত হইয়া থাকে। সেখানে সংবাদের বাহুল্যবর্জ্জন করিয়া খাঁটি সংবাদটা উপরে মস্তিষ্ক কোষ সমূহের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অসাধারণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় কেহ অভিভূত ও তন্দ্রাগত হইলে তাহার মহামস্তিষ্কে নিহিত মধ্য গ্যাংলিয়াটি স্বয়ং পরিচালিত হইয়া থাকে, তখন তাহার মহামস্তিষ্কের প্রেরণা আবশ্যক হয় না। কারণ তখন মহামস্তিষ্কের শক্তি প্রেরণা যেন বিরত্তিত হইয়া যায়।

মহামস্তিষ্কের কার্য্যকলাপ অতি জটিল। প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক মহামস্তিষ্কই মানব দেহের নিয়ন্তা। ইহার বিভিন্ন অংশের প্রেরণা প্রভাবে দৈহিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে; কোন অংশের দ্বারা কোন কোন কার্য্য পরিচালিত হয়, কোন অংশের সহিত দেহের কোন অংশের সম্বন্ধ, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধানতঃ উচ্চ শ্রেণীর বানরের উপর পরীক্ষা কার্য্য চালাইয়াছেন, কেননা মানব মস্তিষ্কের সহিত উহাদিগের মস্তিষ্কের সাদৃশ্য আছে! মানব মস্তিষ্কের 'টোপ' সমাবেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পীড়া অথবা আহত স্থান সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলেও শরীরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বৈজ্ঞানিকগণ মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রদেশ ও তৎসমুদয়ের ক্রিয়া বৈচিত্র বহুল পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন।

'লালাটিক প্রদেশ' (Frontal lobe) মানবের উচ্চ-ধ্যানে ও উচ্চ জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত হয়। ঐ প্রদেশটি ইচ্ছাশক্তি বা সংবিদের আসন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মননধারা, (Association-of ideas), অনুভূতি ও চিন্তা মহামস্তিষ্কের এই প্রদেশের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। সুতরাং এই প্রদেশটিকে "প্রজ্ঞাপ্রদেশ" বলা যাইতে পারে। লালাটিক প্রদেশের পশ্চাদ্‌ভাগটি ক্রিয়া পরিচালন প্রদেশ (Motor-area) নামে আখ্যাত।

কারণ এইটিই দেহের উদ্দীপনা বা প্রেরণা শক্তির ভাণ্ডার। জ্ঞাত সারে আমরা অঙ্গের যে সব চালনা করিয়া থাকি, তাহার প্রত্যেকটি এই অংশের উদ্দীপনা বা প্রেরণা শক্তির দ্যোতনা। কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইবা মাত্র মস্তিষ্কের ঐ অংশটিতে তাহার মননের উদ্ভব হইয়া থাকে। আর মননের উদ্ভবমাত্র ক্রিয়া পরিচালনা-প্রদেশের স্নায়ুকোষ স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল হয়। আর তখনই উহাতে স্নায়বিক প্রেরণার উদ্ভব হয় এবং ঐ প্রেরণা মস্তিষ্ক-কেন্দ্র নিহিত স্নায়ুতন্তুমালা বহিয়া মস্তিষ্ক-স্নায়ুর কেন্দ্র অথবা মেরুদণ্ডের স্নায়ু কোষ মহামস্তিষ্কে আজ্ঞা প্রচার করে, কারণ মেরুদণ্ড নাড়ী হইতে মেরুদণ্ড, স্নায়ু সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপে স্নায়বিক প্রেরণা পেশীপুঞ্জে পৌছিয়া পৈশিক প্রেরণায় (muscular energy) পরিণত হইয়া কর্ম্মপরিচালনা করে।

মহামস্তিষ্কের ক্রিয়াপরিচালনা প্রদেশের পশ্চাতে মস্তিষ্কের অনুভব প্রদেশ বা ঐন্দ্রিক প্রদেশ (Sinorium). মস্তিষ্কের এই অংশটি দেহের বার্ত্তাবহ বা ঐন্দ্রিক স্নায়ু-মালার দ্বারা নীত প্রেরণাগুলিকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে ঐন্দ্রিক প্রদেশের সন্নিবেশ না থাকিলে মানুষের পক্ষে শীতাতপ ও যন্ত্রণাদির অনুভব সম্ভবপর হইত না। কেহ অঙ্গুলি দ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ করিলে, তাহার আঙ্গুল প্রান্ত হইতে প্রসারিত স্নায়ু-মালার স্নায়বিক প্রেরণার উদ্ভব হয় কিন্তু তথাপি সে যে কোন বস্তু স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না, কারণ বার্ত্তাবহ স্নায়ুমালা দ্বারা সংবাহিত প্রেরণা মস্তিষ্কের ঐন্দ্রিক প্রদেশে নীত না হওয়া পর্য্যন্ত সে বোধ জন্মে না। মস্তিষ্কের ক্রিয়া পরিচালন প্রদেশ ও ঐন্দ্রিক প্রদেশ পরস্পরের প্রতিরোধ করে না, কারণ তাহারা তন্তু-সমাবেশ দ্বারা পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ সম্পন্ন, মস্তিষ্কের এক প্রদেশে স্নায়বিক প্রেরণা সমূহ নীত হইলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের ক্রিয়াকে সংযত করিতে পারে অর্থাৎ ঐন্দ্রিক প্রদেশ ক্রিয়াপরিচালন প্রদেশের এবং ক্রিয়াপরিচালনা প্রদেশ ঐন্দ্রিক প্রদেশের ক্রিয়া সংযত করিয়া ক্রিয়া শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। মনে করুন আপনি পিচ্ছিল ভূমির উপর দিয়া চলিতেছেন এবং স্বভাবতঃ পায়ের অঙ্গুলির উপর চাপ দিয়া পা ফেলিতেছেন, কারণ আপনার মনে পদ-স্খলনের ও পতনের আশঙ্কা জাগিতেছে। ঐরূপ ক্ষেত্রে পিচ্ছিল ভূমিতে পদক্ষেপ মাত্রেই এক প্রকার অদ্ভুত অনুভূতি আপনার মস্তিষ্কের ঐন্দ্রিক প্রদেশে নীত হইল। আর অমনই ঐন্দ্রিক প্রদেশের কোষিকাগুলি তন্তু সমাবেশের সাহায্যে ঐ সংবাদটা ক্রিয়াপরিচালনা প্রদেশের কোষিকাগুলিকে জানাইয়া দিল। তখন চরণের পেশীগুলিকে ঐ জরুরি খবরটা জানাইয়া অঙ্গুলি চাপিয়া সাবধানে গমনের জন্য ক্রিয়া পরিচালনা প্রদেশের কোষিকাগুলি ক্রিয়াশীল হইল।

মহামস্তিষ্কের এই তিনটি প্রদেশ ভিন্ন আরও কতকগুলি প্রদেশ আছে, উহাদিগের সহিত দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও রসন এই চারিটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু এই প্রদেশগুলি এখনও আশানুরূপ স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মহামস্তিষ্কের প্রান্তিক প্রদেশে চাক্ষুষ-ধারণার (Visual impression) স্থান। আবার চাক্ষুষ স্মৃতির (Visual memory) স্থান বা আধার-ক্ষেত্রটি প্রাচীরী প্রদেশের (Occipital lobe) সমস্ত উপরিভাগ ব্যাপিয়া সংস্থিত। এক বৎসর পূর্ব্বে একটি লোককে দেখিয়াছিলাম, দর্শন মাত্রেই ঐ ব্যক্তির দর্শনগত চাক্ষুষ ধারণাটি মস্তিষ্কের প্রাচীরী প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমার মস্তিষ্কের ধারণা-রক্ষণী শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইলে আমি আবার ঐ লোকটির মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিব! কিন্তু লোকটিকে চিনিবার পূর্ব্বে মস্তিষ্কে অনেক প্রকারের ক্রিয়ার খেলা চলিবে। মনে করুন, মানুষটাকে আবার দেখিলাম, লোকটার মুখের প্রতিবিম্ব আমার চক্ষুমুকুরে (Retina) প্রতিফলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার চাক্ষুষ-স্নায়ুতে (Optic nerve) স্নায়বিক প্রেরণার স্ফুরণ হইল এবং মধ্য মস্তিষ্কে অবস্থিত নিম্ন দর্শন কেন্দ্রগুলিতে ঐ প্রেরণাটি চলিয়া গেল।



[illegible]রা আবার ঐ প্রেরণাকে মস্তিষ্কের প্রাচীরী প্রদেশের [illegible] কেন্দ্র সমূহে পাঠাইয়া দিল। চাক্ষুষ স্নায়ুর [illegible]রণাটি প্রাচীরী প্রদেশে পৌছিল আমি চাক্ষুষ ধারণা [illegible] করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক [illegible], ও সতর্ক না হইলে আমি পূর্ব্বদৃষ্ট লোকটিকে [illegible] দর্শনেই চিনিতে পারিব না। এই দর্শন ক্রিয়া [illegible]চালনার সময় মস্তিষ্কের উর্দ্ধ চাক্ষুষ কেন্দ্র এবং [illegible] স্মৃতি কেন্দ্রের মধ্যে খুব রহস্যময় কার্য্য চলিয়া [illegible]! এই কার্য্যগুলি কেমন তাহা আমরা জানি না। [illegible] আমার চাক্ষুষ স্মৃতিতে পূর্ব্বদৃষ্ট লোকটির মুখের [illegible] ধারণা সঞ্চিত না থাকিলে আমি তাহাকে চিনিতেই [illegible]ব না।

[illegible] উচ্চ শ্রোত্র-কেন্দ্রগুলি ললাটপার্শ্বিক প্রদেশে অবস্থিত, [illegible] শ্রুতিস্মৃতির (Auditary memory) কেন্দ্রগুলিও [illegible] প্রদেশে নিহিত, কিন্তু তাহাদিগের স্থান সমূহ সুস্পষ্ট-[illegible] নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মস্তিষ্কের উপরিভাগের বিকলতা [illegible] মানুষের কয়েক প্রকার Epilepsy হইতে দেখা [illegible]। এই শ্রেণীর ব্যাধিতে রোগের প্রকোপ সুস্পষ্ট [illegible]শ পাইবার পূর্ব্বে মানুষ কোনরূপ দৃশ্য দর্শন এবং [illegible] প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া থকে। একজন রোগীর [illegible] প্রকোপ বৃদ্ধির পূর্ব্বে তাহার কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি [illegible] করিত, ঐ সময়ে তাহার মনে হইত পরলোক [illegible] তাহার মহাযাত্রার নিমন্ত্রণ আসিতেছে। আর [illegible] রোগী রোগের অতি প্রকোপের পূর্ব্বে দেখিত, [illegible] সুন্দরী রক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাহার পাশে [illegible]ইয়া আছে; এই দৃশ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার [illegible] বিলুপ্ত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরে [illegible] প্রকাশ পাইত। এইরূপ বিচিত্র দর্শন ও শ্রবণ [illegible] উপরিভাগের বিভিন্ন অংশের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার [illegible] ইহার সহিত দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়েরও সংস্রব থাকে!

[illegible]স্বাদন ও আঘ্রাণ শক্তির কেন্দ্র দুইটি ললাট পার্শ্বিক [illegible] সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। কুকুর প্রভৃতি যে [illegible] পশুর ঘ্রাণ শক্তি অতি প্রবল, বিজ্ঞানবিদগণ [illegible]দিগের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ললাট পার্শ্বিক প্রদেশে উহাদিগের মস্তিষ্ক খুব পুষ্ট। কেবল তাহাই নহে, উহাদের মস্তিষ্কের এই অংশ পরিপুষ্টিতে মানব মস্তিষ্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রোকা নামক একজন শারীর বিজ্ঞানবিৎ, মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ গোলকের সম্মুখ ভাগের নিম্নতন ঊর্ম্মিকা (Convolution) "টোপকে" বাক্‌শক্তির কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদবধি মস্তিষ্কের উপরিভাগের ঐ অংশটিকে Broca's convolutions ব্রোকার ঊর্ম্মিকামালা নামে অভিহিত করা হইতেছে। কিন্তু, ইদানীং বাক্‌রোধ নামক রোগ Aphasia সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই রোগে রোগীর বাক্‌শক্তি রহিত হইলেও, অন্যান্য শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে সুতরাং অনেকে ব্রোকার নির্দ্দেশ অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বাক্‌শক্তির কেন্দ্র ঐরূপ স্বল্পায়তন স্থানে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বাক্‌শক্তির কেন্দ্র আরও বিস্তৃত, উহা ললাটপার্শ্বিক প্রদেশদ্বয় এবং প্রাচীরী প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্ত খুব কর্ম্মঠ, তাহাদিগের মস্তিষ্কে রামার্দ্ধগোলকের দ্বারা শরীরের দক্ষিণ ভাগের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর লোকদিগের মস্তিষ্কের বামভাগে বাক্‌শক্তির কেন্দ্রটি নিহিত বলিয়া কার্য্যতৎপরতায় মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ গোলক দক্ষিণার্দ্ধ গোলক অপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদিগের বাম হস্তে ক্ষিপ্রকারিতা খুব বেশী,—চলিত কথায় যাহারা "বেঁয়ো"—তাহাদিগের বাক্‌শক্তি-কেন্দ্র মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধ গোলকে নিহিত। এই শ্রেণীর লোকদিগের মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধ গোলক সুপরিপুষ্ট আয়তনে বড় এবং কর্ম্ম গৌরবে বামার্দ্ধগোলক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যে কয়েটি-মস্তিষ্ক-স্নায়ু (Caranial nerves) মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, এখন আমরা সেই স্নায়ুর কথা কহিয়া, আমাদিগের বক্তব্য আপাততঃ শেষ করিব। এই স্নায়ুগুলির মধ্যে কয়েকটি মস্তিষ্ক স্নায়ু মানব-দেহের

বিভিন্ন অংশরে বার্ত্তা মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং আর কতকগুলি স্নায়ু মস্তিষ্কের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের নিকট ঘোষণা করে। স্নায়ুগুলি এই :—

১। ঘ্রাণ-স্নায়ু (Olfactory nerve)

২। দর্শন-স্নায়ু (Optic nerve)

৩। অক্ষিচালন স্নায়ু (Oculo motor)
৪। আকর্ষী-স্নায়ু Trochlear } নেত্র-সংক্রান্ত।
৫। সংকর্ষী স্নায়ু Abducens)

৬। ত্রিগুণস্নায়ু (Trigeminal) এই স্নায়ু দ্বারা হনু-সঞ্চালন, জিহ্বাচালন এবং মুখমণ্ডলে স্পর্শবোধ কার্য্য সম্পন্ন হয়!

৭। আনন-স্নায়ু (Facial nerve) এই স্নায়ু দ্বারা মুখমণ্ডলে পেশী নিচয় চালিত হয়।

৮। শ্রুতি-স্নায়ু (Auditory Nerve) এই স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে শ্রবণানুভূতি হয়।

৯। স্বাদন বা রাসন-স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve) এই স্নায়ু দ্বারায় জিহ্বায় বিবিধ রসের বা স্বাদের অনুভূতি হইয়া থাকে।

১০। পরিব্রাজক স্নায়ু (Vagus Nerve) এই স্নায়ু সহিত কণ্ঠ কক্ষ, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্ত্রমালা ঘনিষ্ঠ সংস্রব বিদ্যমান। নানা পথে বিচরণ করিয়া শরীরে নানা যন্ত্রের সহিত এই স্নায়ু সংলগ্ন হইয়াছে বলি এই স্নায়ুর নাম পরিব্রাজক স্নায়ু বা Vagus Nerve.

১১। মেরুদণ্ডগামী স্নায়ু (Spinal Accessory Nerve) এই স্নায়ু দ্বারা গ্রীবার পেশী-সমূহ পরিচালি হয়।

১২। রসনা চালন স্নায়ু! (Hypoglossal Nerve) এই স্নায়ু দ্বারা জিহ্বা সঞ্চালিত হয়।

---

# মাংস ভোজন

লেখক—ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার ঘোষ

আমরা আবশ্যক মত নানা প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ সকল পদার্থ পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে পরিবর্ত্তিত হয়, পরে রক্তে শোষিত হইয়া শারীরিক যন্ত্র সকলের নির্ম্মাণ ও ক্ষয় পরিপূরণ করিয়া থাকে।

খাদ্যদ্রব্যাদিকে প্রধানতঃ—১। Nitrogenous (যবক্ষারজানযুক্ত) ২। Non-Nitrogenous (যবক্ষার জান হীন) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রধান নাইট্রোজিনাস্ খাদ্য যথা :—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ, মাখন, ডাইল ও সিম ইত্যাদি।

নন্ নাইট্রোজিনাস ১। চর্ব্বি ২। শ্বেতসার ও শর্করা (ভাত চিনি গুড় ইত্যাদি) ৩। উদ্ভিদান্ন ৪। লবণ ও জল।

সকল ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার খাদ্য উপযোগী নহে। স্বাস্থ্য, ঋতু, কার্য্য, লিঙ্গ ও বয়স ভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা হয়। পরিশ্রমশীল ব্যক্তিগণ অধিক আহার করিয়া থাকেন এবং সচরাচর স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অল্পাহারী হয়। শিশুর পক্ষে দুগ্ধই খাদ্য। বৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা যুবা ব্যক্তির অধিক আহার করা কর্ত্তব্য, কারণ এই সময় শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য সকল খাদ্য অপেক্ষা যবক্ষারজান যুক্ত খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা নূতন তন্তু নির্ম্মাণ এবং পুরাতন তন্তু মেরামত হয়। ইহা শরীরস্থ নিস্রাব ও অন্যান্য তরল পদার্থ নির্ম্মাণের সহায়তা করে। দাহন ক্রিয়াদ্বারা শরীরে উত্তাপ উৎপন্ন করায় এবং চর্ব্বি নির্ম্মাণ ও তেজউৎপাদনের সাহায্য করিয়া থাকে। অক্সিজেনের শোষণের পরিমাণকে নিয়মিত করিয়া রাখে।

এই খাদ্য একবারে বন্ধ করিয়া দিলে শরীর কৃশ হয়



যায় ও শরীরের তন্তু সকল ক্ষয় হইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

মাংসে অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান পদার্থ, চর্ব্বি ও লবণ থাকে। সচরাচর লবণের মধ্যে ক্লোরাইডস্, ফস্ফেট্ ও পটাস পাওয়া যায়। ইহা সহজে পরিপাক হয় এবং তন্তুর মধ্যে পরিবর্ত্তন বৃদ্ধি করায়। মাংসে শতকরা ২২ ভাগ এ্যাল্‌বিউমিনেটস্ থাকে, তন্মধ্যে ১৭ ভাগ সহজে পরিপাক হয়। কিন্তু পীড়ার সময় উহা সহজে পরিপাক হয় না। এজন্য ঐ সময় উত্তমরূপে জেলি প্রস্তুত করিয়া দিলে সহজে শোষণ হইয়া যায়।

মাংসে পেশী নির্ম্মাণকারী পদার্থ অধিক থাকায় মধ্যে মধ্যে দৈনিক খাদ্যের সহিত মাংস আহার করা উত্তম! গৃহপালিত পক্ষীদিগের মাংসে চর্ব্বি ও লৌহ উপাদান কম থাকে, এজন্য বন্যপক্ষী অথবা উত্তম ছাগ বা মেষ মাংস নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবহার করা উচিত!

অনেক আমিষ ভোজী উত্তম মাংস নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বড় একটা যত্ন করেন না। কোন প্রকার মাংস হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে খাদ্যের সহিত শরীরের এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সে খাদ্য সর্ব্বাংশে উত্তম হওয়া উচিত। রুগ্ন ও বৃদ্ধ জন্তুদিগের মাংসে অধিক সংযোজক তন্তু থাকে এজন্য তাহা শক্ত হয়। ছোট পশুর মাংসে জলের ভাগ অধিক থাকে এ কারণ তাহা পুষ্টিকর নহে। অতএব মাঝারি আকারের হৃষ্টপুষ্ট জন্তুর মাংস আহার করা বিধেয়। মাংস দুই প্রকার—

১। লাল মাংস যথা :—গরু, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি।

২। সাদা মাংস যথা :—মুরগী, খরগোস, পেরু, মৎস্য ইত্যাদি।

সকল প্রকার মাংস 'রাইগার মর্টিস্' অর্থাৎ পচন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রন্ধন করা আবশ্যক! 'রাইগার মর্টিস্' অবস্থায় রন্ধন করিলে তাহা শক্ত হয় এবং সহজে পরিপাক হয় না। তখন মাংসের রং মার্ব্বেলের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ চিত্র বিচিত্র লাল, পীত এবং মধ্যে মধ্যে চর্ব্বি থাকিবে। মাংস টিপিলে দৃঢ় বোধ হওয়া উচিত। রং বেগুণী অথবা মলিন হইবে না এবং অধিক আর্দ্র বা মাংস মধ্যস্থ বস্তুতে পুঁয কিম্বা অন্য কোন তরল পদার্থ থাকিবে না। মাংসের রং লালবর্ণ ও প্রতিক্রিয়া অম্ল হওয়া উচিত এবং ঘ্রাণ লইলে কোন দুর্গন্ধ থাকিবে না।

পচা মাংস সহজেই চেনা যায়। তাহা মলিন ও নরম বোধ হয়, কিন্তু অধিক পচিলে রং সবুজ দেখায়। ঘ্রাণ লইলে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যদ্যপি দুর্গন্ধ না পাওয়া যায় তাহা হইলে মাংস মধ্যে ছুরি প্রবেশ করাইয়া উক্ত ছুরির ঘ্রাণ লইলে দুর্গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হয়। অথবা মাংসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গরম জলে ফেলিয়া ঘ্রাণ লইলে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। চর্ব্বি সমূহ টিপিলে দৃঢ় বোধ হয় এবং মলিন ও পীত বর্ণ দেখায়। পচা মাংস কিছুতেই আহার করা উচিত নয়। তাহা ভোজন করিলে নানা উৎকট পীড়া উৎপন্নের সম্ভাবনা।

টিনেতে যে মাংস থাকে তাহা ভোজন করিলে কখন কখন অত্যন্ত কঠিন পীড়া হয়; কারণ উহাতে 'টোকস্' নামক বিষ থাকে। টিন খুলিয়া শীঘ্র তন্মধ্যস্থ আহার্য্য ভক্ষণ করা উচিত। টিন মধ্যস্থ খাদ্য যদ্যপি ফাঁপিয়া বা ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে সেই খাদ্য একবারে পরিত্যাগ করিবে। খোলা টিনে অধিক দিন মাংস সঞ্চিত রাখা অতীব দোষাবহ। দুষ্ট মাংস ভোজন করিলে "সিষ্টোসার্কস্ সেলুলোজ" ব্যাধি হইতে পারে। যাহারা শূকরের মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের অন্ত্রনালীতে অনেক সময় "টিনিয়া সোলিয়াম" (Tape worm) এবং "টিনিয়া স্পাইরেলি" নামক কীট উৎপন্ন হয়। কারণ শূকরের মাংসে সচরাচার "সিষ্টোসার্কাস সেলুলোসিস" থাকে। অর্থাৎ মাংস মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ জলপূর্ণ থলিতে ফিতা কৃমি শাবক অবস্থিতি করে। এই প্রকার কীট ফুটন্ত জলে মরিয়া যায়। কিন্তু সামান্য ভাবে সিদ্ধ করিলে অথবা খাদ্য দ্রব্য ভাজিয়া লইলে তাহা নষ্ট হয় না। ঐ প্রকার কীটগ্রস্ত মাংস উদরস্থ

করিলে উহাদের ডিম্ব সপ্তাহ কাল অন্ত্রনালীতে থাকিয়া কীটের পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে। ৩।৪ দিন পরে প্রত্যেক স্ত্রী কীট এক শতের অধিক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ঐ প্রকারে তাহারা শরীরের সর্ব্বত্রই চালিত হয়। পরে স্থানে স্থানে উত্তেজনা আনয়ন করিয়া প্রদাহ জন্মায়। ঐ প্রকার একটী রোগীর মৃত্যুর পরে শব ব্যবচ্ছেদ কালীন এক স্কোয়ার ইঞ্চ পরিমাণ মাংস পেশীতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক কীটাণু পাওয়া গিয়াছিল। একজন খৃষ্টান যুবকের চিকিৎসা কালীন তাহার অন্ত্রনালী হইতে একটী ১২।১৩ হাত লম্বা ফিতা কৃমি বাহির হইয়াছিল। ঐ যুবক সর্ব্বদা শূকর মাংস ব্যবহার করিত এবং পুনরায় উক্ত প্রকার কৃমি রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

গো-মাংস ভোজীরা অনেক সময়ে সস্তায় খারাপ মাংস ভোজন করিয়া "টিনিয়া মিডিওক্যাল সোয়লসি" নামক কৃমি রোগে ভুগিয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিলে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়।

যাহাদের পরিপাক শক্তি অল্প, তাহাদের পক্ষে মাংস ব্যবহার না করাই ভাল। তবে আবশ্যক হইলে কেবল মাত্র মাংসের যূস্ ব্যবহার চলিতে পারে। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সামান্য উত্তাপে অধিক সময় পর্য্যন্ত মাংস সিদ্ধ পরিষ্কার রূপে ছাঁকিয়া সামান্য ঘৃত, গরম মসলা ও লবণ দিয়া সাঁতলাইয়া লইবে। যূস্ করিবার মাংসে কদাচ চর্ব্বি রাখিবে না। যূসে চর্ব্বি থাকিলে ব্লটিং কাগজ দ্বারা চর্ব্বি উঠাইয়া লইবে। রুগ্ন ব্যক্তি সহজে চর্ব্বি পরিপাক করিতে পারে না, এজন্য ইহা তাঁহাদের পক্ষে অনিষ্টকর। মাংস রন্ধন করিতে হইলে কাবাব পাক করা ভাল। কারণ উহা সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয় এবং সার পদার্থ সমূহ উহাতেই থাকিয়া যায়। মাংসখণ্ডগুলি সিদ্ধ করিবার সময় প্রথমে ফুটন্ত গরম জলে ৪।৫ মিনিট রাখিবে, ফুটন্ত জলের উত্তাপ দ্বারা মাংসের উপরস্থ এ্যালবুমেন্ জমিয়া যায় এবং মাংসের অভ্যন্তরস্থ সার পদার্থ ও রস নির্গত হইতে পারে না। পরে উহাতে অল্প পরিমাণে লবণ ও মসলা মাখাইয়া মৃদু উত্তাপে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে এবং যে পর্য্যন্ত আহারের উপযোগী না হয়, সে পর্য্যন্ত অগ্নির উত্তাপে বসাইয়া রাখিবে। সে সময় মাংস যেন ধরিয়া না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

অন্যান্য মাংস অপেক্ষা কুক্কুট ও পেরুর মাংস অতি উত্তম। উহা সহজে পরিপাক হয় এবং দেহস্থ স্নায়ু সকলের ও মস্তিষ্কের পোষণ ক্রিয়ার সাহায্য করে। খরগোষের মাংস অতি নরম ও পুষ্টিকর। মাংসের অভাবে উপযুক্ত মৎস্য ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে।

মৎস্য—ইহা সহজে পরিপাক করা যায় এবং ইহাতে ফস্ফেটের ভাগ অধিক থাকে। রোহিত মৎস্যের মস্তক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি সুপথ্য। রোগীর জন্য কৈ, মাগুর ও সিঙ্গি মৎস্য উত্তম, কারণ উহা কোমল ও সহজে পরিপাক হয়। টাট্‌কা ইলিস মৎস্য খাইতে উপাদেয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় সকলের পক্ষে সহ্য হয় না। পরিপাক করিতে পারিলে তদ্দ্বারা শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিয়া যথেষ্ট বলবৃদ্ধি করায়। কিন্তু অধিক আহারে উদরাময় পীড়া উৎপন্ন হয়। পচা মৎস্য সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত কারণ উহা দ্বারা কলেরার মত পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন বিশেষ প্রকার মৎস্য ভক্ষণে urticaria উৎপন্ন হয়। খারাপ মৎস্য ভোজন করিলে কখন কখন "টিনিয়া মোড্রিকাফিওলেটিস্" নামক ফিতা কৃমি জন্মায়। কেহ বলেন যে অধিক দিন পচা মৎস্য ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির মতে উহা সংক্রামক ও কৌলিক ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত। পচা মৎস্যের সহিত কুষ্ঠরোগের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। উড়িষ্যা দেশে শুষ্ক মৎস্যের প্রচলন আছে। তাহা ব্যবহারে অনেক সময়ে উদরাময় ও আমাশয় রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; এজন্য মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারিগণ সে সময়ে বাজারে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় করিতে দেন না। যাঁহারা সহজে মাংস



পরিপাক করিতে পারেন না। কিম্বা যাঁহারা অলস কর্ম্মে দিন অতিবাহিত করেন তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যই উৎকৃষ্ট খাদ্য। বৃদ্ধ বয়সে সকল যন্ত্রের কার্য্যশক্তি হ্রাস হইয়া যায় এজন্য সে সময় মাংসের পরিবর্ত্তে মৎস্য ব্যবহার করাই উত্তম। সাদা মাংস যুক্ত মৎস্য শীঘ্র পরিপাক হয়। কিন্তু লাল মাংসযুক্ত মৎস্যে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি থাকায় শীঘ্র পরিপাক হয় না। ঐ প্রকার মৎস্য আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যায় না। যে প্রকার মৎস্য হউক না কেন তাহা পরিমিত পরিমাণে টাট্‌কাবস্থায় ব্যবহার করিলে কোন পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না।

---

# দন্ত-ধাবন

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী

দন্ত-ধাবন করা, স্বাস্থ্য-রক্ষার একটী প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য। দন্ত পংক্তির সর্ব্বাংশ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত না করিলে, নানাবিধ দন্ত রোগের সঞ্চার হয়। দন্তমূল শিথিল হইয়া অকালে দন্ত সকল পতিত হইয়া অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত করে। দন্ত পরিপাক যন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ সুতরাং দন্তের কোন প্রকার পীড়া হইলেই পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে না হওয়ায়, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে।

দন্ত-ধাবন কার্য্যে মার্জ্জন ও দাঁতন ব্যবহার প্রথা প্রচলিত আছে। উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্দ্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তি দাঁতন ব্যবহার করেন। এমন কি দন্ত মার্জ্জনের জন্য তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই জন্য এই সকল দেশবাসীর দন্তরাজি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম থাকে। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহরে দাঁতন ব্যবহার প্রথা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণ দাঁতনের পরিবর্ত্তে বিদেশে প্রস্তুত টুথ ব্রাস ব্যবহার করিয়া সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং দন্তপীড়ার জন্য ও দন্ত ধাবনের জন্য নানা প্রকার "টুথ পাউডার" ব্যবহার করেন। কেহ কেহ বা চা খড়ি, ঘুটের ছাই, তামাকের গুল, কয়লা, বালি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই মহামূল্য দন্তরাজি রক্ষা করিতে যে কি প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা কেহই সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে কি শিক্ষা প্রদান করে, তাহা কেহই জানিতে চেষ্টা করেন না। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর মুখ কিরূপ বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহা সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অজীর্ণ, আমাশয়, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি রোগে মুখ অত্যন্ত বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয় তাহাও সকলে জানে না। ঐ সময় যদি দন্ত ও দন্তমূল সকল বিশেষরূপ পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা দন্তে ও দন্তমূলে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা পরিষ্কার না করিলে, দন্তের মূল দেশে ঐ সকল ময়লা দৃঢ়রূপে জমিয়া ক্রমে "আথরি" (Tartar of the teeth) উৎপন্ন হইয়া দন্তরাজীকে নষ্ট করিয়া দেয়; তজ্জন্য দন্তে বেদনা, দন্তমূল, ফোলা, কন কনানি-বেদনা, প্রভৃতি কষ্টদায়ক উপসর্গ সকল উপস্থিত হইয়া দন্তমূল শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হয় এবং অকালে দন্ত পড়িয়া যায়।

ভাত পচিলে, আমানি ( কাঁজি ), গুড়, চিনি প্রভৃতি

পচিলে শির্কা, দুধ পচিলে দধি, হয়। পচন জনিত উৎপন্ন দ্রব্য সকল অম্লগুণ বিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত, দাইল, কলাই, ময়দা প্রভৃতি পচিলে অম্ল হয় এবং মুখমধ্যস্থ লালা পচিয়া এক প্রকার লাবণিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের প্রায় সকল গুলি পচিলেই অম্ল হয়। অম্ল দন্তের মহা অনিষ্টকারী পদার্থ। আহারান্তে যদ্যপি খাদ্য দ্রব্যাংশ মুখাভ্যন্তরে দন্তের মধ্যে বা গোড়ায় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পচন জনিত দন্তের অনিষ্ট কারী পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দন্তরাজি ক্ষীণ ও পীড়িত করে এবং মুখমধ্যস্থ লালার লাবণিক পদার্থ দন্তমূলে দৃঢ়রূপে জমিয়া যায়।

পাকাশয়ের সঙ্গে দন্তের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। পাকাশয় ও অন্ত্রে কোন প্রকার পীড়া উৎপন্ন হইলে, মুখ অত্যন্ত বিস্বাদ, অম্লাক্ত, লবণাক্ত অথবা তিক্তাক্ত হইয়া থাকে, ঐ সময় মুখ পরিষ্কার না করিলে ঐ সকল দ্রব্যের পচন জনিত দূষিত পদার্থ দন্তে লাগিয়া দন্ত পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত এবং সেজন্য তাহাদের নিকটে বসিয়া থাকা অসম্ভব। ঐ সকল লোকের লালারসের সর্ব্বদাই পচন ক্রিয়া হয়। সেজন্য তাহাদের মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে। অধিক সময় বক্তৃতা করিলে কিম্বা কথা বলিলেও মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে এবং দন্ত ও দন্তমূলে একপ্রকার সাদা আটাল ময়লা সঞ্চিত হয়। যাঁহারা কৃত্রিম দন্ত ধারণ করেন তাঁহারা তাহা বেশ দেখিতে পান।

নানা প্রকারে উৎপন্ন অনিষ্টকারী পদার্থ সমূহ দন্ত ও দন্তমূল হইতে শীঘ্রই দূরীভূত করাই দন্তধাবনের কার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে সকলেই এক প্রকার উদাসীন ও অজ্ঞ। শত শত ব্যক্তি কৃত্রিম দন্তের দ্বারা পতিত দন্তের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান প্রদত্ত দন্ত অপেক্ষা কি তাহা অধিক কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। বরং একটা আগন্তুক পদার্থ মুখ গহ্বরে রাখিয়া নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং সে গুলিকে বার বার পরিষ্কার না করিলে, মুখ গহ্বরে ধারণ করাও অসম্ভব হয়। তাহা পরিষ্কার না করিলে তাহাতে নানা প্রকার শক্ত দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা জমিয়া যায়।

দন্ত ধাবন স্বাস্থ্য রক্ষার একটী প্রধান ও প্রয়োজনীয় কার্য্য। সেজন্য আর্য্য ঋষিগণ দন্ত ধাবনের নানা প্রকার সুনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ আলোচনা করিতেছি এবং বৈজ্ঞানিক মতে কি দ্রব্য দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ উৎপন্ন হইতে পারে না ও দন্ত পরিষ্কার হয় তাহাও আলোচনা করিতেছি।

দন্তকাষ্ঠ—( দাঁতন ) সকল কাষ্ঠে দাঁতন করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের ভিন্ন ভিন্ন গুণ। গুণ ভেদে দন্ত কাষ্ঠ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

"তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতম্।
ক্ষীরিণো বৃক্ষগুল্মাদ্যা ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥"
( মহাভারত।)

তিক্ত, কষায়, কটু, সুগন্ধযুক্ত, কণ্টকযুক্ত, দুগ্ধ সংযুক্ত গুল্মবৃক্ষ দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। তিক্ত কাষ্ঠ নিম্ব, কষায় কাষ্ঠ বদর, কটু কাষ্ঠ করঞ্জ, মধুর কাষ্ঠ মধুক বৃক্ষ প্রভৃতি দন্ত ধাবনের প্রধান উপযোগী।

সময় ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যথোচিত রস ও বীর্য্যযুক্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে, মুখের বিরস ভাব জিহ্বা ও দন্তের মল দূরীভূত হয় এবং দন্ত শুভ্রবর্ণ ও লঘু হয় ও সুন্দর দেখায়।

"কেহপ্যত্র করবীরাম করঞ্জ বকুলা শনান্।
দন্ত কাষ্ঠার্থ মন্যে তু সর্ব্বান্ কণ্টকিনোহভ্যধুঃ॥
খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ বটস্তথা।
তিন্তিড়ী বেণু পৃষ্ঠঞ্চ আম্র নিম্বৌ তথৈব চ॥
অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোড়ুম্বরস্তথা।
এতে প্রশস্তা কথিতা দন্ত ধাবন কর্ম্মণি॥"



আকন্দ বৃক্ষে দন্ত ধাবন করিলে, বল, বটবৃক্ষে দন্ত ধাবন করিলে দীপ্তি, করঞ্জ বৃক্ষে বিজয়, অর্থ সম্পত্তি, করীতে মধুর ধ্বনি, খদিরে মুখ সৌগন্ধ, বিল্বে বিপুলতা, যজ্ঞডুমুরে বাক সিদ্ধি, আম্রে আরোগ্য, কদম্বে মেধা ও বুদ্ধি, চম্পকে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য আয়ু বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ, অপামার্গে মতি, মেধা প্রজ্ঞাশক্তি ও সুস্বর; দাড়িম্ব, অর্জ্জুন বৃক্ষ রুচি বৃক্ষে দন্তধাবন করিলে দুঃস্বপ্ন নাশ হয়।

স্থৌল্যং পরিমাণঞ্চাহবিষ্ণুঃ।
কনিষ্ঠাগ্র সমং স্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলম্॥

দন্ত কাষ্ঠ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, গ্রন্থিবিহীন ও সরল হওয়া কর্ত্তব্য দন্তকাষ্ঠ কোনরূপ দৃঢ় হওয়া উচিত নহে। ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

"মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন চ দ্বিজঃ।
দন্তস্য ধাবনং কুর্য্যাৎ তর্জ্জন্যা ন কদাচন॥"

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দন্ত ধাবন করা কর্ত্তব্য। তর্জনী দ্বারা করিবে না।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভাতে দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য।

"গুবাক তাল হিন্তালস্তথা তাড়ীচ কেতকী।
খর্জ্জুর নারিকেলৌচ সপ্তৈতে তৃণ রাজকাঃ॥

সুপারি, তাল, হিন্তাল তাড়ী ( হাঁতাল ) কেতকী (কেয়া ) খর্জ্জুর ও নারিকেল প্রভৃতি কাষ্ঠে কখনও দন্ত ধাবন করিবে না।

দন্তকাষ্ঠ কোনরূপ দৃঢ় হওয়া উচিত নহে।

কোমল দাঁতন দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া দন্ত শোধন চূর্ণ দ্বারা দন্ত ও মাড়ি ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য। দন্ত শোধন চূর্ণ বিশুদ্ধ দোষ বর্জ্জিত ও কোমল হওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহা ক্ষার ও লবণ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

আহারান্তে লবণ দ্বারা দন্ত ধাবন করা উত্তম। মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ অথবা তেজপত্র চূর্ণ দ্বারা কিম্বা তৈল ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা দন্ত শোধন করা কর্ত্তব্য। আটালিয়া মাটি, পোড়ামাটি চূর্ণ দন্ত ধাবনের উত্তম উপযোগী। খদির লবণ, ফট্‌কিরি, চা খড়ি সুপারি পোড়া কয়লা চূর্ণ প্রভৃতি দন্ত ধাবনের পক্ষে উপকারী ও উপযোগী পদার্থ।

বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গে নরনারীগণ মিসি ব্যবহার করিতেন। কোন উৎসব, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিতে মিসির বহুল প্রচলন ছিল কালক্রমে মিসি উঠিয়া গিয়াছে। লৌহ, কষায় দ্রব্য, হরীতকী প্রভৃতি, ছাই প্রভৃতি লবণ ও ক্ষারাক্ত পদার্থ দ্বারা মিসি প্রস্তুত হইত তাহাতে দন্তরাজীর শোভা সম্পাদন করিত ও কার্য্যক্ষম এবং দৃঢ় থাকিত।

দন্ত আমাদের যেরূপ উপকারী সকলের তাহা রক্ষার জন্য তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন থাকা কর্ত্তব্য সেই জন্যই আমরা দন্ত ধাবন সম্বন্ধে আধুনিক ও পাশ্চাত্য বিধি ব্যবস্থার আলোচনা করিলাম।

# ইনফ্লুয়েঞ্জা

লেখক—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী

দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার এই প্রকোপের সময় ইহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বোধ হয় কাহারও নিকট অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না।

প্রায় ২৮।২৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার এতদ্দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ দেখা গিয়াছিল। সে সময় ইহার আক্রমণ বহু বিস্তৃত হইলেও এত ভয়াবহ রূপে প্রকাশ পায় নাই। সামান্য সর্দ্দিজ্বর সঙ্গে সঙ্গে গা ব্যথা ইহাই সমস্ত লক্ষণ ছিল। তখন খবরের কাগজে ইহার ঔষধ বাহির হইয়াছিল, তুলসী পাতার রস, আদার রস ও মধু। বাস্তবিক দেখিয়াছি ইহা খাইয়াই তৎকালে অনেকানেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কাহারও কাহারও বা মোটেই কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই। ঐ সময় আমারও ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল, আমিও তুলসী পাতার ও আদার রস মধু সহ পান করিয়া আরোগ্য-লাভ করিয়াছিলাম। সে সময় যাহার যাহার ঐ ব্যারাম হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই এই একটি বিশেষ লক্ষণের কথা বলিয়াছে যে, তাহাদের নিকট খাদ্য সামগ্রী বিশেষত জল অতি বিস্বাদ ও তিক্ত আস্বাদ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইত।

এই ব্যারামটি প্রথমে স্পেন দেশে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। তথা হইতে ১৮৮৯।৯০ সনে ইয়ুরোপের বহু প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও ১৮৯০।৯১ সনেই ইহার বিস্তৃতি দেখা গিয়াছিল। সে বার কোন লোক এই ব্যারামে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় নাই।

কিন্তু এবার ইহার প্রকোপ বড় বেশী। ভারতবর্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকা, জারমানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক দেশেই ইহা এপিডেমিক আকারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বড় বড় সহরের মৃত্যু তালিকা খবরের কাগজে প্রায়ই বাহির হইতেছে। তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ছোট ছোট গ্রামে যে কত লোক এই রোগে প্রাণ দিতেছে তাহার তালিকা বড় একটা দেখা যায় না। এই ব্যারাম গ্রামে গ্রামে অল্প লোকদের মধ্যে এপিডেমিক ভাবে ব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে, কত লোকে অন্যায় ভাবে বিনা চিকিৎসায় অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শীঘ্র ইহার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।

এই ব্যারামের কারণ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মহামতি পেইফারের (Pfeiffer) আবিষ্কৃত জীবাণুই এই ব্যারামের মূল কারণ বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে। এই জীবাণু শ্বাস প্রণালির শ্লৈষ্মক ঝিল্লি (Respiratory mucous membrane মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে একপ্রকার সর্দ্দি উৎপন্ন করে। এই জীবাণু সকল নাসা রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া যখন সংখ্যাতীত রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখনই তাহারা এক প্রকারের বীষ উৎসেচন (elaborate) করিয়া নানা রন্ধ্রের প্রদাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং স্নায়বীয় গঠন সমূহকে বিষাক্ত করিয়া সমস্ত শরীরের গ্লানি আনয়ন করিয়া থাকে। কেহ কেহ আপন প্রতিষেধক ক্ষমতা গুণে নিস্তার পাইয়া যায়; কেহ সামান্য হাঁচি ও সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়, কেহ কেহ বা খুব গভীর ও সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া শ্বাস রোধ বসত প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু এই ব্যারামের কঠিন অবস্থায় ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ছাড়া আরও কয়েক প্রকারের জীবাণু দৃষ্ট হয়। মেজর ম্যাক্ কেচনিয়াই (Major W. E. Mc Kechnie I.M.S.) সম্প্রতি তাঁহার লিখিত একটী বিখ্যাত প্রবন্ধে মানবের শ্বাসযন্ত্রের (respiratory tract) মধ্যে আরও তিন প্রকারের জীবাণুর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহারা প্রায় সর্ব্বদা মানবের শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে বসবাস করিয়া থাকে। প্রথম সাধারণ সর্দ্দির জীবাণু (Micrococcus catarrhalis), দ্বিতীয় নিউমোনিয়ার জীবাণু (Pneumococcus) এবং তৃতীয় যক্ষ্মারোগের জীবাণু (Tubercole bacilli). এই তিন প্রকারের জীবাণুর মধ্যে কোন না কোন এক বা ততোধিক প্রকারের জীবাণু সদাসর্ব্বদা মানব শ্বাস যন্ত্রে নিদ্রিত অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহারা মানবের কোনই ক্ষতি করিতেছে না বা করিবার সুবিধা পাইতেছে না। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থানকে দুর্ব্বল করিয়া এবং ঐ স্থানের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমাইয়া বা দূর করিয়া দেয়। সঙ্গেই সেই সময় নিউমোনিয়া, সর্দ্দি প্রভৃতির জীবাণু সমূহ, যাহারা এযাবতকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল, তাহারা প্রবল ভাবে আক্রমণ করিবার অবসর পায় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার সহিত নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগও প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহার সহিত সর্দ্দির জীবাণু (Micrococcus catarrhalis) যোগ দিলে শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ ও স্ফীতি হইয়া রোগী শ্বাস রোধ বশতঃ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও তাহার যক্ষ্মাদ্বারা আক্রমনের আশঙ্কা দূর হয় না। এমনকি সামান্য আক্রমণের পরও কেহ কেহ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন দেখা গিয়াছে। বিগত ২৮ বৎসর পূর্ব্বের এপিডেমিকে এই প্রকার ঘটনা দেখা গিয়াছিল। অতএব যাহাতে এই ব্যারাম মোটেই আক্রমণ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার।

এই রোগকে কেমন করিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে? আমাদের এই অশিক্ষিত দেশে এই রোগ নিবারণ প্রণালির নিয়ম গুলি পালন করা একেবারেই অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে কলেরা, বসন্তকে এত ভয় করে, ইহাকে এত মারাত্মক ব্যারাম বলিয়া জানে, তত্রাচ কয়জনে ইহার বিস্তৃতি নিবারণ কল্পে সচেষ্ট? সর্ব্বজনে যে পুকুরের জল পান করিয়া প্রাণ বাঁচায় ইহারা বসন্ত কলেরায় কলুষিত বস্ত্রাদি সেই পুকুরে ধৌত করিবেই।—এক আইন ছাড়া আর কাহারাও বারণ তাহারা শুনিবে না। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইহা ত তাহারা এতদূর ভয়াবহ ও সংক্রামক বলিয়াই জানে না। ইহার জন্য ত তাহারা মোটেই চেষ্টা করিতে রাজি হইবে না।

সকলেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক ইনফ্লুয়েঞ্জা একটী ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি এবং ইহার মৃত্যু সংখ্যা প্লেগ, বসন্ত, কলেরা অপেক্ষা কম ত নহেই বরং বেশীই হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যারামটি এক মানব হইতে অপর মানবে অতি শীঘ্র সংক্রামিত হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু মানবের শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ছাড়া, বাতাসে বা অন্য কোন স্থানে বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এটি একটী আমাদের পক্ষে ভারি সুবিধার কথা। বসন্ত ডিপথিরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের জীবাণু বহুকাল ঘরের দেয়ালে, ছাদে বাঁচিয়া থাকিয়া অনেক বৎসর পরে অবসর পাইলেই আবার মানবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু বাতাসে বা অন্যত্র বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। এক মানুষের শ্বাস যন্ত্র হইতে (Respuratory tract) হাঁচি, কাসি ও প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ইহারা বাহির হইয়াই যদি নিকটে অন্য মানব না পায় তবে ইহারা কদাপি অন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন একস্থানে বহু লোক একত্র হইতে না পারে। তাহা হইলেই এই জীবাণু আর দ্বিতীয় আশ্রয় স্থান না পাইয়া ক্রমে ক্রমে মরিয়া যাইবে এবং এপিডেমিক অচিরেই থামিয়া যাইবে। থিয়েটার, স্কুল, সভা, আপিস্ এবং অন্যান্য যে সকল গৃহে লোকের জনতা হইবার সম্ভাবনা, এপিডেমিকের সময় তাহা বন্ধ রাখাই নিরাপদ। এই প্রকারের জনতা বন্ধ

করিতে পারিলে এই ব্যারাম অতি শীঘ্র শীঘ্র থামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

খোলা ও পরিষ্কার বাতাস ইনফ্লুয়েঞ্জার একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। শয়ন গৃহে যাহাতে বেশী লোক একত্রিত ভাবে শয়ন না করে, যাহাতে ইহার জানালাদি যথারীতি ভাবে খোলা থাকায় ঘরে কোন প্রকার দূষিত বায়ু না জন্মিতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক।

ইনফ্লুয়েঞ্জাগ্রস্ত রোগী বা সদ্য ব্যারামমুক্ত ব্যক্তি যাহাতে অন্য লোকের সহিত না মিশে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। তোমার কাছে বসিয়া কেহ হাচিয়া বা কাসিয়া অসংখ্য ও অগনিত ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু তোমার দিকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া দেয় তদ্বিষয়ে খুব প্রখর দৃষ্টি রাখিবে। এ বিষয়ে খাতির করিলে চলিবে না। তোমার বৈটকখানায়, বা শয়ন গৃহে এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের আগমন বন্ধ করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট মনের বল থাকা প্রয়োজন। সে ব্যারামে সে হয়ত মুক্তি পাইল, কিন্তু উহা তোমার, অথবা তোমার বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ও অন্যান্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। এ কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে।

আজকাল খবরের কাগজে অনেক প্রকার প্রতিষেধের ব্যবস্থা দেখা যায়। নাসারন্ধ্র থাইমল সলিউসন দ্বারা ধৌত করণার্থ কেহ কেহ নেজাল ডুস্ (Nazal Douche) ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন, কেহ কেহ বা পচন নিবারক ঔষধ দ্বারা স্প্রে (Spry) দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা ত সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে! সকলের প্রবৃত্তিও না হওয়া সম্ভব। করিতে পারিলে খুবই ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়জনে ইহা করিতে পারিবে? মাঝে মাঝে ইউক্যালিপ্ টাস্ ওয়েল অভাব পক্ষে টার্পিন তৈল আঘ্রাণ করা বরং সহজ ও বিশেষ উপকারজনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরে যাহারা পারেন তাহারা সকালে বিকালে নিম্নলিখিত কুলিটি (Gargle) ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। বোরাসিক্ এসিড্, পটাস্ ক্লোরাস্, কার্ব্বলিক এসিড ও পিপারমেণ্ট ওয়েল প্রত্যেক অর্দ্ধ ড্রাম, জল ২৪ চব্বিশ আউন্স। ইহার এক আউন্স পরিমাণ লইয়া প্রাতে মুখ ধুইবার সময় কুলি করা যাইতে পারে। আমার বোধ হয় ইহাতে অনেকটা ফল লাভ করা যাইতে পারে। ঐ দুই উপায় দ্বারা নাসারন্ধ্র, গল-মধ্যে এবং মুখ গহ্বর সমস্তরই জীবাণু ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করা হইল। Nazal douche বা Spray অপেক্ষা ইউক্যালিপটাস্ আঘ্রাণ ও কুলি অনেক সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়।

---

# বার্দ্ধক্যের স্বাস্থ্য-নীতি

বার্দ্ধক্য আরম্ভ হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ ৪০ বৎসর বয়সেই বৃদ্ধ হইয়া পড়েন আবার কেহ বা ৭০ বৎসর বয়সেও অনেকটা যুবাজনোচিত থাকেন। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, যে সময়ে দেহের প্রধান যন্ত্র সমূহ স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অপেক্ষাকৃত অপারগ হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় হইতে বার্দ্ধক্যের সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ স্থলে ৫০ হইতে ৬০ এর মধ্যে এইরূপ ঘটে।

## বার্দ্ধক্যের বিশেষত্ব।

বার্দ্ধক্যকে অনেকে রোগের ন্যায় মনে করেন কিন্তু বার্দ্ধক্য আদৌ রোগ নহে এবং অনেক স্থলে একবারে রোগশূন্য হইতে পারে। এসময় রক্তাধার সমূহ (blood vessels) হইতে অসম্যক রক্ত সরবরাহের ফলে শারীরিক যন্ত্র ও তন্তু সমূহের ক্ষয়ই প্রধান পরিবর্ত্তন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তাধার সমূহের নমনীয়তা হ্রাস পাইয়া থাকে। রক্তাধারের এই পরিবর্ত্তন এক প্রকার ক্ষয়েরই অনুরূপ। অনেকস্থলে রক্তাধার সমূহের গাত্র বার্দ্ধক্য আরম্ভের পূর্ব্বেই অনমনীয় ও পুরু হইয়া পড়ে, এই অবস্থাকে "Arterial Sclerosis" বলা হয়। ফলে উপযুক্ত পরিমান রক্ত দ্বারা তন্তু সমূহের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। এই "Arterial Sclerosis" বংশানুবর্ত্তিতা, অমিত আহার, মদ্যপান ও ধূমপানের ফলে যৌবন বয়সেই আরম্ভ হইয়া অকাল বার্দ্ধক্যের সৃষ্টি করিতে পারে। মোট কথা রক্তাধার সমূহের অবস্থার উপরই দেহের প্রধান যন্ত্র সমূহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র সমূহের কোষের (Cell) ক্ষয়ে সেই সকল যন্ত্রের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। এই কারণে মস্তিষ্ক কোষ ও তন্তুর (Cells and fibers) ক্ষয় বশতঃ বৃদ্ধের স্মরণ শক্তি হীনতা, অসম্যক উপলব্ধি এবং ভুল ধারণা প্রভৃতি মানসিক রোগ সমূহ প্রকাশ পায়। ফুসফুসের ক্ষয়ে তাহার শক্তি হীন হইয়া যায় এবং রোগাক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে অল্প আগে বা পরে শরীরের সকল যন্ত্রের পেশীই ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়।

## অকাল বার্দ্ধক্য নিবারণ

মানুষকে বৃদ্ধ হইতে হইবে কিন্তু অকালে বার্দ্ধক্যকে উপস্থিত হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। রোগের ন্যায় অকাল বার্দ্ধক্যের বিপক্ষেও আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। শরীরের সকল যন্ত্রকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা এবং আহার ও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে মিতাচারী হওয়াই উত্তম উপায়। শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে সুস্থ রাখিতে এবং তাহাদের ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে, সর্ব্বদা নির্দ্দোষ রক্ত সরবরাহ করিতে হইবে। হৃদয় ও রক্তাধার সমূহ দ্বারা রক্ত সকল যন্ত্রে চালিত হয়, নানা প্রকার ব্যায়াম দ্বারা এই গুলিকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইবে। যাহাদের নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার তাহাতেই ব্যায়ামের সুফল পাইবেন কিন্তু যাহারা পরিশ্রম করে না তাহাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভ্রমণই তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য উপায়। ভ্রমণ দ্বারা হৃদপিণ্ডের ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াবৃদ্ধি পায়, রক্তাধার সমূহে (Blood-vessels) অধিক রক্ত চালিত হয়, ফলে রক্তাধার সমূহ অধিকতর ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বিভিন্ন যন্ত্র ও তন্তু সমূহে সবলে রক্ত প্রেরণ করে এবং তাহাদিগকে সুপুষ্ট করে। শ্বাস অধিক গভীর হয় এবং অধিকতর অক্সিজেন গৃহীত ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যক্ত হইয়া সমস্ত দেহ-যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে। ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যায়ামের আর একটি সুফল এই যে, তদ্দারা পেশী সমূহের পুষ্টিরও উন্নতি ঘটে, ফলে বলহানী এবং দেহের তাপহানীর সম্ভাবনাও রোধ হয়। ভ্রমণের পরিবর্ত্তে অশ্বারোহন, নৌকাচালন, জিমনাষ্টিক প্রভৃতি অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামও চলিতে পারে।

প্রত্যহ দশ পনের মিনিট ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম করিলে ভ্রমণের সুফল আরও বর্দ্ধিত করা যায়। এই ব্যায়ামের একটি সহজ উপায় লিখিত হইল। সোজাভাবে দাঁড়াইয়া মুখ বন্ধ রাখিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। ১৫ সেকেণ্ড হইতে ৬০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্বাস ধরিয়া রাখিয়া প্রশ্বাসে যতটা পারা যায় ততটা বায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। পরে যতক্ষন সম্ভব শ্বাস গ্রহণ একবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। এই সময়ে উদরের পেশী একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া ভিতরস্থ যন্ত্রাদির উপর চাপিয়া দিতে হইবে। নিশ্বাস গ্রহণের সময় হস্তদ্বয় তুলিয়া রাখিতে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের সময় সমস্ত শরীর নত করিতে হইবে। শরীরের পোষণ ঠিক ভাবে হইতে থাকিলে এই ব্যায়ামে হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তাধার সমূহ এবং ফুসফুসের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে এবং অকালাক্ষয় নিবারিত হইবে।

## বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা।

অকাল বার্দ্ধক্য নিবারণে যে উপায় লিখিত হইল প্রকৃত বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও সেই উপায় অবলম্বনে সুফল দর্শিবে। ব্যায়াম পূর্ব্বের মতই চলিবে। বার্দ্ধক্য অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ব্যায়াম

পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা বিশেষ ভুল, ইহাতে মানসিক অবসাদ এবং স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। বৃদ্ধ লোকের মুক্ত বায়ুতে সহ্যমত ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকের ধারণা যে ৬০।৭০ বৎসরের লোকের অধিক ভ্রমণ ভাল নয়, ইহাতে তাহাদের শক্তি শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই ক্ষয় হওয়ার ধারণা একেবারে ভুল, অবশ্য যাহাতে শ্রম অধিক না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের পেশী সমূহ প্রস্তরের মত নহে যে ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া যাইবে। পেশী সমূহের ক্ষয় সর্ব্বদাই নূতন উপাদান দ্বারা পূরণ হইতেছে। বৃদ্ধ লোকে ভ্রমণ বা ব্যায়াম বন্ধ করিবেন না কিন্তু শক্তির অনুপাতে তাহার মাত্রা ঠিক করিয়া লইবেন।

৬০।৭০ বৎসরের অধিকাংশ বৃদ্ধই ব্যায়াম আমাদের উপযোগী নহে এই ভুল ধারনা বশতঃ শারীরিক ও মানসিক অবসাদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করাইতে পারিলে সকল প্রকার অবসাদ দূর হইয়া বল সঞ্চার হইবে এবং চিত্তে প্রফুল্লতা আসিবে। কোনরূপ অসুস্থতা না থাকিলে সামান্য বৃষ্টি বা ঠাণ্ডার ভয়ে বৃদ্ধ লোকের দৈনিক ভ্রমণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। আবশ্যক মত বস্ত্রাদিতে আবৃত হইয়া ভ্রমনে কোন বাধা নাই। যাঁহারা ভ্রমণ করিতে অপারগ তাঁহাদের প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা মুক্ত বায়ুতে কাটান আবশ্যক। গৃহের খোলা বারণ্ডায়, ছাদে বা ছায়ায় বৃক্ষতলে বসিয়া বা সুবিধা হইলে গাড়িতে চড়িয়া কয়েক ঘণ্টা যাপন করা ভাল। অনেক বৃদ্ধ লোকে মুক্ত বায়ুকে অন্যায় ভয় করেন কিন্তু ঘরের ভিতর যাহাতে তাঁহারা সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

## বার্দ্ধক্যে পাক যন্ত্রের অবস্থা

বার্দ্ধক্যে পাক শক্তি কমিয়া যায় এজন্য সে সময় খাদ্য সহজ পাচ্য এবং পরিমানে অল্প হওয়া আবশ্যক। শারীরিক বলের এবং দেহের কোষ সমূহের (cells) শক্তি হ্রাস হওয়ায়, দেহে যৌবনকালে যে পরিমান খাদ্য পরিপাক পাইত সে পরিমানে আর পরিপাক হয় না। বার্দ্ধক্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমানও ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দেওয়া অবশ্যক। অল্পপরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যই বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী। জীবনকে আরও কিছু কাল স্থায়ী করিতে হইলে এ সময়ে খাদ্যে লোভ একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিতাচারি হওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সকল বয়সে আবশ্যক হইলেও, বার্দ্ধক্যে তাহার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা না জন্মিতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মল কঠিন হইলে ও অধিকক্ষণ অন্ত্র মধ্যে থাকিলে আস্তরণের প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য অনেকের অর্শের উৎপত্তি ঘটে। নিয়মিত সময়ে মল ত্যাগের অভ্যাস থাকা এবং খাদ্যের মধ্যে ফল মূল ও শাক সব্জি উপযুক্ত মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আবশ্যক বোধ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য মধ্যে মধ্যে মৃদু জোলাপও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

## বার্দ্ধক্যে উত্তেজক সেবন

বৃদ্ধ লোকের চা, কফি ইত্যাদি সেবনের মাত্রা অল্প হওয়া উচিত এবং তামাকের মাত্রাও বিশেষ কম করিতে হইবে। বার্দ্ধক্যে সুরাপান বিশেষ অনিষ্টকর এবং একেবারে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা "Arterial Sclerosis" রোগের একটি অতি সাধারণ কারণ। সুরা সেবনের ফলে মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয় শীঘ্র হইয়া থাকে এবং মানসিক বৃত্তিরও হানী ঘটে। বাত, অজীর্ণতা, ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি বৃদ্ধ বয়সের সাধারণ রোগ সমূহও অনেক সময়ে এই কারণে জন্মিয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকে বৃদ্ধের পুরাতন অভ্যাস একবারে পরিত্যাগ করা ভাল নহে। কিন্তু এ কথার কোনই মূল্য নাই। উত্তেজক সেবনের মাত্রা ক্রমে ক্রমে কম করিয়া দেওয়ায় সকল স্থলেই সুফল ফলিতে দেখা যায়। অত্যাধিক ধূমপান, অধিক মা...জন প্রভৃতি অনিষ্টকর অভ্যাস সমূহের পক্ষেও এই নিয়ম খাটিবে।



...কোনরূপ সংক্রামন যাহাতে না ঘটে সে জন্য ... লোক বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। সামান্য ঠাণ্ডা ...গায় যুবা ব্যক্তির কোনই ক্ষতি না হইলেও তাহাতে ... লোকের ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া এমন কি মৃত্যু ...ন্ত ঘটিতে পারে। সর্দ্দি আক্রান্ত লোকের বৃদ্ধের ...র্শে আসা উচিত নয়। শক্তির হানীকর সকল ...রণ হইতেই রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, ...বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

## বৃদ্ধের দৈনন্দিন কার্য্য

অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকেরই কোন কার্য্য করিবার ...ক না। প্রাতে স্নান আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শয্যায় ...য়া থাকা, আহারের পর নিদ্রা, আবার সন্ধার পর ...হার শেষ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শয্যা গ্রহণ, এইরূপ ব্যবস্থা ...য়া থাকে। তাঁহারা বাড়ির বাহির হওয়া বা কোনরূপ ...নসিক পরিশ্রম করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। ... এরূপ ভাবে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল নহে। ...র শক্তি অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ... সকলের পক্ষেই আবশ্যক। বৃদ্ধ লোককে যে ...বাই কঠিন নিয়মে বন্ধ হইয়া চলিতে হইবে তাহা ... তিনি বিবেচনা করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যবস্থার ...র্ত্তন করিতে পারেন। অনেকের বৎসরের মধ্যে ...ক মাস স্থান পরিবর্ত্তন করায়ও অনেক উপকার ...য়া থাকে।

## বার্দ্ধক্যে মানসিক অবস্থা

বৃদ্ধ বয়সে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের অবনতি ঘটে। মস্তিষ্ক কোষ ও তন্তুর ক্ষয় হওয়ায় মানসিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে প্রথমতঃ স্মরণ শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, ধারণা শক্তিও কমিয়া যায়। ব্যক্তি বিশেষে ইহার বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায়। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত ব্যতিক্রমকে পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ব্যবহারের অভাবে বিদ্যারও হ্রাস ঘটে। ব্যায়ামের অভাবে আমাদের পেশী সমূহ যেমন দুর্ব্বল হইয়া যায়, আবার উপযুক্ত ব্যায়ামে তাহারা অধিকতর সবল হইয়া উঠে। সেইরূপ অলস মস্তিষ্কের ত্বরিত অবনতি, বিবেচনা মত মানসিক চর্চ্চা দ্বারা দূর করা যাইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে লোকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর, অত্যাধিক তামাক আফিম, মদ্য বা নিদ্রার দাস হইয়া পড়েন, ইহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের দ্রুত অবনতি ঘটিয়া থাকে। অপর পক্ষে যাঁহারা কর্ম্মের অভ্যাস রাখিয়া যান তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করেন। আমরা বৃদ্ধগণকে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতেই অনুরোধ করিতেছি। প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলে নিযুক্ত থাকা, দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করা, উদ্যান রচনায় মন দেওয়া প্রভৃতি বৃদ্ধের পক্ষে উত্তম কার্য্য। আত্মীয়স্বজনেরও এই সকল বিষয়ে বৃদ্ধের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

# বিবিধ সংগ্রহ।

**গবেষণার জন্য পুরস্কার**—রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও জীবাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বোম্বাইর ডাক্তার কনষ্টান মিও কুরিনহো তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৫ শত মুদ্রা পুরস্কার পাইয়াছেন।

---

**বার্ম্মার সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সমিতি**—নভেম্বর মাসের প্রথমে ব্রহ্মরাজ্যের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ এক সভায় মিলিত হইয়া আধুনিক ভীষণ পৃথিবীব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যধির চিকিৎসা প্রণালী আলোচনা করিবেন।

---

**বরোদার মহারাজার দান**—বরোদারাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়ান বাহাদুর প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত রাজ্যে আহার্য্য দ্রব্য মহার্ঘ হওয়ায় লোক সাধারণের ক্লেশ হইতেছিল বলিয়া মহারাজা বাহাদুর স্বীয় তহবিল হইতে প্রজা সাধারণের সাহার্য্যার্থ ১০ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

---

**খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা**—যুদ্ধের ফলে সর্ব্বপ্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের, বিশেষতঃ খাদ্য সামগ্রীর মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে জন সাধারণ অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে—কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে অতি ভীষণতর ক্লেশের সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্রহ্ম, আসাম, বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজের কিয়দংশ ব্যতীত ভারতের আর সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। জলাভাবে পশ্চিম বাঙ্গলা, সাঁওতাল পরগণা ছোট নাগপুর, ও উড়িষ্যার ক্ষেতের ধান শুকাইয়া যাইতেছে। ৬।০ টাকার কমে মোটা চাউলও মিলিতেছে না। দরিদ্র নর নারীর এখনই অন্ন জুটিতেছে না। যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে।

---

**যুদ্ধজ্বরের নিদান**—স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে জার্ম্মনদের এক বৃহৎ পরীক্ষাগার আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ এমন রোগ জীবাণু আবিষ্কার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, যাহাতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার জীবাণু বিদ্যমান থাকে। এই জীবাণু আমেরিকার বন্দরে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে আমেরিকার জাহাজের মাঝিমাল্লাগণ পীড়িত হইত, তথা হইতে সৈন্য ও জাহাজ ইউরোপে আসিতে পারিত না। কিন্তু বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে বিবাদ হওয়াতে হঠাৎ জীবাণুগণ মেড্রিড নগরে ছড়াইয়া পড়ে তাই স্পেনে ভীষণ যুদ্ধজ্বর আরম্ভ হয়। তথা হইতে ইউরোপের সকল দেশে ও অবশেষে পৃথিবীময় তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছে।

---

# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩২৫ সাল { ৭ম সংখ্যা

## আলোচনা

**সমর জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় দ্বিতীয় আক্রমণ**—গত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের দ্বিতীয় আক্রমণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। এবারে প্রথমে খিদিরপুর অঞ্চলেই জ্বর সংক্রামক রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী ডাক্তার ক্রেক্ সাহেব যথা সময়ে রোগের সহিত সংগ্রামের জন্য আয়োজন করেন। প্রতিকারার্থে—

| | |
|---|---|
| এমোনিয়া কার্ব্বনেট | ২ গ্রেন |
| সোডিয়াম বেন্‌জোয়েট্ | ২½ গ্রেন |
| কুইনাইন সলফেট্ | ১½ গ্রেন |
| অয়েল অফ্ থাইমল | ⅛ গ্রেন |

এই প্রেশক্রপসনের অনুযায়ী ঔষধের ট্যাবলেট, থাইমল সলিউসন ও অন্যান্য ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মোট ১৫ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ৪৫ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহার মধ্যে খিদিরপুর অঞ্চলেই ২৫টী মরণ। মিউনিসিপালিটি হইতে ২০ জন ডাক্তার ঔষধ গাড়িতে বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন অংশে বটিকা থাইমল আরক বিতরণ করিতে থাকেন। ক্যাম্পবেল হাঁসপাতাল ও শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতালে অস্থায়ী আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া স্থান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা যথোচিত না হওয়ায় সহরে রোগের প্রভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

২রা নভেম্বর যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সহরে এই রোগে মোট ৩২৬ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। খিদিরপুর, ভবানীপুর, ইটালী, শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান প্রভৃতি অংশেই মৃত্যু সংখ্যা অধিক। এক্ষণে স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ২৫টী কেন্দ্রে ঔষধ বিতরণের কার্য্য চলিতেছে। স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর অনুরোধে প্রথমে স্কুল-কলেজগুলি ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হয়। রোগের প্রভাব প্রবল থাকায় শেষে বন্ধের সময় আরও বৃদ্ধি করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম পর্য্যন্ত করা হইয়াছে।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, করাচী, দিল্লী, সিমলা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন প্রভৃতি সকল সহরেই এই জ্বরে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। পল্লীগ্রামও বাদ যাইতেছে না, রোগ একেবারে ভারতব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

**সংবাদ প্রচার সমিতির কার্য্য**—ভারতের জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য সেণ্ট্রাল সংবাদ প্রচার

সমিতি নিম্নলিখিত সংবাদ পুত্রিকা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন ;—

এই ব্যাধি পৃথিবীর সকল দেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই মহামারী হইয়াছিল, উহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়।

রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়।

খোলা হাওয়ায় থাকিও। যথাসম্ভব রোগীর সংশ্রব এড়াইয়া চলিও। যে ঘরে শয়ন কর উহার দরজা জান্‌লা খোলা রাখিও। যখন ঘুমাও তখন মাথা ঢাকিয়া রাখিও না। জনবহুল স্থলে যাইও না। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিও। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিও না।

রোগ কিরূপে আরম্ভ হয়।

প্রথমে জ্বর ও মাথা ধরায় রোগের সূচনা হয়, পিঠে ও শরীরের অপর স্থলে ব্যথা হয়। নাক চোক দিয়া জল পড়ে। গলা ব্যথা হয়, কখন কখন একটু কাসি থাকে।

রোগ আরম্ভ হইলে কি করিতে হয়।

যতক্ষণ জ্বর থাকিবে ততক্ষণ রোগীকে বিছানায় গরমে রাখিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঝোল পথ্য দিতে পারা যায়। জ্বর আছে বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য দিতে বাধা করিও না। অপাক বা উদরাময় না থাকিলে সুসিদ্ধ অন্ন দেওয়া যায়। জ্বরকালে শীতল জলে হাতমুখ ধোয়া ও স্নান করা বিপজ্জনক।

এই রোগের দুর্লক্ষণ নিউমোনিয়া। শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস, বুকে বেদনা, কাসি উঠা, কাসির সঙ্গে কখন কখন রক্ত থাকায় উহা প্রকাশ পায়। ঐ অবস্থায় রোগীকে শয্যায় রাখিতে হইবে, হাঁসপাতালে রাখাই বিধেয়। সকল অবস্থাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সঙ্গত।

**ব্রহ্মদেশে প্রতিষেধক ব্যবস্থা**—স্বাস্থ্য-সমাচারের জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর দত্ত, থঙ্গোয়া, ব্রহ্মদেশ হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

সম্প্রতি পোষ্টাফিস সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল সাহেব ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের নিম্নলিখিত প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

( ক ) পারমাঙ্গানাস পটাস জলে গুলিয়া তাহার কুল্লি রোজ দুই বার করিলে এই রোগ হইতে পারে না। ( খ ) পারক্লোরাইড মারকারী ১ ভাগ, জল ২০০০ ভাগ মীসারিনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গলার ভিতর রোজ দুই বার প্রলেপ দিবে। ( গ ) বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে। ( ঘ ) জনাকীর্ণ স্থানে গমনাগমন নিষেধ জানিবে। এই রোগ বড় সংক্রামক তজ্জন্য রোগগ্রস্ত হইলে অন্য লোকের সংশ্রব যত কম করা যায় ততই মঙ্গল। ( ঙ ) চিহ্নিত ঔষধ কোন ডাক্তার দ্বারা প্রস্তুত করাইবে যেহেতু "পারক্লোরাইড মারকারী" ভয়ানক বিষ।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইতেছে এবং যে সব স্থানে ডাক্তার কবিরাজ নাই সেই সব স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা ( সরকার বাহাদুর ) করিয়াছেন।

Fabrile Type of Influenzaর জন্য—

| | |
|---|---|
| সোডি সেলিসিলস্ | ১ ড্রাম |
| স্পিরিট এমন্ এরোমেট্ | ১½ ড্রাম |
| স্পিরিট ক্লোরোফরম | ১½ ড্রাম |
| জল মিশাইয়া মোট ৬ আউন্স | |

৬ দাগ করিতে হইবে। দিনে ৩ বা ৪ বার সেব্য।

Resperatory Influenzaর জন্য—

| | |
|---|---|
| এমন্ কার্ব্ব | ১৮ গ্রেন |
| টিংচার সিনকোনা কোং | ১½ ড্রাম |
| ভাইনায় ইপিকাক্ | ৩০ ফোঁটা |
| টিংচার সেনেগা | ১½ ড্রাম |
| স্পিরিট ক্লোরোফরম | ১½ ড্রাম |
| জল মিশাইয়া মোট ৬ আউন্স। | |

৬ দাগ করিতে হইবে। দিনে ৩ বা ৪ বার সেব্য।

**গভর্মেণ্ট ও অনাথ শিশু**—বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপে বহু শিশু অনাথ হইয়াছে। এইরূপ পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুর সংখ্যা পুনায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনাথ শিশুগণের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থ ও লোকের অভাবে ইহাদের ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। এই অবস্থা অবগত হইয়া বোম্বাই গভর্মেণ্ট স্বীয় ব্যয়ে শিশু পালন আশ্রম খুলিয়া ইহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। যদি অতঃপর আত্মীয় অভিভাবক ইহাদিগকে গ্রহণ না করে তাহা হইলে ইহাদিগকে প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য অন্য অনাথ আশ্রমে দেওয়া হইবে। গভর্মেণ্ট কলেক্টরদিগের উপর অনাথদিগের সাহায্য ব্যবস্থার ভার দিয়াছেন।

বোম্বাই গভর্মেণ্টকে এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।



# মুখ-গহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষা

মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা সাধারণ এবং চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক। মুখ-গহ্বরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকিলে যে লোককে কেবল খারাপ দন্ত, অজীর্ণতা এবং অন্য সাধারণ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা নহে ইহা হইতে কঠিন ব্যাধিরও উৎপত্তি হইতে পারে। অনেক রোগে চিকিৎসার পক্ষে রোগীর মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষা করাও চিকিৎসকের একটী প্রধান অঙ্গ। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে যে কেবল রোগীর অসুবিধা হয় তাহা নহে, চিকিৎসককেও রোগীর জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয়। কিরূপে ইহাতে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষতি করে প্রথমে সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া পরে এজন্য কিরূপ যত্ন লওয়া আবশ্যক তাহা বলা হইবে।

অপর কথা বলিবার পূর্ব্বে মুখের গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মুখগহ্বর সুদীর্ঘ পাকনালীর প্রথম বিস্তৃত অংশ। ইহার মধ্যে খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হইয়া থাকে। ইহা সম্মুখে ওষ্ঠদ্বয়, পার্শ্বে গণ্ডদেশ, উপরে তালু এবং নিম্নে জিহ্বা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মুখমধ্যে দন্ত সমূহই পেষণী রূপে খাদ্য পেষণ করে এবং জিহ্বা খাদ্য পেষণীর নিম্নে আনয়ন করিয়া কার্য্যে সহায়তা করে। বয়স্ক লোকের দন্ত সংখ্যা বত্রিশ। দন্তসমূহ চোয়ালের অস্থির মধ্যে সংলগ্ন। দন্তের যে অংশ চোয়ালের অস্থির মধ্যে সংলগ্ন থাকে তাহাকে দন্তের Root এবং যে অংশ বাহিরে থাকে তাহাকে Crown বলে। অস্থির ন্যায় যে পদার্থের দ্বারা দন্ত গঠিত তাহাকে Dentine বলা হয়। Dentineএর উপরে আবৃত কঠিন মসৃণ আবরণের নাম Enamel. এই Enamelএর জন্য দন্ত উজ্জ্বল দেখায়। দন্তের মধ্যস্থলে Tooth pulf থাকে ইহা স্নায়ু ও রক্তাধারের সমবায়ে গঠিত এবং দন্তের পুষ্টি সাধন করে।

কার্য্যভেদে দন্ত সমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) ছেদন দন্ত (Incisors)—৮

(২) কুক্কুর দন্ত (Canine)—৪

(৩) চর্ব্বণ দন্ত (Bisuspid)—৮

(৪) পেষণ দন্ত (Molars)—১২

৩২

লালাগ্রন্থি সমূহ হইতে মুখমধ্যে লালাস্রাব হইয়া থাকে। পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে লালাগ্রন্থির অবস্থান দেখান হইল।

মুখগহ্বর দেহাভ্যন্তরস্থ নানা পথের প্রথম প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। মুখগহ্বরের শেষে গল মধ্যে নাসারন্ধ্র, ও কর্ণরন্ধ্রের শেষ ভাগ উন্মুক্ত আছে এবং এই স্থান হইতে ফুসফুসের ও পাকস্থলীর পথ আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশ দ্বার অপরিচ্ছন্ন থাকিলে যেমন ঘর পরিষ্কার রাখা যায় না। সেইরূপ মুখগহ্বর পরিষ্কার এবং সুস্থ না থাকিলে পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতিকে সুস্থ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

## মুখগহ্বরের সাধারণ অবস্থা

খাদ্যদ্রব্যের চর্ব্বণ সম্পন্ন করাই মুখের প্রধান কার্য্য। চর্ব্বণকালে খাদ্যের অংশ দন্তে সংলগ্ন হয়। জিহ্বা সঞ্চালন এবং ওষ্ঠের সহায়তায় ও তৎসঙ্গে লালাস্রাবের দ্বারা সে সকল দ্রবীভূত হইয়া যায়। চর্ব্বণ ক্রিয়া দন্ত ও দন্তমাড়ীকে সুস্থ রাখে। দন্তের গোড়া হইতে সংলগ্ন খাদ্য অংশ দূর করার প্রাকৃতিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা কতক পরিমাণে দন্ত মধ্যে থাকিয়া যায়। এই সকল খাদ্য অংশ ও সঞ্চিত লালা দূর করাই দন্ত পরিষ্কার করার উদ্দেশ্য।

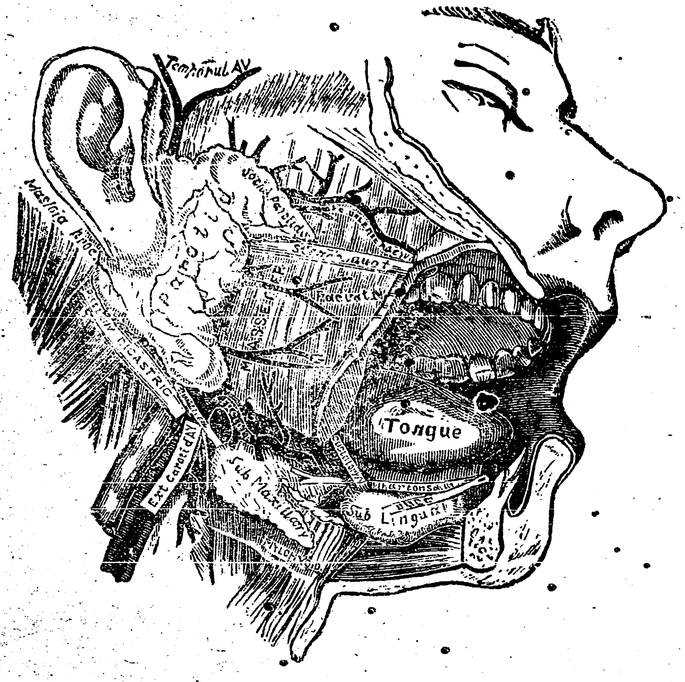


চিত্রে -- লালাগ্রন্থি, জিহ্বা ও উপরের দন্ত পাটি দেখান হইয়াছে।

## ব্যবস্থার দোষ

আজকাল এরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয় যাহাতে চর্ব্বণের অতি অল্পই আবশ্যকতা দেখা যায়। এরূপ খাদ্য ইচ্ছা থাকিলেও চর্ব্বণ করা দুরূহ ব্যাপার। নরম খাদ্যের অংশ সহজে দন্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। সংলগ্ন খাদ্য অংশ মুখ মধ্যে পচিতে আরম্ভ করে। 'কার্ব্বহাইড্রেট' জাতীয় খাদ্যের পচনে ল্যাক্‌টিক্ ও অন্যান্য এসিডের উৎপত্তি হয়। এই সকল এসিডের গুণে দন্ত হইতে "ক্যাল-সিয়ম" উপাদান নষ্ট এবং কালে দন্ত ক্ষয় হইতে পারে।

সংলগ্ন খাদ্য অংশ প্রদাহ উৎপন্ন করায় দন্তমাড়ির স্ফিতিও হইতে পারে। স্ফীতমাড়ি হইতে রস বাহির হইয়া খড়ির ন্যায় একপ্রকার পদার্থ (Tartar) দন্তের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হয়। দন্তের মাড়ি ও দন্তের মধ্যস্থিত স্থানে বীজাণু জন্মিয়া শেষে পুঁয হয়। দন্তের মূলদেশের চতুর্দ্দিকে পুঁয সঞ্চিত হইলে তাহাকে ডাক্তারীতে "Pyorrhœa alveolaris" বলে। এইরূপ স্থায়ী রোগে শেষে দন্তের আশ্রয় অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া দন্ত পড়িয়া যায় এবং চোয়ালেরও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে।

মুখ দিয়া নিশ্বাস লওয়া আর একটি মন্দ অভ্যাস। ইহার ফলেও দন্ত এবং মাড়ির নানা ব্যাধি জন্মে। সাধারণতঃ মুখমধ্যে চর্ব্বণের অনবরত ঘর্ষনে, গণ্ডদেশের আন্তরণের সংস্পর্শে, জিহ্বা সঞ্চালন ও তৎসঙ্গে লালা-ক্ষরণে দন্তমাড়ি সুস্থ অবস্থায় থাকে। মুখশ্বাস গ্রহণে বা দন্তের অশক্ত অবস্থা ইত্যাদি ব্যতিক্রমে মাড়ির চতুঃপার্শ্বে ফুলিয়া উঠে। মুখশ্বাস গ্রহণকারীতে এই লক্ষণ বিশেষ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। নাসিকাবন্ধের জন্য কষ্ট পাইতেছে এইরূপ শিশুর দন্ত মাড়ি পরীক্ষা করিলেই তাহতে ফুলা দেখা যাইবে। মুখগ্রাস গ্রহণ করায় দন্ত মাড়ীতে ওষ্ঠের ঘর্ষণ অনেক কম হয় সেজন্য মাড়ীর ক্ষতি হইয়া থাকে।

## দন্তের যত্ন

সকল প্রকার দন্তরোগ নিবারণ করিতে হইবে। মুখশ্বাস গ্রহণ ও খারাপ দন্ত এই দুইটি কারণ হইতেই প্রধানতঃ মুখের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। যাহাতে শ্বাস পথের যে কোন বাধা ( নাসা প্রভৃতি ) দূর হইয়া সহজে শ্বাস ক্রিয়া চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগ দুষ্ট দন্তে চর্ব্বণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং চর্ব্বণ ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন না হইলে দন্ত পরিষ্কার রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য রুগ্ন দন্ত তুলিয়া ফেলা বা তাহা নির্দ্দোষ করা কর্ত্তব্য।

আহারের পর দন্ত পরিষ্কার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক আহারের পর দন্ত ভালরূপে পরিষ্কার করার সুবিধা না হইলে রাত্রির আহারের পর ইহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিদ্রার সময় লালার স্রাব বন্ধ হয় এবং এই সময়ই খাদ্যের প্রধান পচন আরম্ভ হয়। দন্ত পরিষ্কারের জন্য 'টুথ্ ব্রাস' ছোট



করা কর্ত্তব্য। ব্যবহারের সময় 'ব্রাস' পার্শ্ব দিকে না লাইয়া সোজাভাবে চালান উচিত। নিমের দাঁতন আমাদের দেশে বহু দিন হইতেই দন্ত পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা বিলাতি 'টুথ ব্রাস' অপেক্ষা অনেক উত্তম। নিমের দাঁতনে প্রতিষেধক ও সঙ্কোচন দুয় গুণই বর্ত্তমান।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ Royal Dental Hospital এ রুগ উপদেশ রোগিগণকে দেওয়া হয় তাহার অনুবাদ য় দেওয়া হইল।

(১) দন্ত সমূহ অবশ্যই পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

(২) অপেক্ষাকৃত কড়া ছোট 'টুথ ব্রাস' ব্যবহার রিবে। খড়িরগুঁড়া ও তৎসহ অল্প সাবানে দন্তমার্জ্জন রিবে।

(৩) সমস্ত দন্ত বিশেষতঃ পশ্চাতেরগুলি উত্তমরূপে করিবে। দন্তের সকল অংশ যেন ব্রাস করা হয়।

(৪) শুইতে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দন্ত পরিষ্কার রিবে। পরিষ্কারের পর আর কোনরূপ খাদ্য ভক্ষণ রিবে না। পুনরায় প্রাতঃকালে দন্ত পরিষ্কার করিবে।

(৫) পরিষ্কৃত দন্ত নষ্ট হয় না। দন্তের মধ্যবর্ত্তী ন উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

## দন্তক্ষয় নিবারণ।

প্রতিশোধের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য গিতে হইবে—

(১) শিশুকে মাতৃদুগ্ধের দ্বারাই পোষণ করা।

(২) যে সব খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃ করিতে হয়, সেইরূপ খাদ্যই জীবনের প্রথম ভাগে হার করা।

(৩) "কার্ব্বহাইড্রেট" খাদ্যের ব্যবহার। এ খাদ্য ম পচনশীল নহে।

যে সকল খাদ্য চর্ব্বণ করিতে হয় আহারে তাহার ন্ত থাকা কর্ত্তব্য। নরম খাদ্য যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। মিষ্ট ভোজনের মাত্রা কম া আবশ্যক। সুবিধা থাকিলে আহারের শেষভাগে ফল খাওয়া উত্তম। ফলে অম্ল অম্লভাগ থাকায় লালার স্রাব অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। নিয়মিত সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর আহার গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তখন আহার গ্রহণ দ্বারা লালাস্রাবকে উত্তেজিত করিলে তাহার গুণের ব্যতিক্রম ঘটে।

যে মুখ মধ্যে দন্তক্ষয় রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শয়নের পূর্ব্বে নিম্নলিখিতরূপ ঔষধ লাগাইলে সুফল দেখা যায়।

| | | |
|---|---|---|
| ম্যাগ্ কার্ব্ব ( Levis ) | — | ৪ ড্রাম্ |
| গোলাপ জল | — | ৬ আউন্স |
| জল | — | ৬ „ |

দন্ত পরিষ্কারের পর এই ঔষধ মুখমধ্যে এক চামচ পরিমাণ লইয়া দন্ত সমূহে লাগাইতে হইবে।

## দন্ত মাড়িতে পূঁয সঞ্চয় নিবারণ।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে দন্তের চতুর্দ্দিকে খাদ্যের অংশ ও Tartar সঞ্চিত হইয়া দন্ত মাড়ির স্ফীতি উৎপন্ন করে। ইহাতে পূঁয সঞ্চয় নিবারণ করিতে—

(১) পূর্ব্ব লিখিত মত দন্ত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

(২) দন্তের চতুর্দ্দিকে অধিক Tartar জমিতে দিবে না। অধিক পান বা সুপারি চর্ব্বণে এক প্রকার রঙ্গিন খড়িবৎ ময়লা দন্তের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হয়। যাঁহারা দন্তরোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের ইহা একবারে নিবারণ করিতে হইবে। পান চর্ব্বণে মুখের দুর্গন্ধ চাপা থাকে সেজন্য রোগ সহজে ধরা পড়ে না। পানখোর লোকের এজন্য বিশেষরূপে দন্ত পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

যে সকল লোকের দন্তস্ফীতি রোগের সম্ভাবনা আছে তাহাদের পক্ষে পচন নিবারক ঔষধের কুল্লি ব্যবহার করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দন্তের মাড়ি ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগের গতি আরম্ভেই রোধ হইয়া থাকে। মাড়ি আল্গা থাকিলে টুথ্ পাউডার বা মাজন ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ মাড়ির খাঁজের মধ্যে গুঁড়া জমিয়া অধিক প্রদাহ উৎপন্ন করিতে পারে।

# ম্যালেরিয়া তত্ত্ব

লেখক—শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়

( 'আয়ুর্ব্বেদ' হইতে উদ্ধৃত )

ইহা আনন্দের বিষয় যে, বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হয় এ বিষয়ে বাঙ্গালী মাত্রেই অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক পর্য্যালোচনা করিতেছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে "ধ্বংসোম্মুখ জাতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসরের সেন্সস-বিবরণী হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুসলমান জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দু জাতির সংখ্যা-হ্রাস দেখাইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তাহার ধ্বংসের কারণ নিহিত আছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধের উত্তরে ঐ সকল সেন্সস বিবরণী হইতেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী-হিন্দু ক্ষয় হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ হিন্দুর আচার ব্যবহারে নহে, তাহার কারণ অন্যত্র। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক—বাঙ্গালী প্রকৃতই ধ্বংসোম্মুখ কিনা সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাঁহারা সকলেই সেন্সস বিবরণী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্ব-সম্মতিমতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালী জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান্ সকলেরই সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বঙ্গদেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশে মৃত্যুরহার যেরূপ ভীষণ, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার হাজার-করা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে জন্মহার খুব অধিক, কিন্তু মৃত্যুহার দেখিলে মনে হয়—এ কেবল মরিবার জন্যই জন্ম।

জন্মহার

| দেশ | ১৮৮১ | ১৮৯০ | ১৯০১ | ১৯০৪ | ১৯০৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| বঙ্গদেশ | ৪৭.৯ | ৫১.৮ | ৪৩.৯ | ৪২.৬৯ | ৩৯.৫ |
| ইংলণ্ড | ৩৪.৭ | ৩০.২ | | | ২৭.২ |

মৃত্যুহার

| দেশ | ১৮৮৫ | ১৮৯১ | ১৮৯৩ | ১৯০৩ | ১৯০৪ | ১৯০৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড | | ১৯.৮ | ১৭০ | ১৫.৪ | ১৫.৩ | ১৫.২ |
| বঙ্গদেশ | | ২২.৭৮ | ২৬.৯৪ | | ৩১.৩২ | ৩৩.৩৩ |
| | | | | | ৩২.৪৫ | ৩৮.৩ |
| বম্বে | | ২৭.২৬ | ৩২.৩ | | ৪১.৩৯ | ৩১.৮৪ |
| মান্দ্রাজ | | ২৬.২ | ২২.৩ | | ২২.৫ | ২১.৪ |

বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর বন্যা যেরূপ প্রবলভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এমন আর কোথায়? মৃত্যু সকল দেশেই আছে, সকল মানবেরই আছে, জন্মিলে মরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের একি মরণ? স্বাভাবিক বার্দ্ধক্য অনেক সময় মৃত্যুর কারণ; আকস্মিক আধিদৈবিক ঘটনা বহুশঃ মৃত্যুর কারণ, অনেক ব্যাধি—যাহার হস্ত হইতে মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম—সেই সকল নিবার্য্য-ব্যাধিতেও অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই সকল নিবার্য্য-ব্যাধির প্রতিপত্তি ইংলণ্ডে কিরূপ শুনিবেন!—তাহা দ্বারা হাজার করা ৭ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। বঙ্গদেশে হাজার করা প্রায় ৩০ জন ঐরূপ ব্যাধিতে জীবন ত্যাগ করে। আর ঐ ৩০ জনের মধ্যে ২০।২১ জনের একমাত্র জ্বর রোগেই জীবনের অবসান হয়। এ কি মরণ! মৃত্যু চাহি না—একথা আমি একবারও বলিব না, মৃত্যু ত চাহি, কিন্তু পৃথিবীর লোক যেমন করিয়া মরে—তেমনি করিয়া মরিতে চাহি—এ সৃষ্টি ছাড়া মরণ চাহি না, এ পৃথিবীর আস্তাকুড়ে পচিয়া পচিয়া মরিতে চাহি না। বাঙ্গালা দেশে এখন কিরূপ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য বুঝিবার জন্য যেমন রুদ্ধ গৃহে বসিয়া চাঁদের ছবি না দেখিয়া মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়, তেমনি বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সস-বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে আর বিচারবিতর্ক মনে আসিবে না,—বাঙ্গালার যে কি অবস্থা হইয়াছে—তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লীবাসীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চহাস্য, সে ক্রীড়া কলরোল, সে আত্মীয়-স্বজন-ভরা-প্রফুল্ল সংসার! কোথায় গেল সে সম্মুখ সংগ্রাম—সে জীবন্ত জীবন!—কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব,—কোথায় গেল সে পূজা-পার্ব্বণ? বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম—যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ ভবন ছিল, যেখানে একদিন বালকের কলরোলে, যুবকের সঙ্গীতে, বৃদ্ধের ক্রীড়ায় আনন্দের অসীম প্রস্রবণ উন্মুক্ত ছিল,—যেখানে একদিন কুলবধূগণ সুস্থ সুন্দর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর কণ্ঠে আকাশের দেবতাকে আহ্বান করিত—নারীগণের ব্রতে—দেবার্চ্চনায়, গুরু সেবায় ভক্তির ভাব জাগরিত হইত—যুবক ও প্রৌঢ়জনের সঙ্কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালীতে অনন্ত স্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া উঠিত—সেই পল্লীগ্রামে আজ নিরানন্দের ছায়ায় অন্ধকার,—সেখানে আজ লোকসংখ্যা বিরল—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মাণ, আনন্দের,—স্ফূর্ত্তির চিহ্ন মাত্র নাই—সে স্থান শ্মশানের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

কোনও কোনও গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহ জনশূন্য, কোথাও বা একটি বৃহৎ অট্টালিকা, একদিন সে বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত এখন সে অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়,—তাহারই একটা ঘরে দুইটী বিধবা,—কেবল বিধবা বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া আছেন।

অনেক বাটীতে ঘরে ঘরেই জ্বর, শুশ্রূষা করিবার লোক পাওয়া যায় না। কাহারও জ্বর আসিয়াছে—কাহারও আসিতেছে—কাহারও বা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। কেহ মুমূর্ষু, কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত। পাঁচজনে দেখা হইলে রোগের কথা, শোকের কথা, দুঃখের কথা। এই ত এখন বাঙ্গালার প্রাণের কথা,—আমি একথা চাহি না। একদিন জন্ম—একদিন মৃত্যু; মাঝের দিন কয়টা প্লীহা-যকৃতের বেদনা—জ্বর। এই ত এখন বাঙ্গালার জীবন! এ জীবন-কি জীবন—না একটা দুর্ব্বহ ভার! এ জীবনে কি আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে, না আশার আলো আছে? আমি এ জীবন চাহি না! ১৯১৬ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণ (Report on Sanitation in Bengal for the year 1916) প্রকাশিত হইয়াছে, তদবলম্বনে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার গত মাঘ মাসের সংখ্যায় বঙ্গদেশে ১৯১৬ সালের একটী মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে! তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৯১৬ সালে সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৪১,০২১ জন যমপুরে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র জ্বর রোগেই ৯,০৯৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১,৭৪,৬৮০, প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে ১,৮১,৫৮৩; রাজসাহী বিভাগ হইতে ২,৮২,১৮৭; ঢাকা বিভাগ হইতে ১,৮৫,৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ৮৬,০৫৪ একুনে ৯,০৯,৮৮০ জন একমাত্র জ্বর রোগেই যমালয়ে গমন করিয়াছে। কি ভীষণ অবস্থা!

ম্যালেরিয়া যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং এই ম্যালেরিয়াকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে যে দেশের মঙ্গল নাই—সে বিষয়ে দুইমত হইবার কারণ দেখা যায় না।

এই "আয়ুর্ব্বেদের" এক সংখ্যায় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—"কি কুক্ষণে জানিনা ম্যালেরিয়া বিষ বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীমাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব"। কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—"একি সম্ভব? এত বড় ভীষণ রাক্ষস—যে সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—তাহাকে বিতাড়িত করিবার শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? আমরা অর্থহীন শক্তিহীন—আমরা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া দিব—ইহা অসম্ভব।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া দেশবাসীগণ ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় এই কথাই দেশ জননীকে নিবেদন করিয়াছেন—"কি সেই মহাসত্য—যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে।" আমাদের দেশে সকলের মনে এই ভাবটী জাগরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনি এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে।

ম্যালেরিয়াকে তাড়িত করিতে হইলে আমাদের কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক:—

১ম—ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ কি?

২য়—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কি না এবং কোনও দেশ হইতে দূরীভূত করা গিয়াছে কি না?

৩য়—ম্যালেরিয়া নিবারণের কি সহজ উপায় আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। তবে এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে। যে দেশ নিম্ন, জলাময়—যেখানে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের আধিক্য—যেখানে জঙ্গলাকীর্ণ—সেই সকল স্থলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ইহার কারণ কি?

এত আমাদের সেই পুরাতন দেশ? কোথা হইতে ম্যালেরিয়া আসিল?

(১) অনেক মনীষী এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—"পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানব সংসর্গ একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয় তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়। নূতন জাতির সংস্পর্শে পুরাতন জাতির জাতীয় আচার-ব্যবহার-রীতি নীতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আপাত দৃষ্টিতে কুফল প্রসূ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলও যে মারাত্মক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহার পরিচ্ছদ, উৎসব, আনন্দ, ক্রীড়া—সকল বিষয়েই জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বনে সেই জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ হয়, তাহার নিদর্শন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরাও হইয়াছি।



(২) এদেশে রেলওয়ে বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার ...বির্ভাব বিশেষ সংশ্লিষ্ট আছে। রেলপথের দুইধারে ... নালা থাকে, তাহাতে জল জমিয়া থাকে এবং ...লপথের দ্বারা গ্রামের জল নিঃসরণের পথ অনেক ...ল বন্ধ হইয়া যায়। রাজা দিগম্বর মিত্র এই মত ...প্রথমে সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন।

...দেশের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দারিদ্র্য যে দেশবাসীকে ...ল করিয়া আনে, তাহার ফলে নূতন রোগের ...বির্ভাব সুগম হয়।

...আমাদের বিলাস-বাসনা প্রবল, অথচ আমাদের ...ত্রে ধান্য জন্মেনা, যে উপায় অবলম্বনে ধান্য জন্মিতে ...রে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের শিল্প ... বাণিজ্য নাই। আমাদের খাইবার সংস্থান নাই ...বার সঙ্গতি নাই এরূপ ক্ষেত্রে রোগের বীজ যেমন ...ল এমন আর কিছুই নহে।

উপরে যে তিনটী কারণের কথা উল্লেখ করিলাম, ...রা সম্পূর্ণ পৃথক নহে, পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ঐ সকল ...রণ এবং আরও কতকগুলি কারণ পরোক্ষভাবে ...লেরিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। ম্যালেরিয়ার ...ক কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তে ...নীত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দটী ইটালীয়, উহার ...গত অর্থ মন্দ বাতাস (mala—মন্দ aria—বাতাস) ...জী বৈদ্যক সাহিত্যে ১৮২৭ সালে এই কথাটী ...শ লাভ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণাবলী ...সুস্পষ্ট যে; ম্যালেরিয়া-নির্ণয় আদৌ দুঃসাধ্য নহে ... যে দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবেশ লাভ ...য়াছে, সেই দেশবাসীর দেহের ও মনের যে ইহা ...নাশ সাধন করিয়াছে তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। ... ইহার নিদান সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহই কোনও সিদ্ধান্ত ... করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ইহা এক ...রের বিষ বলিয়া অনুমিত হইত, কোনও প্রকারে ... বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করিত। ...নিকেরা উক্ত বিষের অনুসন্ধান অনেকস্থলে ...য়াছেন, আর্দ্রভূমিতে, জলায়, উদ্ভিদরাজ্যে,—কিন্তু ...তে সফলতা লাভ করেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, দিবসের অতিরিক্ত উত্তাপের পর সহসা নৈশ আর্দ্র শীতবায়ু দেহে সংলগ্ন হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিত। ম্যালেরিয়ার-কারণ অনুসন্ধিৎসুগণ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তমধ্যে একপ্রকার জীবাণু পরিলক্ষিত হয়—অপর কোন রোগীর রক্তে উক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই এবং যাহারই রক্তমধ্যে উক্ত জীবাণু পুষ্ট হইতেছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহারই ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। উক্ত জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার নিদান তাহা বুঝিতে বাকি থাকিল না, কিন্তু কোথা হইতে ঐ জীবাণু আইসে, উহা কি জাতীয় এবং কিরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত হয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

অনুসন্ধানে যিনি সফলকাম হইলেন তিনি নিজের আত্মপ্রসাদের সহিত পৃথিবীর ধন্যবাদ ও তৎসহ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। সে অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৯৯ সালে মান্দ্রাজের জনৈক I.M.S. Ranold Ross তাঁহার আবিষ্কার সভ্যজগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তখন হইতে, ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে আর মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইহা অবিসম্বাদিত রূপে স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে যে বিশেষ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত জীবাণুর দেহের মধ্যে প্রবেশই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ—কোনও রূপে কোনও দেহে উক্ত জীবাণু-প্রবেশ নিবারণ করিতে পারিলে সেই দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়। নিঃশ্বাসে বায়ুর সহিত, পানে জলের সহিত, খাদ্যের সহিত বা অপর কোন প্রকারে উহা সংক্রামিত হইতে পারে কি না—তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার চরম সিদ্ধান্ত Ranold Rossএর কীর্ত্তি এই যে, এক জাতীয় মশক আছে—কেবল তাহারাই উক্ত জীবাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া

গিয়া থাকে। ঐ মশকের নাম anopheles. উক্ত মশক রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তসহ উক্ত জীবাণু শোষণ করিয়া লয়—উক্ত জীবাণু উক্ত মশক দেহে বিনষ্ট না হইয়া পুষ্টি ও বল লাভ করে। পরে জীবাণুবাহী এনোফিলিশ মশক নীরোগ ব্যক্তির গাত্রে দংশন কালে উক্ত জীবাণু তাহার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। উক্ত জীবাণু মনুষ্য রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সাধারণতঃ ১০।১১ দিবস পরে উক্ত ব্যক্তির শীত, কম্প, পিপাসা হইয়া জ্বর আইসে। ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে, এনোফিলিস মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া বীজাণু গ্রহণ পূর্ব্বক নীরোগদেহে দংশন কালে উক্ত জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার করিয়া থাকে—ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় কথা—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কি না? মানব শরীরের গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার ম্যালেরিয়া হইবেই হইবে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়া আদৌ নাই, সুতরাং ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য—তদ্বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংক্রামক রূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে যে স্থানে তাহা নিবারণ করিবার উপায় বিধিমত অবলম্বিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া যে নরশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—তাহার কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) হাভানায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা

| বৎসর | সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৮০ | ৩২৫ |
| ১৮৮৮ | ১০১ |
| ১৮৯০ | ১৭০ |
| ১৮৯৫ | ২০৫ |
| ১৯০০ | ৩৪৪ |

তৎপরে ১৯০১ সাল হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে—

| সাল | ১৯০১ | ১৯০২ | ১৯০৩ |
|---|---|---|---|
| | ১৯০৪ | ১৯০৫ | ১৯০৬ |
| সংখ্যা | ১৫১ | ১৭৭ | ৫১ |
| | ৪৪ | ৩২ | ২৬ |

(২) সুইডেনহাম বন্দরে

১৯০১ সালে জ্বর বিদূরিত করিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়।

| বৎসর | ১৯০১ | ১৯০২ | ১৯০৩ | ১৯০৪ | ১৯০ |
|---|---|---|---|---|---|
| মৃত্যু সংখ্যা | ৬১০ | ১৯৯ | ৬৯ | ৩২ | ২ |

(৩) হং কং

| বৎসর | ১৮৯৭ | ১৮৯৮ | ১৮৯৯ | ১৯ |
|---|---|---|---|---|
| মৃত্যু সংখ্যা | ১৯৭ | ১২৬ | ৬৩ | ১ |

তৎপরে ১৯০১ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা ফলে—

| বৎসর | ১৯০১ | ১৯০২ | ১৯০৩ | ১৯০৪ | ১৯০ |
|---|---|---|---|---|---|
| মৃত্যু সংখ্যা | ১৩২ | ১২৮ | ৬৩ | ৫৮ | ৫ |

(৪) ইসম্যালিয়াতে ১৯০২ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা হয়। ১৯০২ সালের পূর্ব্বের ও পরের মৃত্যুসংখ্যা বিশেষ বিবেচনার বিষয়—

| বৎসর | মৃত্যু সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৭৭ | ৩০০ |
| ১৮৮২ | ৪৮০ |
| ১৮৮৭ | ১৮০০ |
| ১৮৯২ | ২০৫০ |
| ১৮৯৭ | ২০৮৯ |
| ১৮৯৯ | ১৭৮৪ |
| ১৯০০ | ২২৮৪ |
| ১৯০১ | ১৯৯০ |
| ১৯০২ | ১৫৫১ |
| ১৯০৩ | ২১৪ |
| ১৯০৪ | ৯০ |
| ১৯০৫ | ৪৭ |



ইহা দেখিলে কে না বলিবে যে, ম্যালেরিয়াকে দূর মানবের শক্তির অধীন। ইহা দেখিলে নিজের শে ম্যালেরিয়ার এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত প্রভাব খিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পানামা খাল ন কালে সহস্র সহস্র কুলি কার্য্য করিয়াছিল। ম বার পীত জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় বহু সহস্র কুলি ত্যাগ করে কিন্তু দ্বিতীয় বারে বিশেষ সতর্কতার ত কার্য্য করায় ঐ দুইটী রোগের প্রভাব লক্ষিত নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় বারে যাঁহার চেষ্টায় সুফল য়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বিবেচনা করি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে সহজেই াইতে পারেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কোনও র অধিবাসীগণকে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়া হইতে করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত এবং তাহার জন্য যে সকল ার প্রয়োজন তাহাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য।" ন আরও বলিয়াছিলেন—"গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যে স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কবলগ্রস্ত, সেই সকল মানব ইতিহাসের প্রভাত কালে ধনে-জনে-জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল, আবার তেমনি হইবে।" এই ার বাণী এদেশে কি পরিপূর্ণ হইবে না?

তৃতীয় কথা ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে।—ম্যালে- র যে সকল পরোক্ষ কারণের কথা উল্লিখিত াছে বা অন্য যে সকল পরোক্ষ কারণ আছে, তৎ কোন আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেরিয়ার যাহা প্রত্যক্ষ কারণ তাহা কিরূপে দূর করা —তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান ও প্রথম আলোচ্য হইতেছে। এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশক লেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত মশকের চন ও উহার আকৃতি-প্রকৃতি, উদ্ভব-স্থিতি-লয় দি সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যাবশ্যকীয়। তৎপরে মশক যাহাতে আমাদিগকে দংশন করিতে না পারে— র উপায় স্থির করা এবং অবলম্বন করা প্রয়োজন। নোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশকের আকৃতি— ণ মশকের আকৃতি হইতে কিছু ভিন্ন আছে।

উক্ত মশক সাধারণতঃ দূষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে—যেখানে ডোবার চতুষ্পার্শ্বে নলখাগড়া বা অন্য উদ্ভিজ্জের বাহুল্য আছে—সেই স্থানই ডিম্ব ত্যাগের প্রকৃষ্ট স্থল। ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়, উক্ত কীট কিছুদিন পরে রূপান্তরিত হইয়া গুটী হয় ও পরে গুটী হইতে মশক দেহ ধারণ করিয়া জল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। জলে অবস্থান কালে ইহারা মৎস্যের খাদ্য।

ম্যালেরিয়া-মশকের জন্ম ও পুষ্টি—দূষিত জলাশয়ে, সেই জন্য সকল দেশেই দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থাই ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রথম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে কি প্রকারে দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়।

বাঙ্গালা দেশে অনেক নদী পুরাতন প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতেছে, অনেক নদী শুকাইয়া গিয়াছে—এই সকল নদীর সংস্কার করিয়া গ্রাম সমূহের জলপ্রণালী উক্ত নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিবার কল্পনা অনেকের মনে আসিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা যে কিরূপ ব্যয় ও শক্তি-সামর্থ্য সাপেক্ষ ও যেরূপ বিপদ সঙ্কুল, তাহাতে সে কল্পনা করিতে সাহস হয় না। আমি এমন উপায় চিন্তা করিতে বলি—যাহা আমাদের সাধারণের সাধ্যায়ত্ত অথচ যাহার ফলও সুনিশ্চিত।

আমি একএকটী বিশেষ গ্রাম অথবা পরস্পর সংলগ্ন দুই তিনটী গ্রামের এক একটী গ্রাম্য মণ্ডলী সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিবার কথা বলি। এইরূপ পৃথক চেষ্টায় প্রথম ও প্রধান ফল এই যে, যে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা হইবে—সেই গ্রামের আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির উৎসাহ, উদ্যম ও চেষ্টার অবধি থাকিবে না। নিজের সংসার রক্ষা, বংশ রক্ষা, প্রাণ-রক্ষায় কে উদাসীন থাকিতে পারে? গ্রামের মধ্যে এই উন্নতির আবশ্যকীয়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে উক্ত উন্নতির জন্য কার্য্য করা সহজ হইবে।

কোনও একটী গ্রামের অধিবাসীগণ তাঁহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনে অভিলাষী হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আবশ্যক এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, বিরোধ, স্বার্থপরতা—এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু অল্পসংখ্যক কয়েক জন ব্যক্তির উপর সাধারণতঃ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহারা গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী ডোবা, জলপ্রণালী আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুষ্করিণী বৃহৎ—যাহাতে মৎস্য আছে—সেই সকল পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া মশকের ডিম্ব মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র, সুতরাং সেই সকল পুষ্করিণী দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল জলাশয় ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ, সেই সকল পুষ্করিণীর সংস্কার করা আবশ্যক, কিন্তু পল্লীগ্রামে, পুষ্করিণী-সংস্কার এক দুঃসাধ্য বিষয় হইতেছে। অনেক পুষ্করিণীর অধিকারী এক্ষণে নিঃস্ব হইয়াছেন—তাঁহাদের সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই। এরূপ স্থলে গ্রামের অন্য অধিবাসীগণ অপরের পুষ্করিণী সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে কখনই স্বীকার করেন না এবং এমন কি—পুষ্করিণীর মালিকও অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন না। অনেক স্থলে একটী পুষ্করিণীর অনেকগুলি 'সরিক' থাকায় কেহই তাহার উন্নতি কল্পে কোনও চেষ্টা করেন না। কিন্তু এখন আর সে গোলযোগ করিবার দিন নাই—যে পুষ্করিণীর সংস্কার গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে—তাহাতে সরিকের তর্ক, স্বত্বের তর্ক, হিন্দু মুসলমানদের তর্ক করিবার আর অবসর নাই। পুষ্করিণী অসংস্কৃত থাকিলে তাহার বিষময় ফল গ্রামের সকলকেই সমানভাবে ভোগ করিতেই হইবে—সুতরাং পুষ্করিণীর-সংস্কারের ভারও সকলকেই লইতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী ব্যতীত গ্রামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কোনও সংযোগ নাই, তাহারা বদ্ধ জল মাত্র,—তাহাদিগকে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। আবার কতকগুলি জলাশয়—যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে বদ্ধজল বলিয়া প্রতীয়মান হয়—প্রকৃতপক্ষে পয়ঃপ্রণালীর অংশমাত্র, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমতলে এক বা বহু পয়ঃপ্রণালী গঠিত করিতে হইবে—যাহা দ্বারা গ্রামের কলুষ জলরাশি কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া দূরে নদীগর্ভে বা অন্যত্র নিঃসারিত হইতে পারে।

এই প্রকারে কোন গ্রামের উন্নতি করিতে গেলে গ্রামবাসীগণকে প্রথমেই একটী অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে,—কোন্ পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক, কোন্ জলাশয় পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ স্থান দিয়া কি ভাবে পয়ঃপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, কোথায় ম্যালেরিয়া-মশকের নিবাস—এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসীগণের কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস না হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। গ্রামবাসীগণের দ্বিতীয় অসুবিধা—যাহা না হইলে কোন কাজই হয় না সেই অর্থের জন্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা যদি একবার বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াই, তবে ঐ দুইটি অসুবিধার কোনটীই আমাদের পথে অন্তরায় হইবে না।

যেমন পল্লীসংস্কারের ভার একদিকে পল্লীবাসীর উপর ন্যস্ত থাকিবে, তেমনি অপরদিকে যাঁহারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পল্লী হইতে পলাইয়া সহরে আসিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেই তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে না। সহর হইতে তাঁহাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর উদ্যম ও চেষ্টার সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ও জ্ঞানের সম্মিলন করিতে হইবে। এই সম্মিলনেই আমাদের সকল আশা ও ভরসা নিহিত আছে।

সহরের মধ্যে কলিকাতা প্রধান—জ্ঞানে ও অর্থে কলিকাতা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক বিদ্যা হইতেছিল বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল—সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিও কলিকাতার অনেক



কর্ত্তব্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই কলিকাতা সহরে কয়েকটী দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য চিকিৎসক Anti Malarial League (ম্যালেরিয়া দমন সমিতি) নামে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেশ মধ্যে যে কোনস্থানে গিয়া পল্লীবাসীদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমিতিকে লোকবল, অর্থবল দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে,—জেলায় জেলায়—এমন কি প্রতি মহকুমায় যাহাতে উহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করিতে হইবে।

কলিকাতায় উক্ত 'ম্যালেরিয়া দমন সমিতির' নির্দ্দিষ্ট পন্থা আশ্রয় করিয়া কলিকাতার অদূরবর্ত্তী পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটিতে ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য হইয়াছে ও তাহা যেরূপ ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নিতান্তই আশাপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের নিকট আমি এই প্রবন্ধের প্রত্যেক তথ্যের জন্য ঋণী। তিনিই দশবর্ষাধিককাল উক্ত পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীতে ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অভিজ্ঞতা, লোকবল বা অর্থবলের কিছুই ছিল না, তজ্জন্য কোনও কার্য্য করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মশকের আবাসভূমি খুঁজিতে লাগিলেন, দেখিলেন যে, বৃহৎ জলাশয় গুলিতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম্ব নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্থলীগুলি প্রতি বৎসর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কয়েকজন কুলি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্‌গুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন—তাহার প্রভেদ বিচার না করায় তাহাদের দ্বারা ক্ষতিই হইত। সেই মহানুভব ব্যক্তি গ্রামের সর্ব্বস্থান দর্শন করিয়া গ্রামের একটী প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া কোন্ জলাশয়গুলির কোনও সংস্কারের আবশ্যক নাই এবং কোন্ গুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন—তাহা স্থির করিলেন। গ্রামের পয়ঃপ্রণালী গুলি দ্বারা জল নিঃসরণের পথ স্থির করিলেন এবং সেই পথগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত না হইয়া যায় এবং তাহার কোথায় কিরূপ সমতল রাখা আবশ্যক—তাহা স্থায়ী করিবার জন্য সেই পথগুলিতে প্রায়শঃ ৫০ ফিট অন্তরে একটী করিয়া পাকা গাথনী ইটের চিহ্ন রাখিলেন। পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীতে ম্যালেরিয়া দমন সংক্রান্ত এই কার্য্য ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে অল্প অল্প করিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি শুনিবেন? কার্য্য আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে যখন ম্যালেরিয়ায় উক্ত গ্রামের সংলগ্ন দুইটী গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ১৫৯ হইয়াছিল, তখন উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ায় একটী লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই! উক্ত গ্রামের কার্য্য এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই, এখনও কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছে জানেন? বৎসর বৎসর মাত্র ৬০।৭০ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিলে কাহার না আশা হয়?

বিদেশে যাইবার আবশ্যক নাই—নিজের দেশে—নিজের চক্ষে যখন দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দমন করা যায়, তখন কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত? পানিহাটীতে যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপ্যালিটীতে ও সকল গ্রামেই হইতে পারে। ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে একটা রাজশক্তির প্রয়োগ এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে—এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসর বৎসর ৫০।৬০ টাকা খরচ করিলে এবং ধীরভাবে অগ্রসর হইলে যদি ম্যালেরিয়া দমন করা যায়, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে গ্রামের মধ্যে সামান্য ব্যয়ে—অবশ্য এক বৎসরে নহে—কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া একটি গ্রামেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে উপায়ে এই গ্রামের উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহা বহু কষ্টসাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য নহে,—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদিগেরই ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া দমন করা সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়

সাধ্য। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও একমত তত সুলভ নহে। কিন্তু ইহা কি চিরকালই দুর্লভ থাকিবে?—কেবল এক প্রাণ হইলে, কেবল চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম করিলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অমঙ্গল, আমরা তাহাকে দূর করিতে পারি। এ অবস্থায়ও কি আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও যাহা কিছু বুদ্ধি আছে, তাহা ঐ বিরোধ বহ্নিতে আহুতি অর্পণ করিয়া দেশের কল্যাণকে ভস্মীভূত করিব? না—দেশের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া—নিজেদের অতি তুচ্ছ অতি সামান্য বিরোধের কথা বিস্মৃত হইব? এক্ষণে গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীগণ নিজের চেষ্টায় যাহাতে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে পারেন, তাহার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন, এবং সহজে ও অল্পব্যয়ে সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হউন।

যাহাতে অল্পব্যয়ে, সহজে, নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ হইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আমি অপর কাহারও উপর নির্ভর করার কথা বলি নাই। যাঁহারা নিজের সাহায্য করেন—ভগবান, এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা যদি নিশ্চিন্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে আত্ম প্রতারিত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কবে আরম্ভ হইবে, বা কবে শেষ হইবে—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অনেক বৃহৎ ও প্রধান নদীর সংস্কার করিতে পারেন। তাহা সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। বৃহৎ নদীর সংস্কার এবং ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। বরঞ্চ পল্লীর পয়োনালীর ব্যবস্থা অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং তাহা পল্লীবাসীকেই করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্যভার নিজের মাথার উপর বহন করিতে হইবে, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে—চারিদিকে ঘূর্ণমান কালচক্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়—সে দিন বহুদূরে নাই—যেদিন বঙ্গবাসী বিলাস-ব্যসনের কুহক বিস্মৃত হইবে, যেদিন সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,—যেদিন বাঙ্গলার পল্লীলক্ষ্মী পরিপূর্ণ পূর্ণিমায় অগাধ অনন্ত জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া পল্লীবাসীর পূজা গ্রহণ করিবেন। সে দিন দূরবর্ত্তী নহে—যে দিন এই অসংখ্য স্রোতস্বতী বিভূষিত, দিগন্ত প্রসারী-হরিত-ক্ষেত্র-বিমণ্ডিত, শ্যামা-দোয়েল-পিকরব মুখরিত, বিবিধ ফুলফল ভরা তরুরাজি সমলঙ্কৃত, সোণার বাঙ্গালা সুস্থ সবল-সন্তান ক্রোড়ে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিবে। সে দিন কল্পনার কুআশায় আচ্ছন্ন নহে-যেদিন বাঙ্গালী বিদ্যায়—জ্ঞানে—স্বাস্থ্যে—বলে—নিজের শির উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে। সেদিন আসিবেই আসিবে—যে দিন বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করিবে, যে, বাঙ্গলার জলে—বাঙ্গলার মাটীতে বিধাতার করুণ আশীর্ব্বাদ নিহিত আছে। শুধু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা মানুষ,—আমাদের মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, আর আমাদের মানুষের মতই মরিতে হইবে আমরা সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা।



# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## একবিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ স্তবক।

### স্নায়ুতন্ত্র।

স্নায়ুমালার মধ্যে সমবেদন স্নায়ুতন্ত্রটি (Sympathetic system of nerves) স্বতন্ত্র (Involentary) স্নায়ুতন্ত্র নামে অভিহিত, কারণ এই স্নায়ুমালা মানবের ইচ্ছা-শক্তির শাসনাধীন নহে। পক্বাশয়, অন্ত্রমালা, শিরাপুঞ্জ, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র আপনা আপনি কলের মত চলে তাহাদিগের স্বতন্ত্র পেশীপুঞ্জের উপরেই এই সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র প্রধানতঃ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই কারণে সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র "স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্নায়ুগুলি স্বয়ং সিদ্ধ, ইহাদিগকে কার্য্যপরিচালনার জন্য মস্তিষ্কের তাঁবেদারী করিতে হয় না।

সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র প্রধানতঃ দুই গুচ্ছ স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত,—এই গুচ্ছ দুইটি মেরুদণ্ড বা কশেরুকা স্তম্ভের দুই পাশে বিন্যস্ত। ৬২ সংখ্যক চিত্রে দেহের এক পার্শ্বে সমবেদন স্নায়ুতন্তুর বিন্যাস বা অবস্থান দেখান হইয়াছে। এই স্নায়ুগুচ্ছ দুইটি একটু যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহা জপমালার ন্যায় ক্ষুদ্র গোলক সমূহের দ্বারা সজ্জিত, এই গোলক বা কাঁঠি গুলি আবার সমব্যবধান বিশিষ্ট! সুতরাং সমবেদন স্নায়ুগুচ্ছ-সূত্র-গোলক বিন্যাস জাত। স্নায়ু সূত্রে গ্রথিত কাঁঠি গুলি স্নায়ুর গ্রন্থিসকলের পরিপুষ্টির ফল, স্নায়ুকোষ সমূহের একত্র সমাবেশ হেতু কাঁঠি বা গ্রন্থির ঐরূপ পুষ্টি ঘটিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থি গুলি স্নায়ু গুচ্ছের আদ্যন্ত সজ্জিত কোষময় গোলক বা গ্রন্থি পুঞ্জের বিন্যাস ব্যতীত কিছুই নহে।

এই গ্রন্থি বা গুটিকা-বিন্যাস (Gangalia) মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড নাড়ীর সহিত শ্বেত ও কৃষ্ণ দ্বিবিধ মূল দ্বারা নিবদ্ধ। শ্বেতমূল মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডী স্নায়ু হইতে বাহির হইয়া, সমবেদন স্নায়ুতন্ত্রের গুটিকা বা গ্রন্থিপুঞ্জ (Gangalia) পর্য্যন্ত গিয়াছে; যে তন্তুরাজির সন্নিবেশে শ্বেতমূল গঠিত তাহার উপাদানভূত কোষগুলি মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ড নাড়ী হইতে লওয়া হইয়াছে। এই তন্তুগুলি সমবেদন তন্তুর গ্রন্থিরাজি বা গুটিকা-বিন্যাসের (Sympathetic gangalia) দৃঢ়তা সাধন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে। শ্বেতমূল গুলি যে প্রেরণা শক্তি বহিয়া আনে, সমবেদন স্নায়ুতন্ত্রের কোষগুলি তাহা গ্রহণ করে, তাহার পর ঐ প্রেরণা আবার সমবেদন স্নায়ুগুচ্ছের স্নায়ুকোষস্থিত স্নায়ুকাভুজের সহায়তায় সাধারণ পেশী সমূহে নীত হয়।

শ্বেতোপাদান সাধারণ স্নায়ুতন্তুগুলির প্রধান উপাদান-বস্তু, কিন্তু সমবেদন স্নায়ুর কোষিকা-সমূহের স্নায়ুকাভুজ গুলিতে ঐ শ্বেতোপাদান দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সমবেদন স্নায়ু সমূহের তন্তুগুলি অল্পাধিক পরিমাণে ধূসরবর্ণ। সমবেদন-স্নায়ুমালার তন্তুগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অথবা মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুজালের সহিত মিলিয়া তাহাদিগের গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত আত্ম-প্রসারণ করিতে পারে। যে সকল সমবেদন স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুজালের সহিত মিলিয়া প্রসারিত হয় তাহারাই সমবেদন-স্নায়ুতন্তুর গুটিকা বিন্যাসের (Sympathetic gangalion) ধূসর মূলদেশ গঠন করিয়া থাকে।

সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্য সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মানব-শরীরের সাধারণ পেশী ও স্বতন্ত্র পেশী মালায়, কর্ম্ম প্রেরণার সঞ্চালন

এবং উক্ত প্রেরণার যথাযথ প্রয়োগই উহার কার্য্য। স্বেদ গ্রন্থিমালা, লালা গ্রন্থিমালা, যকৃৎ, অগ্নাশয় সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুরাজি দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছে এবং যথা-বিধি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সমবেদন-স্নায়ু তন্ত্রের স্নায়ুগুলি কিরূপ পদ্ধতিতে আপনাদিগের কার্য্য পরিচালন করে তাহার যথোচিত বর্ণনার স্থান আমাদিগের নাই। কারণ আমরা মানব-দেহের সাধারণ তত্ত্বগুলিই পাঠকগণের গোচর করিতেছি। তবে এই কথাটি পাঠকের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে সমবেদন-স্নায়ু তন্ত্রের দ্বারা পরিপাক নালীর (Alimentary canal) সঞ্চালন এবং যন্ত্রগুলির ক্রিয়া পরোক্ষভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ পূর্ব্বক সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্র এবং তাহার পরিচালনাধীন যন্ত্রাদিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

এ পর্য্যন্ত সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যে সকল তথ্য পাঠককে বলিয়াছি, তাহা তৎসংক্রান্ত তথ্য সমূহের অতি সামান্য অংশ মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে

হৃদ্‌যন্ত্র-ও শিরা সকলের

উপর উহার ক্রিয়া সমধিক প্রবল। হৃদ্‌যন্ত্র, উদর ও বস্তিদেশের শিরা সমূহের উপর সমবেদন স্নায়ু-তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় উহাদিগের প্রভাব ক্ষেত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক অংশকে একটি গ্রন্থনিকা বা বুনাট বলা যায়। এই গ্রন্থনিকা বা 'বুনাট' তিনটি কশেরুকা স্তম্ভের সমবেদন তন্তুগুচ্ছ দুইটির মধ্যে উপর দিক্ হইতে নীচের দিকে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এই গ্রন্থনত্রয়ের নাম যথা :—

(১) হৃদ্‌প্রদেশের গ্রন্থনিকা (The cardiac plexus)
(২) উদরপ্রদেশের গ্রন্থনিকা (The solar plexus)
(৩) বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থনিকা (The pelvic plexus)

হৃদ্‌প্রদেশের গ্রন্থনিকা—ঘনসন্নিবিষ্ট স্নায়ু-তন্তু সমূহের দ্বারা জালাকারে গ্রথিত। সমবেদন-স্নায়ুতন্তু এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু সমূহের ভেগাস্ স্নায়ু বা দশম স্নায়ু দ্বারা রচিত। এই গ্রন্থনিকাই হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীপুঞ্জে প্রেরণার সঞ্চার বা সরবরাহ করিয়া থাকে। সমবেদন-তন্ত্রের এই দুইটি বেণীর দ্বারা যে ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরিচালিত হয় তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। মস্তিষ্কের 'ভেগাস' স্নায়ু হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী সমূহে সংযমনী প্রেরণা (Inhibitory impulse) সংবহন করে, অন্যদিকে সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী গুলিতে সন্দীপনী (Acceleratory) প্রেরণা বহন করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ ক্রিয়া বা প্রেরণার অধীন হৃদ্‌যন্ত্রটিকে কষা ও রশ্মির অর্থাৎ চাবুক ও লাগামের অধীন অশ্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের 'ভেগাস্' স্নায়ু অশ্বের রশ্মি এবং সমবেদন-স্নায়ু কষা। ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া বা কাটিয়া দিলে, সে দুর্দ্দমনীয় বেগে ছুটিতে থাকে, ঐ সময় তাহাকে সংযত করিতে গেলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কোনক্রমে 'ভেগাস' স্নায়ুবিচ্ছিন্ন হইলে হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ঠিক ঐরূপ ঘটে, সংযমনী প্রেরণার অভাবে হৃদ্‌যন্ত্র অতি দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। আবার যখন সমবেদন তন্তু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখন অতি মন্থর গতিতে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন কার্য্য চলিতে থাকে, ঐ সময়ে শরীরে তাড়িত প্রবাহ বহাইয়া যদি সমবেদন স্নায়ুর ক্রিয়া উদ্দীপিত করা হয় তাহা হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত ও দ্রুততর হইয়া থাকে। মানব-শরীরের শিরাপুঞ্জের ক্রিয়া পরিচালনার জন্য, সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্রের সংশ্রবে একটি বিশিষ্ট স্নায়ু তন্ত্র বিন্যস্ত হইয়াছে; এই স্নায়ুতন্ত্রের নাম কর্ম্মপরিচালক (Vaso-motor) স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্রের একটি পরিচালক কেন্দ্র (Vaso motor centre) এবং কর্ম্ম-পরিচালক স্নায়ুমালা আছে। আমরা "অব্‌লং ম্যারো" (Oblong marrow) বা "মস্তিষ্ক বেণী" সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলিয়াছি, এই কেন্দ্র মস্তিষ্কবেণীর শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্র ও ভেগাস কেন্দ্রের সান্নিধ্যে অবস্থিত। কর্ম্মপরিচালক-স্নায়ু কেন্দ্র (Vaso motor centre) হইতে কর্ম্মপরিচালক স্নায়ুমালা বহিয়া কর্ম্মপ্রেরণা তালে তালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতেছে। এই কর্ম্ম-প্রেরণা গুলি শিরা সমূহের আস্তরণপেশী সমূহে পৌছিয়া তাহাদিগকে আকুঞ্চিত রাখিতেছে। শিরা-



মূহে রক্তধারার চাপ সর্ব্বদা সমপরিমাণে রাখার জন্য শিরাগুলির ঐ প্রকার আকুঞ্চন আবশ্যক। শিরাসমূহ ঐরূপ আকুঞ্চিত না থাকিয়া শ্লথ বা শিথিলভাবে থাকিলে দ্বারা স্বভাবতঃ সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং রক্ত অধিক পরিমাণে শিরাগুলির মধ্যে প্রবেশ করে; ফলে শিরা মধ্যে রক্তের চাপ হ্রাস পায়। শিরা মধ্যে শোণিত ধারার চাপ খুব হ্রাস পাইলে শরীরের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে নিরূপিত সময়ের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকার অস্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কেন্দ্রগুলির বিকার সর্ব্বাগ্রে ঘটে; মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কেন্দ্রগুলি পর্য্যাপ্ত শোণিতের অভাব বশতঃ যথানিয়মে ও সুচারুরূপে কাজ করিতে পারে না। মস্তিষ্কের ক্রিয়া কেন্দ্রগুলিতে শোণিতাপ্রবাহের স্বাভাবিক সঞ্চাপের ঐরূপ অভাব বশতঃ মস্তিষ্কের অধিকারী হতচেতন হইয়া পড়ে। দৈব-দুর্ঘটনায় লোকের শরীরে খুব বড় রকমের জখম অথবা বড় রকম অস্ত্রোপচার হইলেই রক্তপ্রবাহের ঐরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

প্রত্যহ শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমাদিগের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহকে নানা প্রকার ক্রিয়ার অধীন হইতে হয়, সেই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রিয়াপরিচালক স্নায়ু গুলিকে যন্ত্র সমূহে কর্ম্ম প্রেরণা বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। যন্ত্রমধ্যে নীত কর্ম্মপ্রেরণা, প্রয়োজনানুসারে যন্ত্রমধ্যে শোণিতের সঞ্চাপকে নিয়মিত করে। আহারের অব্যবহিত পরে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের প্রয়োজন হয় সুতরাং পাকাশয়ের যন্ত্রতন্ত্রে অধিক পরিমাণে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার আবশ্যক হইয়া পড়ে; তখন পাকাশয়ের যন্ত্রতন্ত্রে পর্য্যাপ্ত শোণিত সঞ্চালনের জন্য উদরের ত্বক শিরাগুলি আপনাআপনি শিথিল হইয়া পড়ে, যন্ত্রগুলিতেও তখন প্রচুর শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। শরীরের এক স্থানে এই ভাবে পর্য্যাপ্ত শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকায় শরীরের অন্য অংশে অর্থাৎ ত্বক বা চর্ম্মে রক্ত সঞ্চালনের অল্পতা ঘটে, এই কারণে আহারের পর গাত্রে স্নিগ্ধতা বোধ হয়। শারীরিক তাপের হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হয় তাহা বুঝিতে হইলে, চর্ম্ম মধ্যস্থ শিরাগুলির ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। সর্ব্ব সময়ে শরীরের বা গাত্রের সর্ব্বস্থানে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করা চর্ম্মের একটা বিশেষ কাজ, শরীরে তাপাধিক্য ঘটিলে শারীরিক তাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ ঐ সময়ে চর্ম্মের ভিতর ন্যস্ত শিরাগুলি সম্প্রসারিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক তাপ যুক্ত রক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে শিরাগুলির মধ্যে নীত রক্তের তাপ বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে অপনোদিত হয়। আবার যে সময়ে শরীরের কল্যাণের জন্য দেহ মধ্যে সঞ্চিত তাপ রক্ষা করাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সে সময়ে চর্ম্ম মধ্যস্থ শিরাগুলির আকুঞ্চন দ্বারা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিরা সকলের আস্তরণ পেশীর উপর ক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুতন্ত্রের যে প্রভাব বিস্তৃত হয়, তদ্দ্বারা চর্ম্মমধ্যস্থ শিরা গুলির কর্ম্মতৎপরতা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

শরীরের শিরা-সকলের পরিচালনা একটা বিশিষ্ট কার্য্য। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শরীরের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সর্ব্বদা পর্য্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যক, শরীরের ঐ কয়টি স্থান ব্যতীত যে সমস্ত স্থানে শিরা সকল বিন্যস্ত আছে, তৎসমুদয় স্থানেই উহাদিগের সান্নিধ্যে ক্রিয়াপরিচালক-স্নায়ুমালা (Vaso motor nerves) সন্নিবেশিত আছে। মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র বা ফুস্‌ফুসেই স্বভাবতঃ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শোণিত-সঞ্চালনের প্রয়োজন, সুতরাং যে সকল শিরা দ্বারা ঐ সকল স্থানে শোণিতধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা-দিগের উপর ক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুর শাসন নাই। সুস্থ দেহে তাহাদিগের ক্রিয়া পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু উদরপ্রদেশ ও বস্তিদেশের যন্ত্রগুলি ক্রিয়া-পরিচালন স্নায়ুর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। উদরপ্রদেশ ও বস্তিপ্রদেশের শিরাসমূহের শাসন ও পরিচালন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঐ দুইটি প্রদেশকে "উদর-প্রদেশের গ্রন্থনিকা" (Solar plexus) ও বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থনিকা

(Pelvic plexus) এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

উদরপ্রদেশের গ্রন্থনিকাটি পাকস্থলীর পশ্চাদ্‌ভাগে ঠিক মহাধমনীর (Aorta) সম্মুখে স্থাপিত। স্নায়ু-গ্রন্থনিকা সমূহের মধ্যে এইটি বিশেষ অবধান যোগ্য। এই গ্রন্থনিকা দ্বারা উদরের শিরাগুলির ও অন্ত্রমালার সাধারণ পেশী-সমূহের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

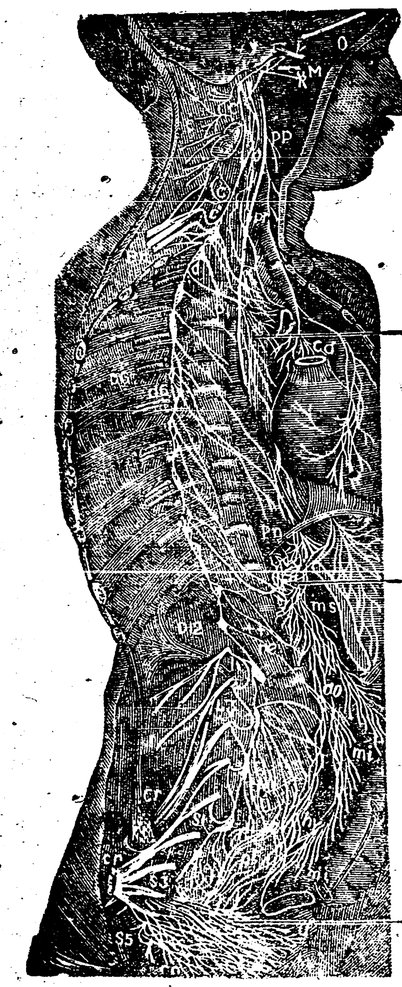


চিত্র ৬২—দক্ষিণ পার্শ্বের সমবেদন স্নায়ু শৃঙ্খল ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রধান Cerebro spinal স্নায়ু সমূহ।

অন্ত্রমালার স্তরপরম্পরার মধ্যে উদর প্রদেশের গ্রন্থনিকার পল্লব-সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পল্লবগুলির সহিত "ভেগাস্" স্নায়ু বা মস্তিষ্কের দশম-স্নায়ুর পল্লবমালা মিলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট গ্রন্থনিকা (Plexus) গড়িয়া তুলিয়াছে। এই গ্রন্থনিকা পাকাশয় হইতে Colon অবধি সমস্ত পাকনালীর পেশীপুঞ্জের পরিচালন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

পাকনালীতে খাদ্য প্রবেশ করিবামাত্র এই গ্রন্থনিকার ক্রিয়া আরম্ভ হয়, আবার খাদ্য পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র পাকাশয় ও অন্ত্র মালার পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। এই প্রকারে পেশীসমূহেব মধ্যে এক প্রকার তরঙ্গমালার উৎপত্তি হয়। এই তরঙ্গ সকল গৃহীত খাদ্য পাকনালীর বিভিন্ন অংশে বহিয়া লইয়া যায় এবং ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা ভুক্ত-দ্রবের পরিপাক ও সারশোষণ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বস্তি-গ্রন্থনিকা—(Pelvic plexus) কশেরুকা-স্তম্ভের সম্মুখে ও মূত্রাধারের পশ্চাতে অবস্থিত। এই গ্রন্থনিকা দ্বারা কেবল যে বস্তিপ্রদেশের শিরাসমূহে কর্ম্ম-প্রেরণা সঞ্চালিত হয় তাহা নহে, উহা দ্বারা মূত্রাশয়, মলভাণ্ড ও মল দ্বারের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্ভিন্ন নারী-দিগের জরায়ু ও ডিম্বাণুর পরিচালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের শিরা সমূহ কর্ম্মপরিচালক স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবাধীন নহে বলিয়া মস্তিষ্কের উপর সহজেই অন্যবিধ ক্রিয়ার প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। শোণিতের সঞ্চার ঈষৎ বৃদ্ধি পাইলে, মস্তিষ্কের শিরাসমূহে শোণিতের বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মস্তিষ্কের শিরাগুলিতে শোণিতের সঞ্চার হ্রাস পাইলে কিরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে সকল লোক সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু ক্লেশভোগ করে তাহারা শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। মস্তিষ্কের শিরা-সমূহের কর্ম্মপরিচালক স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব না থাকাই ঐরূপ ঘটনার মূলীভূত কারণ। কথাটা একটু খোলসা করিয়া বলিব। অন্ত্রমালার মধ্যে যে মল সঞ্চিত থাকে তাহা রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার খুব বাধা দিয়া থাকে। ঐ প্রকার বাধার ফলে শিরাসমূহে শোণিতের সঞ্চার বৃদ্ধি পায়। ইহাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটায় শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। আবার অন্ত্রমালার মধ্যে সঞ্চিত মল পচিয়া যে বিষ উৎপাদন করে, রক্তের সহিত সেইবিষ মস্তিষ্কে নীত হওয়াতে লোকে ঐরূপ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। শোণিতে এই বিষ মিশ্রণের পর, শরীরের



সর্ব্বশ্রেণীর তন্তুসমূহে বিষক্রিয়া ঘটে, তজ্জন্য শরীর অসুস্থ হয়। মানব দেহের অতিকোমল ও সূক্ষ্ম তন্তু-গুলিতে বিশেষতঃ স্নায়ুতন্তু গুলিতে সহজেই এরূপ বিষক্রিয়া ঘটে। এই কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আবার স্নায়ুশূল রোগে ভুগিয়া থাকে, এই শ্রেণীর লোকের সংকল্পের দৃঢ়তাও থাকে না।

মানসিক উত্তেজনা বশতঃ বৃহন্মস্তিষ্কের শিরা-সকলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ ঘটিলে তদ্দ্বারা কর্ম্ম পরিচালক স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থার ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

আমরা এ পর্য্যন্ত সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন, মানব দেহের বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টিসাধনই ইহার কার্য্য, ইহার দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক, ভুক্ত বস্তুর সারশোষণ, রক্ত সঞ্চালন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরিচালন এবং কিয়ৎ-পরিমাণে শ্বাসযন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র যে পদ্ধতিতে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া পরিচালন করে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর।

সমবেদন-স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত কথা ফুরাইবার আগে আমরা আরও দুইটি বিচিত্র গ্রন্থি সম্বন্ধে পাঠকদিগকে কয়টি কথা বলিব। এই গ্রন্থি দুইটির নাম (The Adrenal Bodies) "আকুঞ্চক গ্রন্থিযুগ্ম"। এই গ্রন্থি-দুইটি আকারে ছোট, ইহারা মূত্রপ্রসেক দুইটির উপর মুকুটের মত রহিয়াছে। সমবেদন তন্তুরাজি যে উপাদানে গঠিত, এই যুগ্মগ্রন্থিও সেই উপাদানে গঠিত। কিন্তু এই আকুঞ্চক গ্রন্থির ক্রিয়া অন্যান্য গ্রন্থিরই অনুরূপ। এই গ্রন্থিযুগল হইতে এক প্রকার রস (Secretion) নিঃসৃত হয়, এই রস মানব শরীরের শিরা গুলিকে সর্ব্বদা আকুঞ্চিত রাখে। গ্রন্থি-নালিকা বা গ্রন্থি-প্রণালী বাহিয়া এই রস বাহির হয় না, গ্রন্থি হইতেই এই রস শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর গ্রন্থিগুলিকে "অনালিক গ্রন্থি" নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের শরীরে আরও অনেক অনালিক গ্রন্থি আছে। মানুষের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর গ্রন্থি সকলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রতি-পালিত হইতেছে।

# আয়ুর্ব্বেদই ভবিষ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদর্শ পথ প্রদর্শক

লেখক—কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম্, এস্

আজকাল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অভূতপূর্ব্ব প্রসার ও উন্নতি দেখিয়া এদেশবাসী অনেক ইংরেজ ডাক্তার এই উন্নতির গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত মৌখিক (হইতে পারে প্রকৃত) সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন—আয়ুর্ব্বেদ যখন অবৈজ্ঞানিক যখন ইহার বাতপিত্তশ্লেষ্মা বিষয়ক নিদান (Pathology) প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপহাস্যাস্পদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি না এদেশবাসিগণ কেমন করিয়া এইরূপ ভ্রান্তিসঙ্কুল চিকিৎসার উপর আপনাদের পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনের জীবন রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ যে হাতুড়িয়া চিকিৎসা ইহা জানিয়া শুনিয়াও বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলের সদস্য পর্য্যন্ত গণ্য মান্য ব্যক্তি, জমিদার, রাজা মহারাজরা যে কি কুহকে ভুলিয়া দলে দলে ক্রমশ এই চিকিৎসার শরণাপন্ন হইতেছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। মনে হয় দালালের দ্বারা, বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যের দ্বারা, জন কতক কবিরাজ এই সকল লোককে মুগ্ধ করিয়া রোগ যত

ভাল হউক না হউক আপনাদের আয়ের পথ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতেছেন। দেশ এইরূপ চিকিৎসায় বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত।" অতি অল্প দিন হইল, মান্দ্রাজের লাট-কৌন্সিলে এই ধুয়া তুলিয়া অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে দেশ মধ্যে আর প্রসারিত না হয়, তাহার জন্য বড় বড় ইংরেজ মেম্বর, বিশেষ ভাবে বক্তৃতা করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদের কথায় মুগ্ধ হইয়া দুঃখের বিষয় যে এদেশবাসিগণের অনেকে তাঁহাদের মতে মত দিয়া দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রস্তুত, ফলতঃ সাহেব দিগের কথায় বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যদি একবার আয়ুর্ব্বেদের বাতপিত্ত শ্লেষ্মা কি? সত্য সত্য ইহা হাতুড়িয়ার ভেলকীমি, কিনা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে, সত্য কোন পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইত না।

এদেশে বৃটিশ শাসন সংস্থাপনের পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা, হাকিমি চিকিৎসা, সুচিকিৎসা বলিয়া সাধারণে গ্রহণ করিত। তখন ডাক্তারি চিকিৎসা এদেশে ছিল না। লোকের মনে সন্দেহও হয় নাই যে আর্য্য ঋষিদিগের সংস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদীয় মূল সূত্র সকল ভ্রমাত্মক। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রবল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশে কুইনাইনের বহুল প্রচলন, এবং তৎসঙ্গে ডাক্তারি চিকিৎসার উপর সাধারণের শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ঘটে। মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন এবং সেই সঙ্গে এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ডাক্তারি শিক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রবল অন্তরায়-রূপে দণ্ডায়মান হয়। এই সময়ে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচনা ও কোন কোন পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইতে থাকে। স্বদেশ বাসী শিক্ষিত ডাক্তারদিগের দ্বারা এই কার্য্য প্রায় পরিকল্পিত হইতে দেখা যায়। ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত তাঁহার হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকার ভূমিকায় প্রথম প্রচার করেন,—আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক বাতপিত্ত শ্লেষ্মা লইয়া ইহার Therapeutics, এবং Pathology সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক (erroneous) ইহার ভিতর প্রতক্ষ ও পরিদর্শন কিছুই নাই। হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকা লিখিয়া তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে কিন্তু বলিতে কি, এ লেখা কি কুক্ষণে বাহির হয়; ঐখান হইতেই আয়ুর্ব্বেদ হেটমুণ্ডে অবস্থিত। একদিকে ডাক্তারদিগের কুইনাইনের জয়ধ্বনি, অপরদিকে আয়ুর্ব্বেদকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা এবং লোকের সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন, বিচার বিবেচনা না করিয়া ইহার বেদ সম্পূজিত ত্রিধাতুকে air, bile, phlegm বলিয়া নূতন কৃত্রিম উপাধি প্রদান, মনিয়র উইলিয়মসের অভিধানে সেই কথা, সেই অযথা অর্থ লিপিবদ্ধ করায় দেশ ব্যাপিয়া ধুয়া উঠে আয়ুর্ব্বেদ Quackery আয়ুর্ব্বেদের গৌরব একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। একজন অর্দ্ধশিক্ষিত কম্পাউণ্ডারের যে আদর, যে অর্থাগম একজন সাংখ্যতীর্থ ব্যাকরণ তীর্থ কাব্যতীর্থ ও সুশিক্ষিত কবিরাজের হিন্দু সমাজে সম্মান থাকিলেও দারিদ্র্যের প্রবল পেষণে অস্তিত্ব শূন্যতা ঘটে। ত্রিধাতু যে air, bile phlegm ছাঁড়া আর কিছু তাহা যে কেবল মলরূপী নহে ধাতুরূপী—basic principles of Biologys ব্যাখ্যা করিতে পারিলেও তাঁহার কথা কে শুনে? গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল লাঞ্ছনায় আয়ুর্ব্বেদ দুর্ব্বল হেটমুণ্ড। কে না স্বীকার করিবেন, ডাক্তার উদয় চাঁদ ইহার মূলীভূত কারণ, তারপর সেই ধুয়ায় আয়ুর্ব্বেদের যে কোন ইংরাজী অনুবাদ পরিগঠন, সর্ব্বত্রই সেই এক কথা air, bile, phlegm—পূর্ণ বিজ্ঞানকে Quackery বলিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কতক্ষণ লাগে? ডাক্তারি শিখিয়া উদয় চাঁদ যেমন দেশের মুখ মলিন করিয়া দিয়াছেন, ডাক্তারি শিখিয়া যদি কেহ, সেই মলিন মুখ আবার চির উজ্জ্বল করিতে পারেন তাহা হইলে এই দুর্গতির ঠিক সমানে সমানে প্রতীকার হয়। ঘটনাও তাহা যে না ঘটিয়াছে এমন নহে। বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আয়ুর্ব্বেদে বাতপিত্ত শ্লেষ্মা যে একমাত্র মলরূপী air bile phlegm নহে, সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতাচ্য নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই কথা প্রথম প্রচারিত হয়। সমগ্র কবিরাজ সমাজের দৃষ্টি তাহাতে আপতিত না হইলেও, ইংরাজী শিক্ষিত



অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন, এতদিন ধরিয়া দেশে যে ধুয়া বিরাজমান তাহা ভুল সম্পূর্ণ ভুল। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদের বাত পিত্ত শ্লেষ্মা স্ববৈষম্য অশ্বিদ্বয়ের সংস্থাপিত সমাদৃত ত্রিধাতু ইহারই পবিত্র ক্রোড়ে সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের চিকিৎসা বিজ্ঞান মাতার স্নেহ ক্রোড়ে ক্ষুদ্র শিশুর মত অবস্থিত এবং সভ্য ও শ্রীতেসমুদ্ভাসিত। এ মহাসত্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জুড়িয়া প্রচারিত হইতে আর বহু বিলম্ব নাই। প্রতীচ্য বিজ্ঞান বলেন জীব দেহের যাবতীয় ক্রিয়া অতি বহুল হইলেও তিনটি মাত্র প্রধান বিভাগে বিভাজিত, ১ম Correlative functions দ্বিতীয় Sustentative functions তৃতীয় Generative functions. সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন আয়ুর্ব্বেদের বাত (Falsely so-called air) ও প্রতীচ্য Biologyর Physiologyর Correlative functions সমানার্থক। ইহার পিত্ত আর প্রতীচ্যের Anobolic এবং Katabolic Metabolism এক ও অভিন্ন বা গত্যর্থবোধক। যেখানে গতি সেইখানে বায়ু ক্রিয়মান। বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ প্রবর্ত্তকঃ "সর্ব্বচেষ্টানাম্" মহর্ষি আত্রেয়ের এই মহামূল্য উপদেশ। যেমন বাহিরে আমার বায়ুর গতাগতি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি সেইরূপ সজীব দেহে যে কোন গতাগতি "পরমাণুর" সংযোগ বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন রক্তের সঞ্চালন মলমূত্রের নিঃসরণ যেখানে গতি সেইখানে, বাহ্য বায়ুর গতির মত এমন এক অদ্ভুত গতি শক্তি ক্রিয়াশীল (প্রতীচ্য বিজ্ঞান যাহাকে, Akin to electricity বলিয়াছেন—যথার্থ শব্দের অভাবে, যাহা উপস্থিত তাঁহাদের মধ্যে Nerve impulse বলিয়া সমাখ্যাত) প্রাচ্য প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে নামকরণ করিয়াছেন আন্তর বায়ু। ইংরাজীতে যেমন ইহা Akin to electricity, সংস্কৃতের ইংরাজী অনুবাদ করিলে বলিতে হয় "Akin to air" চরক সুশ্রুত বাগভট প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতা বা সংগ্রহ গ্রন্থে এই বায়ু বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। তন্ত্রে বর্ণনা আছে তাহাতে আমারা দেখি এই বায়ুর স্থান Cerebro Spinal and Sympathetic Nerve System এবং তাহাদিগের Plexus. সংস্কৃতে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না মূলাধার সাধিষ্ঠান চক্র প্রভৃতি নামে এই Nerve system এর যথাযথ নামান্তর। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শেষ পৃষ্ঠায় ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে বাত বাহ্য বায়ুর মত—কিন্তু বাহ্য বায়ু (Atmospheric Air) নহে—ইহা কিং স্বরূপ, আয়ুর্ব্বেদে গ্রন্থের মধ্যে এক সুশ্রুত সংহিতায় তাহার আভাস আছে—আভাস বায়ু—গতি শক্তি, পিত্ত—যেখানে তাপ (heat) সেইখানে পিত্ত ক্রিয়া-শীল (তপ্ ধাতু হইতে পিত্ত) আর শ্লেষ্মা—(শ্লিষ আলিঙ্গনার্থক) অগ্নি সাদন—অর্থাৎ—combustion oxidation এর—নিয়ন্তা—নিয়ামকরূপে অবস্থিত। যাহাতে শীর্য্যমাণ প্রতিনিয়ত দহ্যমান এই শরীর (শৃ শীর্ণ হওয়া এই ধাত্বর্থ বোধক শরীর শব্দ) শুষ্ক নীরস কাষ্ঠের মত (dried fuel এর মত) দেখিতে দেখিতে ভস্মাবশেষ হইয়া না যায় বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে বল লাবণ্য উৎসাহ শ্রী মানুষের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ ঘটে—জননী যেমন স্নেহ বশে দহ্যমান সন্তানকে বুকের ভিতর করিয়া রক্ষা করেন, শ্লেষ্মার কাজ সেইরূপ—sustenla-tive function এর এক অঙ্গ। অধ্যাপক মাইকেল ফষ্টার বলেন, এ শরীর একদণ্ডে শুষ্ক কাষ্ঠের মত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত কিন্তু ইহাতে moisture আপ্য ধাতু বহুল থাকায় তাহা হয় না। মানুষ রূপ লাবণ্য শ্রী উৎসাহ বল তেজ এক কথায় ওজঃ সম্পন্ন হইয়া শতবর্ষাধিক জীবিত থাকে শ্লেষ্মার ইহাই কার্য্য। মাইকেল ফষ্টার সাহেবের moisture আর প্রাচ্যের শ্লেষ্মার যথেষ্ট মিল আছে-প্রতীচ্য ইহার অতিরিক্ত জীব দিগের শ্রী উৎসাহ লাবণ্য বল তেজের মূলে যে কি আছে তাহা জানিতে পারেন নাই অতি অল্প দিন হইল তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন Nerve system ই যে একা আমাদের দেহে correlation সম্পাদন করে তাহা নহে আমাদের দেহে দুই প্রকার chemical

process আবহমান ক্রিয়া করিতেছে তাহা sustenlative functions নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইলেও দুইটির রূপ এক নহে, একটিতে oxidation (combustion) দ্বারা তাপের সমুৎপাদন করে, আর একটি chemical process হইলেও এই চির দহ্যমান শরীরে লাবণ্য সৌকুমার্য্য বল বর্ণ উৎসাহ তেজ প্রভৃতির উৎপাদক। প্রতীচ্য বড় জোর ২০।৩০ বৎসর হইলে এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। প্রতীচ্যের এই তত্ত্ব ( Internal secretion ব্যাপার ) আমি বলিতে চাই—আমাদের শ্লেষ্মাতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস মাত্র। পিত্ত ও শ্লেষ্মা উভয়েই পঙ্গু; বায়ুর দ্বারা পরিচালিত—এই কথা যদি আমরা সংযত হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব—দেহ তত্ত্বের মূল ভিত্তি কোথায় অবস্থিত। আমাদের বেদ সম্পূজিত ত্রিধাতুর প্রকৃত অর্থ কি? এবং বুঝিতে পারিব ভবিষ্যৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমুন্নত স্তর—আর ত্রিধাতুর স্তর এক ও অভিন্ন কি না!

Internal secretion তত্ত্ব প্রতীচ্যে যেমন আজ শরীর বিষয়ে গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে—আমি বিশ্বাস করি, যে আয়ুর্ব্বেদের মুখ এত দিনের পর পুনরায় সমুজ্জ্বল করিতে ইহাই সগৌরবে দণ্ডায়মান হইবে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মার প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত হইয়া ডাক্তারগণ আয়ুর্ব্বেদকে কেন Quackery বলিতে আর সাহসী হইবেন না, তাহা বারান্তরে বলিব! বলিব, শ্লেষ্মিক ওজ আয়ুর্ব্বেদের মুখ কেমন করিয়া চির উজ্জ্বল করিবে।

ক্রমশঃ

# বিশুদ্ধ বায়ু

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক উহা পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবন-স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই। অন্ন, জল, ব্যতীত দুই এক দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু বায়ু ব্যতিত ক্ষণমাত্র প্রাণ ধারণ করা যায় না। সকল বায়ু সমান রূপ উপকারী নহে। বিশুদ্ধ বায়ুই প্রকৃতরূপ উপকারী। যেমন দুর্গন্ধ জল পান করিলে ও গলিত ফল ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলেও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে।

শরীরের মধ্যে অবিশ্রান্ত রক্ত চলিতেছে। সেই রক্ত চলিতে চলিতে শরীরস্থ অন্যান্য দুষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতেছে পরে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিশ্বাস সহকারে দেহ মধ্যে নীত হইয়া, সেই দূষিত রক্ত সংস্কৃত করিতেছে। যদি কোন অহিতকারী পদার্থ ঐ বায়ু সমভিব্যাহারে সতত শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আশু বা বিলম্বে রোগ জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ু নানা কারণে ও নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস উহার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ু নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করি, তাহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। ইহা নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় আমাদের প্রাণ ধারণের উপযোগী থাকে, পরে প্রাণ সংহারের উপযোগী হইয়া বহির্গত হয়। ঐ বিষতুল্য বিকৃত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী। তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে আমরা প্রত্যেকবার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ৩০ কিউবিক ইঞ্চি বায়ু ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের মধ্যে গ্রহণ করি



এবং প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করি। অতএব ইহা হইতেই প্রতিয়মান হয় যে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টায় ৭৭৭৬০০ কিউবিক ইঞ্চি বায়ু আমাদের শ্বাস নালীর ভিতর দিয়া গমনাগমন করে। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় পাঁচ আউন্স পরিমাণ রক্ত বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা পরিশোধিত হইবার নিমিত্ত ফুস্‌ফুস্‌কে প্রদান করে অতএব দেখা যাইতেছে যে ২৪ ঘণ্টায় ৩৪০০ গ্যালন রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রে যাইতেছে। অম্লজান ( Oxygen ) আমাদের শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং বিশুদ্ধ বায়ুতেই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বতোভাবে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য মানব অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছে এবং সেই অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহারা নিস্তার পান না। তাঁহারা স্বপ্নেও ধারণা করেন না যে বিনা আয়াসে বিনা অর্থব্যয়ে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প মনে হইল :—

একদা এক ব্যক্তি ব্যাধি পীড়িত হইয়া এক চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "পৃথিবীতে কি এরূপ কোন ঔষধ নাই যদ্দ্বারা আমি রোগ মুক্ত হইতে পারি?"

চিকিৎসক প্রত্যুত্তরে বলিলেন "পৃথিবীতে এরূপ একটী ঔষধ আছে যাহাতে শত শত লোক রোগ মুক্ত হইয়াছে এবং এই ঔষধেই আপনিও যে রোগ মুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" উক্তব্যক্তি আগ্রহের সহিত ডাক্তারকে বলিলেন "মহাশয়! দয়া করিয়া ঔষধটী আমাকে বলিয়া আমার জীবন দান করুন। রোগ নিবারণ জন্য আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।" ডাক্তার উত্তর করিলেন "এই ঔষধ বিত্তসাপেক্ষ নহে জগতে ইহা অপেক্ষা সুলভ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই বস্তুতঃ আপনি ইহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন।" রোগীটী হতাশের সহিত বলিলেন "ডাক্তার বাবু, আমার সহিত কি বিদ্রূপ করিতেছেন?" প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসক তাঁহার সহিত কিছুই রহস্য করেন নাই কারণ তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য তিনি বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে বিশুদ্ধ বায়ুর উপকার সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন এবং রোগী তৎকাল হইতে উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে রোগমুক্ত হইলেন।

কি রোগী, কি সুস্থ ব্যক্তি সকলেরই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এমন কি জীব জন্তু প্রভৃতি সকলেরই জীবন ধারণ জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। এক পশু ব্যবসায়ীর রোগ হেতু অনেক পশ্বাদি মরিয়া যাওয়ায় তাহার ব্যবসায় অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে ইহা স্থির হইল যে একস্থানে বহু প্রাণী একত্রে বাস করিলেই এরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে এক বিজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত পশুশালাটী দর্শন করিয়া স্থির করিলেন যে পশুগুলিকে অনায়াসেই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যায়। তিনি দেখিলেন যে পশুশালাটী অত্যন্ত অল্প পরিসর। পশুগুলিকে জল, ঝড়, ও তুষারপাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উক্ত পশুশালার উপরে একটী ছাদ আছে সুতরাং তাহারা যখন ঐ সকল বিপদ হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই শরীর গরম রাখে। আমরা অবগত আছি যে প্রাণীগণের নিশ্বাসের সহিত (Nitrogen) যবক্ষারজান বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের দেহের পক্ষে অহিতকারী। সুতরাং একটী আবদ্ধ স্থানে বহুসংখ্যক পশুর শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যবক্ষারজান বাষ্পতে স্থানটী পরিপূর্ণ হয় এবং উক্ত দূষিত বায়ু পুনরায় নিশ্বাসের সহিত তাহাদের শরীরে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের ব্যধিগ্রস্ত করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া চিকিৎসক পশু ব্যবসায়ীকে বলিলেন পশুগুলিকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের বাসস্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে ও উন্মুক্ত করিতে হইবে। আদেশ মত তদ্রূপ করিবার পর

দেখা গেল যে পশুগুলির মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ডাক্তার নংথার্প যখন প্রথমে আবিষ্কার করেন যে বিশুদ্ধ বায়ুই সর্ব্বপ্রকার রোগের একমাত্র ঔষধ তখন সকলেই তাঁহাকে উন্মাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন—কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন যে বিশুদ্ধ বায়ু হইতে নিউমোনিয়া, কাসি, হাম ও অন্যান্য বহুবিধ শিশুরোগ সমূহ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু প্রাণী মাত্রেরই জীবন স্বরূপ। রোগ নিবারণ জন্য আমাদের অন্য ব্যবস্থার আবশ্যক হয় না; জন্মাবধি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলেই আমরা সুস্থ দেহে জীবন ধারণ করিতে পারে। অতএব সকলেরই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

## বিবিধ সংগ্রহ

বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ—বোম্বাই প্রদেশের একাংশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বৃষ্টি পাতের অভাবে অজন্মা হওয়াই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। গভর্ণর বাহাদুর এজন্য ধনীগণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন।

মাদক দ্রব্যের প্রসার :—( দেশীমদ ) গত পূর্ব্ব বৎসর ১১৫৮টী মদের দোকান ছিল গতবর্ষে অতিরিক্ত ৪টা মদের দোকান খুলিয়াছে। তন্মধ্যে বীরভূমে একটী, রাজসাহীতে একটী এবং খুলনায় দুইটী। দেশী মদ হইতে রাজস্ব বাবদ ৭৮৫৯১০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাড়ী বিক্রয়ের জন্য গতবর্ষে ৩৬৫টী পাশ অতিরিক্ত হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর ১৯৫৪টী পাশ ছিল। তাড়ী বিক্রয় হইতে ১৭৫০৬৲ টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব বৎসর ২১৯টি খুচরা ভাঙ বিক্রয়ের দোকান ছিল গতবর্ষ একটী অতিরিক্ত হইয়াছে। মেদিনীপুরে একটী দোকান বন্ধ হইয়াছে এবং রংপুরে ২টী নূতন দোকান খুলিয়াছে। পাশে এবং করে মোট ১২৪৪৯৬৲ টাকা আয় হইয়াছে ( গত বৎসর ১১২৪৮৩৲ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৫ মণ ৪ সের ভাঙ বিক্রয় হইয়াছে। গাঁজা মোট ৩৪১৮৭৪৲ টাকা কর আদায় হইয়াছে। গাঁজা বিক্রয় অনেক কমিয়াছে। রাজসাহী নওগাঁতে ৩০৮২ বিঘা জমি গাঁজার জন্য চাষ করা হইয়াছিল। গাঁজা প্রস্তুত করিতে প্রতি মণ ৪৩ টাকা খরচা পড়িয়াছে। নওগাঁ হইতে ৫২৪০ মণ ২ ছটাক গাঁজা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গতবর্ষে আফিং এর আয় ৭৩৮০৯৲ টাকা অতিরিক্ত হইয়া ২৯৪৪২৪৬৲ টাকা হইয়াছে। আফিং সেবন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সাল { ৮ম সংখ্যা

## আলোচনা

আহার্য্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—বর্ত্তমানে প্রায় সকল প্রকার আহার্য্য দ্রব্যেরই মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্রগণের এজন্য বিশেষরূপ কষ্টভোগ হইতেছে। অনেকের উপযুক্তরূপ আহার ঘটিতেছে না। কতদিন পরে যে দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইয়া পূর্ব্ববৎ হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আহার্য্য দ্রব্যের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরে গভর্মেণ্ট জানাইয়াছেন—"যুদ্ধ হেতু কোন কোন দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে, উহার উপর গভর্মেণ্টের হাত নাই। যাহাতে ব্যবসায়ীরা অকারণে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে না পারে গভর্মেণ্ট ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

গভর্মেণ্টের ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও সাধারণের পক্ষে মঙ্গল সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যে অল্পকাল মধ্যে হ্রাস হইবে তাহার আশা দেখা যাইতেছে না।

মেদিনীপুর বোর্ডের কার্য্য—মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কার্য্য দেখিয়া প্রীত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—"মেদিনীপুর জলের কলের জন্য যে দেড় লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছে তাহা যুদ্ধাবসানে হ্রাস হইতে পারে। যাহাতে গভর্মেণ্ট হইতে উক্ত ব্যয়ের সাহায্য করা হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। জেলা বোর্ড পানীয় জলের জন্য অধিকতর ব্যয় করিতেছেন দেখিয়া সুখী হইলাম এবং আশা করি ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। আপনারা সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হইয়াছেন এবং স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহাও সুখের বিষয়। বিনামূল্যে টীকা দিবার ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। আপনারা ছয়টী নূতন ঔষধালয় স্থাপন করিতেছেন তদ্বারা বিশেষ প্রতীকার হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

মেদিনীপুর বোর্ডের এই কার্য্য যে অতীব প্রশংসনীয়

ও জনহিতকর তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য জেলা বোর্ডসমূহও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এইরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে বিশেষ মঙ্গল হইবে।

**হুকওয়ার্ম ব্যাধি ও বঙ্গেশ্বর**—বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসর এ দেশের বহু লোককে গ্রাস করিতেছে, আমাদের দেশের এই প্রধান শত্রুর হস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি নানা প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত বক্রকীট বা 'হুক ওয়ার্ম' ব্যাধি বাঙ্গালা দেশের অপর একটী প্রধান শত্রু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বাঙ্গালী দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আকর করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত পীড়ার কবল হইতে কি উপায়ে বঙ্গদেশকে মুক্ত করা যায় তাহার আলোচনার জন্য মধ্যে গভমেণ্ট প্রাসাদে এক স্বাস্থ্য কন্‌ফারেন্সের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই সভায় বঙ্গের সেনিটারী কমিশনার ডাঃ বেণ্টলী, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ এবং দেশের নেতৃস্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রণা সভায় সহৃদয় লাট বাহাদুর এক সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

যে সকল অঞ্চলে বক্রকীট ব্যাধি আছে উহাদের মধ্যে নির্দ্ধারিত কতিপয় স্থানে উহা নিবারণের নিমিত্ত ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হউক।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য—(১) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাট কল (২) দারজিলিংয়ের চা-বাগান (৩) ডুয়ারের চা বাগান (৪) কয়লার খনিগুলি (৫) বর্দ্ধমান জিলা (৬) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সামরিক কারখানা (৭) কলিকাতা কর্পোরেসনের শ্রমজীবী ফৌজ (৮) পোর্ট-ট্রাষ্টের শ্রমজীবী ফৌজ (৯) রেলওয়ের ফৌজ (১০) পুলিস ট্রেনিং স্কুল কলেজ পরীক্ষায় ক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত হউক।

শ্রমশিল্প ক্ষেত্রে ও গ্রামে কার্য্য করিবার জন্য বেসরকারী কমিটি গঠন করা হউক। কমিটিতে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক থাকিবেন। শ্রমশিল্প ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সমূহের চেয়ারম্যান স্থানীয় বেসরকারী কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।

স্বাস্থ্য কমিশনারের সাহায্যার্থ স্বাস্থ্য বোর্ডের এক বিশেষ কমিটি থাকিবে। দুই একজন ডেপুটী স্বাস্থ্য কমিশনারের সহিত যোগে তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তত্ত্বাবধান করিবেন।

স্বাস্থ্য বোর্ডের বিশেষ বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন।

ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-সমাচারের ৫ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় "হুকওয়ার্ম জনিত পীড়া" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে ব্যাধি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। পাঠকগণ তাহা হইতে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

---



# স্বাস্থ্য কন্‌ফারেন্সে গভর্ণরের বক্তৃতা

"বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার আলোচনার নিমিত্ত আমি এই প্রাসাদে স্বাস্থ্য-বোর্ডের সভ্য এবং অপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছিলাম। উক্ত কার্য্যে আমি জিলাবোর্ড সমূহের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়ার চেয়ারম্যান রাজা হৃষীকেশ লাহা, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ও মিঃ হেমিণ্টনের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা পাইয়াছি। ইহাদের হস্তে অরুল বিল, যমুনা ও নউইসস্থীর যে তিনটি প্রস্তাবনা দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা পয়ঃপ্রণালী আইন মতে উহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। অরুলবিলে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যমুনায় শীঘ্র হইবে। সুতরাং আমরা ম্যালেরিয়া-সংগ্রামে প্রকৃষ্টরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি। জিলাবোর্ড সমূহ সাহায্য করিলে আমরা প্রত্যেক বৎসর এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিব। আগামী বৎসরের কার্য্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং বাজেটে আমি ইহার জন্য যথোচিত সহায়তার ব্যবস্থা করিব। ম্যালেরিয়া আমাদের অতি দুর্দ্দান্ত শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই আমাদের একমাত্র শত্রু নহে। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এমন বিরাট যে ইহার সুচারু ব্যবস্থার আমাদের আয়োজনের স্বল্পতায় আমি বিস্মিত হইয়াছি।

আমার মনে হয় এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক জিলায় বহু স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত। বর্দ্ধমান জিলাবোর্ড এইরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত জিলাবোর্ডের উদ্যম ও লোক হিতৈষণা প্রশংসনীয়। এই বিষয়ে আমরা এই প্রেসিডেন্সীর সকল জিলার বোর্ডসমূহের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অনেক বৃহৎ প্রশ্নে মতভেদ থাকিলেও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যূহবদ্ধ চেষ্টায় সকলে মোটামুটি একমত।

উক্তরূপ নবপ্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে দুইটি যুক্তি আছে। (১) সিভিলসার্জ্জনকে এত বিচিত্র কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় যে, তাঁহার পক্ষে জিলার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য সাধন করা অসম্ভব। (২) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যেরূপ বিকাশ হইতেছে তাহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে।

### স্বাস্থ্য বিদ্যালয়।

এই কার্য্যের নিমিত্ত যুবকদিগকে স্বাস্থ্য-বিধি ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ বিদ্যালয় যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে আমরা তৎপ্রতি মনোযোগী হইব। আগামী বর্ষে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে আমরা ঐ জন্য একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিব। ভারতীয় গবেষণাভাণ্ডার হইতেও এই নিমিত্ত লক্ষমুদ্রা প্রতিশ্রুত হইয়াছে। আমাদের আশা আছে যে, অধুনা যে স্থানে পুলিশ-শব ব্যবচ্ছেদ হইতেছে সেই স্থানে আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব।

### ডিপ্লোমা।

যতদিন এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত না হয় ততদিন পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসকদিগকে "স্বাস্থ্যবিভাগীয় কলিকাতা ডিপ্লোমা" দিবার জন্য কতকগুলি বক্তৃতা প্রদানের আয়োজন করুন। আমরা যেন ঐ সকল ডিপ্লোমা-প্রাপ্তদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারি।

### বক্রকীট ব্যাধি।

গত ২১এ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বক্রকীট সম্বন্ধে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম আপনারা সকলেই সেই পত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ পত্রে আমি এই ব্যাধির ব্যাপকতা সম্বন্ধে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছি। আমি আবার সেই সকল কথার

উল্লেখ করিব না। উহাতে স্থূল দুইটি কথা আছে—(১) ব্যাধির ভীষণ ব্যাপ্তি (২) ইহার প্রকৃতি ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক সাধারণের অজ্ঞতা।

প্রচার।

এই ব্যাধি সম্বন্ধে এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে ইহার অর্থ লোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং এক্ষণে আমি যাহা বলিব উহা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ ও চিকিৎসক মহাশয়দের জন্য নহে, লোক সাধারণকে জানাইতে হইবে।

এই কীট আকারে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি, উপজীবী, ইহা মানুষের অন্ত্রমধ্যে বাস করে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও রক্তহীনতা উৎপাদন করিয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই রোগে যাহাকে আক্রমণ করে তাহার অবসাদ ও কাজ-কর্ম্মে নিরুৎসাহতা জন্মে। মানুষের অন্ত্রে অবস্থানকালে কীট অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। উহা মলের সহিত বহির্গত হইয়া উত্তাপের সাহায্যে সরস ভূমিতে অত্যল্প-কাল মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম কীট উৎপাদন করে। এই আকারে কীট মানুষকে আক্রমণ করিয়া, সাধারণত পায়ের চর্ম্মমধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ অন্ত্রমধ্যে গমন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া বক্রকীটে পরিণত হয়। আবার তাহারা ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। এইরূপে তাহাদের বংশবিস্তার হয়। চিকিৎসকদিগকে ইহাদের এই বংশ বিস্তারের ধ্বংস সাধন করিতে হইবে।

দুইটি কার্য্য।

এই নিমিত্ত দুইটি কর্ত্তব্য সাধনীয়। (১) এই কীট-পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে কীটগুলিকে বিতাড়িত করা (২) তাহাকে আবার সূক্ষ্ম কীটদল আক্রমণ করিতে না পারে উহার ব্যবস্থা করা।

প্রথম কাজটি অনায়াস সাধ্য। থাইমল বা চেনে-পোডিয়ম দ্বারা প্রতীকার হইতে পারে। বঙ্গদেশের যে কোন স্থলের যে কোন চিকিৎসক এই চিকিৎসা করিতে পারেন। কিন্তু লোককে যদি বিশ্বাস করান না যায় যে, তাহার রোগ আছে তাহা হইলে সে ঔষধ গ্রহণ করিতে চাহিবে কেন? লোকের রোগ আছে কি না উহা সুশিক্ষিত চিকিৎসককে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এই রোগ সম্বন্ধে লোকের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে এই সকল পরীক্ষার ফেসাদে কেহ আসিতে চাহিবে না।

পল্লীগ্রামে লোকের অভ্যাস দোষে গ্রামপ্রান্তে এই সূক্ষ্ম কীট অসংখ্য জন্মিতেছে। লোকে নগ্ন পদে কলুষিত জমির উপর দিয়া চলিবার সময়ে কীটগুলি তাহাদের পা দিয়া বহিয়া চর্ম্মের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করে। ঐ সময়ে সাধারণ চুলকানি হয়। ইহার প্রতীকার করিতে পারিলেই লোকের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

কার্য্য প্রণালী।

অধুনা এই বিষয়ে দুই প্রকার কার্য্য আরম্ভ করা যায়। প্রথমতঃ লোকশিক্ষা। ইহার ফল অতি মৃদু হইবে। কিন্তু যে কোন ব্যাপক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য লোকশিক্ষার আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশে সেই সকল স্থলেই প্রথমতঃ সেই শ্রেণীর লোক মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে যাহাদের তত্ত্বাবধান সম্ভবপর। এত কাল আমরা জেল বা চা-বাগান ও কোন কোন স্থলের শ্রমজীবীদের মধ্যেই পরীক্ষা করিয়াছি। এখন উক্ত প্রণালীক্রমে কার্য্যের পরিসর বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে আমাদিগকে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহার আলোচনার জন্যই আমি আপনাদিগকে এই কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করিয়াছি।

এখানে অসাধারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিও উপস্থিত আছেন। স্বাস্থ্য বোর্ডের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ডাক্তার বেণ্টলি একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার উৎসাহে আমাদের কন্‌ফারেন্স বসিয়াছে। তিনি সাগ্রহে এই কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন।

আপনারা এই বিষয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। লোক ক্লেশ দূর করিবার মত মহৎ কর্ত্তব্য আর কিছুই হইতে পারে না, আশা করি এই কার্য্যে আপনারা শক্তি নিয়োগ করিবেন।"



# শৈশবে নিদ্রা

শিশু এবং বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই নিদ্রা অত্যাবশ্যক। উপযুক্ত সময় নিদ্রা ব্যতিরেকে কেহ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। নিদ্রাকালে সমস্ত শরীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রাম-লাভ করে। কিন্তু এ বিশ্রাম পূর্ণ বিশ্রাম নহে। তাহা না হইলেও সমগ্র দেহের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়া থাকে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ধীর হয়, শ্বাস স্বল্প গভীর ও মৃদু হয়, জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মরত থাকিলেও একেবারে কর্ম্মশূন্য হয়। নিদ্রায় মস্তিষ্কেরই বিশ্রাম লাভ ঘটে। মস্তিষ্কের যে অংশ হৃদপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে তাহা তখনও কর্ম্মরত থাকিলেও পেশী পরিচালনকারী অপর অংশ সমূহ বিশ্রাম সুখভোগ করে এবং এইরূপে আমাদের দৈনিক ক্ষয়িত কর্ম্মশক্তির পূরণ হইয়া থাকে।

বয়স্ক লোকের পক্ষে আট ঘণ্টা কাল নিদ্রা আবশ্যক বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নিদ্রার কাল অনেক কমাইয়াও অসুবিধা হইতে দেখা যায় না। নিদ্রার কালের হ্রাস বৃদ্ধি ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার উপর নির্ভর করে। কেহ কেহ পাঁচ ঘণ্টা কাল নিদ্রা গিয়াও সতেজ কর্ম্মক্ষম থাকেন। আবার কাহার কাহারও নয় দশ ঘণ্টার নিদ্রা আবশ্যক হইয়া থাকে। বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুগণের পক্ষে নিদ্রার আবশ্যকতা অনেক অধিক। শিশুরা বৃদ্ধি পাইতেছে, পুষ্ট হইতেছে, দেহের সমস্ত যন্ত্রের তন্তু গঠিত হইতেছে এবং দিবা ভাগে সকল সময়ে চঞ্চল কর্ম্মরত থাকায় তাহাদের শক্তি হানি হইলেই এই হানির পূরণ কেবল যথেষ্ট সময় গাঢ় নিদ্রার সাহায্যে হইতে পারে। যে সকল শিশু কোন কারণে উপযুক্ত পরিমাণ নিদ্রা লাভ করিতে পারে না তাহাদের ভবিষ্যতে বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। মস্তিষ্ক সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দ্রুত গতিতে ওজনে বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ে মস্তিষ্ক গঠনের জন্য অধিক পরিমাণ নিদ্রার আবশ্যক হইয়া থাকে। অভিভাবকগণের এ বিষয়ে অজ্ঞতার ও অমনোযোগিতার জন্য অনেক শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। উপযুক্ত নিদ্রার অভাব হইলে শিশুর মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, চক্ষের নীচে কালি পড়ে, মনঃ সংযোগের অভাব দৃষ্ট হয় এবং ধারণাশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। যথোপযুক্ত নিদ্রার পর শিশু নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে এবং দিবসের কর্ম্ম ও খেলা ধূলার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

দরিদ্র গৃহের শিশুগণের এ বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তাহাদের নিদ্রার পরিমাণ অল্প হয় বা অনপূর্ণ, নিস্তব্ধতাহীন, বায়ু চলাচল শূন্য গৃহে শয়নের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। অনেকে নানারূপ স্বপ্নও দেখিতে থাকে। নিদ্রার সময়ই মস্তিষ্কের গঠন হয় কিন্তু এই সকল শিশুকে এ পক্ষে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

সুশিক্ষিত পিতামাতারাও শিশুর নিদ্রার বিষয়ে অনেক সময় ভুল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শিশুকে অধিকক্ষণ জাগ্রত রাখেন। ধনী গৃহে অনেক স্থলে শিশুগণ অত্যধিক পরিমাণে ভোজন করে এবং সকল বিষয়ে নিজের ইচ্ছামত চলে। তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত সময়েই নিদ্রা যায়। পিতামাতারা সেজন্য নির্দ্ধারিত সময় রাখেন না। সহরে থিয়াটার, বায়স্কোপ ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ দেখার জন্য সময় সময় শিশু গণও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্র জাগরণ করেন ফলে পরবর্ত্তী প্রাতে তাহাদিগকে স্ফূর্ত্তিহীন ও অনেকটা জড়তা ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত নির্দ্দেশমত শিশুর নিদ্রার সময় ঠিক করিয়া দেওয়া ভাল।

| | | |
|---|---|---|
| ৫ বৎসর পর্য্যন্ত | ... | ১৩ ঘণ্টা |
| ৬ হইতে ৮ বৎসর | ... | ১২ ,, |
| ৯ হইতে ১১ বৎসর | ... | ১১ ,, |
| ১২ হইতে ১৫ বৎসর | ... | ১০ ,, |
| ১৬ বৎসর | ... | ৯ ,, |

শিশুর নিদ্রার সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া পিতা-মাতারই কর্ত্তব্য। অতি শৈশব কাল হইতেই শিশুকে সকল বিষয়ে নিয়ম পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং নিদ্রারও সময় বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। শিশুর নিদ্রার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পিতা-মাতার নিকট হইতে অনেকরূপ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন যখন ইচ্ছা তখন নিদ্রা যায়, কেহ বলেন "অল্প রাত্রে শুইলে তাহাদের নিদ্রা হয় না" আবার "অধিক রাত্রে আমরা যতক্ষণ না শয্যা গ্রহণ করিব ততক্ষণ তাহারা নিদ্রা যাইবে না" এরূপ কথাও শুনা যায়। অধিক রাত্রে শুইয়া শিশু নিজের আবশ্যক মত কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা যাইয়া প্রাতে বিলম্বে উঠিতে পারে কিন্তু পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে প্রথম রাত্রের নিদ্রাই অধিকতর গাঢ় ও উপযোগী। শিশুগণ যাহাতে নিয়মমত অল্প রাত্রেই নিদ্রিত হয় পিতামাতার সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। একবার নিয়মবদ্ধ হইলে শিশুর পক্ষে আর কোনও অসুবিধা হয় না, মস্তিষ্কও নিয়মের অনুগত হইয়া পড়ে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়েই নিদ্রার আবির্ভাব হয়।

শিশুর নিদ্রা যাহাতে অধিকক্ষণ ও গাঢ় হয় সেদিকে অভিভাবকগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। গাঢ় নিদ্রার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাত্রের আহার যেন গুরু না হয়, শুইতে যাইবার অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে পাঠ্য পুস্তকের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে, শয়ন গৃহে নির্ম্মল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, নিদ্রার সময় পরিধানে আঁট কাপড় বা পোষাক থাকিবে না। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে শিশুর নিদ্রা গাঢ় ও স্বপ্নশূন্য হইয়া সমস্ত ক্লান্তি দূর করিবে এবং তাহাদের মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ভবিষ্যতে জীবনের মঙ্গল সাধিত হইবে।

# পরিমিত আহার

সর্ব্বজন হিতকর প্রাকৃতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন করিলেই আমাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিলে ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া স্বেচ্ছাচারীতা না করিলে আমাদিগকে শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতে হয় না। স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখের আকর; স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই জীবনের সবই রক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেই জীবন ধারণ বিষবৎ হইয়া উঠে। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা মানুষের সর্ব্ব প্রথম কার্য্য। স্বাস্থ্য রক্ষার সহিত পরিমিত আহারের কি সম্বন্ধ আছে তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যে বিষয়েই আমরা স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করি তাহাতেই আমাদিগকে তাহার ফলভোগী হইতে হইবে। আহার কার্য্যেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা। কেবল আহার বিষয়ে কেন মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম্মই ঐরূপ নিয়মাধীন হওয়া কর্ত্তব্য। যে মুহূর্ত্তে আমরা কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিব তন্মুহূর্ত্তেই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি স্বরূপ আমাদিগকে রোগ ভোগ করিতে হয়।

কেবল মাত্র আহার করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যেরূপ খাদ্য আহার করিলে আমাদের চিন্তা শক্তির স্ফুরণ হয় তদ্রূপ আহার্য্যই আমাদিগের পক্ষে প্রশস্ত, কারণ চিন্তাই মনুষ্যকে প্রকৃত পক্ষে গঠিত করে। সুখ ও শান্তি মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য। গভীর সুচিন্তাই এই সুখোৎপাদন করিতে সমর্থ এবং সুস্থ মনই সুচিন্তা করিতে সক্ষম আবার সুস্বাস্থ্যই সুস্থ মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অধিকন্তু আমরা সকলেই অবগত আছি যে স্বাস্থ্যকর, সুপাচ্য খাদ্যই মনুষ্যকে অতুল সুখ শান্তির অধিকারী করে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আহার করিলে মনুষ্য দেহ নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির আকর হইয়া অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সুখ ও শান্তি ইহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে।

ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইতেছে যে আহার মনুষ্য জীবনের একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য। তজ্জন্য বিশেষ বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সহিত আমাদের শরীরের পক্ষে উপযোগী ও হিতকর খাদ্য নির্ণয় করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আহার বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ও আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অসতর্কতা যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার রোগের মূলীভূত কারণ ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের দেহের মধ্যে বহুবিধ শত্রু বাস করিতেছে, সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদিগকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি আমাদের শরীর সর্ব্বপ্রকারে উত্তমরূপে সুরক্ষিত থাকে তবে আমরা নিরাপদ; অন্যথা আমাদের দেহ যে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

এরূপ ভাবে পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য আমাদিগের আহার করা উচিত যাহাতে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় মাত্র। প্রকৃতরূপে ক্ষুধার্ত্ত হইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধি শক্তির দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য নিয়মিত ভাবে আমাদের প্রকৃত ক্ষুধা দূর করিবে তাহা বুঝিতে পারি এবং তদনুযায়ী সেই পরিমাণ খাদ্যই আহার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। খাদ্য কতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখগহ্বরে থাকিয়া লালার সহিত মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন তাহাও আমরা স্বাদেন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। দর্শন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপযোগিতা অর্থাৎ কিরূপ খাদ্য আমাদের পক্ষে হিতকর ও অহিতকর তাহা আমরা জানিতে পারি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ই যথা দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইত্যাদি সর্ব্বদাই পাকস্থলীর সাহায্যার্থে কার্য্য করিতেছে ও ইহাকে রক্ষা করিতেছে।



আমাদের পাকস্থলীর পরিপাক শক্তির যে একটী সীমা আছে ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি কার্য্য যদিও আপাতমধুর বলিয়া মনে হয় কিন্তু পরিণামে ইহাতে শরীরের অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দায়ক রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। ঈদৃশ আহারে পাকস্থলীর পরিপাক শক্তিকে হ্রাস করিয়া তাহাকে কার্য্যে অক্ষম করে ও ফলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে।

পরিপাকযন্ত্রস্থ ভুক্ত পদার্থকে অম্ল উচ্ছলন হইতে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞান। ইহাতে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এরূপ রাখিবার প্রয়োজন কি, ইহা হইতে আমাদের কি অনিষ্ট হইতে পারে? কিন্তু এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতিরিক্ত ভোজন, গুরুপাক দ্রব্যাদি ও উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ এবং দ্রুতগতিতে আহার করিলে পাকস্থলী হইতে বায়ু ও অম্লের উচ্ছলন হয় তজ্জন্য পরিপাক যন্ত্রস্থ সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলি স্ফীত ও উত্তেজিত হইয়া সুপরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং অনুত্তেজক ও পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত ভাবে আহার করিলে যে পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিপাক যন্ত্রকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে উপরোক্ত সর্ব্ববিষয়েই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক ক্রিয়া কলাপ কালীন আমরা প্রায়ই আহার সম্বন্ধে অনেক অনিয়ম করিয়া থাকি। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইলেও আমরা নিরূপিত সময়ে আহার করিতে পাই না আবার অনুরোধে পড়িয়া ও নানাপ্রকার সুস্বাদু এবং গুরুপাক দ্রব্যের লোভে আমরা অনেক সময় গুরু আহার করিয়া থাকি। ইহাতে পরিপাক শক্তির সমূহ ব্যাঘাত ঘটে এবং ফলে এই প্রকার অনিয়মই বিবিধ রোগের কারণ হয়। এইরূপ ভাবে পাকস্থলীর উপর অত্যাচার করিলেই পরিণামে সংগ্রাস, ক্ষয়, পক্ষাঘাত প্রভৃতি অন্যান্য দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৃত্যু জীব

মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই জন্য লোভ প্রযুক্ত নানারূপ অখাদ্য আহার করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যু দ্বারের দিকে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত মূর্খতা।

জীবন ধারণ ও রসনার তৃপ্তির জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য আহার করিয়া থাকি। শরীর গঠনোপযোগী বিভিন্ন উপাদান সমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার একটী খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না; সেই জন্য নানা প্রকার খাদ্য আমাদের প্রয়োজন। আহার্য্য হইতে আমাদের শরীর গঠনের জন্য নিম্নলিখিত রূপ উপাদান গুলি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক (ক) প্রোটিড্ বা আমিষ জাতীয় (খ) চর্ব্বি (গ) কার্ব্বোহাইড্রেট বা শালি জাতীয় (ঘ) লবণ জাতীয় (ঙ) জল। অতএব যেরূপ আহার্য্য ভক্ষণ করিলে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ আমরা পাইতে পারি সেইরূপ খাদ্যই পরিমিত ভাবে আমাদের আহার করা উচিত।

সাধারণের বিশ্বাস যে যত অধিক পরিমাণে আহার করিবে, সে তত বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হইবে। এইরূপে সভ্যসমাজে ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবিধ রোগ উৎপত্তি হইতেছে। সর্ব্বত্র খাদ্যের উপাদান উৎকৃষ্ট হইলেই এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাইলেই যে স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এরূপ নহে। কারণ খাদ্যের ফলাফল ব্যক্তিগত রুচি, স্বাস্থ্য ও অগ্নি বলের উপর নির্ভর করে। ভক্ষণ করিলেই শরীরের পুষ্টি হয় না, এই সঙ্গে পরিপাক করা চাই ইহা সর্ব্বদা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

অতিরিক্ত আহারের ফলে আমাদের রক্ত দূষিত হয় এবং তাহাতে আমাদের অশেষ প্রকার অনিষ্ট করে। উক্ত প্রকার দোষে যে কেবল মাত্র আমরা নিজেরাই ব্যাধি গ্রস্ত হই এরূপ নহে ইহাতে আমাদের বংশধরগণও আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু পীড়া গ্রস্ত হইয়া অতীব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। প্রচলিত কথায় আছে "পিতার পাপে সন্তানের কষ্ট।" এই শ্রেণীর ব্যক্তি যে কেবল তাহাদের স্বকীয় অনিষ্ট সাধন করে তাহা নহে অধিকন্তু তাহারা সমাজ ও দেশের শত্রুতা করে। অপরিমিত আহার করিলে আত্মহত্যা করা হয় আবার সন্তানদের সুখ ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। সুতরাং পাকস্থলীকে সুস্থ রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য অন্যথা কিরূপ বিষময় ফলের সম্ভাবনা তাহা বোধ হয় সকলে কতক পরিমাণে বুঝিয়াছেন।

বয়স ও অবস্থা ভেদে খাদ্যের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিশু ও যুবার পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় প্রৌঢ়াবস্থায় সেই পরিমাণ আহার প্রয়োজন হয় না। শিশু ও যুবা পুরুষের শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। শিশু ও বালকদিগের শরীর হইতে অধিক তাপ বহির্গত হইয়া যায়, অতিরিক্ত তাপ উৎপাদনের জন্যও তাহাদের অধিক পরিমাণে আহারের আবশ্যক হয়। ইহা ব্যতীত বালক ও যুবকেরা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তজ্জন্যও তাহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক। কিন্তু সকল বয়সেই অতিভোজন প্রভূত অনিষ্টের মূল, কারণ খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ পরিপাক না হইয়া অন্ত্র মধ্যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং তদুৎপন্ন দূষিত দ্রব্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

যুবা বয়সে অনেকে গুরুভোজন করিয়াও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাহার কারণ এই যে ঐ বয়সে শারীরিক যন্ত্রাদি অতিশয় শক্তি সম্পন্ন থাকে বলিয়া অধিক পরিশ্রম করিয়া খাদ্যের অতিরিক্তাংশ পরিপাক করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু এরূপ অত্যাচার তাহারা অধিক দিন সহ্য করিতে পারে না; পাকযন্ত্র শীঘ্রই বিকল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। যাঁহারা যুবা বয়সে অধিক ভোজন করেন তাঁহারা প্রায়ই প্রৌঢ়াবস্থায় বহুমূত্র, বাত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য যুবা বয়সেও অতি ভোজন করা উচিত নহে।

গুরু ভোজন করিলে গৃহীত খাদ্যের অধিকাংশই



আমাদের শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় না। শারীরিক যন্ত্রাদি প্রথমতঃ খাদ্যের এই অতিরিক্ত অংশকে দেহের কার্য্যে লাগাইবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করে। এই অনাবশ্যক চেষ্টায় তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম হয় ও শক্তির অপব্যয় হইয়া থাকে। পরে যখন এই অতিরিক্ত খাদ্য শরীরের কোন কার্য্যে লাগে না তখন তাহাকে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিবার জন্য অপর কতকগুলি দেহ যন্ত্রকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ কোন কার্য্যে না আসিলে উহা নানারূপ দূষিত পদার্থে পরিণত হয় এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে বিকৃত করে ও নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং গুরু ভোজনে শরীরের যন্ত্রাদি যে শুধু ক্ষীণশক্তি হয় তাহা নহে, খাদ্যের বিকৃত অংশ রক্তকে দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

দেখা যাইতেছে যে পরিমিত আহারের উপরেই পাকস্থলীর সুস্থতা ও শারীরিক যে কোন অনুষ্ঠান নির্ভর করিতেছে। আহারের পরিমাণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া শরীরের প্রকৃত উপযোগী দ্রব্য আহার করাই আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। গুরু ভোজন বহুবিধ রোগের উৎপত্তি করিয়া থাকে সুতরাং গুরু ভোজন আমাদিগের সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

### আস্বাদন ও আঘ্রাণ।

জিহ্বা আস্বাদনের বা রস-গ্রহণের যন্ত্র, তাই উহার একটি নাম রসনা। এই পেশী বিরচিত বিচিত্র যন্ত্রটি মুখ কোটরে নিহিত। জিহ্বার উপাদানভূত পেশী-পুঞ্জ এরূপ কোমল এবং অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন যে কথা কহিবার ও আহার করিবার সময় রসনা নানাদিকে অবলীলাক্রমে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। জিহ্বার উপাদানভূত পেশী ব্যতীত, কয়েকটি বড় বড় পেশী উহাকে 'হাইঅয়েড' অস্থি ও নিম্ন হনুর সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ রাখিয়াছে। এই সকল পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণকালে জিহ্বার বড় বড় ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। জিহ্বার বড় বড় পেশীর ক্রিয়া প্রভাবে চর্ব্বিত দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারা যায়। আমাদিগের গাত্রের বহিস্ত্বক যেমন শরীরের অন্তস্ত্বকটিকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, তেমনই জিহ্বার উপরিস্থ একটী শ্লৈষ্মিক আস্তরণ জিহ্বার মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রগুলিকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিটী বড় সূক্ষ্ম বা পাতলা। তজ্জন্য ললাট, কপোল, ও করতল অপেক্ষা জিহ্বা অধিক লোহিত বর্ণ। জিহ্বার প্রতিকৃতি দেখিবার পর পাঠক যদি কোন সহচরের জিভটি একবার নিরীক্ষণ করেন তাহা হইলে, এই উক্তি যে কতদূর সত্য তাহা বুঝিতে পারিবেন।

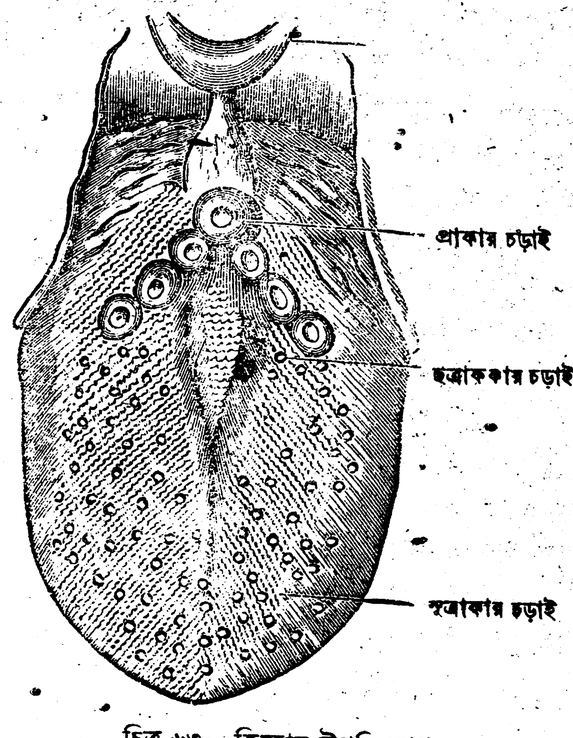


চিত্র ৬৩—জিহ্বার উপরি ভাগ।

জিহ্বার যে প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে জিহ্বার 'উপর পিঠ' দেখান হইয়াছে। জিহ্বার এই উপর পিঠটি নিম্ন পিঠ অপেক্ষা কিছু কর্কশ। পাঠকের নিকট এই তথ্যটি কিছু বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে. কিন্তু কেন যে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা খুলিয়া বলিলে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে আনন্দের সঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই। মানুষের জিহ্বার উপর পিঠে কতকগুলি "চড়াই" থাকাতেই ঐ পিঠটা অমন কর্কশ বা পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় বন্ধুর হইয়াছে। এই চড়াই গুলির মধ্যে কতকগুলি সূত্রের মত এবং অন্য কতক ছত্রাকার মত। আমরা রসনার যে অংশের দ্বারা রসাস্বাদন করি এই 'চড়াই' গুলি তাহার অঙ্গীভূত। শ্রেণীভেদে এই চড়াই গুলি তিন প্রকার। যথা :—(১) সূত্রাকার চড়াই Filiform papillæ (২) ছত্রাকাকার চড়াই Fangiform Papillæ (৩) প্রাকার চড়াই Circumvallate Papillæ)।

চিত্র ৬৪—সূত্রাকার চড়াই।

সূত্রাকার চড়াইগুলির সংখ্যা খুব বেশী এবং জিহ্বার উপর পিটের সর্ব্বত্র সুবিন্যস্ত। পার্শ্বে সূত্রাকার চড়াইয়ের যে বর্দ্ধিত প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, "উন্মুখ" ও গুচ্ছবদ্ধ সূত্রের দ্বারা যেন উহা নির্ম্মিত। সূত্রাকার চড়াইয়ের এই সূত্রমুখগুলি মাংসাশী জীবের রসনায় কণ্টকের ন্যায় থাকে। এইজন্য শ্বাপদ প্রাণী ও মাংসাশী জীবদের রসনা কর্কশ বা খরখরে। রসনার এই সূত্রাকার চড়াই গুলির সহিত রসাস্বাদনের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাদিগের দ্বারা কেবল স্পর্শানুভূতির কাজ চলে।

ছত্রাকাকার চড়াই গুলির উপযোগিতা আরও অধিক। এই শ্রেণীর 'চড়াই' গুলি প্রধানতঃ জিহ্বার অগ্রভাগে ও প্রান্তদেশে বিন্যস্ত। এই ছত্রাকারে চড়াই গুলির ভিতর অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু সন্নিবেশিত আছে তজ্জন্য উহাদিগের দ্বারা স্বাদনানুভূতির (Sensation of taste) কাজটা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এবার আমরা "প্রাকার চড়াই" এর কথা বলিব। পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা পার্শ্বে প্রাকার চড়াইয়ের একটি প্রতিকৃতি দিলাম। এই ছবির দিকে চাহিলেই পাঠক 'প্রাকার চড়াইয়ের' নামের অর্থটি বেশ বুঝিতে পারিবেন। কারণ এই চড়াই দেখিতে দুর্গ প্রাচীর বা প্রাকারের ন্যায়। এই প্রাকার চড়াই গুলি জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে কোনের আকারে সজ্জিত। এই চড়াইগুলি বৃত্তের ন্যায় গোলাকার এবং এক ইঞ্চির এক পঞ্চবিংশ অংশ হইতে এক দ্বাদশ অংশ বিস্তৃত। জিহ্বা প্রসারণ করিলে এই প্রাকার চড়াই গুলিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা জিহ্বার এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাহারা মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর গোলাকার চড়াইয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জিহ্বাতে রোগ হইয়াছে মনে করিয়া ভীত ও চিকিৎসকের স্মরণাগত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐরূপ অনভিজ্ঞতা প্রসূত ভয় চিকিৎসকের নিকট বেশ কৌতুকাবহ।

চিত্র ৬৫—প্রাকার চড়াই।

জিহ্বার ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের বা আস্বাদনের অনুভূতি হইয়া থাকে। রসনাগ্রেই মধুর রসের অনুভূতিটা প্রকৃষ্টরূপে হয়, রসনাপার্শ্বে অম্লরসের এবং রসনার পশ্চাদ্ভাগে তিক্তরসের অনুভূতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে জ্বরের জ্বালায় কুইনাইন অনেকেই খাইয়াছেন এবং অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কুইনাইন গলাধঃকৃত হইবার সময় উহার তিক্ত স্বাদটা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে। কুইনাইনের তিক্ত স্বাদটা জিহ্বার সম্মুখ ভাগের চড়াই গুলিতে অনুভূত হয় না বলিয়াই ঐ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কারণ প্রাকার চড়াই ব্যতীত অন্যান্য চড়াইয়ের উপর কুইনাইনের তিক্ত স্বাদের ক্রিয়া হয় না। রসনাতে যে



সব স্নায়ু-পল্লব আছে, তৎসমুদয়ের সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ আছে। তাহাদিগের দ্বারা রসনার স্বাদনানুভূতি মস্তিষ্কে নীত হয়। কুইনাইন জিহ্বা স্পৃষ্ট হইবা মাত্র মস্তিষ্ক উহার তিক্তাস্বাদের বার্ত্তা পায়।

আস্বাদ্য বস্তু গলিয়া কোমল হইলেই আস্বাদনের উপযোগী হয়। রসনার এই স্বাদন-ক্রিয়ার ও নাসার আঘ্রাণ ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। আমরা স্থানান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব। আস্বাদ বস্তু যত তরল ও বস্তুপ্রধান হয় উহার আস্বাদ তত তীব্রভাবে ও ব্যাপক ভাবে রসনায় অনুভূত হইয়া থাকে।

অন্যান্য বস্তুর তুলনায় কতকগুলি বস্তুর স্বাদ অতি শীঘ্র অনুভূত হইয়া থাকে। সমুদয় বস্তুর মধ্যে লবণের স্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র অনুভূত হয়। তাপের আধিক্য ও শৈত্যের আধিক্য বশতঃ রসনার আস্বাদান শক্তির হানি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অত্যুষ্ণ চা এবং অতি শীতল সরবতের সম্যক্ রস গ্রহণ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

জিহ্বা ও কণ্ঠকক্ষীর স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve) বা নবম স্নায়ু এবং ত্রিবেণী স্নায়ুর (Trigeminal nerve) একটি শাখা আস্বাদনভূতির বাহন বলিয়া পরিচিত। জিহ্বা ও কণ্ঠকক্ষীর স্নায়ুর শাখা প্রশাখা সমূহ এক দিকে প্রাকার চড়াই গুলির মধ্যে এবং অন্যান্য স্নায়ুগুলির শাখা সমূহ জিহ্বার সম্মুখ ভাগে নিবিষ্ট হইয়া উহার স্বাদিনী শক্তির উন্মেষ ও পরিচালন করিতেছে।

## আঘ্রাণ।

নাসিকা দ্বারা গন্ধানুভূতি বা আঘ্রাণ কার্য্যটি সম্পন্ন হয়, বলিয়া উহার একটি নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকা ত্রিভুজাকৃতি এবং এই ইন্দ্রিয়টি অস্থি এবং উপাস্থির সংযোগ-সংশ্লেষণে গঠিত। নাসিকার অগ্রভাগ এবং নাসারন্ধ্রের পার্শ্বভাগ উপাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। তজ্জন্য চাপ দিয়া ঐ স্থানগুলি অবনমিত ও আকুঞ্চিত করিতে পারা যায়। দুইখানি নাসাস্থি এবং ঊর্দ্ধ হনুস্থির একাংশ দ্বারা নাসা সেতু (Bridge of the nose) নির্ম্মিত হইয়াছে। নাসা-কোটরের তলদেশে তালব্যাস্থির (Palate bone) সন্ধান পাওয়া যায়; নাসাকোটরের ছাদ বা ঊর্দ্ধদেশে চালুনীর মত সচ্ছিদ্র Ethmoid অস্থি বিনিবিষ্ট। অশ্রুসেকাস্থি (Lachrymal) আঘ্রাণ কোটরের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। হল-ফলকাস্থি (Vomer) নাসা কোটরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পত্রাস্থি খানিই ভিতর ও বাহিরের দিকে আপনাকে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া নাসা কোটরে দুইটি কক্ষ প্রস্তুত করিয়াছে। স্থান ও ক্রিয়া ভেদে এই কক্ষের কার্য্য বৈচিত্র ঘটিয়াছে। সুতরাং কক্ষ দুইটিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভাগ বা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; যথা :—

১। নিম্ন বা শ্বাসগ্রাহী অংশ (Resperatory chamber).

২। ঊর্দ্ধ বা ঘ্রাণগ্রাহী অংশ (Olfactory chamber).

নাসা-কোটরের নিম্নকক্ষের সহায়তায় যে বায়ু গৃহীত হয় তাহা কণ্ঠকক্ষ ও অধোবায়ুনালী অতিক্রম পূর্ব্বক ফুস্‌ফুসে গিয়া পৌছে। নাসা-রন্ধ্রে লোমরাজি সুকৌশলে সজ্জিত আছে, ধূলি অথবা তাহার ন্যায় সূক্ষ্ম এবং পীড়াজনক বস্তুর গতিরোধ করাই ঐ প্রকার লোমাবলী সন্নিবেশের উদ্দেশ্য, কিন্তু বাষ্প বা গ্যাসের ন্যায় সূক্ষ্মবস্তুর গতিরোধ করিতে পারে না। নাসারন্ধ্রের দ্বারা গৃহীত বায়ুর অধিকাংশই শ্বাসযন্ত্র বা ফুস্‌ফুসে চলিয়া যায়। কেবল উহার অতি সামান্যভাগ পত্রাস্থির (Scroll bone) উপরিস্থিত ঊর্দ্ধ কক্ষে গমন করে। নাসিকার ঊর্দ্ধ কক্ষে উত্থিত বায়ুতে কোন রূপ গন্ধ থাকিলে তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধ কক্ষের স্নায়ু পল্লব সমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঊর্দ্ধ কক্ষের ছাদ হইতে স্নায়ু-পল্লব মালা কক্ষের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া উহাকে আঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

নাসিকার ঊর্দ্ধকক্ষে বিন্যস্ত স্নায়ু পল্লব-পুঞ্জ কক্ষের ছাদে সম্মিলিত হইয়া "আঘ্রাণস্নায়ু" (Olfactory-nerve) বা মস্তিষ্কের প্রথম স্নায়ু গড়িয়া তুলিয়াছে। এই আঘ্রাণ-স্নায়ু বহিয়া গন্ধের অনুভূতি মস্তিষ্কে উপনীত হয়, সুতরাং আঘ্রাণ স্নায়ুর প্রেরণা মস্তিষ্কে না পৌছান

পর্য্যন্ত আমরা গন্ধের স্বরূপ বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ ফুলের মনোহর গন্ধ কিংবা পোলাওএর প্রীতিকর গন্ধ

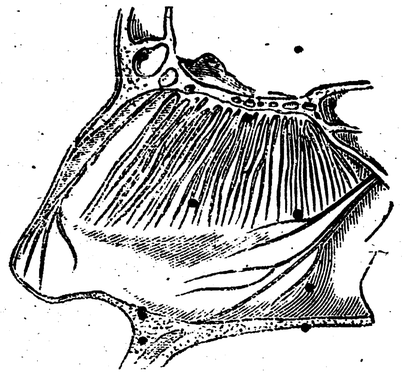

চিত্র ৬৬—নাসিকার উর্দ্ধ কক্ষের স্নায়ু পল্লব।

নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না।

রসনার রসবোধের জন্য যেমন ভোগ্য বস্তু তরল হওয়া চাই, সেইরূপ নাসারন্ধ্রে গন্ধানুভূতির জন্য আঘ্রাণীয় বস্তু বাষ্পীভূত হওয়া আবশ্যক। পিচকারী করিয়া যদি নাসিকার আঘ্রাণ-কক্ষে খানিকটা গোলাপ জল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার সুগন্ধ মোটেই অনুভূত হয় না, কিন্তু একটা পাত্রে কিছু গোলাপ জল রাখিয়া উহাকে নাকের কাছে ধরিলে বেশ স্নিগ্ধ ও মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ঘ্রাণীয় বস্তু বাষ্পাকার ধারণ না করিলে উহার গন্ধ অনুভূত হয় না, কারণ বাষ্পীভূত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর সংস্পর্শে-আঘ্রাণ স্নায়ু-গুলির প্রান্তদেশে কোন প্রকার ক্রিয়া বা উত্তেজনাই হয় না।

ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে লোকের ঘ্রাণশক্তি স্থগিত হয়। ঐ সময় লোকে প্রায়ই বলিয়া থাকে, "সর্দ্দিতে নাক বোঝাই হইয়া আছে, কোন গন্ধই পাই না।" ঠাণ্ডা লাগিলে নাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিকঝিল্লি প্রদাহ যুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে সুতরাং বাষ্পীভূত গন্ধ বস্তুর আঘ্রাণ-স্নায়ু পর্য্যন্ত পৌছিবার কোন উপায় থাকে না।

নিম্ন শ্রেণীর জীবের বিশেষতঃ কুকুরের ঘ্রাণশক্তি যেমন প্রবল মানুষের ঘ্রাণশক্তি তেমন প্রবল নহে। তথাপি পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে মানুষ এক গ্রেণ মৃগনাভির ১০০০০০০০০০ দশকোটি ভাগের মাত্র তিন ভাগের গন্ধও আঘ্রাণ করিতে পারে।

# জীবন রক্ষার্থ নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য

মানব জীবনের প্রতি কার্য্য নিয়মাবদ্ধ ভাবে চালিত হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে একটী শ্রেণীবদ্ধ নিয়মে প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই চলিতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা জীবনের ক্লেদ স্বরূপ। ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি জীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে জীবনই সমস্তের মূল এবং সেই জীবন ধারণের মূলই স্বাস্থ্য রক্ষা। অতএব শরীর ও মন যাহাতে সুস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোন নিয়মের অধীন হইতে হইবে এবং কি কি দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে সকলেরই সম্যক্ জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের দেশে বঁহুদিন অবধি জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির আবাসভূমি হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে এবং কি উপায়েই বা ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, এ বিষয়ের চিন্তায় অনেকেই ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। অত্যাচার করিলে যে আমাদিগকে রোগগ্রস্ত হইতে হয়, ইহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।



কেহ কেহ বা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও অভ্যাস ও অবস্থার দোষে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন না। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে যে সচরাচর সুস্থ শরীরে থাকা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে কয়েকটী সাধারণ নিয়মের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল।

জীবগণের শরীর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিশ্বাস, প্রশ্বাস, স্বেদ নির্গম প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জীবিত থাকি, হস্তপদ সঞ্চালন প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি তৎসমুদয় দ্বারাই শরীরের অংশ বিশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আমরা পান ভোজন দ্বারা এই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি।

জল আমাদের জীবন ধারণের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। জল আমাদের পোষণ কার্য্যের সাহায্য করে ও রক্তের তারল্য রক্ষা করিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরের দূষিত দ্রব্য সমূহ নিঃসরণের সাহায্যার্থেও জল আমাদের ব্যবহার্য্য, ইহা ব্যতীত দেহ ধৌত করিবার জন্য এবং রন্ধনাদি কার্য্যেও আমরা জল ব্যবহার করি। আমাদের দেহের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ জল এবং রক্তের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জল এমন কি দেহের অস্থি সমূহের মধ্যেও প্রায় ১০ ভাগ জল বর্ত্তমান।

ঘর্ম্ম, মূত্র, শ্লেষ্মা ইত্যাদি আকারে দৈনিক প্রায় তিন সের পরিমাণ জল আমাদের দেহ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে আমরা শরীরে জলের অভাব বুঝিতে পারি। আমরা আমাদের আহারীয় বস্তু হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল পাইলেও দৈনিক প্রায় তিন সের জল আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।

আহারের এক ঘণ্টা পরে জল পান করিলে এবং শয়নের পূর্ব্বে ও প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর এক গ্লাস করিয়া জল পান করিলে আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আহার কালীন অধিক মাত্রায় জল পান করা উচিত নহে কারণ উহাতে পাকস্থলীর পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। অল্প পরিমাণে জল পান করিলে শরীরের ক্লেদ উত্তমরূপে নির্গত হয় না এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়।

আমাদের দেহ পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য স্নান করিতে ও হস্ত পদাদি ধৌত করিতে জলের আবশ্যক। আমাদের শরীরের ক্লেদ ঘর্ম্মরূপে লোমকূপের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং লোমকূপ গুলি ক্লেদ দ্বারা বন্ধ হইলে শরীরের ভিতর হইতে অন্য ক্লেদ নির্গত হইতে পায় না এবং তদ্বারা অনেক প্রকার চর্ম্ম-রোগ উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুসের এবং মূত্রাশয়ের (Kidney) অনেক কার্য্য চর্ম্ম দ্বারা সাধিত হয় সুতরাং লোমকূপের দ্বার বন্ধ হইলে ফুস্‌ফুস্ ও মূত্রাশয়ের উপর অতিরিক্ত কার্য্য পড়ে এবং ফলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া নানারূপ ব্যাধির কারণ হয়। সুতরাং লোমকূপগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। তৈল মর্দ্দন বা সাবান ব্যবহার করিলে দেহ পরিষ্কার থাকে। পুষ্করণী নদী ইত্যাদিতে অবগাহন স্নান বিশেষ উপকারী কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর অথবা পূর্ণ ভোজনের পর স্নান শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী।

আমাদের দন্তগুলি প্রত্যহ দোষ নিবারক চূর্ণ দ্বারা অথবা নিম্ব ডালের দাঁতন দ্বারা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। কারণ আমরা যাহা আহার করি তাহার কণা আমাদের দন্তে লাগিয়া থাকে। এই সকল খাদ্যের কণা পচিয়া দন্তের বিশেষ অনিষ্ট করে। দন্তের চতুর্দ্দিকে একরূপ স্তবক জমিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা দন্তের চর্ব্বণ শক্তির হ্রাস হয় ও দন্তশূল প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

বাসন ধৌত করিবার জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন কারণ খাদ্য দ্রব্য বাসনে লাগিয়া থাকে এবং তদুপরি মাছি ইত্যাদি পতঙ্গ বসিয়া বাসন গুলিকে দূষিত করে সুতরাং উত্তমরূপে জল দ্বারা বাসন গুলি ধৌত না করিয়া ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা। আলু, পটল প্রভৃতি আমাদের ব্যবহার্য্য তরকারী সমূহ উত্তমরূপে ধৌত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কারণ ঐ সমস্ত দ্রব্য নানাদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে

ও তৎসহ বিবিধ রোগোৎপাদনকারী জীবাণু সকল (Bacilli) আসিয়া থাকে তজ্জন্য ধৌত না করিয়া ব্যবহার করিলে টাইফয়েড (Typhoid) রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ নদী, পুষ্করিণী, কূপ ও বৃষ্টি হইতে জল সংগ্রহ করা হয় কিন্তু পবিত্র পানীয় জল পাওয়া কঠিন। লোকে প্রায়ই নদী, পুষ্করিণী ও কূপের জলই পান করিয়া থাকে। যে সকল কূপ অধিক গভীর নহে তাহার জল পরিষ্কার হয় না। নদীর জলে সাধারণতঃ অনেক ময়লা থাকে এবং পুষ্করিণীর জল প্রায়ই অপরিষ্কার, কারণ পুষ্করিণীতে অনেক সময় স্নান করা ও কাপড় কাচা হয়। সেই জন্য যে পুষ্করিণীর জল পানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে কোনরূপ আবর্জ্জনা ফেলা, কাপড় কাচা, স্নান করা প্রভৃতি নিতান্ত অনুচিত কার্য্য। জলের দ্বারাই কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রোগ বিস্তৃত হয়। তজ্জন্য পানীয় জল ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া তৎপরে ব্যবহার করা বিধেয়।

আহার আমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্যতম এবং সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয় কার্য্য, ইহার দ্বারা আমাদিগের শরীরের পেশী সমূহ গঠিত হয় ও দেহের পরিমিত উত্তাপ রক্ষার জন্য যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন এবং দেহের পুষ্টি সাধনের সমস্ত অভাব পূরণ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্য হইতে আমরা আমিষ জাতীয়, স্নেহ জাতীয়, শালিজাতীয়, লবণ জাতীয় উপাদান পাই সেই সকল জিনিষই প্রকৃত পক্ষে আমাদের উপযোগী আহারীয় দ্রব্য। যেরূপ আহারে আমাদের দেহের প্রকৃত অভাব সমূহ মোচন হয় সেইরূপ দ্রব্য আহার করাই কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ, জল, বায়ু, বয়স, ব্যক্তিগত পরিশ্রমের পরিমাণ ও উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া এবং যে সকল সহজে হজম হইবে এরূপ দ্রব্য আহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষ ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে আমিষ জাতীয় (Proteids) আহারীয় আমাদের শরীরের অঙ্গ সমূহ গঠিত করে ও শরীরের ক্ষয় পূরণ করে। স্নেহযুক্ত (Fatty) দ্রব্য প্রায়ই শীত প্রধান দেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঐ প্রকার দ্রব্যে আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় উত্তাপ রক্ষা করে ও শরীরের চর্ব্বি প্রস্তুত করে। (Carbohydrates) শালি উপাদানও স্নেহযুক্ত দ্রব্যের ন্যায় শরীরের উত্তাপ এবং তেজ রক্ষা করিয়া থাকে কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায়। লবণ জাতীয় খাদ্য অস্থি প্রস্তুত করে ও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হয়। আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি জল তাহাদিগকে শরীরের সমস্ত অংশে বহন করিয়া লইয়া যায় ও শরীরের দূষিত পদার্থ গুলির নিঃসরণের সাহায্য করে। আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই, ব্যক্তিগত পরিশ্রম অনুযায়ী আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহাকে কোন রূপ কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না তাহার অধিক মাত্রায় আহার করিবার প্রয়োজন হয় না। বৃদ্ধদের অপেক্ষা যুবকদের আহারের পরিমাণ অধিক হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত দ্রব্য আমরা সচরাচর আহার্য্য রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি তন্মধ্যে কোনটি হইতে আমরা কি পরিমাণ কোন উপাদান পাইয়া থাকি তাহা পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল।



| | জল | আমিষ | স্নেহ | শালি | লবণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়দা | ১৫·০ | ১১·২ | ২·০ | ৭১·২ | ·৮ |
| চাউল | ৯·০ | ৬·৪ | ·৮ | ৮৩·২ | ·৫ |
| ডাল | ১১·৩ | ২৩·৫ | ২·২৯ | ৫৫·৯ | ১·২ |
| আলু | ৭·৪ | ·২ | ·১৬ | ২১·০ | ১·০ |
| সবজী | ৯১· | ·২ | ·৫ | ৫·৮ | ·৭ |
| কুক্কুট মাংস | ৭০·৮ | ২২·৭ | ৪·২ | ১·৩ | ১·১ |
| মেষমাংস | ৫২·০ | ১৬·০ | ১৬·০ | ... | ১·০ |
| ছাগমাংস | ... | ২৪·৬ | ২·৫ | ... | ১·২ |
| মৎস্য | ... | ১৭·৫ | ৭·৪ | ... | .. |
| হংসডিম্ব | ৪৫·১১ | ১৯·৫৩ | ৩৩·৭১ | ... | ১·৬৫ |
| কুক্কুট ডিম্ব | ৭৩·৫ | ১৩·৫ | ১১·৬ | .. | ১·০ |
| ছানা | ৫৭·২ | ২২·৩৩ | ১৮·৬১ | ·৩৮ | ১·৬৩ |
| দুগ্ধ | ৮৬·৪৭ | ৩·৫ | ৪·২ | ৪·৮ | ·৬ |
| মাখন | ৭·৫ | ১·০ | ৯০·৫ | ... | ১·০ |
| চিনি | ৩·০ | ... | ... | ৯৬·৫ | ·৫ |

সাধারণতঃ আমরা দৈনিক দুইবার আহার করিয়া থাকি সুতরাং উক্ত দুইবার আহারেই যাহাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য পাই ইহা বিবেচনা করিয়া আহারীয় নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। একজন সুস্থ ব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য দৈনিক খাদ্যে যে পরিমাণ বিভিন্ন উপাদান থাকা প্রয়োজন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। অধিক মাত্রায় আহার করা হানিকর এবং আহারের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

| | জীবনধারণোপযোগী | অল্প পরিশ্রম | অধিক পরিশ্রম |
|---|---|---|---|
| | আউন্স | আউন্স | আউন্স |
| আমিষ | ২ | ৪·৫ | ৬·৫ |
| স্নেহ | ·৫ | ·৫ | ৪·০ |
| শালি | ১২ | ১৪·২৫ | ১৭·০ |
| লবণ | ·৫ | ১·০ | ১·৩০ |
| মোট | ১৫·০ | ২৩·২৫ | ২৮·৮ |

উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়! মনুষ্য অনাহারে কিছুদিন জীবন ধারণ করিতে পারে কিন্তু বায়ুর অভাব হইলে কয়েক মুহূর্ত্তেই মৃত্যু ঘটে।

বিষাক্ত বা দূষিত বায়ু হইতে আমাদের সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে পারে, আবার নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ুতে উৎকট ব্যাধিও আরোগ্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বায়ু দুই প্রকারে দূষিত হয়; প্রথমতঃ দুর্গন্ধ সংযোগে দ্বিতীয়তঃ ধূলিকণার মিশ্রণে। কোন অন্ধকার গৃহের একটী ছিদ্র দিয়া রৌদ্র প্রবেশ করিলে বায়ুতে ঐ সকল ধূলিকণার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। বাস্তবিক বায়ুতে এত প্রকার দূষিত পদার্থ থাকিতে পারে যে ঐ প্রকার বায়ু সেবন করিলে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় প্রকৃতি-দেবী বৃষ্টি ধারা ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বদাই বায়ু মণ্ডলকে নির্ম্মল রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

নিশ্বাসের সহিত অম্লজান (Oxygen) আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাসের সহিত তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic acid gas) নির্গত হয়। অঙ্গারাম্লজান পরিপূর্ণ বায়ু আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। থিয়েটার সভা প্রভৃতি জনতাপূর্ণ স্থানের বায়ুতে অঙ্গারাম্লজানের পরিমাণ অধিক থাকে সেইজন্য ঐ সকল স্থানে অধিকক্ষণ থাকিলে শিরঃপীড়া প্রভৃতি অনেক প্রকার শারীরিক গ্লানি উপস্থিত হয়। শীতকালে গৃহ গরম রাখিবার জন্য গৃহ মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিলে গৃহস্থিত অম্লজান মিশ্রিত বায়ু অঙ্গারাম্লজানে পরিণত হয় এবং তজ্জন্য ঐ বায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত হয় এবং ইহার ফলে ঐরূপ গৃহে বাস করিলে অনেক সময় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। উল্লিখিত প্রকারে গৃহ গরম রাখিবার প্রয়োজন হইলে বায়ু চলাচলেরও উত্তম রূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা যুক্তি সঙ্গত।

ব্যায়াম আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে কর্ম্মঠ রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ভুক্ত দ্রব্য গুলিকে শরীরের ব্যবহারোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ অম্লজানের (Oxygen) আবশ্যক তাহা আমরা ব্যায়াম দ্বারা পাইয়া থাকি। অধিকন্তু ব্যায়াম দ্বারাই পেশী সমূহ সবল ও সুগঠিত হইয়া থাকে। মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। ব্যায়ামকালীন ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তৎকালীন শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্লজান (Carbon) আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুর সহিত অম্লজান আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয় ও আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। যাঁহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ উপকারী। ঐ প্রকার ব্যক্তিগণের প্রত্যহ পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম করা একান্ত কর্ত্তব্য। আবার ব্যায়াম অধিক মাত্রায় করিলে শরীরের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যায়ামের অপর একটী উপকারিতা এই যে ব্যায়াম কালীন অধিক পরিমাণ স্বেদ নির্গম হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা লোম-কূপগুলি পরিষ্কৃত হয় ও দেহের ক্লেদ সমূহ নিঃসরণের সাহায্য করে তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয়। ব্যায়ামের সময় যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য কারণ উহা শরীরের পক্ষে হানিকর।

আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে এতক্ষণে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। খাদ্য জল বায়ু ব্যায়াম ইত্যাদি আমাদিগের নিত্য আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে আমরা কতকপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু এখনও আমাদের স্বাস্থ্যনীতির অন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হয় নাই তাহা নিদ্রা ও বিশ্রাম। শরীর রক্ষার্থ নিয়মিত পরিমাণে নিদ্রা ও বিশ্রাম মানব দেহের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। যে অবস্থায় আমাদের মন ও শরীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে সেই অবস্থাকেই আমরা



নিদ্রা বলিয়া থাকি। পর্য্যায়ক্রমে নিয়মিতরূপ শ্রম ও বিশ্রামের দ্বারা আমাদেব সময় অতিবাহিত হওয়া উচিত। শ্রম দ্বারা শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয় হয় বিশ্রাম দ্বারা তাহা পূরণ করা কর্ত্তব্য। বয়ঃক্রম, পরিশ্রম ও অভ্যাস অনুসারে নিদ্রার মাত্রার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রার মাত্রা অধিক হওয়া ভাল নহে কারণ তাহা হইলে মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য হয়।

নিদ্রা আমাদের দেহ রক্ষার একটী প্রধান উপায়। এইরূপ কথিত আছে যে জীবগণের পক্ষে খাদ্যের অভাব অপেক্ষা নিদ্রার অভাব অধিকতর হানিকর। পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে কুক্কুরেরা প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল আহারাভাবে থাকিতে পারে কিন্তু নিদ্রার অভাব হইলে পাঁচ দিবসের মধ্যেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। নিদ্রার পরিমাণ বয়ঃক্রম অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয় শিশুদিগের অধিক মাত্রায় নিদ্রার প্রয়োজন। যুবক-দিগের অন্যূন ২৪ ঘণ্টায় ৭ ঘণ্টা নিদ্রার দরকার এবং বৃদ্ধদিগের ও দুর্ব্বল লোকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় নিদ্রার প্রয়োজন।

আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। নিদ্রা কালীন মুখ ঢাকিয়া শয়ন করা ও একঘরে অধিক লোক থাকা এবং চিৎ হইয়া শয়ন করা উচিত নহে। শয্যাগৃহ বেশ প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং যাহাতে সে ঘরে উত্তমরূপে বায়ু চলাচল হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা বলা বাহুল্য যে আমাদের যাবতীয় কার্য্য আমাদের অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কিরূপ ভাবে নিয়মাবদ্ধ হইয়া আমাদের চালিত হওয়া কর্ত্তব্য তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

# শিশু-পালন

( Mother-Craft Manual হইতে )

( ১ )

ছেলেদের কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা জানিতে গেলে প্রথমে ছেলেদের ভাল করিয়া জানা চাই, ভাল করিয়া বোঝা চাই। মাতার প্রতি পুত্রের মাঝে একটি বিশেষত্ব আছে; দেহ ও মনে, কর্ম্ম ও চরিত্রে, দোষে ও গুণে অন্য পুত্রদের হইতে তাহার কোন না কোন পার্থক্য আছে। প্রতি মাতা পিতাকে প্রতি সন্তানের দোষ ও গুণ, শক্তি ও দুর্ব্বলতা জানিতে হইবে। তাহার চিন্তার ধারা কোন দিকে, তাহার প্রাণের গতি কোন মুখে তাহা বুঝিতে হইবে। প্রতি সন্তানের স্বরূপটি ধরিতে পারিলেই তাহার শিক্ষার ও পালনের পথটি খুজিয়া পাওয়া যাইবে! ছেলে কি খেলে, সে কিরূপে খেলে; সে কি গল্প শুনিতে ভালবাসে, সে কি গল্প নিজে বলে, সে কি জিনিষ দেখিয়া মুগ্ধ হয় আনন্দিত হয়, সে কি প্রকার প্রশ্ন করে, কি জানিতে বলিতে করিতে চায়—এইরূপে ছেলেদের খেলায়, গল্প শোনায়, কথা বলায়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় তাহাদের দেহের ও অন্তর প্রকৃতির বিশেষ রূপটি ধরা পড়ে।

পুত্রদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার একটি পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) দেহের মাপ।

নাম :— বয়স :— বছর মাস সপ্তাহ

লম্বা :—(দাঁড়াইয়া) ইঞ্চি — সাধারণ মাপের উপর নীচে

লম্বা :—(বসিয়া) ইঞ্চি সাধারণ মাপের উপর নীচে
ওজন :— মন সের সাধারণ ওজনের বেশী কম
পরিধি :— মাথার বুকের পেটের
বক্ষঃর ব্যাস :—বুকের মাঝখান হইতে পিঠের শিরদাঁড়া পর্য্যন্ত ইঞ্চি
বুকের মাঝখান হইতে বগল পর্য্যন্ত ইঞ্চি
বক্ষঃ ফুলাইলে ইঞ্চি
হস্তের দৈর্ঘ্য :— পদের দৈর্ঘ্য :—

## দেহ পর্য্যবেক্ষণ।

( বামদিকের কলমটি স্বাস্থ্যের ও দক্ষিণ দিকেরটি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ )

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণভাবে দেখিতে | বলবান | দুর্ব্বল |
| | তেজস্বী | অবসন্ন |
| কিরূপে দাঁড়ায় | সোজা | বেঁকিয়া |
| | | বুক ভিতরে |
| | | মাথা সামনে |
| | | পেট সামনে |
| কিরূপে বলে | সোজা | বুক নুইয়া পড়ে |
| | কটিভর করিয়া | পিঠ বেঁকিয়া যায় |
| কিরূপে চলে | সাধারণভাবে | এঁকিয়া বেঁকিয়া |
| | দ্রুতগতিতে | ধীরে ধীরে |
| মাথার আকার | সাধারণ | অসমান |
| চুল | খুব বেশী | খুব কম |
| | মিহি | মোটা |
| অবয়ব | সুগঠিত | সব অঙ্গ সমানভাবে বাড়ে নাই |
| চক্ষু | নির্ম্মল | ঘোলা |
| | উজ্জ্বল | তেজহীন |
| | | জলে ভরা |
| | | ভাসা ভাসা |
| | ভাল | রাঙা |
| | | কাছে দেখিতে পায় না |
| | | দূরে দেখিতে পায় না |
| | | টেরা |
| চোখের তারা | স্বাস্থ্যকর | ফোলা |
| | | রাঙা |
| | | অগ্নীওয়ালা |



| | | |
|---|---|---|
| নাক | লম্বা | ছোট |
| | | ঘা-ওয়ালা |
| | | সর্দ্দি ঝরে |
| মুখ | সুগঠন | অসমান |
| | লম্বা | মুখ দিয়া নিশ্বাস লয় |
| | | ছোট |
| জিহ্বা | কোন গন্ধ নাই | দুর্গন্ধময় |
| | পরিষ্কার | ময়লা |
| | | মোটা |
| | | মুখের বাহির |
| | | মুখের সহিত জড়াইয়া |
| দাঁত | সবগুলি বাহির হইয়াছে | কতকগুলি বাহির হয় নাই |
| | | বেশী বাহির হইয়াছে |
| | সুগঠিত | মুখের বাহিরে আসিয়াছে |
| | ভাল | Tartar জমে |
| | | রং সাদা নয় |
| দাঁতের মাড়ি | স্বাস্থ্যকর | বিবর্ণ |
| | | রক্ত পড়ে |
| | | ফোলে |
| | | অতি নরম |
| গলা | | ময়লা জমে, |
| | পরিষ্কার | টন্‌সিল বড় |
| | | ফোলে |
| | স্বাস্থ্যসম্পন্ন | ঘা হয় |
| | | কাসে |
| ঠোঁট | রাঙা | রক্তহীন |
| | | সরু |
| | | ফোলা |
| চিবুক | দৃঢ় | লম্বা |
| | সাধারণ | |
| কাণ | লম্বা | ছোট |
| | | খারাপ গড়া |
| | | রস পড়ে |
| | | ব্যথা হয় |
| | | অত্যন্ত বড় |

| | | |
|---|---|---|
| চামড়া | দোষহীন | ময়লা |
| | পরিষ্কার | খোস, চুলকনা ভরা |
| | রক্তাভ | ফ্যাকাসে |
| | | অত্যন্ত নরম |
| মাংসপেশী | দৃঢ় | শিথিল |
| | সুগঠিত | দুর্ব্বল |
| পিঠ | সোজা | বক্র |
| বক্ষঃ | প্রশস্ত | ভিতরে বসা |
| | উন্নত | সরু |
| | বিশাল | হাড় বাহির করা |
| | বেশ ফোলে | কিছু ফোলে না |
| তলপেট | মাংসপেশীবহুল | শিথিল মাংসপেশী |
| | | অতি শক্ত |
| | | অতি প্রশস্ত |
| হাতগুলি | সমান লম্বা | অসমান |
| | সোজা | সন্ধিস্থল অতিবড় |
| | সুগঠিত | |
| | ডান হাতে কাজ করে | আঙ্গুল খুব মোটা |
| | বাঁ হাতে কাজ করে | নখের রং ভাল নয়। |
| পাগুলি | সমান লম্বা | অসমান |
| | সোজা | বেঁকা |
| | গুলফ্ শক্ত | গুলফ্ শিথিল |
| স্নায়ু | দৃঢ় | দুর্ব্বল |
| | | সহজে ভয় পায় |
| | শক্তি সম্পন্ন | সহজে রাগে |
| | সহজ | অতি চঞ্চল |
| | | সহজে ক্লান্ত হয় |
| | | ফিট হয় |
| | | স্বপ্নদোষ ঘটে |

| | | |
|---|---|---|
| দেহের উপর দখল | আপনি বসিতে পারে ( ছয় মাস ) | দাঁড়াইয়া চলিতে পারে না (তিন বছর) |
| | হামাগুড়ি দেয় (নয় মাস) | |
| | দাঁড়াতে পারে (এক বছর) | জিনিষ হাতে ধরিতে পারে না (তিন বছর) |
| | চলিতে পারে (দেড় বছর) | |
| | ছুটিতে পারে (দুই বছর) | ভাল কথা বলিতে পারে না ( তিন বছর ) |



| | | |
|---|---|---|
| | বাটি ধরিতে পারে (এক বছর) | |
| | আপনি খাইতে পারে (তিন বছর) | আপন গতির উপর |
| | আপনি কাপড় পরিতে পারে (তিন বছর) | অধিকার নেই |
| | লাফাইতে পারে (চার বছর) | (চার বছর) |
| পরিপাক শক্তি | ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে পারে (পাঁচ বছর) | প্যারালিসিস্ |
| | ভাল ক্ষিদে হয় | ক্ষিদে হয় না |
| | ভাল হজম হয় | খাবার সময়ের মাঝে ক্ষিদে হয় |
| | খাবার জিনিষ আনন্দের সহিত খায় | অতি বেশী খায় |
| | | জিনিষ বাছিয়া খায় |
| | | ধূলা, মাটি বা অখাদ্য |
| | | জিনিষ মুখে দেয়। |
| | | পেটে ব্যথা হয় |
| প্রস্রাব :— | | পেটে গ্যাস জমে |
| | পরিষ্কার | ঘোলা |
| | দুর্গন্ধ নেই | রক্ত মেশানো |
| | কষ্ট হয় না | বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত |
| | সহজ পরিমাণে হয় | কষ্ট হয় |
| | | জ্বালা করে |
| | | অত্যন্ত বেশী হয় |
| মল | সুগঠিত | কম হয় |
| | | পাতলা |
| | | কালো বা সবুজ |
| | | রক্তময় |
| | | অভুক্ত খাদ্যময় |
| | সামান্য আম | বেশী আম |
| | সামান্য গন্ধ | দুর্গন্ধময় |
| | দিনে এক হইতে তিনবার | দিনে একবারও নয় |
| | | বহুবার |
| ঘুম | শান্ত | অশান্ত |
| | গভীর | প্রায়ই ভেঙ্গে যায় |
| | | স্বপ্নময় |
| নিশ্বাস প্রশ্বাস | গভীর | অগভীর |
| | নাক দিয়া | মুখ দিয়া |
| | নিয়মিত | তাড়াতাড়ি |
| | সহজ | |
| রক্তচলাচল | উত্তম | কম |
| | | ঠাণ্ডা হাত পা |
| দেহের তাপ | স্বাভাবিক | বেশী |

দেহের এই সব লক্ষণ মাতা পিতারা লক্ষ্য করিতে পারেন ইহা ছাড়া দেহটিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করানো দরকার। দেহের নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি দেখানো দরকার :—

হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, যকৃৎ ; হার্ণিয়া ; ডাকলেস্ গ্লাণ্ড।

বড় টন্‌সিল ; গলা ; ধমনী, রক্তের চাপ।
হাতের বা পায়ের অসমতা, চেটা পা, সরু বুক।
চোখের বা কাণের বা নাকের বা দাঁতের কোন দোষ।

রাসায়নিক পরীক্ষা :

মূত্র : এ্যলবুমেন বা চিনি বা কোন দোষ আছে কি না
মল : কোন কৃমি বা অন্য রোগের বীজাণু আছে কি না।
রক্ত : কত হোমোগ্লোবিন আছে ; সিফিলিস্ বা গনোরিয়া বা যক্ষ্মার কোন জীবাণু আছে কি না।

কেবল দেহের দোষ বা গুণ জানিলেই হইবে না, প্রতিদিনের অভ্যাসগুলি দেখিতে হইবে ;

অভ্যাস।

| | | |
|---|---|---|
| ঘুম | একা শোয় | কয়েকজন একসঙ্গে |
| | খোলা জায়গায় | বদ্ধ ঘরে |
| | নিয়মিত সময়ে শোয় | ঘুমাইবার ঠিক সময় নাই |
| | ভোরে ওঠে | দেরীতে ওঠে |
| স্নান | প্রতিদিন | কয়েকদিন অন্তর |
| খাওয়া | ঠিক সময়ে | অসময়ে |
| | সহজ সরল পথ্য | গুরুভার |
| | চিবাইয়া | না চিবাইয়া |
| | আস্তে আস্তে | অতি তাড়াতাড়ি |
| | খাদ্যদ্রব্যে শরীর পুষ্টির সব উপাদান আছে | |
| শিশুর খেলা | বেশ হাত পা ছুড়িতে পারে | জামা কাপড় জড়ানো থাকে |
| | খোলা জায়গায় খেলে | বদ্ধ ঘরে খেলে |
| শিশুকে ঘাঁটা | সামান্য রকম | অত্যন্ত বেশী |
| | সহজ রকম | দোলানো, ছোঁড়া, খুব নাচানো হয় |

ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে তাহার মাতাপিতার বিষয়ও জানা দরকার। প্রতি শিশু সেই বংশের দোষ ও গুণের অধিকারী। দেহের ও মনের বহু শক্তি শিশু মাতা পিতার নিকট হইতেই পায়, আবার শরীরের ও অন্তরের অনেক দোষ মাতা পিতার নানা পাপের ফল। শিশুকে গঠন করিয়া তুলিতে মাতা পিতার জীবনের ইতিহাসের দরকার ; তাহা হইলে বংশানুক্রম অনুসারে যে দোষ শিশুতে জন্মাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যায়।

বংশানুক্রম।

| | পিতা | পিতার পরিবার* | মাতা | মাতার পরিবার* | ভ্রাতা | ভগ্নী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ | | | | | | |
| ওজন | | | | | | |
| ব্যবসায় | | | | | | |
| শিক্ষা | | | | | | |
| বিশেষ মানসিক শক্তি কি আছে | | | | | | |
| স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য কি আছে | | | | | | |
| মদ খাওয়া | | | | | | |
| যক্ষ্মা | | | | | | |
| সিফিলিস্ বা গনোরিয়া | | | | | | |
| কে কে বাঁচিয়া আছেন | | | | | | |
| মৃত্যুর বয়স ও কারণ | | | | | | |

* পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী



দেহকে কিরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; পুত্রের মানসলোকের পরিচয়টি দেহের পরিচয়ের অপেক্ষা বেশী দরকারী কারণ মনই দেহের চালক, মনের অপূর্ব্ব অজ্ঞাত লোকে যে ইচ্ছা, আশা, ভাবের ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে, তাহারই ইতিহাস দেহের কর্ম্মে ও চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। মনের স্বভাবটি কিরূপ তাহা নানা কাজে প্রকাশ পায়

মাতা পিতাকে দেখিতে হইবে পুত্র কোন প্রকৃতির

(১) চট্‌পটে, চঞ্চল, প্রাণবান, না অতিশান্ত, স্থাণুর ন্যায়, নিস্তেজ অথবা দুইয়ের মাঝামাঝি।
(২) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজের মত আছে, আপনার উপর বিশ্বাস আছে,
অপরের দ্বারা সহজে পরিচালিত হয় না ;
অথবা অস্থির চিত্ত, অপরে যাহা বলে তাহাই করে, কোন কাজ আপন ইচ্ছায় করে না।
(৩) চিন্তাপ্রবণ, জিনিষের বিষয় ভাবে কিন্তু কিছু করে না
অথবা ভাবপ্রবণ, ভাবের উত্তেজনায় সব করে, বুদ্ধির পরামর্শে নয় ;
অথবা কর্ম্মপ্রবণ, সর্ব্বদাই কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়।
(৪) প্রফুল্ল : কিছুতেই দমে না, হাস্যমুখ ও আনন্দিত চিত্ত
বিমর্ষ : সহজেই দমিয়া যায়, মুখ ভার করিয়া থাকে, অসুখী মনে করে ; ভয় পায় ; মাঝামাঝি
(৫) নায়কঃ সকল কাজেই এগিয়ে যায় ; সঙ্গীদের খেলায় ও চালায়
সাথীদের বিশ্বাস ও ভালবাসা আকর্ষণ করে
অনুবর্ত্তী : অপরের আজ্ঞায়, পরামর্শে বা অধীনে চলিতে বা কাজ করিতে চায় ; মাঝামাঝি
(৬) বিশেষত্ব আছে, সৃষ্টি করিতে চায়, নতুনের উপর লোভ
বিশেষত্ব হীন ; অপরের কাজ, ভাব অনুকরণ করে
(৭) উদার চরিত্র : সকলকে ভালবাসে, সকলেরই বন্ধু, সাহায্য করিতে, উপকার করিতে চায়
স্বার্থপরঃ একা থাকে, কাহারও সহিত ভাব নাই অন্তরের আদান প্রদান নাই ; মাঝামাঝি
(৮) উদারপন্থী : মুক্ত অন্তর ; কুসংস্কার দূর করিতে, কুপ্রথা ভাঙ্গিতে চায়, নতুন করিয়া উচ্চ আদর্শে সব গড়িতে চায়
অনুদার : প্রাচীন মত ও বিশ্বাসকে ভালবাসে ; লোক মত ও সমাজের সংস্কারকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। নবীনকে ভয় করে, মাঝামাঝি
(৯) আধ্যাত্মিক : সফল ঘটনার এক নিগুঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ দেখে
বাস্তব : কল্পনার রঙীন ফানুষ ভালবাসে না, সহজবুদ্ধি প্রখরা ; মাঝামাঝি
(১০) ধর্ম্মের ও নীতির উচ্চ আদর্শের মাপকাটিতে সকল ঘটনার মূল্য ঠিক করে।
আদর্শের শাসন মানে না, কোনটি সুখের তাহাই চায় ; শ্রেয়ই তাহার অভিলিপ্সিত হয়।
মাঝামাঝি
(১১) দায়িত্ব বোধ আছে ; চিন্তাশীল, বিবেকানুবর্ত্তী, সদ্‌বিবেচক।
দায়িত্ববোধহীন : অন্যমনস্ক, অবিবেচক,
মাঝামাঝি
(১২) প্রতি কাজের মোটাদিকগুলি দেখে
প্রতি কাজের সূক্ষ্মদিকগুলির উপর নজর

(১৩) আত্মনির্ভরশীল ; আপনার উপর ভরসা আছে ; সাহস আছে, আপনার উন্নতির জন্য এগিয়ে যায়
পরাধীন : অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; কখন কাজ করিতে নিজে এগিয়ে যায় না।

মাঝামাঝি

আপন পুত্রের বংশগত জাতিগত দেশগত সমাজগত পরিবার ও অবস্থাগত কি কি দোষ ও গুণ দেহে ও মনে জন্মাইয়াছে, মাতাপিতার তাহা জানা অতি আবশ্যক। তাহা না জানিলে সন্তান-পালনের পন্থা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়। কারণ, দেহের যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, মনের যে দিকে শক্তির বৃদ্ধির অভাব সেইদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে ; তাহার যে স্বাভাবিক শক্তি সমাজের বা দেশের কল্যাণকারী আছে, তাহাকে জাগাইতে বাড়াইতে হইবে। যে সদ্‌গুণগুলি তাহার মধ্যে নিহিত সেইগুলিকে বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়াইত প্রকৃত শিক্ষাদান। দেহের দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করা মনের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করাইত প্রকৃত সন্তান পালন।

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মাতা বা পিতার সন্তান সহজেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইতে পারে। কারণ সে দুর্ব্বল বক্ষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; ফুস্‌ফুসের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহাকে চিরজীবন সজাগ থাকিতে হইবে। যাহাতে তাহার ফুস্‌ফুসের শক্তি বাড়ে এইরূপ ব্যায়াম করিতে হইবে ; তাহার ভাগ্যে জীবনীশক্তি সুস্থ মাতাপিতাদের সন্তান অপেক্ষা কম পড়িয়াছে, এই দুর্ভাগ্য মানিয়া লইয়া বংশানুক্রমের বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ; তাহার পক্ষে নির্ম্মল বায়ু অপর জন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অপর অপেক্ষা অধিক চাই। নগরের ধূলিমলিন বাতাসে জন্মতায় বাস করিলে সে অকালে মরিবে, পল্লীর নির্ম্মল বায়ু ও শান্তির মাঝে সে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। শিশুকাল হইতে মাতাপিতা যদি তাহাকে সাবধানে যত্ন লইয়া পালন করেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুস্‌ফুসের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বংশানুক্রমের অভিশাপ হইতে সে বাঁচিবেই।

মাতা বা পিতা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বল, বা মাতাল বা সিফিলিস্ গনোরিয়া আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান শারীরিক দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয় ; তাহাদের নানা মানসিক ব্যাধি হইতে পারে। বর্ত্তমান কালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে সকল চোর ডাকাত, জুয়াচোর খুনী ইত্যাদি জগতের সকল বদমাসরা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ। সমাজের সকলেই যদি দেহে ও মনে পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইত তাহা হইলে কোন পাপ বা বিপত্তি ঘটিত না। বদ্‌মাস লোকদের ছেলেদের মধ্যে কুবুদ্ধি ও পাপ করিবার ইচ্ছা লুকাইয়া আছে, সহজেই জাগিয়া ওঠে ; শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে যদি সঙ্গে সঙ্গে রাখা যায়, উচ্চ ভাবের মাঝে শিক্ষিত করা যায়, সৎবৃত্তিগুলি জাগানো ও বাড়ানো যায় তাহা হইলে তাহারা বংশগত পাপের শিকল ছিঁড়িয়া নূতন জীবন যাপন করিতে পারে।

ইয়োরোপে ও আমেরিকায় অসুস্থ মাতাপিতাদের পুত্রদিগের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গিরিশিখরে পর্ব্বতের কোলে বা সমুদ্রতীরে মুক্তস্থানে তাহাদের পাঠাগার। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মাতাদিগের ছেলেদের ছেলেবেলা নির্ম্মল বায়ুতে রাখা উচিত ; তাহাদের পড়ার জন্য খুব বেশী খাটা উচিত নয় ; ধীরে ধীরে যাহাতে দেহ সবল হয় তাহার জন্য ব্যায়াম, নিয়মিত আহার, বিহার, খেলা, পাঠ করা উচিত। বাল্যকাল হইতে যদি ছেলেদের সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বংশানুক্রমে অনেক দোষ এড়ান যাইতে পারে। এই সকল বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ ছেলেদের পাঠ অপেক্ষা তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বেশী নজর রাখেন ; কারণ কেবল বিদ্বান হইলেইত হইবে না, বিদ্বান অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান হওয়া কম দরকার নয়, বিদ্যালাভ করিতে যদি অকালে মরিতে হয় তবে সে বিদ্যায় লাভ কি ? সে বিদ্যায় নিজের অপকারই হইল, দেশের, সমাজের বা মানবের কোন কল্যাণও হইল না। আমাদের মত গরীব দেশে অসুস্থ দুর্ব্বল বা বংশজাতব্যাধিগ্রস্ত ছেলেদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় নাই ; সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণও ছেলেদের মানসিক উন্নতির জন্যই ব্যস্ত, শারীরিক দোষ বা গুণের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। দেহ ও মন সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার মাতাপিতাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | পৌষ ১৩২৫ সাল | ৯ম সংখ্যা

## আলোচনা

ধূমপান নিবারণ আইন—গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ধূমপান নিবারণ আইন' পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইনের বলে ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ধূমপানকারী বালকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে। পুলিশ সব্ ইন্সপেক্টর বা তদুর্দ্ধ যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বা সামাজিক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার করিবার অধিকারী হইবেন। অপরাধী বালকগণকে প্রথম অপরাধের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, তৎপরে তাহাদের ৫৲ ১০৲ এবং উর্দ্ধ সংখ্যক ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ডাক্তার সারওয়ার্দ্দি এই আইনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ধূমপান নিবারণী সভার সভ্যগণ আইন পাশ হওয়ার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা ইহাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এক্ষণে এই আইনের ফলে বালকগণের মধ্যে ধূমপানের কদভ্যাস্ শীঘ্র শীঘ্র নিবারিত হইলেই মঙ্গল।

জিলা বোর্ডের অর্থ সঞ্চয়—ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে বঙ্গের জেলা বোর্ড সমূহের বর্ষশেষে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। "সঞ্জীবনী" এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—বর্ষশেষে জিলাবোর্ড সমূহের ন্যূনকল্পে যে পরিমাণ অর্থ হাতে থাকা উচিত জিলাবোর্ড সমূহে উহার বহুগুণ অধিক পর্য্যন্ত অর্থ মজুত আছে। জিলাবাসীর অভাব, দুঃখ দৈন্য অজ্ঞানতা, অসুস্থতা প্রভৃতি শত শত প্রকারের ক্লেশ রহিয়াছে জিলা বোর্ড সমূহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়ত অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন, তাহারা বিস্তর টাকা জমাইয়া রাখিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জিলাবোর্ডে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৬৬ টাকা, ২৪ পরগণা ১২ হাজার ৩৫৫ টাকা, ময়মনসিংহ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫২ টাকা, ত্রিপুরা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৬৪, মেদিনীপুর ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩২২, নোয়াখালী ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা জমাইয়াছেন। হুগলি, পাবনা ও জলপাইগুড়ি জিলাবোর্ডের হস্তেও বিলক্ষণ টাকা আছে। ম্যালেরিয়া দেশ উজাড় করিতেছে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে, প্রায় অধিকাংশ লোকের এখনও বর্ণ পরিচয় হয় নাই, পানীয় জলের

অভাবে অপের জল পান করিয়া লোকে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন?—জিলাবোর্ড টাকা জমাইয়া লক্ষপতি হইতেছেন?"

"টাকা জমাইবার হিসাবে মুর্শিদাবাদ ও যশোহর পূর্ব্বোক্ত মিউনিসিপালিটি সমূহের মত যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। মুর্সিদাবাদে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন মাত্র ৩২ হাজার ৯৯৭ টাকা হস্তেস্থিত দেখাইয়াছেন। তিনি সঞ্চয়ে অর্দ্ধ লক্ষেরও কাছে যাইতে পারেন নাই। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ও সরকারী চেয়ারম্যানদের মত টাকা মজুত করিতে পারেন নাই।

বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, ময়মনসিং জিলার পল্লীবাসীরা পানীয় জলের অভাবে ক্লেশ ভোগ করে, ঐ সকল জিলার কত প্রাচীন পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া জিলাবোর্ড লোক সাধারণের জল কষ্ট দূর করিতে পারিতেন জিলাবোর্ডের কর্ত্তারা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিবার হয়ত অবসর পান নাই।

আমরা বঙ্গের লোক সাধারণকে, বিশেষতঃ জিলা বোর্ডের সভ্যদিগকে এই নিন্দনীয় ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আহ্বান করি। যাহাতে ভবিষ্যতে এমন আর না হয় জিলাবোর্ডের সুভ্যগণ সচেষ্ট হইয়া তাহা করুন।"

কলিকাতায় শুদ্ধ সরবরাহ—কলিকাতায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। এই বৃহৎ নগরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করাও সহজ ব্যাপার নহে। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিদ্ধারণের জন্য কলিকাতা করপোরেশন হইতে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। গত ৯ই ডিসেম্বর ঐ কমিটি কর্পোরেশনের অনুমোদনার্থ নিম্নলিখিত মন্তব্য পেশ করিয়াছেন।

১। নগরের অধিবাসীদিগকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদান করিতে হইলে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী গোষ্ঠ স্থাপন করুন। বাহিরের কোন লোক এত বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে পারিবে না। এই সঙ্গে গো জাতীর উন্নতি বিধানের জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে।

২। উক্ত গোষ্ঠ প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব করা উচিত হইবে না। নূতন মিউনিসিপাল আইন পাশ হওয়ার জন্য বিলম্ব করা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ঐ আইন কবে পাশ হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং আইন লইয়া অনেক বাদানুবাদও চলিবে।

কমিটির নির্দ্দেশ মত কর্পোরেশন সভা যাহাতে শীঘ্র গোষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া নগরবাসীর দুগ্ধের অভাব দুরীকরণে সচেষ্ট হন সেজন্য আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সরকারী তদন্ত—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের উৎপত্তি, বিস্তার, প্রকৃতি, সংক্রামকতা ও মড়ক সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হইবার জন্য সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন।

কোন প্রদেশে, কি ভাবে, কোন সময়ে এই রোগের উৎপত্তি হইল, কি ভাবে বিস্তারলাভ করিয়া কোন কোন নগরে বা কোন কোন গ্রামে কোন অবস্থায় রোগের সংক্রামকতা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন নগরে বা কোন কোন গ্রামে এই রোগ প্রবেশ করিতে পারে নাই, বা কোন কোন স্থানে এই ব্যাধির প্রকোপ কম, এইরূপ কমবেশীর কারণ কি, কোথায় প্রতিকারের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ফল কিরূপ হইয়াছে, মড়ক কোথায় কিরূপ ইত্যাদি সকল সংবাদ সংগৃহীত হইবে।" তথ্য সংগ্রহের ফলে রোগ নিবারণের সরকারী সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল।



# উষ্ণোদকের উপকারিতা।

( 'আয়ুর্ব্বেদ' হইতে উদ্ধৃত )

লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ।

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি—আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাঙ্গালার বহু সাময়িক পত্রের অঙ্গ একদা অলঙ্কৃত করিত।

পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়—জলকষ্ট। অনেক সময় পল্লীবাসিগণকে পঙ্কিল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। একদিন এই জলকষ্ট-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। সেই সময় তিনি উষ্ণ-জলের উপকারিতা সম্বন্ধে—আমার কাছে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া আমি সেই অমূল্য উপদেশের নোট লইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

হেমচন্দ্র পল্লীগ্রামের লোকগণকে জল গরম করিয়া পান করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—বঙ্গদেশে এই যে বর্ষে বর্ষে এত নরনারী অজীর্ণ-ম্যালেরিয়া ও কলেরায় মারা পড়ে, ইহার এক মাত্র কারণ—নির্ম্মল জলের অভাব। তিনি বলিতেন—কেবল মাত্র উষ্ণোজল পান করিয়া পল্লীগ্রামের লোকগুলা পূর্ব্বোক্ত মারাত্মক রোগ সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ রোগই জলের দোষে হইয়া থাকে। অতএব জল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সর্ব্ব সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত।

জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর উপায় জল আগুণে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া। এরূপ জলে সংক্রামক রোগ জন্মিতেই পারে না। আমরা অনেকেই দেখিয়াছি—কলেরা, কয়েক প্রকার জ্বর, আমি, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জলকে আগুনে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ গুলির হস্ত হইতে অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

১। খালি পেটে গরম জল পান করিলে অম্লজনিত বুকজ্বালা এবং অম্ল ঢেকুর ওঠা নিবারিত হয়।

২। আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ না হইলে, পাকস্থালীতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গরম জল পান করিলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়।

৩। গরম জল পান করিলে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

৪। গরম জল পানে আমাশয়ে বা পাকস্থালী হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়,—উদরে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকিলে জীর্ণশক্তি কমিয়া যায়। গরম জল পানে এ দোষ থাকে না।

৫। গরম জল পাকাশয় হইতে যকৃৎ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য করিয়া থাকে।

৬। গরম জল শুষ্ক কাসের মহৌষধ। যাঁহারা শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পান, কাসিয়া কাসিয়া পেটে ব্যথা ধরে, অথচ শ্লেষ্মা কিছুই ওঠে না, তাঁহারা যদি রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ দেড় পোয়া আন্দাজ গরম জল খাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের কফ তরল হইয়া যাইবে, ফলে কাসির কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইবে।

৭। গরম জল হাঁপানির ব্যায়রামেও বিশেষ উপকারী। শ্বাস কৃচ্ছ্রের সময় লবণ সহ পান করিতে হয়।

৮। গরম জল পানে বাত রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। যাঁহাদের বাত আছে, তাঁহাদের বাতও ভাল হইয়া যায়।

৯। খালি পেটে আধ সের আন্দাজ গরম জল পান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। যাঁহাদের প্রস্রাবের পীড়া আছে ( অর্থাৎ প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, প্রস্রাবের বর্ণ—রক্ত বা পীত এবং যাঁহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত বলিয়া প্রস্রাব কালীন মূত্রদ্বার জ্বালা করিতে থাকে ) তাঁহারা গরম জল পান করিবেন।

১০। গরম জল পান করিলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

১১। গরম জলে কিঞ্চিৎ সর্জ্জিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, যকৃতের ভিতর পিত্ত সঞ্চয় জাত—পাথুরী জন্মিতে পারে না। সর্জ্জিক্ষার সকল বেণের দোকানেই পাওয়া যায়।

১২। পিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে যকৃতে এক রকম শূল হইয়া থাকে,—এই শূল—পূর্ব্বোক্ত বিধানে গরম জল মুহুর্মুহু পানে আরোগ্য হইতে পারে।

১৩। লবণ মিশ্রিত জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে জ্বর, বিসূচিকা, শোণিতস্রাব প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ২ রতি লবণ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত লবণাক্ত উষ্ণ জল পিচকারী দিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া হেম বাবু ২।৩টী মৃতপ্রায় রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

১৪। নূতন জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরের অভ্যন্তর গাত্র আমরস বা কফ কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই-জন্য নূতন জ্বরে পিপাসা হইলে, জল পান করিলে সে জল উদরে শোষিকা হয় না। এইজন্য পানে পিপাসা থামেনা, পীত জল ও বমন হইয়া যায়। কিন্তু গরম জল পান করিলে, তাহা উদরে শোষিত হয়, পিপাসাও দূর হয়।

১৫। ভোজনের অব্যবহিত পরে জ্বর হইলে, তৎক্ষণাৎ লবণ মিশ্রিত গরম জল পান করিলে ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা আর উদরে থাকিয়া বাষ্পাকার বিষাক্ত হইতে পারে না।

১৬। লবণ মিশ্রিত গরম জল বমন কারক, আবার বমন নাশক। তবে বমন নিবারণ করিবার জন্য অত্যুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ যতটা গরম—রোগী সহ্য করিতে পারে, জল তত গরম চাই এবং সেই জল—মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে পান করাই বিধি।

১৭। গরম জল পানে স্বেদনিঃসরণক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

১৮। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে গরম জল বিশেষ উপকারী।

১৯। গরম জলের ভাপ্‌রা লইলে বাত রোগ এবং শোণিত দুষ্টি আরোগ্য হইয়া থাকে।

২০। গরম জলের বাষ্প—গলার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ ও বহুবিধ গলরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

২১। নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত গরম জলের বাষ্প ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হইলে—ফুস্‌ফুসের প্রদাহ কমিয়া যায়।

২২। অভুক্ত ব্যক্তি যদি চার মত উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করে—তাহার হজম শক্তি বাড়ে।

২৩। সুস্থাবস্থায় নিয়ম করিয়া প্রত্যহ একপোয়া গরম জল খাইলে শরীরের দূষিত মল নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়া যায়,—কোন রোগ আক্রমণের সহসা আশঙ্কা থাকে না। এই জলের মাত্রা একপোয়া হওয়া উচিত। উষ্ণ জল পানের ২।৩ ঘণ্টা পরে—তবে আহার করিবে।

২৪। ঈষদুষ্ণ জল অর্দ্ধ প্রহরে পরিপাক হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলে, তাহা এক প্রহরে জীর্ণ হয়। কিন্তু শীতল জল পরিপাক করিতে দুই প্রহর সময় লাগে।

২৫। কেবল মূর্চ্ছা রোগে, রক্তাধিক্যে, দাহ থাকিলেও সুরাপান জনিত রোগে এবং মাথা ঘোরায়—উক্ত জল পান করা বিধেয় নহে।

২৬। গরম জল পানে অভ্যন্তর দেশে স্বেদ দেওয়ার কার্য্য হইয়া থাকে।

২৭। পার্শ্বশূল, অতিসার, বাত, গলগ্রহ, আধ্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শীতল জল একেবারেই বর্জ্জন করিয়া গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৮। নূতন জ্বর, অরুচি, গুল্ম এবং বিদ্রধি রোগে ও শীতল জলের পরিবর্ত্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৯। গরম জলে স্নান দুর্ব্বল দেহে সালসার কার্য্য করিয়া থাকে।

৩০। যাহাদের রোগ ভাল হইয়াছে—অথচ শরীরে বল হয় নাই—তাহারা গরম জলে স্নান করিবে।

গরম জলের গুণ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বেত্তা ঋষিগণ—সত্যযুগে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠকগণের আগ্রহ দেখিলে, ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

---



# আদা

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায় কবিভূষণ।

আদার সংস্কৃত নাম আর্দ্রক; বাঙ্গালা নাম আদা, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ডাক্তারি নাম Gingiber Officinale ইংরেজীতে Ginger এবং হিন্দিতে আদ্‌রক বলে।

আদা উদ্ভিত বিশেষ; ইহার কন্দের নাম আদা। ইহা বাঙ্গালা দেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। রৌদ্র ও গাছের ছায়া উভয় স্থানেই ইহার আবাদ চলে; চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমি উত্তমরূপে খুড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে, এবং প্রতি শ্রেণীতে আধ হাত অন্তর আদা পুতিয়া দিবে। বেশ এক পসলা বৃষ্টির পরে জমিতে আদা বসাইবে। গোড়ায় যাহাতে জল না দাঁড়ায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছাই ও খোল আদার পক্ষে উত্তম সার। দোঁয়াশ মাটিই আদার উত্তম জমি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদা তাঙ্গিয়া লওয়া চলে এবং পরে মাটী চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে পাঁতা শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটী হইতে উঠাইবে। আদা ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পরিপুষ্ট আর্দ্রক কন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বুড়িতে রাখিয়া কৃষকেরা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহা রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই শুঁঠ প্রস্তুত হয়। উত্তম শুঁঠ দেখিতে শুভ্রবর্ণ এবং বহুদিন অবিকৃত থাকে। পাটনাতে বিস্তর আদা জন্মে এবং বঙ্গে পাটনাই শুঁঠই সাধারণতঃ বাজারে বিক্রিত হয়।

মাত্রা—সরস অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা; চূর্ণ ।০ আনা হইতে ।০ আনা ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

এই বৎসর ( ১৩২৫ সন ) কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে এমন কি গ্রামে ঘরেও এক প্রকার বহুব্যাপক সংক্রামক সর্দ্দি জ্বর দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বর সমর জ্বর বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বোম্বে প্রদেশেই এই রোগ দেখা দেয়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল সর্দ্দিজ্বরের মত নাক ও গলা শ্লেষ্মাতে পূর্ণ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধামাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজম্যাজে ও দুর্ব্বল বোধ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর দেখা দেয়, মূত্র রক্তবর্ণ হয়। শেষে বুকে সর্দ্দি বসিয়া স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে। এ রোগ কলিকাতায় সংক্রামকরূপে দেখা দিলে তথায় আমরা যে বাটিতে ছিলাম, ঐ বাটীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩।৪ দিন ভুগিয়া সকলে আরোগ্য-লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য স্থলে এই ব্যাধি এত সহজেই আরোগ্য হয় নাই। এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা ভীতিপ্রদ।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহাই হউক মুখ্যত কোনও

আগন্তুক বিষ গলা ও নাকের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি এবং পাকস্থলী আক্রমণ করিয়া বায়ু পিত্ত কফকে দূষিত করে। কফের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আকণ্ঠ আদার রসের কুলি দিবসে ৩৪ বার এবং আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী পাতার রস ও মধু সন্ধ্যার পর এক বার সেবন করা যায় তাহা হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে পারে না; এবং ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। জিঞ্জারেড্ ব্যবহার করাও মন্দ নহে। ইহাতে আদা আছে। গুরুতর আক্রমণেও এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক রোগীকে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন দুষ্ট উপসর্গ দেখা যায় নাই। সকলকেই ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আদা প্রাত্যাহিক খাদ্যরূপে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ব্যবহারে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। আদার রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা বুক ও নাক হইতে সর্দ্দি কাটিতে থাকে, বেদনার হ্রাস হয় এবং সমর জ্বরের যাতনাও অনেকটা নিবৃত্তি হইয়া যায়, ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা দেখা যায় ও রোগ আরোগ্য হয়। গ্রামে ঘরে সমর-জ্বর দেখা দিলেই আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব লবণ সেব্য। এরূপে চলিয়া সমর-জ্বরে আক্রান্ত হইতে আমরা কাহাকেও দেখি নাই। আদা ও তুলসী সমর-জ্বরের প্রতিষেধক ও উত্তম ঔষধ; যতদূর পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহাতে এই সত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আদা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিস্তৃত অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চক্রদত্ত মতে (১) আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বরে বুকের, গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া লঘুতা জন্মে। (জ্বর চিঃ) (২) অতিসার রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে পিষ্ট আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহা অতিসার রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর। (অতিসার চিঃ)। (৩) শুঠ কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া গ্রহণী রোগে সেব্য; ইহা বায়ুর অনুলোমক। (গ্রহণী চিঃ)। (৪) ক্ষুধাবৃদ্ধি জন্য মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব লবণ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য চিঃ। নূতন সর্দ্দি ও শ্বাসকাসে আদার রস ও মধু সেব্য। (কাস চিঃ)। (৬) আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠ চূর্ণ পান করিবে। (আমবাত চিঃ)। হৃদরোগ ও কাসাদির পক্ষে শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান হিতকর। (হৃদরোগ চিঃ)। (৮) তীব্র শিরো বেদনায় গব্য দুগ্ধের সহিত শুঁঠ চূর্ণ নস্য লইবে। (শিরোরোগ চিঃ)।

সুশ্রুত মতে (১) তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ বিন্দু বিন্দু কাণের ভিতর দিলে কর্ণশূল ও বেদনা নিবারিত হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) পুরাতন গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন কামলা রোগীর পক্ষে হিতকর। (উঃ ৪৪ অঃ) (৩) গুল্ম রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক গো মূত্রের সহিত ত্রিবৎ ও শুঁঠ চূর্ণ সেব্য। (উঃ ৪২ অঃ)

শার্ঙ্গধর মতে (১) শুঁঠ চূর্ণ গব্য ঘৃত মাখাইয়া এড়ণ্ড পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটী প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুট পাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবনে আমাতিসারের বেদনা দূর হয়। (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ)। (২) শুঁঠ চূর্ণ এড়ণ্ড মূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ এড়ণ্ড পত্র দ্বারা আবৃত ও মাটীর প্রলেপ দিয়া পুট পাক করিবে। ইহার রস মধুসহ পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ মতে (১) পিত পুষ্প বেরেলা মূলের ছাল ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীত কম্প দাহযুক্ত বিষম জ্বর নষ্ট হয়। (মঃ খঃ ১ ভঃ) (২) বমন বিসূচিকায় বেল শুঁঠ ও শুঁঠের মিশ্রিত ক্বাথ পান করিলে বমন ও বিসূচিকা বিনষ্ট হয়। (মঃ খঃ ৩ ভাঃ) (৩) পানীফল ও খেজুর ভোজন জন্য অজীর্ণ হইলে শুঁঠ সেবন বিধেয়। (মঃ খঃ ২ ভাঃ) ৪) সর্জ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্ম রোগে সেব্য। (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)।



চরক মতে (১) আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে উদর রোগে সেব্য, (চিঃ ২৮ অঃ)। (গরম জলের সহিত শুঁঠ পান করিলে আম বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৯ অঃ।) (৩) পুরাতন গুড় ও আদা তুল্য ভাগে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ১ মাস সেবন করিবে, এই সময়ে দুগ্ধের সহিত অন্নপথ্য ব্যবস্থেয় শোথ রোগে ও শ্বাসের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ হিতকর। (চিঃ ১৭ অঃ) (৪) ক্ষত ক্ষীণ রোগী শুঁঠ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন ত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ পান বলারোগ্য প্রদ। (চিঃ ১৬ অঃ)। (৫) বালা ও শুঁঠ সমভাগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অতিসারে সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসার হর।

দ্রব্যগুণ হিসাবে আদা ভেদক, ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বাত ও কফ নাশক। শুঁঠের যে সমস্ত গুণ প্রায় সমস্তই আদাতে আছে। শুঁঠের গুণ যথা শুঠ রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক বলকারক এবং স্বরবর্দ্ধক। আগ্নেয় গুণ হেতু শুঁঠ আভ্যন্তরীন জলীয়াংশ শোষণ করতঃ মল পদার্থ সংগ্রহ করে এই হেতু শুঁঠ গ্রাহী।

---

# রোগী বীর

জগতের ইতিহাসে আমরা কত ধর্ম্মবীর কত কর্ম্মবীর কত যোদ্ধা জগজ্জয়ীর কথা পড়ি; বুদ্ধ, মহম্মদের মত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা, রামমোহনের ন্যায় কর্ম্মী, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নের মত ভুবন বিজেতা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কত মহাপুরুষের কথা, কত যোদ্ধার বীরত্বের কথা, কত দেশভক্তের, জনহিতৈষীর নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত, অভিভূত হই। তাঁহারা আমাদের চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় হইয়া থাকেন। নবীনের সহিত প্রবীনের সংগ্রামে, দেশের সহিত দেশের যুদ্ধে, কত বীর, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত শৌর্য্য দেখাইয়া ধন্য ও পূজার্হ হইয়া আছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জেতা ফরাসী সেনাপতি 'ফস্' (Foch) জগৎ বিদিত ও জগৎ পূজিত হইয়াছেন।

কিন্তু জগতে আর একটী বীরের দল আছে, যাহাদের কথা ইতিহাসে লেখে না, যাঁহাদের নাম দেশে দেশে প্রচারিত হয় না, কিন্তু তাঁহাদের সংগ্রাম যিনি দেখিয়াছেন, তিনি পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এই বীরগণ স্বাস্থ্যভগ্ন রোগী। ইহাঁদের লড়াই মৃত্যুর সহিত লড়াই। জীবনের সহিত মৃত্যুর লড়াই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। প্রতি মানুষই প্রতিক্ষণ মৃত্যুর সহিত লড়াই করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। যদিও মানুষ জানে যে জীবন শেষে মৃত্যুই জয়ী হইবে, তবুও মানবাত্মা এ সৌন্দর্য্যময় ধরণীর একটী আনন্দময় মুহূর্ত্তকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। মৃত্যু প্রতিক্ষণ চারিদিকে তার দূতদিগকে পাঠাইতেছে, নানা রোগের অসংখ্য জীবাণু আকাশে, বাতাসে, সলিলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের নিশ্বাসে, আহারে তাহাদের গমনাগমন চলিতেছে। এই জীবাণুগুলি যখন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন লোকের দেহে প্রবেশ করে, দেহের প্রাণশক্তি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। দেহদুর্গ অধিকার করিতে

গিয়া তাহারা বার বার পরাস্ত হয়। কিন্তু যখনই কোন রোগের বীজাণু দেহের কোন অংশ বেশ করিয়া দখল করিতে পারে; তখনই আশঙ্কার কথা। তখনই প্রাণ শক্তির সংগ্রাম গুরুতর হইয়া উঠে। মৃত্যুর সঙ্গে রোগীর এই লড়াইয়ের কথা ওয়াটারলু (Waterlôo) যুদ্ধের অপেক্ষা কম আশ্চর্য্যকর ও উদ্দীপক নহে।

আমেরিকার ডাক্তার এডওয়ার্ড ট্রুডিও Edward Trudeau) একজন রোগী বীর। তিনি ৪৩ বৎসর যক্ষ্মা রোগের সহিত লড়াই করিয়াছেন। যৌবনের প্রথমে নব আশা, নব উৎসাহ লইয়া যখন জীবনের রমণীয় স্বপ্ন আঁকিতেছেন, তখন মৃত্যু তাঁহার দ্বারে দূত পাঠাইল। যক্ষ্মা বীজাণু তাঁহার দেহ দুর্গ দখল করিল। তিনি ভীত হইলেন না, আশাহীন হইলেন না। তিনি নির্ভীক অন্তরে বলিলেন, আমার যৌবন মৃত্যু-জয়ী হইবে। ৪৩ বৎসর দীর্ঘ সংগ্রামের পর মৃত্যু জয়ী হইল। মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে করিয়া যক্ষ্মা বীজাণু দেহে ঢুকিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অধিকার করিতে ৪৩ বৎসর লাগিল। এই ৪৩ বৎসেরর সুদীর্ঘ লড়ায়ে ট্রুডিও কম শৌর্য্য, বীর্য্যের পরিচয় দেন নাই। জীবন প্রদীপের সলিতার মুখে যে আলো জ্বলিতেছে, তাহা আশার আলো, যে রস এ আলো জ্বালাইয়া রাখিতেছে সে আনন্দ রস। ট্রুডিওর অন্তরে আশা ছিল; আনন্দে তাঁহার দেহ মন ভরা ছিল। সমস্ত মানব জীবন এ সৌন্দর্য্যময় ধরণীতে এক পরমাশ্চর্য্য আনন্দলীলা এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাই মৃত্যুর কাল ছায়া দেখিয়া তিনি ভয় পান নাই, তাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত ও হাস্যোজ্জ্বল আনন কত রোগীকে শান্ত করিয়াছে, কত ভগ্ন হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। তিনি জানিতেন রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করাই মৃত্যুর হাত হইতে দূরে থাকিবার একমাত্র উপায়। তাই যখনই যক্ষ্মাক্রান্ত হইলেন, তিনি নগর হইতে পলাইয়া গেলেন। পর্ব্বত কোলে বা হ্রদের তীরে, বা সমুদ্রের ধারে, নির্ম্মল, উন্মুক্ত বাতাসে ঘর বাঁধিলেন। সদা প্রফুল্ল থাকিয়া, নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার ভগ্ন দেহ সারিয়া উঠিল। যখনই দেহ সুস্থ হইয়া উঠিত তখনই নগরের ডাক তাঁহার কাছে বার বার আসিত। আরামদায়ক মনোহর নগর জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি যখনই ধূলি মলিন সহরের মাঝে আসিতেন, তখনই পুরাতন যক্ষ্মা শত্রু আপন প্রতাপ জানাইত। আবার তাঁহাকে মুক্ত স্থানে নির্ম্মল বাতাসে পালাইতে হইত। গিরি শিখরে মুক্ত অরণ্যে বাসা বাঁধিতেন, আর মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতেন। এমনি করিয়া সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন। কেবল যে দেহেই বাঁচিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি নগর সমাজ হইতে দূরে থাকিয়াও সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভাবিয়াছিলেন, বই লিখিয়াছিলেন, স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই থাকিতেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী গরীব রোগীদিগকে বিনামূল্যে দেখিতেন, অর্থ সাহায্যও করিতেন। তাঁহার প্রফুল্ল অন্তর হইতে আনন্দ রস উৎসারিত হইয়া উঠিত, যিনি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন তিনি তাঁহার আদর্শে, তাঁহার আশা, বিশ্বাস আনন্দ দেখিয়া জীবনে এক নবশক্তি লাভ করিয়াছেন। জীবনের প্রতিক্ষণ এইরূপে মৃত্যুর সহিত লড়াই করিয়া যিনি ৪৩ বৎসর যক্ষ্মার করাল গ্রাস এড়াইয়া চলিয়াছেন তিনি কি প্রকৃত বীর নন?

এইরূপ কত অখ্যাত, অজ্ঞাত বীর আছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মত অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির নিয়ম পালন করিয়া মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইয়া রহিয়াছেন। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত কত ব্যক্তি স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া বেশ সারিয়া গিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক আছে। ডাক্তার ট্রুডিওর আদর্শে কোন রোগী বীর সঞ্জীবিত হইয়া, নব আশা, নব উৎসাহে, রোগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন এই আশা করিয়া তাঁহার কথা লিখিলাম।



# শরীর তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা।

স্বাস্থ্যই আমাদিগের প্রকৃত জীবন। অসুস্থ শরীরে জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। অনেকে পীড়াকে শরীরের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। শরীর থাকিলেই পীড়া হয় এই ধারণায় তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় চিন্তায় তাদৃশ যত্ন করেন না। কেহ বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে অথবা গ্রহ বিশেষের কোন দৃষ্টিকে পীড়ার কারণ বলিয়া জানেন। তাঁহারা রোগ হইলে চিকিৎসার উপর তাদৃশ নির্ভর না করিয়া তাহার প্রশমনার্থে অনেক প্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া থাকেন। রোগের কারণ এবং শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতেই আমাদিগের দেশে এই সমস্ত ভ্রমমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে এবং এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জন্যই আমরা এত কষ্ট পাইয়া থাকি।

দেহের যন্ত্র সকল কি ভাবে কাজ করে; কিসে তাহাদের ক্রিয়ার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সে সকলের প্রতীকার হইতে পারে এ সকল বিষয়ে একটা মোটামুটী জ্ঞান সকলেরই থাকা আবশ্যক। ফলতঃ শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে রোগোৎপত্তির কারণ ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর নহে। কি কি পদার্থের সংযোগে শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিরূপে তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পোষণ হয়, তাহা না জানিলে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা ঠিক করা অসম্ভব।

দেহযন্ত্র ও ইঞ্জিন—ইঞ্জিন ও মানবদেহে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। (১) মানব দেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েরই খাদ্যের আবশ্যক হয়, আমাদের পক্ষে যেমন খাদ্য দ্রব্য ইঞ্জিনের পক্ষে সেইরূপ কয়লা! কয়লা ব্যতীত যেমন ইঞ্জিন চলেনা তেমনি আহার ব্যতীত আমাদের দেহ রক্ষা পায় না। (২) মানব দেহ ও ইঞ্জিন উভয়েই বর্জ্জার অংশ পরিত্যাগ করে। দেখিতে পাওয়া যায় যে ইঞ্জিন হইতে ছাপরের মল, অর্দ্ধদগ্ধ কয়লা ইত্যাদি পরিত্যক্ত হয় কারণ কয়লা পুড়িয়া গেলে অবশিষ্ট অসার অংশে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি পায় না। সেইরূপ মানুষেরও আহার্য্য দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়া অবশিষ্ট অসার অংশ মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি নানা আকারে বহির্গত হইয়া যায়। (৩) মানবদেহ ও ইঞ্জিন উভয়কেই সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়—কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে জং বা মরিচা পড়িয়া ও ময়লা জমিয়া ইঞ্জিনের অংশ সকল ক্রমে ক্রমে অচল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে মানব শরীরও ঠিক সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া ক্রমে অচল হইয়া পড়ে। (৪) মানবদেহ ও ইঞ্জিন উভয়ই ব্যবহারে কর্ম্মক্ষম থাকে (৫) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েরই প্রত্যেক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ইঞ্জিনের যে কোন একটী অংশ বিকল হইলেই সমস্ত ইঞ্জিন যন্ত্রটী অকর্ম্মণ্য হয় মানব শরীরও ঠিক তদ্রূপ, শরীরস্থ কোন অংশের বিশৃঙ্খলা হইলে সমস্ত শরীরই তজ্জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

দেহ যন্ত্রের অপর একটী বিশেষ গুণ আছে যাহা ইঞ্জিনে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহ যন্ত্র বর্দ্ধনশীল। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে একজন যুবকে পরিণত হয়, যুবক হইতে প্রৌঢ় এবং পৌঢ়াবস্থা হইতে বৃদ্ধ হয়। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য দেহযন্ত্রের আর এক প্রকার বৃদ্ধি আছে। মানবদেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যখন উহার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় তখনও উহার বৃদ্ধি শেষ হয় না! তবে তখন তাহার আকারে বৃদ্ধি না হইয়া শরীরকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। আমাদের প্রতি কার্য্যে অর্থাৎ আমরা যখনই কোনরূপ কাজ করি, কথা বলি, হাত নাড়ি তখনই সেই পেশীর কিছু ক্ষয় হয়। এইরূপে মাংস পেশীর ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে; কিন্তু আমরা যাহা খাই তাহার

সারাংশ রক্তে পরিণত হয় এবং একদিকে যেমন ক্ষয় হয় তেমনি আবার এই রক্ত দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত দেহে অনবরত ক্ষয় ও পূরণ ক্রিয়া চলিতেছে।

শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে রোগোৎপত্তির কারণ স্থির করা ও তন্নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা যে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে ইহা বলা বাহুল্য। যেমন কোন ইঞ্জিন চালকের ইঞ্জিন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে সে তাহা উত্তমরূপে চালাইতে এবং কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তাহা মেরামত করিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ আমাদের শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ কি কি পদার্থের সংযোগে শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিরূপে তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পোষণ হয় তদ্বিষয়ে অবগত না থাকিলে সুচারুরূপে শারীরিক ক্রিয়াগুলি চালাইতে সক্ষম হই না। এ স্থলে আমরা ঐ বিষয় সম্বন্ধে অতি চুম্বক ভাবে আলোচনা করিতেছি।

আমাদিগের শরীর কঠিন, কোমল ও তরল পদার্থে নির্ম্মিত। কঠিন পদার্থ গুলিকে অস্থি বলা যায়। অস্থিই শরীরের অপরাপর পদার্থের আধার স্বরূপ। তাহাতে শরীরের আকার নির্দ্দিষ্ট ও সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। অস্থি শরীরের অভ্যন্তরে আছে অন্যান্য পদার্থগুলির তাহার অন্তর্ভাগে বা বহির্ভাগে সংলগ্ন থাকে ও বিশেষ কার্য্য সমাধা করে। স্ব স্ব স্থানে সন্নিবিষ্ট শরীরের অস্থি সমষ্টিকে কঙ্কাল বলে। একখানি অস্থি অপর অস্থির সহিত যেখানে সংযুক্ত আছে তাহাকে সন্ধি কহে এবং এক প্রকার ভেদাবরোধক পদার্থ দ্বারা অস্থির সংযোগ সম্পাদিত; ঐ সংযোজক পদার্থকে বন্ধনী কহে। বন্ধনী সকল এরূপ সুচারু রূপে অস্থিতে সম্বদ্ধ যে, সন্ধিস্থানের সকল অস্থিগুলি অনায়াসে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে। বন্ধনী স্থান ভ্রষ্ট হইলেই অস্থিবন্ধ নষ্ট হইয়া যায়।

যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয়, তাহাকে পেশী কহে, পেশী মাংসরাশি মাত্র, পশুশরীরের ঐ পেশীই লোকে মাংস বলিয়া ভক্ষণ করে। পেশী সকল দুই খণ্ড অস্থির মধ্যে বিস্তৃত থাকিয়া তাহার একখানি বা উভয় খণ্ডকেই সঞ্চালিত করে। প্রকৃত পেশী অস্থিতে সংযুক্ত থাকে না বরং উহার যে অন্তভাগ অস্থিতে সংযুক্ত থাকে তাহার প্রকৃতি প্রকৃত পেশীর প্রকৃতি হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক। ঐ অন্তভাগ কোন কোন স্থলে শুভ্ররজ্জুবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহা অস্থিতে এত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয় যে উহাকে অস্থি হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করিলে উহা পৃথক না হইয়া বরং অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। পেশীর এক প্রকার বিশেষ গুণ আছে। উহাকে সঙ্কোচতা গুণ বলে। ঐ গুণ থাকাতেই পেশীদ্বারা অস্থি সকল চালিত হইয়া থাকে। যে অস্থি একবার একদিকে এবং একবার তাহার বিপরীত দিকে চালিত হয় তাহার উভয় দিকে দুইখানি পেশী নিবদ্ধ থাকে। ইহাদের একটীর নাম আকুঞ্চন পেশী এবং অপরটীর নাম প্রসারণ পেশী। আমাদের আঙ্গুল মুঠো করিবার সময় আকুঞ্চন পেশীর ক্রিয়া হয়; আবার খুলিবার সময় বিপরীত দিক হইতে প্রসারণ পেশীর ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাদিগকে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশী (voluntary muscles) কহে।

কোন কোন পেশী আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া বা আমাদের অজ্ঞাতে আপনা হইতেই তাহার ক্রিয়া সম্পন্ন করে। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াদির কার্য্য যাহারা নির্ব্বাহ করে তাহারা অনৈচ্ছিক বা স্বতঃ প্রবৃত্ত পেশী (involuntary muscles) নামে অভিহিত। এই সকল পেশী সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। নিদ্রিত অবস্থাতেও অনৈচ্ছিক পেশী সমূহ ক্রিয়াবান থাকে। স্বতঃ প্রবৃত্ত পেশীর ক্রিয়া যদিও আমাদের ইচ্ছাধীন নহে তথাপি অনেক সময় আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হইলে আপনা হইতেই তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে। যেমন ভয় পাইলে এই স্বেচ্ছাধীন পেশীর সঙ্কোচন হয় এবং তাহাতেই লোম সোজা হইয়া দাঁড়ায় ইহাকেই রোমাঞ্চ বা "গা কাঁটা দিয়া উঠা" বলে।



হঠাৎ ভয় কিম্বা গুরুতর শোক সংবাদ পাইলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে মনের ভাবানুযায়ী তখন রক্ত কোষের স্বতঃ প্রবৃত্ত পেশী সকলের ক্রিয়া হয় অর্থাৎ উহাদের সঙ্কোচন হয়। তাহাতে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে এবং তখন রক্ত বহা শিরা সকল রক্তশূন্য হইয়া পড়ে বলিয়া "ফ্যাকাসে" দেখায়। এইরূপ গুরুতর ভয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতেও দেখা যায়, এজন্য শিশুদিগকে হঠাৎ ভয় দেখান কর্ত্তব্য নয়।

যে তরল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। হৃদয় রক্তের প্রধান আশ্রয় স্থান। হৃদয়স্থ পেশীবলে উহা তথা হইতে দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হয়। যে সকল নাড়ী দ্বারা দেহের রক্ত সঞ্চার হয় তাহাদিগকে রক্তবহা নাড়ী কহে। রক্তবহা নাড়ী দুই প্রকার, যদ্দ্বারা হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চরণ করে তাহাদিগকে ধমনী এবং যদ্দ্বারা দেহের রক্ত হৃদয়ে আনীত হয় তাহাদিগকে শিরা কহে। ধমনীর প্রারম্ভ-স্থল স্থূল কিন্তু শরীরের সমুদয় অংশে যত বিস্তৃত হইয়াছে ততই ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত ও ক্রমে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছে। ধমনী পথে রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ দেহে সংযোজিত হইয়া বৃদ্ধ শরীরের অপচিত অংশ পূরণ ও শিশুদেহের সম্বর্দ্ধন করে। ধমনী পরিত্যাগ করিয়া শিরায় গমন কালে রক্তের প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। রক্ত যে পুষ্টিকর পদার্থ সম্পন্ন হইয়া হৃদয় হইতে ধমনীতে গমন করে, তাহা নষ্ট হয় এবং উহার রংএর উজ্জ্বলতা থাকে না। রক্তশিরা দ্বারা হৃদয়ে নীত হইয়া তথায় সংশোধিত ও পুনর্ব্বার পোষণীশক্তিসম্পন্ন হইয়া ধমনীপথে পুনরায় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। পোষণীশক্তিবিহীন বিবর্ণ শোণিত, শিরাপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে অন্য এক প্রকার পদার্থের সহিত মিলিত হয়। উহাকে লসীকা কহে, লসীকা এক প্রকার বর্ণ-বিহীন জলের ন্যায় তরল পদার্থ। কোন কোন স্থানে উহা শ্বেত বর্ণও হইয়া থাকে। লসীকা শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত আছে। যে সকল নাড়ী দ্বারা লসীকা প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে লসীকা বহ নাড়ী কহে। লসীকা রক্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে অন্ন রসের সহিত সংযুক্ত হয়। ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয় মধ্য দিয়া গমন কালে তাহা হইতে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয় তাহাকে অন্ন রস কহে। শিরা যে স্থানে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকট লসীকা বহের সহিত উহার মিলন আছে; সুতরাং শিরাস্থ রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই লসীকার সহিত মিশ্রিত হয়। তাহাতেই রক্ত পুনর্ব্বার পোষণী-শক্তি সম্পন্ন হয়। শিরা দ্বারা হৃদয়ে শোণিত সঞ্চালিত হইলে, উহা তত্রত্য পেশী বলে কতকগুলি নাড়ী দিয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে, ঐ সকল নাড়ীকে ফুস্‌ফুসের ধমনী কহে। ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইলে নিশ্বাসিত বায়ু দ্বারা রক্তের দোষ শোষণ হয়। পরিশোধিত হইলেই উহা উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া, আর একপ্রকার প্রণালী দ্বারা হৃদয়ের গহ্বরান্তরে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর রক্ত পুনর্ব্বার ধমনী পথে দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইরূপে শরীরের মধ্যে রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রক্তসঞ্চারের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। যে বায়ু নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগের শরীরস্থ হয়, প্রধানতঃ তাহাতে দ্বিবিধ পদার্থ থাকে অম্লজান বায়ু ও যবক্ষারজান বায়ু। ফুস্‌ফুস্ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে পূর্ণ; নিশ্বাসিত বায়ুর অম্লজান ভাগ সেই সকল কোষের গাত্রাভ্যন্তর দিয়া সেই স্থানের রক্তের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পরিশোধন করে। দেহের মধ্যে দূষিত রক্তে অম্লঅঙ্গার বায়ু নামক এক প্রকার অনিষ্টকর পদার্থ থাকে তাহাও সেই সময়ে রক্ত হইতে পৃথক হইয়া প্রশ্বাসিত বায়ুর সহিত বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে শোণিত দুষ্ট পদার্থ শূন্য এবং পুষ্টিকর পদার্থ সংযুক্ত হইয়া শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পেশী ও তাহার সঙ্কোচতা শক্তি দ্বারা শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু কিরূপে পেশীর সঙ্কোচন প্রবৃত্তি জন্মে, কিরূপেই বা ইচ্ছামাত্র শত শত পেশী এককালে সঙ্কোচিত হয়

তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপারটী একটী চমৎকার যন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হয়। ঐ যন্ত্রকে স্নায়ু কহে। স্নায়ু অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রময়; মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানেই ব্যাপ্ত হইয়ছে। মস্তিষ্ক আমাদের মনোযন্ত্র; অতএব মনোমধ্যে কোন অঙ্গ পরিচালনের ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা যেন স্নায়ু সহযোগে সেই সঙ্গে উপস্থিত হইয়া, সেই স্থানের পেশীকে সঙ্কুচিত হইতে আদেশ করিতে থাকে এবং সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সেই অঙ্গকে পরিচালিত করে।

শরীরের অঙ্গাদি চালনা করা যেমন স্নায়ুর কার্য্য, সেইরূপ শরীরের কোন অংশে বাহ্য বা আন্তরিক কারণে কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, মনের মধ্যে সেই ভাবান্তর উদ্রেক করাও স্নায়ুর কার্য্য। যখন আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন সেই দৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি নেত্রমধ্যে পতিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুর ভাবান্তর করিলেই আমাদিগের দর্শন জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ে কোন শব্দের প্রতিঘাত ও নাসাভ্যন্তরে কোনরূপ বিশিষ্ট প্রতিঘাত ও নাসাভ্যন্তরে কোনরূপ বিশিষ্ট দ্রব্যের পরমাণু-যোগ হইলে সেই স্থানের স্নায়ু সহকারে আমাদিগের মনে সেই ইন্দ্রিয় লভ্য জ্ঞান জন্মে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্নায়ু দ্বারা শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয় এবং উহা দ্বারা দর্শন ঘ্রাণ ইত্যাদি জ্ঞানও জন্মে। কিন্তু ঐ উক্তরূপ কার্য্য একই প্রকার স্নায়ুর দ্বারা সাধিত হয় না। উক্ত উভয় প্রকার কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র স্নায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। মনোগত ইচ্ছা স্নায়ুযোগে পেশীকে সঞ্চালিত করে এবং কোন অঙ্গের কোনরূপ ভাবান্তর হইলে স্নায়ু যোগে মস্তিষ্কে তাহার বোধ জন্মে ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি কোন অঙ্গের স্নায়ু কাটিয়া দেওয়া যায় তবে সেই অঙ্গ গতি রহিত ও অসার হইয়া উঠে।

লসীকাবহ নাড়ী দ্বারা শিরাস্থ রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ হয়, তাহা অন্ন হইতে জন্মে। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করি পাক যন্ত্র দ্বারা তাহা হইতে পুষ্টিকর পদার্থ সঙ্কলিত হয় এবং অসার ভাগ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যা। অন্ন নালী, আমাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ, প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হয়।

মুখ হইতে যে নালী দ্বারা অন্ন আমাশয়ে নীত হয় তাহাকে অন্ন নালী কহে। ঐ অন্ন-নালীর সহিত সংলগ্ন এবং ফুস্‌ফুস্ ও হৃদয়ের অব্যবহিত নিম্নে আমাশয় অবস্থিত। আমাশয় হইতে একটী সুদীর্ঘ নল বাহির হইয়াছে, উহাকে অন্ত্র কহে, অন্ত্র সুদীর্ঘ কিন্তু জড়িত আকারে উদরের নিম্নভাগে সংস্থিত। অন্ত্রের সহিত যকৃতের সংযোগ আছে। প্রথমে চর্ব্বণ কালে লালার সহিত অন্নের সংযোগ হইয়া উহা অন্ন-নালী দ্বারা আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। তথায় উহার পরিপাকের অনেক কার্য্য সমাধা হয়। অনন্তর, আমাশয় হইতে অন্ত্র মধ্যে গমন কালে যকৃৎ এবং অন্ত্রের গাত্র হইতে রস নির্গত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইতে থাকে। ঐ সকল রস সংযোগে অন্নের পরিপাক কার্য্য সমাধা হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া গমন কালে অন্ন হইতে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক হইয়া এক প্রকার আকর্ষণ দ্বারা আমাশয় ও অন্ত্রের গাত্র দিয়া বহির্গত হইয়া তৎসংলগ্ন অসংখ্য শোষণী নাড়ী দ্বারা লসীকাবহ নাড়ীতে সঞ্চরণ করে এবং তাহার পর লসীকা সহযোগে শিরাস্থ শোণিতের সহিত হৃদয়ের নিকট মিলিত হইয়া তাহার পোষণী শক্তি সম্পাদন করে।

এইরূপ অশেষ কৌশল দ্বারা করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতেছেন। শরীরের মধ্যে যে কত চমৎকার কৌশল আছে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অদ্যাপি সম্যকরূপে অবধারিত হয় নাই।

---



# ত্বক ও ঘর্ম্ম নিঃস্রবণ

ত্বক দ্বারা আমাদিগের সমুদায় শরীর আচ্ছাদিত আছে। উহা দ্বারা শরীরের কোমল পদার্থগুলি বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষিত হয়; বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ-সাধ্য জ্ঞান জন্মে; শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, বহিঃস্থ জল, বায়ু প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট এবং শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। নানাকারণে ত্বক্ আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন।

শরীরের অন্তর ও বাহির, উভয় ভাগই ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; কিন্তু উহার যে অংশ দ্বারা শরীরের বহির্ভাগ আচ্ছাদিত, তাহাকে ত্বক্ বা চর্ম্ম বলে; এবং যে ভাগ দ্বারা অন্তর্দ্দেশ আবৃত, তাহা হইতে অনবরত একপ্রকার রস নির্গত হয় বলিয়া, তাহাকে শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ কহে। ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে; কেবল গুণের ও কার্য্যের ভিন্নতা জন্য উভয়ের পৃথক পৃথক নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বয়স, স্ত্রী, পুরুষ ও জাতি ভেদ এবং আকার ভেদে ত্বকের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ত্বকের গঠন প্রণালীঃ—ত্বক্ তিনটী পৃথক পর্দ্দায় রচিত। বহিস্ত্বক্, মধ্যত্বক্ বা প্রকৃত চর্ম্ম ও অধস্ত্বক্।

বহিস্ত্বক্ শ্বেতবর্ণ ও অল্প স্বচ্ছ। উহাতে অনেক-গুলি স্তর আছে। ঐ সকল স্তর ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঐ ত্বকের অন্তর্দ্দেশে নূতন নূতন স্তর জন্মিতে থাকে, এবং বহির্দ্দেশস্থ স্তরগুলি ক্রমেক্রমে উঠিয়া যায়। যখন বহির্দ্দেশ হইতে স্তর উঠিতে না পারে, তখন অন্তর্দ্দেশে নূতন নূতন স্তর জন্মিয়া বহিস্ত্বক্ পুরু হইয়া উঠে। এইরূপে স্তর পুরু হইয়া অঙ্গবিশেষে ঘাঁটা পড়িয়া থাকে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহিস্ত্বকের উপরি হইতে স্তর উঠিয়া উহা পাতলা হইয়া যায়। বহিস্ত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রন্ধ্র ও গহ্বর আছে। উহাতে কোন প্রকার নাড়ী বা স্নায়ু নাই এবং উহা অনুভাবকতা শক্তি বিহীন! শরীরে ফোস্কাজনক মলম দিলে ফোস্কা হইয়া ত্বকের যে ভাগ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহাই বহিস্ত্বক। সর্পাদি সমূহ সময়ে সময়ে বহিস্ত্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা হইতেই শরীরের লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার গহ্বরগুলিতে সর্ব্বদা একপ্রকার রস আছে। তাহারই বর্ণানুসারে শরীরের বিভিন্ন রং হইয়া থাকে। আফ্রিকা বাসী নিগ্রোরা কাল, আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কটা বা তাম্র বর্ণ, চীনেরা পীতবর্ণ, ইংরাজেরা শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ হইবার ইহাই কারণ। এই বর্ণ কোষের স্তরটী যদি তুলিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে সকলের দেহই শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইতে পারে।

ফোস্কার ছাল বা নুনছাল উঠিয়া গেলে তাহাতে হাত দিলে জ্বালা করে। তখন উহাতে কোনরূপ আঘাত লাগিলে রক্তও বাহির হয়। ত্বকের এই সর্ব্ব নিম্ন স্তরটী স্নায়ু এবং রক্তকোষে পরিপূর্ণ; জ্বালা বোধ হওয়া এবং রক্ত বাহির হইবার ইহাই কারণ। ইহাই মধ্যত্বক্। এই ত্বকে চুলের মত সরু সরু অসংখ্য রক্ত কোষ আছে যে দেখিলে মনে হয় যেন শুধু রক্ত কোষ দিয়াই উহা প্রস্তুত হইয়াছে। এই রক্ত কোষগুলির সহিত স্নায়ু সূত্র গুলি (Nerve fibres) গায় গায় ঠেকান ঘন বুনট করা জালের মত। এই জন্য একটুখানি সূঁচ ফুটিলেই কোন না কোন রক্ত কোষে আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইবে এবং কোন না কোন স্নায়ুতে লাগিয়া বেদনা অনুভূত হইবে অধস্ত্বক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরময় ও বসাকীর্ণ। উহাতেও অনেক সূক্ষ্মতর মাংস গ্রন্থি আছে। ঐ সকল গ্রন্থি দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়; এই নিমিত্ত উহারা ঘর্ম্মস্রবণ গ্রন্থি শব্দে নির্দ্দিষ্ট। ঘর্ম্ম স্রবণ প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে এক একটী ঘর্ম্মবহ প্রণালী বাহির হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যত্বক ভেদ করিয়া বহিস্ত্বকের মধ্য দিয়া তাহার বহিঃসীমায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

**চর্ম্মের কার্য্যকারিতা**—উপরিস্থ লিখন অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে, চর্ম্মের ঘনত্ব, ভেদাবরোধকত্ব ও সচ্ছিদ্রতা প্রভৃতি গুণ আছে। তদ্ভিন্ন চর্ম্মের অল্পতাপ পরিচালকতা প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গুণ থাকাতেই উহা শরীর রক্ষোপযোগী হইয়াছে। উহা ঘন, ভেদাবরোধক বলিয়া তদধঃস্থ কোমল পদার্থ গুলি বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষা পায়। বহিস্ত্বক অনুভাবকতা শক্তিবিহীন ও উহাতে কোন প্রকার নাড়ী বা স্নায়ু নাই, অতএব উহা রক্ত ও লসীকাবহ নাড়ী এবং স্নায়ু সম্পন্ন মধ্য ত্বকের উপরিভাগে থাকিয়া ঐ সকল সূক্ষ্ম নাড়ী ও স্নায়ুদিগকে বাহ্য শৈত্য ও উত্তাপ যোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে দেয় না; এবং আমরা সর্ব্বদাই যে সকল নানাবিধ বিষময় পদার্থ স্পর্শ করিতেছি তাহার সংস্পর্শে মধ্যত্বকস্থ রক্ত বহা নাড়ীর রক্ত বিষাক্ত হইতে পারে না। গাত্র স্পৃষ্ট যে সকল বিষ রাসায়নিক কার্য্য বিশেষ দ্বারা শরীরস্থ হয়, তদ্ভিন্ন অপর কোন বিষ গাত্রে লাগিলে বহিস্ত্বকের গুণে আমাদিগের অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে না।

চর্ম্মের তাপ পরিচালকতা শক্তি অল্প হওয়ায় আমাদিগের শরীরে সর্ব্বক্ষণ যে তাপ জন্মিতেছে, তাহা অধিক পরিমাণে শরীর হইতে বহির্গত হইতে পারে না; তাহাতেই শরীরের আবশ্যকীয় উত্তাপ রক্ষা পায়। অচেতন পদার্থ সকল যে স্থানে থাকে, তত্রত্য বায়ুর তাপাংশ অনুসারে তাহারা উত্তপ্ত হয়, কিন্তু জন্তুগণের পক্ষে সে নিয়ম নহে। মনুষ্য শীত-প্রধান দেশেই অবস্থিতি করুন, বা উষ্ণ প্রধান দেশে বাস করুন, স্বাস্থ্যাবস্থায় প্রায় সকলেরই গাত্র তাপ সমান থাকে এবং ঐ উত্তাপ বাহ্য বায়ুর তাপাংশ হইতে অনেক অধিক। শরীর মধ্যে অনুক্ষণ উত্তাপ জন্মিবার বিধান থাকায় ও চর্ম্মের তাপ পরিচালকতা শক্তি অল্প বিধায় আমাদিগের শরীরে ঐরূপ তাপ বিদ্যমান থাকে।

চর্ম্মের সচ্ছিদ্রতাগুণ থাকায় শরীরস্থ দূষিত পদার্থ চর্ম্মপথে বহির্গত হইয়া যায়, এবং বহিঃস্থ জল বায়ু প্রভৃতি শরীরস্থ হইতে পারে। চর্ম্মপথে শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে, তাহা রক্তস্থ দূষিত পদার্থ, এই জন্য কামলা ও পাণ্ডু রোগীদিগের ঘর্ম্ম পীতবর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীদিগের ঘর্ম্ম মূত্রধর্ম্মী এবং বাত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঘর্ম্ম নিঃসরণের উপায় বিধান থাকায় আমাদিগের ভূয়িষ্ঠ উপকার হইয়াছে। কিন্তু শরীর হইতে অধিক পরিমিত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তৎপ্রতিবিধানার্থে উহার সচ্ছিদ্রতা গুণ থাকিলেও চর্ম্মের অপর একটী মহৎ গুণ আছে যাহাতে অধিক পরিমিত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া রক্তের ক্ষয় ও শরীরের বিনাশ করিতে পারে না। শরীর হইতে অনবরতই চর্ম্মগত ছিদ্র দিয়া নষ্ট পদার্থ সকল বহির্গত হইতেছে, কোনক্রমে উহার নিঃসরণ পথ অবরুদ্ধ হইলেই নানা প্রকার পীড়া জন্মে। এই হেতু সর্ব্বদা গাত্র পরিষ্কার ও পরিমার্জ্জনা করা আবশ্যক, এবং দিবসে ২।৩ বার বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। যখন অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তখন সহসা শীতল জলে স্নান বা শীতল জল পান এবং নিতান্ত শীতল স্থানে উপবেশন করা উচিত নহে। তাহাতে সহসা শীত প্রভাবে চর্ম্ম সঙ্কুচিত এবং ঘর্ম্মবহ প্রণালীর স্বেদনিঃসরণ পথ অপ্রসারিত অথবা রুদ্ধ হইয়া যায়। অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় ঘর্ম্মও অসংকোচ্য; সুতরাং ঘর্ম্মবহ প্রণালী গত নিঃসরণোন্মুখ ঘর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে না পারিয়া ঘর্ম্মস্রবণ গ্রন্থিতে উল্টিয়া যায়, এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতেই ঘর্ম্ম নিঃসরণ রুদ্ধ হইলে পীড়া হইয়া থাকে। যেমন চর্ম্ম পথে স্বেদ ও বাষ্পের আকারে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, সেইরূপ শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক দ্বারাও অনেক নষ্ট পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্তু চর্ম্ম অপেক্ষা শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকের স্থূলতা অল্প ও সচ্ছিদ্রতা অধিক, এই হেতু চর্ম্ম অপেক্ষা তৎপথে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।

চর্ম্মের অন্তর্দ্দেশ স্পর্শজ্ঞানজননী স্নায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত আছে।



অতএব, কোন বাহ্য পদার্থ চর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেই আমাদিগের তদ্বিষয়ের স্পর্শ-সাধ্য জ্ঞান জন্মে। কিন্তু স্নায়ুকীর্ণ মধ্যত্বক বহিস্ত্বকে আচ্ছাদিত; বহিস্ত্বক সকল স্থানে সমান পুরু নহে; সুতরাং তাহার স্থূলতা অনুসারে ও বাহ্য পদার্থের স্পর্শ লাগানুসারে স্থান বিশেষে ঐ জ্ঞান অধিক বা অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

অন্ত্র, মূত্রকোষ ও লোমকূপদ্বার দিয়াই আমাদের দেহের সর্ব্বপ্রকার মল নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু এই চারি প্রকার শারীরিক বহির্গমন পথ গুলির মধ্যে লোমকূপ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও একজন সুস্থ ব্যক্তি লোমকূপ দিয়া দৈনিক প্রায় ১৮ আউন্স পরিমাণ জল, ৩০০ শত গ্রেণ কঠিন পদার্থ এবং ৪০০ শত গ্রেণ অম্লজারক বায়ু নির্গত হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম দ্বারা এইরূপে শরীরের ক্লেদ সর্ব্বদাই নিঃসরণ হইতেছে কিন্তু তাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই না কারণ উহা দেহ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র অদৃশ্য হয়। অপেক্ষাকৃত তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উহারা ঘর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দর্শন যোগ্য অবস্থাতেই হউক কিম্বা অদৃশ্য অবস্থাতেই হউক আমরা দৈনিক যে পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকি প্রায় সেই পরিমাণ ঘর্ম্ম দৈনিক আমাদের দেহ হইতে লোমকূপ দিয়া নির্গত হয়।

আমরা অবগত আছি যে ঘর্ম্মে, জল, অঙ্গারাম্লজান এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ আমাদের রক্তের যাহা জলীয় অংশ তাহা বর্ত্তমান থাকে। রক্ত হইতে ঐ জলীয় পদার্থ স্বেদগ্রন্থি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘর্ম্ম প্রণালী দ্বারা চর্ম্মের উপরিভাগে আনীত হয় এবং তথা হইতে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। শারীরিক অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের সহিত তুলনা করিলে ঘর্ম্মনিঃসরণ ক্রিয়া অতি সরল বলিয়া মনে হয়।

দেখিয়া মনে হয় যে লোমকূপ দেহের সর্ব্বস্থানে সমভাবেই আছে কিন্তু করতলস্থ লোমকূপের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ও আকারে বৃহত্তর এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ২৫২৮ হইতে ২৭৩৬ বলিয়া অনুমান করা যায়। সাধারণতঃ আমাদের হস্তের উপরিভাগে আন্দাজ ১৫০০, পদতলে, ২০০০, পদের উপরিভাগে ৯২৪, কপালে ১২৫৮, গণ্ডদেশে ৫৪৮ সংখ্যা লোমকূপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বর্ত্তমান। যখন আমরা আমাদের করতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন আমাদের মনে হয় না যে ঐ স্থানের প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে লোমকূপের সংখ্যা ২৫২৮ হইতে ২৭৩৬ হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের প্রত্যেকের দেহে আন্দাজ ২,৪০০,০০০ সংখ্যা লোমকূপ আছে, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না যে অধিকাংশ ব্যক্তির দেহ হইতে দৈনিক, ১৬ পাউণ্ড ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং এক বৎসরে আন্দাজ ৬২৫ পাউণ্ড ঘর্ম্ম নির্গত হয়। আমাদের শারীরিক বহির্গমন পথ গুলির সুস্থতা এবং নিয়মিত কার্য্যকারিতার উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে এবং ঘর্ম্মনিঃসরণ ক্রিয়া আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে যে একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহা নিঃসন্দেহ।

# আয়ুর্ব্বেদই ভবিষ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদর্শ পথ প্রদর্শক

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

লেখক—কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম্, এস্

সত্তর বৎসর ন্যূনাধিক পূর্ব্বে প্রতীচ্য চিকিৎসা আমাদের শরীরের রূপ, লাবণ্য, বল, উৎসাহ যৌবনের কৃতিত্ব—এক কথায় যে ওজঃ ধাতুর উপচয় ও উৎকর্ষের জন্য—যে Internal Secretion এর মুখাপেক্ষা করে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন সিকেরোউ প্রথম, অণ্ডকোষ এর এই Internal Secretion, পুং জাতির রূপ লাবণ্যাদির মূলে অবস্থিত বলিয়া প্রচার করেন কিন্তু সে কথাও তখন কেহ কর্ণপাত করেন নাই। Nerve স্রোত, নিয়ামক শক্তিরূপে দেহতন্ত্র যন্ত্রধর—এবং ইহার একটী স্বতন্ত্র প্রবাহ Cerebro spinal system রূপে জীবদেহে বিদ্যমান, লোকে এই কথা বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা পরায়ণ—তাহা ছাড়া আর একটী স্রোত—বা প্রবাহ যাহার সাহায্যে আহার্য্য বস্তুর বিবিধ ধাতুরূপে একদিকে পরিণতি এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে বিনাশ বা ক্ষয় সংসাধিত হইতেছে (শৃ শীর্ণ হওয়া) যাহাকে ইংরাজীতে Anabolic এবং Katabolic processes of Metabolism বলে, এই দুইটী প্রবাহ ভিন্ন, তৃতীয় প্রবাহের অস্তিত্ব কাহারও মনে প্রতিফলিত হয় নাই। এপ্লম, এ প্রবাহের অত্যদ্ভুত ক্রিয়া আর কাহারও অপরিচিত নহে—এখন সকলেই জানিতে পারিয়াছেন *Thyroid gland* প্রভৃতির মার্গনিরুদ্ধ Ductless gland সকলের আভ্যন্তরিক রসের শক্তি কত? এবং জড় গদগদ, মিন্‌মিনে পুরুষত্ব হীন, যৌবনে জরাতুর—এ সকল বিকৃতির স্থল কোথায়? এখন যদি ধরিয়া লইতে আর আপত্তি না থাকে, যে এই Internal Secretionই, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ যাহাকে শরীরের বল তেজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাই সার—ওজ ইহাই রূপ লাবণ্য যৌবন বুদ্ধ্যাদি বৃত্তি নিচয়ের প্রখরতার মূলে অবস্থিত—মহর্ষি আত্রেয় যাহাকে শ্লেষ্মারূপ ধারি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলে এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছেন, যিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রবাহের পার্শ্বে আর একটী শক্তির প্রবাহ দেখিয়াও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না।

জীবদেহে—তিনটী শক্তি বা শক্তি প্রবাহ—ক্রীড়া বা ক্রিয়া করিতেছে। তাহার একটির নাম পূর্ব্বে বলিয়াছি। Correlative functions—দ্বিতীয়টি Sustentative functions যাহাতে শরীরের শ্রী অহরহ শীর্ণ হইয়াও, পরক্ষণে আহার্য্য গুণে আপ্যায়িত হইয়া পুনরায় সংহত হইয়া পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপ হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় ও আপূরণ লইয়াই সমস্ত জীবদেহ নহে—দেহের উৎসাহ বল, বীরত্ব যৌবনের ঊষা সৌকুমার্য্য—তাহা যে প্রবাহে জীবলোককে মনুষ্যত্বের অধিকারী করিতেছে তাহার প্রবাহ স্বতন্ত্র।—Internal Secretion এ দেহে—তৃতীয় প্রবাহ রূপে স্বতন্ত্র অবস্থিত—আয়ুর্ব্বেদই তার নামকরণ করিয়াছিল—ওজঃ প্রবাহ শ্লেষ্মরূপী আয়ুর্ব্বেদের বাঁতের ক্রিয়া Correlative function পিত্তের ক্রিয়া তাপের উৎপাদন পচন দহন, পরিপাক বা পরিপাক পিত্ত হইতে Sustentative functions আর সেই তৃতীয় প্রবাহ, প্রতীচ্য বিজ্ঞান ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র সংবাদও প্রাপ্ত হয়েন নাই সেই তৃতীয় প্রবাহ! এমন ধৃষ্টতা যদি কাহারও থাকে তিনি বলুন এই ওজ প্রবাহ ধাতুর সাররূপে অবস্থিত এই শ্লেষ্মা প্রবাহ, ইহা হিপোক্রেটিসের ভুল Humours এর মত Quackery অবৈজ্ঞানিক। প্রতীচ্য বিজ্ঞান যে তত্ত্ব, অতি অল্পদিন হইল আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়া চিকিৎসা মঞ্চ পরিশোভিত করিয়া বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব জয় নিনাদ উত্থাপিত করিয়াছেন,—সে তত্ত্ব স্ববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের আবিষ্কৃত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষির ধ্যান নেত্রে এ তত্ত্ব শর্ম্ম বাহী ত্রিধাতু বলিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল কোহিনুর থাকিলে কি হয়, ভারতের দুরদৃষ্ট! দেখিবার লোকের অসদভাব না থাকিলেও শ্রদ্ধার অভাবে বা ধাতুর গতি স্বরূপতা, তপ ধাতুর পিত্ত স্বরূপতা এবং শ্লিষ্ম ধাতুর আলিঙ্গনার্থ অগ্নি সাদনতা অর্থাৎ এক কথায় Combustion এবং Oxidation নিয়মন শক্তি "ওষহা আপ্যস্তন বহুলতা" যাহা মাইকেল ফষ্টার moisture বলিয়া বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, একদিন একদণ্ডেই শুষ্ক ইন্ধনের মত এই দেহ দগ্ধ ভস্মীভূত হইয়া যাইত যদি ইহাতে প্রভূত আপ্য ধাতু না থাকিত, থাকিয়া থাকিয়া নিরন্তর দহ্যমান হইয়াও যে আপ্যধাতু মাতৃ স্নেহের আলিঙ্গনের মত এই অগ্নি কার্য্য হইতে শরীর ধাতুকে রক্ষা করিতেছে কেবল তাহাই নহে, অমৃত স্বরূপ শ্লেষ্মা-কার্য্য ওজো প্রবাহ আদানে, স্তন্য ধারার মত শিশুকে বল বর্ণ বীরত্ব উৎসাহে সুসজ্জিত করিতেছেন। শ্রদ্ধার অভাবে air bile phlegm বলিয়া তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে Quackery বলিয়া পদানত করিয়াছে। স্বদেশ বাসী ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত প্রথম এই অমঙ্গলের ভেরী ঘাড়ে করিয়া দেশ বিদেশে জানাইয়া দেন আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু ইহার Therapeutic এবং Pathology কিম্বা যাহা কিছু সমস্ত erroneous ভ্রান্তি উপন্যাস রূপ কথা। তার পর এ ধূয়ায় প্রতীচ্য বিজ্ঞান নৃত্য করিতে করিতে দেশকে যতদূর সম্ভব ভ্রান্তিত করিয়া এখন বলিতেছেন, যাহাতে এই ভ্রান্তিপূর্ণ চিকিৎসার মূলোচ্ছেদ ঘটে, প্রজার কেন গভর্ণমেণ্টেরও সে বিষয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া প্রতীচ্য বিজ্ঞান আজ ধন্য আয়ুর্ব্বেদের পুণ্য ক্রোড়ে সেই তত্ত্ব আবহমান কাল নিদ্রিত শিশুর মত অবস্থিত স্বচক্ষে দেখিয়াও এমন কে আছেন যে এখন বলিবেন, আয়ুর্ব্বেদ Quackery আয়ুর্ব্বেদের Therapeutics এবং Pathology erroneous ভাই বৈজ্ঞানিকগণ পরের মুখে ঝাল আর খাইও না নিজে দেখ তোমাদের মাতৃ ভাণ্ডারে কোথায় কোন মহাত্মা লুকাইয়া আছে। Sir Nilratan বলিয়াছেন Chair of Indian Therapeutics যত শীঘ্র সংস্থাপিত হয় দেশের তাই মঙ্গল। তাঁহার এ কথার উদ্দেশ্য কি তাঁহার কনফারেন্স বক্তৃতা হইতে তাহা ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায় না যদি প্রকৃত কল্যাণার্থ দেশের মুখের দিকে চাহিয়াই এ কথা তিনি বলিয়া থাকেন, লক্ষ লক্ষ টাকায় বিদেশী বিষের (Alkaloids) এর ও পথ্য ও ঔষধের পরিবর্ত্তে ভারতের ভৈষজ্য প্রচার ও সংস্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত সমকণ্ঠ হইয়া বলি আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই এক দিনও দেরী করিও না।

University তে এত চেয়ার নিত্য নূতন আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে প্রতিভার জীবিত জলন্ত মূর্ত্তি রাশি জষ্টিস মুখার্জ্জিকে ধরিয়া এ কাজ করিতে কতক্ষণ? ভারতে প্রকৃত মঙ্গল এখানে।

আমাদের ত্রিধাতু ভবিষ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদর্শ ইহা প্রমাণ করিতে বুক ঠুকিয়া কেহ দাঁড়াইতে সাহস না করেন আমি এই ভগ্ন শরীরে তাহার জন্য প্রস্তুত, আসুন ভাই স্বদেশ হিতৈষীগণ আমি যে ত্রিধাতু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ধন্য মনে করিতেছি আপনাদের সহায়তায় তাহা সর্ব্বজন পরিগৃহীত হইয়া ভারতের কেন জগতের মুখ সমুজ্জ্বল করুক। Internal Secretion ও ওজ এবং শ্লেষ্মা যে এক তাহা পক্ষান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

# মানবদেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

### কণ্ঠধ্বনি।

মানবের কণ্ঠ-মঞ্জুষাই তাহার কণ্ঠধ্বনির উৎপত্তি স্থান। মানবের কণ্ঠমঞ্জুষাটি খুব ছোট, কিন্তু অভ্যাস যোগের দ্বারা সেই ক্ষুদ্র মঞ্জুষা হইতে অতি মধুর স্বরসপ্তক বাহির করিতে পারা যায়। কণ্ঠ-মঞ্জুষা বা কণ্ঠকক্ষ শ্বাসপ্রশ্বাসবাহী পথের উর্দ্ধমুখের প্রসাধিত অংশ ব্যতীত কিছুই নহে। পাঠক এখন শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত অধ্যায়টি পুনর্ব্বার পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন শ্বাস-প্রশ্বাস নালীর উপাস্থিময় প্রথম দুইটি অঙ্গুরীয়কের সঙ্গেই প্রকৃতপ্রস্তাবে কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধ। কেননা ঐ দুইটি অঙ্গুরীয়কের দ্বারা কণ্ঠ-মঞ্জুষা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুইটি উপাস্থির মধ্যে প্রথমটির নাম – Thyroid Cartilage—থাইরয়েড উপাস্থি। মানুষের কণ্ঠের যে জায়গাটায় "কণ্ঠা" উঠিয়া থাকে একটু লক্ষ্য করিলে সেখানেই "থাইরয়েড" উপাস্থির দর্শন মিলিবে। ঠিক ইহার উপর বাঁকনলের অগ্রভাগের মত বাঁকা একখানি উপাস্থি আছে। ইহার নাম "হাইঅইড" অস্থি।

কণ্ঠের দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটি "ক্রিকয়েড" উপাস্থি। এই অঙ্গুরীটী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন। অন্ননালীর মধ্যে যখন অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়, তখন এই উপাস্থিখানি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একটুও সরিয়া যায় না। ক্রিকয়েড উপাস্থির পিঠের উপর আরও দুইখানি উপাস্থি ভর দিয়া রহিয়াছে, ইহাদিগের আকার পিরামিডের মত, ইহাদিগের নাম এরিটিনয়েড উপাস্থি। এই উপাস্থি দুইখানি ক্রিকয়েড অস্থির পিঠের উপর থাকিয়া তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সুস্পষ্ট সন্ধি উৎপাদন করিয়াছে। এরিটিনয়েড উপাস্থির সহিত ক্রিকয়েড উপাস্থির বন্ধুত্বটা খুব প্রবল, সঞ্চালনকালে উভয়েই পরস্পরের অনুসরণ করিয়া থাকে। এরিটিনয়েড উপাস্থি ক্রিকয়েড উপাস্থির পিঠে থাকিলে ঘুরিতে ফিরিতে ও মোচড় খাইতে পারে।

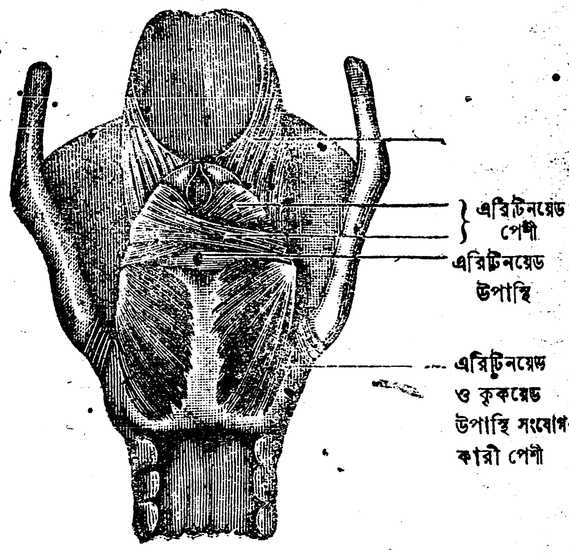




চিত্র ৬৮—কণ্ঠ কক্ষের পশ্চাৎ ভাগ।

এরিটিনয়েড উপাস্থি ক্রিকয়েড উপাস্থির নিতান্ত 'হাতধরা' ও অনুগত হইলেও থাইরয়েড উপাস্থির সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই এরূপ মনে করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। কারণ ঐ অস্থি দুইখানি, নমনশীল-তন্তু-নির্ম্মিত বন্ধনী ( bands ) দ্বারা থাইরয়েড উপাস্থির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। এই বন্ধনী দুইটির নাম—( The Vocal Cords )—কণ্ঠ-তন্তুমালা।

পাঠক, ৬৮ সংখ্যক চিত্র দর্শনে বুঝিতে পারিবেন যে কণ্ঠকক্ষের অধিকাংশ পেশীই এরিটিনয়েড উপাস্থি



দুইটির সহিত সংযুক্ত। কণ্ঠতন্তুমালাকে শিথিল করা, প্রসারিত করা এবং নিকট ও দূরবর্ত্তী তন্তুগুলিকে প্রয়োজনানুসারে সঞ্চালিত করাই—ইহাদিগের কাজ। কণ্ঠতন্তুগুলি যখন ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকে তখন যে বায়ু তাহাদিগের মধ্যস্থ অবকাশের ভিতর দিয়া বহিয়া যায়, তখন ঐ বায়ুর স্পর্শে কণ্ঠতন্তু কম্পিত হইতে থাকে। এই কম্পন ও স্পন্দনের ফলে একরূপ ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং আমরা কথা কহি। যখন কণ্ঠতন্তুগুলি পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় তখন কোন শব্দই হয় না, তবে আমরা শ্বাসযন্ত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করিতে পারি। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস কালে কণ্ঠ-তন্তুমালা মধ্যস্থ অবকাশের ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করে। ঐ সময় আমাদিগের কথা কহিবার ইচ্ছা হইলে আমরা কণ্ঠ তন্তু পরিচালক ক্ষুদ্র পেশী গুলিকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়া কণ্ঠতন্তুগুলিকে এমন প্রসারিত করি যে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ শব্দ উত্থিত হইতে থাকে।

কোন বস্তুর সংস্পর্শ বা বাধা হেতু বায়ুর গতি ব্যাহত হইলেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বায়ু প্রবাহ কোনরূপ বাধা না পাইলে কোন শব্দই উত্থিত হয় না। যাঁহারা মরুদেশে বিচরণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিশাল মরুভূমি মধ্যে কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় না। মরুভূমির দিকে নেত্রপাত করিলে দেখা যায় দিগন্তব্যাপী বিশাল মরুভূমি দীপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলসিতেছে,—তাহার বিশাল বালুকাবিস্তার মধ্যে কোথাও একটি তরু, বা কোথাও একটি গুল্মের চিহ্নমাত্র নাই। এই দিগন্তপ্রসারী মরুতে কি বায়ু বহে না? সমস্ত দিনই শুষ্ক উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে, তথাপি সেই মরুপ্রান্তর এক অতি মহা নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন। বায়ু সেই প্রকাণ্ড মরুপ্রান্তরের উপর দিয়া বাহিরে যাইবার সময় কোন বাধা পায় না বলিয়া সেখানে কোন শব্দ হয় না।

বায়ুপ্রবাহে পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বাধা দিয়া পৃথক পৃথক সুর উৎপাদন করিতে পারা যায়। এই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণে বায়ুচালিত বাদ্য যন্ত্র সমূহ নির্ম্মাণ করা হয়। মানুষের স্বর-যন্ত্রে, বায়ু-প্রবাহে বাধাদান কার্য্যটি পেশী সমূহের দ্বারা নিয়মিত হয়। কথা কহিবার প্রয়োজন হইলে কতকগুলি অধীন পেশীকে হুকুম করি, কণ্ঠতন্তুগুলি প্রসারিত কর। কণ্ঠতন্তুগুলি সটান্ হইবামাত্র বায়ু তাহাতে প্রহত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তন্তুগুলি স্পন্দিত হইতে থাকে এবং সুরের বা স্বরের স্ফূর্ত্তি হয়। তন্তুযন্ত্রের শব্দোৎপত্তির নিয়মানুসারে মানুষের কণ্ঠতন্তুজাত শব্দের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। তন্তু-গুলি যত প্রসারিত হয় – যত জোরে টানিয়া রাখা হয় স্বর বা শব্দ তত সুস্পষ্ট ও উচ্চ হইয়া থাকে। আমরা যে সময় মৌন বা নীরব থাকি সে সময় আমাদিগের কণ্ঠ-তন্তুমালাও শিথিল থাকে, বায়ুপ্রবাহও অবাধে তাহা-দিগের ভিতর দিয়া যাতায়াত করে সুতরাং কোন শব্দই উত্থিত হয় না। নিম্নে যে তিনটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কণ্ঠতন্তুমালার বিভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে। A চিহ্নিত প্রথম চিত্রে, উচ্চৈঃস্বরে গানকারীর কণ্ঠকক্ষের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোক ও দর্পণের নিপুণ সন্নিবেশের দ্বারা বৈজ্ঞানিক এই চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন—তিনটি




চিত্র ৬৯—কণ্ঠ তন্তুমালার বিভিন্ন অবস্থা।

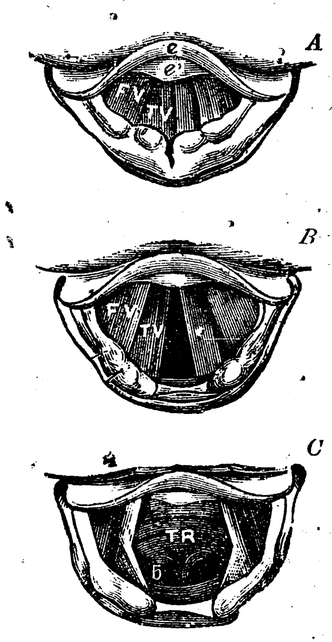

চিত্রেই কণ্ঠতন্তুর আয়তন প্রায় এক, কিন্তু তাহাদিগের প্রান্তদেশগুলি খুব তীক্ষ্ণ এবং সংপ্রসারিত। B চিহ্নিত দ্বিতীয় চিত্রে দ্রুত শ্বাসগ্রহণ কালে কণ্ঠতন্তুমালার অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে; C চিহ্নিত তৃতীয় চিত্রে গাঢ় শ্বাস-গ্রহণকালে বা খাদে গান করিবার সময় কণ্ঠতন্তুমালার অবস্থা দেখান হইয়াছে।

স্বর সঞ্চারের পদ্ধতিটা আমরা মোটামুটি বলিলাম। এখন কাহার আদেশে কণ্ঠদেশের পেশীসমূহ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদন পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর স্ফূরণ ও মূর্চ্ছনাদির সমাবেশ করে, ইহা একটা ভাবিবার ও বুঝিবার কথা। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের শক্তিই নিয়ন্ত্রী, তাহারই নিয়মনে মানব কণ্ঠে হৃদয়মনো-মোহিনী সুমধুর গীতি উত্থিত হয়। আমরা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বর্ণনাকালে বলিয়াছি, ব্রোকা নামক বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের পুরোভাগের বামদিকে নিম্নদেশে বাক্‌শক্তির কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পুরাতন সিদ্ধান্তে এখন অনেকের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা নাই। ইদানীং মার্সে প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বাক্‌শক্তির কেন্দ্র বা ক্ষেত্র ঐরূপ একটা ক্ষুদ্রস্থানে সীমাবদ্ধ নহে, কারণ তাঁহারা এমন অনেক রোগী দেখিয়াছেন, যাহাদিগের ব্রোকা-কথিত বাক্য-কেন্দ্র আহত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বাক্‌শক্তি হীন হয় নাই।

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

### স্পর্শ।

ত্বগিন্দ্রের বা চর্ম্মের দ্বারা স্পর্শানুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু ত্বক্ যে কেবল অঙ্গুলির স্পর্শ, কণ্টকবেধের স্পর্শ অনুভব করে, তাহা নহে। ত্বকের দ্বারা শীতাতপ, ভাব, প্রভৃতির বোধ হয়। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে অনুভব শক্তি কেবল স্পর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ত্বাচ্ অনুভূতি নামে ( Cutaneous Sensations ) কতক-গুলি অনুভূতি ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। চর্ম্মমধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট যন্ত্র সন্নিবেশিত আছে, ইহারা মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অনুভবগম্য বিষয়ের মাঝখানে থাকিয়া অনুভূতি কার্য্যে সহায়তা করে।

মানবচর্ম্মের বিশ্লিষ্ট অংশের বাহিরের চর্ম্মের নীচে আর এক স্তর চর্ম্ম আছে। ইহাই প্রকৃত চর্ম্ম। এই অন্তস্ত্বক্ ভাঁজে ভাঁজে খাঁজে খাঁজে সজ্জিত এবং দেখিতে তরঙ্গীয়া। অন্তস্ত্বকের তরঙ্গগুলিকে papilæ বা চর্ম্মের 'চড়াই' বলে। জিহ্বার 'চড়াই' গুলির মত চর্ম্মের চড়াইগুলির মধ্যে শাখা-জাল-জটিল স্নায়ু তন্তু সকল নিহিত আছে। কিন্তু অন্তস্ত্বকের চড়াইগুলির মধ্যস্থ স্নায়ু তন্তুগুলির বিশিষ্টতা এই যে, উহারা চড়াইগুলির মধ্যে অণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে, জিহ্বার চড়াইয়ের তন্তুগুলির মত উহারা চড়াইয়ের বস্তুমধ্যে প্রবেশ করিয়াই পরিসমাপ্ত হয় নাই। অন্তস্ত্বকের চড়াইগুলির এই ডিম্বাকার স্নায়ুতন্তুকে—"Feeling Cells—অনুভব-কোষ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

এই অনুভব-কোষ আবার নানা শ্রেণীভুক্ত। পেসিনি নামক একজন পণ্ডিত এই শ্রেণীর অনুভব-কোষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ও বর্ণন করিয়াছিলেন বলিয়া এ গুলিকে পেসিনীর কোষ নামে অভিহিত করা হয়। পরপৃষ্ঠায় কোণাকার বা মোচার নিম্নভাগের ন্যায় আকার বিশিষ্ট চর্ম্মের চড়াইগুলির চিত্র দেওয়া হইল। এই চর্ম্মপ্রান্তলগ্ন যন্ত্রগুলিকে Tactile Corpuscles—স্পর্শকণিকা বলে। এই স্পর্শ কণিকা-গুলি চর্ম্মমধ্যে কিঞ্চিৎ, দূরে দূরে সজ্জিত। কিন্তু কণিকাগুলির মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সামঞ্জস্য নাই। জিহ্বাগ্রে স্পর্শ কণিকাগুলির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সন্নিহিত স্পর্শকণিকা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান এক ইঞ্চির (১/২৪) চব্বিশভাগের একভাগ। অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগে



বিন্যস্ত স্পর্শ কণিকাসমূহের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের পরিমাণ ১/৮ ইঞ্চ; পুরোবাহুস্থিত স্পর্শকণিকা গুলির মধ্যস্থ

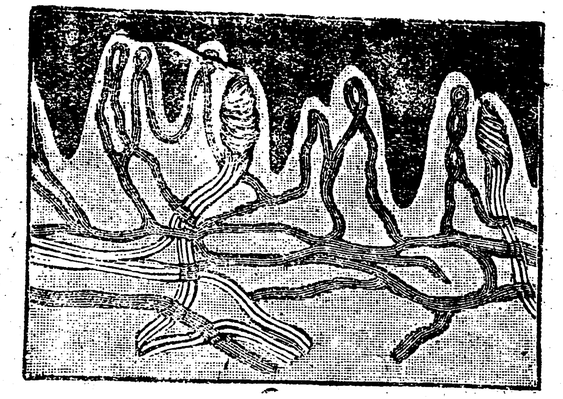

চিত্র ৭০—চর্ম্মে অনুভব-কোষ।

ব্যবধান অর্দ্ধ ইঞ্চ; কিন্তু পদের স্পর্শ-কণিকাগুলি ২॥০ ইঞ্চি অন্তরে অন্তরে সন্নিবেশিত। প্রত্যেক স্পর্শ-কণিকা বা স্পর্শ-বিম্ব কেবল একটি বিন্দু হইতেই স্পর্শানুভূতি বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। যদি কেহ চর্ম্মে দুইটি স্পর্শ-কণিকার অনুভব করিতে চাহেন তাহা হইলে দুইটি স্পর্শ-কণিকাকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। এখন যদি কেহ কম্পাসের দুইটী ভুজের অগ্রভাগ দুইটি এক ইঞ্চি ব্যবধানে দক্ষিণ বাহুর চর্ম্মের উপর স্থাপন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে তিনি দুইটী স্বতন্ত্র স্থানে কম্পাসের স্পর্শ অনুভব করিবেন না। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি চর্ম্মের অঙ্গুলির অগ্রভাগে দুইটি স্বতন্ত্র বিন্দুর অস্তিত্ব অনুভব করেন তাহা হইলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে কম্পাসের প্রান্ত দুইটি স্থাপন করিলেও দুইটি স্পর্শ-বিন্দুর অনুভূতির ব্যতিক্রম ঘটিবে না। যুগল স্পর্শ-কণিকার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের কথা ধরিলে; জিহ্বাগ্রের বিচারণা ও নির্দ্দেশ-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। জিহ্বাগ্রের অনুভূতি ও বিচারণা এত সূক্ষ্ম যে, কম্পাসের ভুজ দুইটির দুইটি প্রান্ত, ক্রমান্বয়ে কপোল হইতে ওষ্ঠাধরে এবং ওষ্ঠাধর হইতে জিহ্বায় সরাইয়া আনিলে স্পর্শ-বিন্দু দুইটির মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং জিহ্বার দ্বারা আমরা যখন দন্তের কোন ছিদ্রের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করি, তখন আমাদিগের ধারণা ঠিক সত্যানুগামিনী হয়, কারণ জিহ্বার তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি তিলকে তাল করিয়া তোলে।

কপোল ও কফোলিতে তাপের অনুভূতি যেমন প্রবলভাবে হয়, এমন আর কোন স্থানেই নহে কারণ ঐ দুইটি স্থানে তাপানুভূতির উপযোগী স্পর্শ-কণিকার সংখ্যা খুব বেশী। এইজন্য রজক ও রজকিনীরা "ইস্ত্রি"র তাপের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য উত্তপ্ত 'ইস্ত্রি'কে কপোলের কাছে ধরিয়া তাপ পরীক্ষা করে।

চক্ষুর মণি বা তারকার যন্ত্রণার অনুভূতি বড় প্রবল। চক্ষে একটি ধূলিকণা পড়িলে কিরূপ যন্ত্রণা হয় তাহা সকলেই জানেন, বিশেষতঃ যাঁহারা সহরের পথে উদ্দাম বায়ু তাড়িত ধূলিকণার দ্বারা রুদ্ধশ্বাস এবং ক্ষণকালের জন্য অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহারা এ তথ্যটি বেশ বুঝিয়াছেন।

চর্ম্মে অনুভূতির তীব্রতা অভ্যাসের ফল। দৃষ্টি-শক্তিহীন ব্যক্তিরা হস্তদ্বারা ক্ষোদিত অক্ষর স্পর্শ করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস করেন। ইহাদিগের স্পর্শানুভূতি সাধারণ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে তীক্ষ্ণ। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি হস্তদ্বারা ক্ষোদিত ও উচ্চ অক্ষর স্পর্শ করে, তাহা হইলে পাঠ করা ত দূরের কথা একটি অক্ষর পর্য্যন্ত চিনিতে পারিবে না কিন্তু অন্ধদিগের অভ্যাসযোগের শক্তি এরূপ অদ্ভুত যে তাহারা ক্ষোদিত অক্ষর শ্রেণী স্পর্শ করিয়া অনায়াসে লিখিত বিষয়ের আবৃত্তি করিয়া যাইবে।

### কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়।

কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে কর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহার সহিত শব্দানুভূতির সংস্রব বড় অল্প। যে কর্ণের মর্দ্দনে স্থানভেদে রসভেদ হইয়া থাকে, উহা উপাস্থি-নির্ম্মিত এবং মনুষ্য মুখের শোভার্থ

শ্রবণেন্দ্রিয়ের মুখের নিকট স্থাপিত। ইংরাজি ভাষায় ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ( Pinna )—পিন্না।

শারীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা :—

বহিঃ কর্ণ।
মধ্য কর্ণ।
আভ্যন্তর কর্ণ বা অন্তঃকর্ণ।

দৃশ্যমান্ কর্ণ এবং কর্ণকুহরগামী নালী বহিঃকর্ণ নামে পরিচিত। এই বহিরঙ্গ-কর্ণ পত্রের ন্যায় প্রসারিত; ইহার দ্বারা শব্দ-সংগ্রহে কিঞ্চিৎ সহায়তা লাভ করা যায়। এই কাণ মানুষের বড় কাজে লাগে না। কিন্তু অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা এই বহিরঙ্গ কর্ণ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়, কারণ যে দিক হইতে শব্দ-তরঙ্গ আসিতে থাকে সেই দিকে কাণ 'খাড়া' করিয়া উহারা অনেক পরিমাণে শব্দ সংগ্রহ করিতে পারে।

বহিরঙ্গ কর্ণ হইতে যে নালী মস্তকের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে তাহাকে শ্রুতি-নালী ( Hearing Canal ) বলে। ইহার দৈর্ঘ্য ১·০ ইঞ্চি। এই শ্রুতিনালীর ভিতর কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়। কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে কর্ণমধ্যস্থ চট্‌চটে কর্ণমল অঙ্গুলিতে লাগিয়া যায়। শ্রুতিনালীর মুখ কতকগুলি লোম দ্বারা সুরক্ষিত। শ্রুতিনালীর নিম্নভাগে কতকগুলি গ্রন্থি আছে, সেই গ্রন্থিসমূহ হইতে যে ক্লেদ নির্গত হয় তাহাই কর্ণমল। এই কর্ণমল দ্বারাও শ্রুতিনালীর নিম্নভাগ রক্ষিত হইয়া থাকে।

এইবার শ্রুতি তত্ত্বের আলোচনা করিব। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ তত্ত্বের অবতারণা অপরিহার্য্য যেমন স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ মাত্র তরঙ্গ উঠে, তেমনই মানুষ শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র, বায়ুতে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ বহুদূর পর্য্যন্ত বহিয়া যায়। যাঁহারা বাল্যকালে জলে খাপরা ফেলিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তাহারা বায়ুমধ্যে উৎপন্ন তরঙ্গের সম্প্রাসরণ ও গতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, মানুষ কথা কহিলেই বায়ুতে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ শব্দ-তরঙ্গ। শব্দতরঙ্গগুলা শ্রুতিপথ বা নালীর ভিতর দিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং কর্ণমল অতিক্রম করিয়া শ্রুতি নালী সুদূর প্রান্তস্থ চিক্কণ চর্ম্মময় প্রাচীরে আঘাত করে। এই চিক্কণ-চর্ম্মময় প্রাচীরের নাম কর্ণপটহ (Ear drum, Tympanic membrane).

এই কর্ণপটহ মধ্যকর্ণ ও বহিঃকর্ণের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর বা যবনিকা। কর্ণপটহে শব্দ তরঙ্গ সমূহের অভিঘাত মাত্রে, উহাতেও ঐরূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ঐ স্পন্দন সমূহ আবার মধ্য কর্ণের কতকগুলি যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে সুদূরবর্ত্তী অন্তকর্ণে প্রেরিত বা নীত হয়।

মধ্যকর্ণ একটি অতি ক্ষুদ্র কোটর মাত্র, উহা ললাট-প্রান্তিক অস্থি (Temporal bone) মধ্যে নিহিত। মধ্যকর্ণের সহিত কণ্ঠ কক্ষের যোগ আছে। শ্রুতি নালিকা (Eustachian tube) মধ্যকর্ণ ও কণ্ঠকক্ষের মধ্যে সংযোগ পথরূপে রহিয়াছে। এই উপায়ে মধ্যকর্ণের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ বায়ু মণ্ডলের (Atmosphere) সমান রাখা হয়। কর্ণপটহের ভিতরের ও বাহিরের দিকে বায়ুর চাপের এইরূপ সমতা থাকাতে উহার স্পন্দন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যদি কেহ ব্যোমযান যোগে অকস্মাৎ ঊর্দ্ধে উঠে তাহার শ্রবণ শক্তি কতকটা হ্রাস পায়। মধ্যকর্ণের বাহিরের বায়ুর চাপ সহসা কমিয়া যাওয়াতে অথচ উহার ভিতরে বায়ুর চাপ পূর্ব্ববৎ থাকাতে ঐরূপ ঘটনা ঘটে। ঐ অবস্থায় মুখ ব্যাদান করিয়া কোন বস্তু গলাধঃকরণ করার ন্যায় ভঙ্গী করিতে হয় ইহাতে মধ্যকর্ণ ও কণ্ঠ কক্ষের সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সাময়িক শ্রুতিশক্তি হানির প্রতীকার হইয়া থাকে। মধ্যকর্ণে স্ফোটক হইলে শ্রুতি শক্তি হ্রাস পায়। কর্ণ স্ফোটকের ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

কর্ণের যে তিনটি উপাঙ্গ (Structures) মধ্যে কর্ণের ভিতর দিয়া স্পন্দন সমূহ প্রেরণ করে, তাহা তিন খানি অস্থি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহাদিগের নাম যথাঃ—

(১) হস্তক্ষেপণী (Hammer)
(২) ঘাতগ্রহণী (Anvil)
(৩) আরোহণী (Stirrup)



মধ্যকর্ণের 'হস্তক্ষেপণী' বা হাতুড়ি কর্ণপটহে লাগিয়া উহাকে খুব চাপিয়া রহিয়াছে। কর্ণপটহ কাঁপিয়া উঠিবা মাত্র হাতুড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠে। ঘাত গ্রহণীর সহিত হস্ত ক্ষেপণীর সংযোগ আছে, এই সংযোগের ফলে হস্তক্ষেপণীর স্পন্দনগুলি ঘাতগ্রহণীর ভিতর দিয়া পরবর্ত্তী অস্থি, আরোহিণী বা রেকাবে সংক্রামিত হয়। স্পন্দন গুলি কর্ণাস্থি তিন খানির ভিতর দিয়া পরিচালিত বা নীত হওয়াতে উহারা আরও সুস্পষ্ট ও প্রবল হইয়া "অন্তঃকর্ণে" গিয়া পৌছায়।

এই অন্তঃকর্ণটি তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা শঙ্খাবর্ত্ত কর্ণ, ( Ear-shell ), তোরণাকৃতি প্রণালী—( The Semicircular Canals ) সমূহ এবং আগম-গৃহ ( Vestibule )। অন্তঃকর্ণ বা অভ্যন্তরীণ কর্ণের এই তিনটি অংশের উপাদান অস্থিময়, কাণের এই তিনটি অংশ মিশিয়া অস্থিময় কর্ণচক্র—(Osseous Labyrinth ) গঠন করিয়াছে। এই কর্ণচক্রের মধ্যে আকার-প্রকারে ঠিক তাহার অনুরূপ একটি থলিয়া আছে; এই থলিয়াটি সূক্ষ্ম ঝিল্লিময়। ইহার নাম ঝিল্লীময় কর্ণচক্র ( Membranous Labyrinth ), বলা বাহুল্য গঠনের জটিলতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এস্থলে চক্র শব্দ ব্যবহৃত হইল। চক্র শব্দের পরিবর্ত্তে আবর্ত্ত শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারে।

মধ্যকর্ণের ভিতর জলের ন্যায়-স্বচ্ছ এক প্রকার স্নেহ-বস্তু আছে; উহার নাম কর্ণলসিকা ( Perilymph ), সমগ্র অন্তঃকর্ণটি এত ছোট যে কর্ণলসিকা আকারে এক বিন্দু জল অপেক্ষা বড় নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শব্দের স্পন্দনগুলি কর্ণপটহ হইতে ক্রমে ক্রমে কর্ণের আরোহণী বা রেকাব পর্য্যন্ত পৌছায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত গিয়াই স্পন্দন ক্রিয়ার শেষ হয় না। আরোহণী অস্থি স্পন্দিত হইয়া স্পন্দন-প্রবাহ আগম-গৃহস্থ কর্ণ-লসিকামধ্যে প্রেরণ করে এবং স্পন্দনগুলি তথা হইতে শঙ্খাবর্ত্ত কর্ণে ( ear-shell ) নীত হয়।

শ্রবণের সহিত তোরণাকার প্রণালীমালার কোন সংস্রব নাই, সুতরাং আমরা আপাততঃ তৎসম্বন্ধে আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

শঙ্খাবর্ত্ত কর্ণের ভিতরই প্রকৃতপ্রস্তাবে শব্দ-গ্রহণ যন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। শঙ্খাবর্ত্ত কর্ণের আকার স্থলশম্বুকের ন্যায়সার্দ্ধ দুই আবর্ত্ত বা আড়াই পাক শূন্যগর্ভ নালিকা ( tube ) দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। একটি প্রাচীর দ্বারা এই শঙ্খাবর্ত্ত নালিকা দ্বিধা বিভক্ত। এই দুইটি ভাগ ঊর্দ্ধ-ভাগ ও নিম্নভাগ নামে পরিচিত। ঊর্দ্ধভাগে একটি বিশিষ্ট কক্ষ আছে, এই কক্ষমধ্যে 'ইন্দুলসিকা' (Endolymph ) নামে এক প্রকার স্নেহ বস্তু আছে।

কর্ণ লসিকার স্পন্দনগুলি ইন্দু-লসিকা দ্বারা গৃহীত হয়। তখন উহার স্পন্দন সমূহের সংস্পর্শে মস্তিষ্কের অষ্টম স্নায়ু বা শ্রুতি স্নায়ুর প্রান্ত ভাগ গুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন শ্রুতিস্নায়ু শব্দানুভূতি গিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখন মস্তিষ্কের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উহার অর্থগ্রহণ করেন।

অন্তঃকর্ণে বা অভ্যন্তরীণ কর্ণে শব্দ বিশ্লেষণ কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু কি কৌশলে ঐ অদ্ভুত কাজটা সম্পন্ন হয় তাহা এখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অনুশীলনের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কেহ বলেন, অন্তঃকর্ণে অনুবীক্ষণে দ্রষ্টব্য অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি কেশাকার-কোষ ( Hair-Cells ) আছে, সেগুলি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ স্পন্দন মাত্রে পিয়ানোর তন্ত্র সকলের ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। ইহাকে প্রতিধ্বনিমূলক স্পন্দন বা সমবেদনাত্মক স্পন্দন বলে। মানবকর্ণে ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, মানব কর্ণে এরূপ বৈচিত্র্য-সম্পন্ন বহুবিধ শব্দের অনুভূতি হইয়া থাকে যে, কেশাকার-কোষকে শব্দানুভূতির কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্তঃকর্ণে ঐ শ্রেণীর কেশাকার-কোষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইত। তাঁহারা ঝিল্লময় কর্ণচক্রকে শব্দ-বিশ্লেষণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা বিবিধ সুরের পার্থক্য

নির্দ্ধারণ ও রাগ-রাগিণীর আলাপ শ্রবণ করিয়া আমাদিগের শ্রবণশক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারি। যাহাদিগের সঙ্গীতানুরাগ বাল্যকাল হইতে প্রবল, তাহাদিগের শব্দ-বিশ্লেষক উপাঙ্গটি বেশ পরিপুষ্ট, তথাপি সঙ্গীতের অনুশীলনের উপর শ্রুতিশক্তির উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

তোরণাকার বা অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রণালীগুলির সহিত শ্রবণ শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদিগের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে, আমরা মস্তক সঞ্চালন করিলে ঐ তরল পদার্থ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই তরল-পদার্থের সঞ্চালন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি স্নায়ুতে এক-প্রকার অনুভূতির সঞ্চার হয়, এই অনুভূতি আমাদিগের দেহের অবস্থান জ্ঞাপক। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের কর্ণে এই অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রণালীমালা নাই, তজ্জন্য তাহারই শরীরের ভার-সাম্যরক্ষায় অপটু। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই তোরণাকার প্রণালী-গুলির সহায়তায় মানুষ দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করে।

## বিবিধ সংগ্রহ

**নিখিল ভারতীয় বৈদ্য সম্মেলন।**—জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে দিল্লী নগরীতে নিখিল ভারতীয় বৈদ্য-সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই সঙ্গে একটী প্রদর্শনী থাকিবে।

**দুর্ভিক্ষে অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ানের মহৎ দান।**—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আমেদনগর ও গারগাঁও জিলায় দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থ জনৈক অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস কর্ম্মচারী ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুর হস্তে ১৫ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। দাতা স্বীয় নাম অপ্রকাশ রাখিয়াছেন।

**১২ সপ্তাহে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু।**—লণ্ডন নগরের টাইমস পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক সংবাদ দাতা প্রকাশ করিয়াছেন—গণনার দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গত ১২ সপ্তাহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে। কিন্তু ৪।০ বৎসরে মহাসমরে ২০০ লক্ষ লোক মরিয়াছে। উহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মহামারীতে অনুপাতে ৫ গুণ অধিক লোকক্ষয় হইতেছে। ব্লাকডেথ্ অর্থাৎ কৃষ্ণ মড়কের পরে আর কোন ব্যাধির আক্রমণে এত অধিক লোকক্ষয় হয় নাই।

**পরলোক প্রাপ্তি।**—১৯শে অগ্রহায়ণ মহাত্মা সোহহংস্বামী (শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) হিমালয় শিখরোপান্তে তাঁহার যোগকোলাস্থ আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনকালে তিনি সুন্দরবনের ভীষণ বন্য ব্যাঘ্রের সহিত মল্লক্রীড়া করিয়াও বক্ষের উপর বৃহৎ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া সমস্ত ভারতে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য সাহস ও অত্যদ্ভুত বলবীর্য্য আর্ত্তের পরিত্রাণ কল্পেই ব্যবহৃত হইত। তিনি কখনও শক্তির অপব্যবহার করেন নাই। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়াল গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। আত্মচিন্তা ও সত্যলাভের ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তিনি ৪৩ বৎসর বয়সে প্রচুর যশোমান ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সোহহং গীতা, সোহহং সংহিতা, Truth প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।


# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | মাঘ ১৩২৫ সাল | ১০ম সংখ্যা


## আলোচনা

**কংগ্রেস ও দেশীয় চিকিৎসা**—কংগ্রেসের গত অধিবেশনে নানা প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী হল—"আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসার প্রভাব এই দেশে প্রবল। জাতীয় মহাসমিতি গভর্মেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীকে তাঁহারা যে সকল সুযোগ প্রদান করিতেছেন এই দুই চিকিৎসা প্রণালীও যেন ঐ সকল সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট সমূহের নিকট হইতে ভারত গভর্মেণ্ট স্বদেশী ঔষধের যেমন বিবরণ প্রাপ্ত হন হাকিম তাহার পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা ইউনানি চিকিৎসা প্রণালীর ঐরূপ বিবরণ গৃহীত হউক। অতঃপর উক্ত বিবরণদ্বয়ের বিচার করা হউক।"

প্রস্তাবটী দেশীয় চিকিৎসার মঙ্গলার্থেই করা হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতিতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিকতর ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

**ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি**—কংগ্রেসের সময়ে দিল্লীতে ভারতীয় চিকিৎসক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সার নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতায় রোগ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সেই বক্তৃতার মর্ম্ম পৃথক স্থলে প্রকাশ করা হইল।

**নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতি**—দিল্লীতে নিখিলভারতীয় মহিলা সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতি বেসান্ত নানা কথার মধ্যে বলিয়াছেন "ভারতের মৃত্যু সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকা অপেক্ষা বালকের মৃত্যু সংখ্যা অধিক কিন্তু অকস্মাৎ ১৫ এর পরে বালিকার মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে। যদি নারী কোনরূপে ২৫ পার হয় তাহা হইলে তাহারা বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে। ১৫ হইতে ২৫ বৎসরের নারীরা কেন অধিক সংখ্যায় মরিতেছে এই বিষয়টি ভারতীয় মহিলাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। বাল্যবিবাহই যে তাহার কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নারীদের আহার্য্য দ্রব্যের দোষগুণ, উৎকৃষ্ট রন্ধন

প্রণালী, স্বাস্থ্যনীতি, সন্তান পালন এবং ঐ সকলের আনুষঙ্গিক সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে প্রাচীনারা ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে বা সন্তানের কোন সামান্য অসুখ করিলে আধুনিক কালে নারীরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিয়া থাকেন কিন্তু প্রাচীনকালে মহিলারা নিজেরাই উহার প্রতীকার করিতে জানিতেন। এই কারণেই এখন সন্তানদের স্বাস্থ্য উপেক্ষিত হয়, গৃহে সুব্যবস্থা নাই, শিশু মৃত্যু অতি ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" সভানেত্রীর কথাগুলি সকলেরই বিশেষ বিচারযোগ্য।

**নিখিল ভারতীয় গো-রক্ষিণী সমিতি**—গো-রক্ষিণী সমিতির দ্বিতীয়বার্ষিক অধিবেশন দিল্লীর জুম্মা মসজিদের সম্মুখে এক মণ্ডপে হইয়াছিল। মান্দ্রাজের বিজয় রাঘব আচারিয়া সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় প্রস্তাবের মধ্যে ছিল—"গোশালা ও পিঞ্জরাপোল গুলির হিসাব ও ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান জন্য কতিপয় হিসাব পরীক্ষক ও ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হউক। সমগ্র দেশে প্রায় ৬শত পিঞ্জরাপোল ও গোশালা আছে, সেগুলিতে প্রায় বৎসরে ১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ঐ গুলির কার্য্য-মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। গোয়ালাদের কার্য্যে শৃঙ্খলা ও সংযম আনয়ন জন্য যেমন আইনের দরকার তেমন লোকমতও চাই। বিশুদ্ধ হিন্দুরীতি অনুসারে নগরের অধিবাসীদিগকে দুগ্ধ প্রদান নিমিত্ত প্রত্যেক নগরে আদর্শ গোষ্ঠ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কতগুলি বিষয়ে সরকারী সাহায্য পাওয়া দরকার। ব্রহ্মদেশে চামড়া যোগাইবার জন্য কসাইদের যে ব্যবসায় আছে উহা বন্ধ করা উচিত। গোচারণ মাঠের ব্যবস্থা চাই। গো-জাতির ভক্ষ্য ঘাসের চাষের ব্যবস্থা করা হউক।"

**ভারতীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কনফারেন্স**—হিতসাধনমণ্ডলীর দ্বিতীয় কনফারেন্স জাতীয় মহাসমিতির মণ্ডপে বসিয়াছিল। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু সভা-নেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় বিবিধপ্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল।

**মেডিকেল কনফারেন্সে আয়ুর্ব্বেদ**—"আয়ুর্ব্বেদ" পত্র লিখিয়াছেন—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দিল্লীতে যে মেডিকেল কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতে কথা হইয়াছে "ভারতের কোন কোন মেডিকেল কলেজে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশী চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিন।" সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণেও একথার সমর্থন করিয়া বলেন—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিয়া ফেলা উচিত। আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেই সহজে ইহা সাধিত হইতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে এদেশী ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এক ফার্ম্মাকোপিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সমিতি ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মত একখানি ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া সঙ্কলন করুন।"



# চিকিৎসা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা

( দিল্লীনগরে ভারতীয় চিকিৎসক-সমিতির সভাপতি রূপে সার নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি মহোদয় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম। )

আমরা এক বিশেষ অভিনব অবস্থার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসর এখানে মিলিত হইয়াছি। মহা-সমরে মানব জাতি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তৎকালে যে সকল নৈতিক পীড়ন চলিয়াছিল উহাতে মানুষ বিস্মিত হইয়াছে। মানবের শুভাদৃষ্টবশতঃ ঐ ভীষণ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে।

### ভীষণ পরীক্ষা।

রোগ আরোগ্য করা ও পীড়িতকে আরাম দান করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কার্য্য। মহাসমরে চিকিৎ-সকদের উক্ত শক্তির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষা কি ভীষণ তাহা ধারণা করাও দুরূহ। পূর্ব্বে যে নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ চলিত আধুনিক নীতি উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অমিতবলসম্পন্ন বিস্ফোটক দ্রব্য এবং বিষাক্ত বাষ্প বর্ত্তমান মহাসমরে অবাধে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ কারণে বহুলোকের প্রাণ ক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে গত মহাসমরে মৃত সৈন্যগণ মধ্যে শত করা ৪ জনের কম লোক রোগে মারা গিয়াছে।

নেপোলিয়ানের সময়ের যুদ্ধে শত করা ৯৭, বুয়ার যুদ্ধে শত করা ৬৭ রোগে মারা গিয়াছিল। যেরূপ জখম হইলে মরিবার কথা এমন অনেক আহতই বর্ত্তমান যুদ্ধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এইরূপ কার্য্য সাধন করিয়া সাম্রাজ্যের অপর অপর সকল দেশের চিকিৎসকদের সহিত ভারতীয় চিকিৎসক-গণও কীর্ত্তি করিয়াছেন।

### মহাসমরে ক্ষতি।

এই মহাসমরে মানব জাতির কিরূপ, দৈহিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্যনৈতিক ক্ষতি হইয়াছে উহাই এখন বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই মহাসমরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধ-লিপ্ত ও নিরপেক্ষ জাতি সমূহের মোট প্রায় ২ কোটি লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার লিপিবদ্ধ ও উহার উচ্চমূল্য হেতু মানুষকে দৈহিক ক্লেশ সহিতে হইয়াছে। যুদ্ধ লিপ্ত ও নিরপেক্ষ বহু জাতির জন্মহার হ্রাস প্রাপ্ত হই-য়াছে। খাদ্যের অপ্রচুরতার জন্য শিশু মৃত্যু বাড়িয়া গিয়াছে। নারীরা এতকাল এমন মানসিক উৎকণ্ঠা বহন করিয়াছেন যে ঐরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থকায় সন্তান জন্মিতে পারে না। জনকগণও অনেক স্থলে ব্যাধি ও আঘাতে শারীরিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

একদিকে যেমন লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, অন্য দিকে যে সকল শিশু জন্মিতেছে তাহারাও সুস্থ সবল নহে।

### মহাসমরের শিক্ষা।

ক্ষত ও অন্যান্য নানা ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে এই মহাসমর কালে আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়াছে।

### যুদ্ধাবসানে কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে ইহাই দেখিতেছি যে, চিকিৎসকগণের সম্মুখে পুঞ্জীভূত কর্ত্তব্য রাজি উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে মানব জাতি যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে এক্ষণে নরনারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিয়া উহা পূরণ করিতে হইবে। এই জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষা, অর্থ নৈতিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং মানবের সংযম বৃদ্ধির জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবস্থা বন্ধ করা আবশ্যক হইবে। যাহাতে মানুষের স্বাস্থ্য ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য প্রত্যেককে স্ব স্ব শক্তি সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে এই জন্য স্বাস্থ্য-সচিবের পদ সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সুখের কথা ভারতবর্ষের সার্জ্জন-জেনারেল এই বিষয়ে প্রচেষ্ট হইয়াছেন।

### মহামারী।

লোকক্ষয়কর মহাসমরের অবসান হইতে না হইতে আর এক মানব-শত্রু উগ্রতর শক্তি লইয়া লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী স্পেনদেশে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে উহা পৃথিবী-ব্যাপ্ত হইয়াছে। উহাতে ভারতবর্ষে ভীষণ লোকক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক অঞ্চলেই উহার যথোচিত হিসাব রক্ষিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্রেও রুগ্নের চিকিৎসা ও সেবার জন্য শত শত বে-সরকারী চিকিৎসক প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন।

### স্বাস্থ্যনীতির উচ্চতর বিধি।

মহাসমরের ক্ষতিপূরণ জন্য স্বাস্থ্যনীতির উৎকৃষ্টতর সুব্যবস্থা আবশ্যক আমি আপনাদিগকে জানাইয়াছি কেবল তাহা নহে ভারতবর্ষে লোকক্ষয়কারী ব্যাধির অভাব নাই। একমাত্র বঙ্গদেশেই ম্যালেরিয়ায় বৎসরে ১০ লক্ষের অধিক লোক মরে। দরিদ্র মধ্য শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে যক্ষ্মাব্যাধি ব্যাপ্ত হইয়াছে। বসন্ত ব্যাধি দরিদ্র লোকসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপদংশ প্রাণক্ষয়ঙ্কর না হইলেও মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস করিতেছে।

### স্বাস্থ্যরক্ষা ও শাসন সংস্কার প্রস্তাব।

শাসন সংস্কার রিপোর্টে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি হস্তান্তরিত বিষয় করা হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত জনৈক মিনিষ্টার উহার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

### যুদ্ধ ও চিকিৎসকগণ।

মহাসমরে ভারতবর্ষের চিকিৎসকমণ্ডলী বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে উপাধি প্রাপ্ত ৭৫০ এবং অপর বহুসংখ্যক চিকিৎসক যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। সামরিক চিকিৎসায় অনভ্যস্ত হইলেও ইহারা অতি প্রশংসনীয় কার্য্য সাধন করিয়াছেন তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

### ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিস।

ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের কতিপয় পদ ব্যতীত অপর সকল পদে উপযুক্ত ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঐ পদগুলিতে একদল লোকের একচেটিয়া অধিকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারে না। (২) উহার আর এক দোষ এই যে, ঐরূপ ব্যবস্থার ফলে ঐ সকল দায়িত্বযুক্ত পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইতেছে না।

(৩) এই চাকুরীর সম্বন্ধে যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, উহাতে ভারতীয়দের ভাগ্যে যোগ্যতা সত্ত্বেও উহা পাওয়া অসম্ভব হইতেছে।

(৪) এতদ্বারা চিকিৎসার উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

### নারীদের চিকিৎসা শিক্ষা।

নারীদের চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই নগরে মহিলাদের জন্য এক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, উহা অতি উত্তম কথা। ঐরূপ কলেজ ও স্কুল কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পুনা, ভিজিগাপট্টম্, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য।

### দেশীয় চিকিৎসা।

সার নীলরতন দেশীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা-প্রণালীর অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা প্রণালীর সত্য সকল নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা প্রচলন করা ও দেশীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।



# আহার সম্বন্ধে উপদেশ

লেখক—শ্রীরাখাল চন্দ্র নাগ

আহার না করিলে জীব জীবন ধারণ করিতে পারে না, আবার আহারের দোষেই অনেক সময় জীবন নষ্ট হইয়া থাকে, সেজন্য নিয়মিত রূপে আহার করাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এখন আমরা অনুকরণ প্রিয় হইয়া পড়িয়াছি, সাহেবদের অনুযায়ী বহু বাঙ্গালীবাবু আহারাদিতে অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। আগে লোকে একশত বর্ষেরও উপর বাঁচিত, কিন্তু এখন এত অকাল মৃত্যু হয় কেন? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন যে কেবলমাত্র আমাদের বুদ্ধির ও শিক্ষার দোষে হইয়া থাকে। আমরা যদি সেকালের আর্য্যঋষিগণের মতানুসারে কার্য্য করি তাহা হইলে অবশ্যই দীর্ঘায়ু হইতে পারিব। নিম্নে মহর্ষি চরকের আহার সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"পরিমিত ভোজী হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আহার করিবার সময় অগ্নির বলের উপর লক্ষ্য করা উচিত। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভোজন করিলে তাহা তাহার প্রকৃতির ব্যাঘাত না করিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহাকেই মাত্রানুযায়ী ভোজন বলা হইয়া থাকে। শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, মৃগ, লাব পক্ষী, গৌর তিত্তিরি, কৃষ্ণসার, শশক, শরভ ও সম্বর প্রভৃতির মাংস যদিও লঘু, তথাপি ইহা মাত্রা ও সহ্যানুসারে ভোজন করিতে হয়। আর মাষকলায়, আনুপ ও উদকমাংস, ইক্ষু, ক্ষীর বিকৃতি সমূহ ও পিষ্টক স্বভাবতঃ গুরু হইলেও ইহাদিগকে মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিবে, এই সমস্ত দ্রব্যের যে গুরুত্বও লঘুত্ব নির্দ্দেশ করা গেল তাহারও বিশেষ কারণ আছে, লঘু দ্রব্য সমূহ বায়ুগুণ ও অগ্নিগুণ বহুল হইয়া থাকে, আর গুরুদ্রব্য সোমগুণ বহুল ও পৃথ্বীগুণ হয়, এইজন্য লঘু দ্রব্য সকল নিজগুনেই অগ্নি-দীপন, অল্পদোষ ও তৃপ্তিকর হয়, আর গুরুদ্রব্য বিপরীত গুণ বশতঃ অগ্নি দীপ্তিতে সহায় হইতে পারে না, অতএব গুরুপাক দ্রব্য অতি মাত্রায় ভোজন করিলে দোষাবহ হয় এবং ব্যায়ামচর্চ্চা বা অগ্নিবল না থাকিলে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করা উচিত নয়। আবার মাত্রাও অগ্নিবল অপেক্ষা করে, লঘু গুরুতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

সচরাচর গুরুপাক দ্রব্য আহার কালে উদরের অর্দ্ধ ভাগ অথবা সিকিভাগ খালি রাখিতে হয়, লঘুপাক দ্রব্যকেও খাইবার সময় কেহ যেন মনে না করেন যে যত খাইব ততই হজম হইবে, অত্যন্ত অধিকমাত্রায় যে কোন দ্রব্যই সেবিত হউক না কেন তাহাতে অগ্নির ব্যাঘাত হইতে পারে। মাত্রানুযায়ী আহার দ্বারা প্রকৃতির ব্যাঘাত না হওয়ায় ভোক্তা অবশ্যই বল, বর্ণ, সুখ ও পরমায়ু লাভ করে।

আগেকার আহার দ্রব্য উদরে জীর্ণ না হইলে পুনরায় গুরুপাক, পিষ্টক বহুলদ্রব্য, তণ্ডুল বহুলদ্রব্য ও পিটক খাইবে না। পুনশ্চ ক্ষুধা হইলে পর মাত্রানুযায়ী ভোজন করিবে। শুষ্ক মাংস, শুষ্ক শাক, শালুক ও মৃণাল প্রভৃতি প্রত্যহ খাইবে না, আর আণুপাদি মাংস সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে না, ষষ্টিক ও শালি তণ্ডুল, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, আন্তরীক্ষজল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস ও মধু প্রত্যহ সেবন করিবে। মৎস্য, দধি, মাষকলাই, গুরু পাক মাংস সমূহ মধ্যে মধ্যে বর্জ্জন করিতে হয়, যে দ্রব্য স্বাস্থ্যের অনুকূল ও রোগকে টানিয়া না আনে তাহাই নিত্য ভোজ্য বলিয়া স্থির করা উচিত।

ইহা ছাড়া যে ঋতুতে যেরূপ আহার বিহার সহ্য হয় তাহাও বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। এইরূপ সে বিষয় জানা থাকিলে মিত ভোজী ব্যক্তি নিয়মিত ভোজন ও পান দ্বারা বল ও অগ্নিবৃদ্ধি অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ সে বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিনটী ঋতু সূর্য্যের

উত্তরায়ণকাল, শাস্ত্রে ইহাকে আদান কাল বলে, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিনটী ঋতু দক্ষিনায়ণ বা বিসর্গ কাল বলিয়া কথিত হয়।

এই উভয়কালে বায়ু উভয় প্রকারের হইয়া থাকে, বিসর্গে রুক্ষতা বিহীন এবং আদানে অত্যন্ত রুক্ষ হয়, কেহ কেহ আদান কালের বায়ুকে আগ্নেয় বলিয়া থাকেন, বিসর্গকালে চন্দ্র সুশীতল কিরণ দ্বারা জগৎকে আনন্দিত করে বলিয়া ইহা সৌম্য অর্থাৎ নাতি উষ্ণ ও নাতি শীতল হয়, এই দুইকালে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু জগতে আপনাদের স্বভাব সংযোজন দ্বারা দেহমধ্যে রস, দোষ, ও বল প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

আদান কালে সূর্য্যদেব নিজ কিরণ দ্বারা জগতের রস গ্রহণ করেন; বায়ু সকল তীব্র ও রুক্ষ হইয়া শোষণ করে এইজন্য রুক্ষতা বশতঃ মানব দুর্ব্বল হইয়া থাকে। বিসর্গকালে ইহার বিপরীত হয়, এই সময় রবি তেজ মেঘ, বাত ও বর্ষা দ্বারা অভিভূত হওয়ার জন্য চন্দ্রের বল অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়, এবং তজ্জন্য জগতে মধুর রসাদি বর্দ্ধিত হইলে মানব ক্রমে ক্রমে বল পাইতে থাকে। মোটের উপর বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে মানবদিগের দুর্ব্বলতা হয়, এই দুই কালের মধ্যে শরৎ ও বসন্তে মানবদেহ মধ্যবল হয়; আর এই দুই কালের অন্তে অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশির কালে অধিক বল হইয়া থাকে, শীতকালে শীতলবায়ু সংস্পর্শে বলবান ব্যক্তিদিগের অগ্নি বলবান হওয়ার জন্য গুরুপাক দ্রব্য অধিক সহ্য হয়, এই কারণেই বহুকাল হইতে আমাদের দেশে শীতকালেই পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য সেবনের ব্যবস্থা আছে। যেমন অগ্নি প্রবল হয়, তাহাতে সেইরূপ আহার প্রয়োগ করাও উচিত নচেৎ সেই অগ্নি দেহস্থ রসকে শুষ্ক করে, এই সময়ে জলজ ও আনুপ জন্তুর মাংসভোজন হিতকর।

শীতকালে দুগ্ধ, গুড়, নবান্ন, বসা, তৈল ও উষ্ণজল সেবনে আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে, হিমাগমে লঘু ও বায়ুকারক অন্নপান সমূহ, বায়ুপ্রবাহ অল্পাহার ও জলে গোলা ছাতু প্রভৃতি বর্জ্জন করা উচিত।

বসন্তকালে গুরু, অম্ল, স্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা পরিহার করিবে, যব ও গোধূম ভোজন করিবে। শরভ, শশক, হরিণ, লাব প্রভৃতির মাংস ভোজন এই কালে হিতকর।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব নিজ কর দ্বারা জগতের সার পান করিয়া থাকেন। এইজন্য এ সময়ে মধুর ও শীতল দ্রব্য এবং স্নিগ্ধ অনুপান প্রশস্ত। গ্রীষ্মে শীতল শর্করা যুক্তমন্থ অর্থাৎ জলে গোলা ছাতু সেবন উপকারী, এই কারণেই এদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে ছাতু দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এবং বৈশাখ মাসে ছাতু সেবন প্রচলিত আছে। গ্রীষ্মকালে জাঙ্গল পক্ষীর মাংস, ঘৃত-দুগ্ধ যুক্ত শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে মানব বলহীন হয় না। মদ্যপান একেবারে পরিত্যাজ্য, নিতান্ত যাহাদের না খাইলে চলে না তাঁহারা অধিক জল মিশাইয়া সেবন করিতে পারেন, লবণ, অম্ল, কটু উষ্ণদ্রব্য সকল সাধ্যমত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বর্ষাকালে যে দিন শীতানুভব হইবে সেইদিন শীতকালের ন্যায় ও যেদিন গ্রীষ্মানুভব হইবে সেইদিন গ্রীষ্মকালের ন্যায় আহারের নিয়ম পালন করিতে হয়, জল পানের উপর এইকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, জলকে যতদূর সাধ্য পরিষ্কার করিয়া পান করা আবশ্যক।

শরৎকালে অধিকাংশ স্থলে পিত্তকুপিত হইয়া থাকে, এজন্য এই সময় আহারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, এইকালে মধুর ও লঘু, শীতল এবং ঈষৎ তিক্ত পিত্তনাশক খাদ্য ক্ষুধাকালে যথামাত্রায় ভোজন করিবে। শরতে লাব, কপিঞ্জল, হরিণ, শরভ ও শশকের মাংস এবং শালি তণ্ডুল, যব ও গোধূম সেবন হিতকর। বসা, তৈল, হিম, জলচর মাংস, আনুপমাংস, ক্ষার, দধি ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের শরীরের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আহারের নিয়মাদি নির্দ্দেশ করা উচিত শরীর অসুস্থ থাকিলে রস জনক দ্রব্যাদি বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।



# স্বাস্থ্যরক্ষায় আমাদের অমনোযোগিতা

লেখক—ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

সাধারণতঃ আমাদের শারীরিক কোন যন্ত্রবিধানের কর্ম্মশক্তির অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হইলেই আমরা তাহা রোগ বলিয়া থাকি। কোন না কোন একটা কারণ বশতঃই রোগ হইয়া থাকে। কারণ ভিন্ন যেমন কোন কার্য্যোৎপত্তি হয় না তেমন কোন একটা কারণ না হইলে রোগও হয় না। চিকিৎসকগণ রোগীর চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগের কারণ বুঝিয়া পরে ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

রোগ যেমন অশেষবিধ, রোগের কারণও তেমনি অসংখ্য কিন্তু এমন কতকগুলা রোগ আছে যাহা আমরা জানিয়া শুনিয়াই ডাকিয়া আনি এবং নিজেদেরই কর্ম্মফলে কতরকমই না রোগ যাতনায় ভুগিয়া মরি। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে তাহা জানিয়াও যদি আমরা আগুনে হাত দেই তবে উহা খেয়ালই বলিব বই কি। আমাদের দেশে অনেকেই এই খেয়ালের বশে মরেন। আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলা প্রায়ই জানি কিন্তু আমাদের অমনোযোগিতা বা স্বাস্থ্যরক্ষার উদাসীনতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। এই অমনোযোগিতার ফলেই বঙ্গীয় পল্লীগুলা শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ইহারই ফলে এখন অনেক পল্লীগ্রাম বাসেরও অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বিশেষ কিছু না বলিয়া আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ত্রুটি বিষয়েই কয়েকটী কথা বলিব।

সকলেই জানেন, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু, পরিষ্কার জল, পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, নিদ্রা, বিশ্রাম ও উপযুক্ত বস্ত্রাদি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিতান্ত দরকার।

অনেক সহর হইতেই পল্লীগ্রামের বায়ু বিশুদ্ধ। সহরে নানাপ্রকার কলকারখানার ধূমে; গাড়ী-ঘোড়ার রাস্তার ধুলায়, বহুলোকের বাস হেতু কত প্রকারে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সে সব উৎপাত নাই। পল্লীরাণী তাঁহার প্রকৃতি সম্পদে মহাঐশ্বর্য্যশালিনী। কিন্তু পল্লীবাসী জঙ্গল ও আবর্জ্জনাদি পঁচাইয়া বায়ু দূষিত ও মক্ষিকাদির বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দেন—অতি সামান্য যত্ন লইলেই ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতার মত বড় বড় সহরে অধিকাংশ ভদ্রমহিলাগণের নষ্ট স্বাস্থ্যের কারণ নাকি বদ্ধ বায়ুতে বাস। কিন্তু পল্লীবধূদের জন্য কোন (পর্দ্দা পার্কের) আবশ্যক কেহ মনে করেন না। পল্লীবধূরা কি বড় কি ছোট সকলেই মুক্তবায়ুর সম অধিকারিণী। পল্লীর ঘর দরজাগুলা যে ভাবে তৈরী তাহাতে গৃহমধ্যে অবাধে বায়ু চলাচল করিতে পারে—সুতরাং বদ্ধবায়ুতে বাসজনিত স্বাস্থ্যহানির অভিযোগ পল্লী-গৃহস্থদের উপর করা যাইতে পারে না। তবে যাহারা কোঠাঘরে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে একটু সতর্কতা আবশ্যক।

কাহারো কাহারো দেখা যায় তাঁহারা সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া থাকেন—ভয়, পাছে বাহিরের ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করে! বিশেষতঃ ঘরে যদি রোগী থাকে তবে তো চন্দ্রের আলো দূরের কথা সূর্য্যরশ্মিও প্রবেশ নিষেধ হইয়া উঠে। তাঁহারা জানেন, বিশুদ্ধ বায়ু সুস্থ লোকের চেয়ে রোগীর আরো বেশী দরকার এবং সুস্থ লোকের চেয়ে রোগীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ু সমধিক দূষিত করে। বদ্ধবায়ুতে বাস করিলে মানুষের যে মৃত্যুও হয় তাহা অন্ধকূপ হত্যার মত এমন দৃষ্টান্ত থাকিতেও আমরা অন্ধকূপেই মরিতে প্রস্তুত হই! গৃহস্থগণ জন্তুপূর্ণ হাঁড়িতে কৈ-মাগুর মাছ বাঁচাইয়া রাখার মতলবে হাঁড়ির ঢাকনীটা যেমন ফাঁক করিয়া রাখেন—

উদ্দেশ্য, বাতাস চলাচলের যেমন সুবিধা থাকে—নইলে সব মাছ মরিয়া যাইবে। নিজেদের জীবনরক্ষার জন্য যদি আমরা সে কথাটুকুও মনে রাখিতে না পারি তবে কি তাহা খেয়াল-বা অমনোযোগিতা বলিব না?

দিনের বেলার তো কথাই নাই, রাত্রিতেও অন্ততঃ ঘরের জানালা গুলা খুলিয়া রাখা উচিত। যে সব গৃহে দরজা জানালা ভিন্ন ও বায়ু-চলাচলের সুবিধা আছে সে সব গৃহের জানালা রাত্রিতে বন্ধ রাখিলেও ক্ষতির কারণ নাই। জানালা খোলা রাখিয়া তাহাতে মোটা কাপড়ের পর্দ্দা টানাইয়া দিলেই বাহিরের বাতাস গৃহপ্রবেশ সময়ে বায়ুর জলীয় ভাগ কাপড়ে শোষিত হইয়া যায়—কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কাহারও কাহারও এমনই অভ্যাস যে সন্ধ্যার পর দরজা-জানালা খুলিতে দেখিলেই আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠেন! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে! মুক্তবায়ু অনেক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা বলিয়া অনেকেরই মত। এমন যে বিষম যক্ষ্মারোগ তাহারও চিকিৎসা মুক্তবায়ু।

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কেহ শীতকালে লেপ বা কম্বলের ভিতর মাথা গুজিয়া ঘুমান। অনেক জননী শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া আপাদমস্তক মোটা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখেন। তাঁহারা বুঝিয়া ও বুঝেন না যে নিজেরই প্রশ্বাস বায়ু আবার নিজেই নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করাইয়া স্বাস্থ্যের কি বিষম ক্ষতি করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুনিদ্রা আবশ্যক। রাত্রিতে ভাল ঘুম না হইলে শরীর মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু যাহারা অমনভাবে দূষিত প্রশ্বাসবায়ু গ্রহণ করেন তাঁহারা কিছুতেই সুনিদ্রাজনিত যে প্রত্যূষে দেহ ও মনের একটা বল ও স্ফূর্ত্তি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাঁহাদের ঠাণ্ডা লাগার অত ভয় তাঁহারা ফ্লানেল কম্ফটারে মাথা ও কাণ চাপিয়া রাখিতে পারেন—বায়ু চলাচলের পথ খোলাই রাখিবেন।

তারপর খাদ্য সম্বন্ধে—"আমরা, ডালভাতের দুফা, করি সবাই রফা"—ইহার মধ্যে আমাদের অমনোযোগিতার কি আছে তাহাই একটু দেখা যাক। আহারে রুচি থাকিলে ডালভাতের দফা রফা করিতে কাহারো অবশ্যই অমনোযোগ দেখা যায় না বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ বাটীতে তো কথাই নাই—একেবারে গলা পর্য্যন্ত। আমি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জানিতাম তিনি নিমন্ত্রণবাটীতে আহার করিতে বসিয়া পেটের ভারে আর উঠিতে পারিতেন না—তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে হইত!

পল্লীগ্রামে ছেলেপিলেদের জন্য মুড়িই সাধারণতঃ জলখাবারের ব্যবস্থা। সহরের মিঠাই মণ্ডার চেয়ে মুড়ি শতসহস্র গুণে ভাল। একে নানাপ্রকার খারাপ তৈল চর্ব্বি দ্বারা ভেজাল দেওয়া ঘি, মিঠাইওয়ালার নানাপ্রকার অসাধুতা, তদুপরি রাস্তার ধুলা, বালি, মাছি ইত্যাদি কত কি যে ছাইমাটীতে দোকানের মিঠাই সাজান থাকে তাহা ভাবিলেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। সে সব খাইয়া লোকে নানাপ্রকার পেটের পীড়ায় ভুগিতে থাকে। অবশ্য সকলেই যে মিঠাই খাইয়া অসুস্থ হয় তাহা বলিতেছি না—মিঠাই ওয়ালাদের ভিতরও ভাল-লোক থাকিতে পারে আবার অতি জঘন্য খাদ্যাদি খাইয়াও কেহ বেশ স্বচ্ছন্দেই চলাফিরা করিতে পারে। —দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। যে সব চিড়া-মুড়ি হাটবাজার হইতে কিনিয়া আনা হয় তাহা খাওয়ার পূর্ব্বে ভালমত পরিষ্কৃত হওয়া উচিত।

মুড়ি-চিড়া একটু কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক ঘরে তৈয়ার করিয়া নিলে একদিকে যেমন অনেকটা পয়সা বাঁচে অপরদিকে বাজারের ধুলাবালির মিশ্রণে স্বাস্থ্যহানিরও সম্ভাবনা থাকেনা।

বাজার হইতে যে সব ফলমূলাদি কিনিয়া আনা হয় তাহাও ভালমত ধুইয়া নেওয়া উচিত। ছেলেপিলে সব পেয়ারা, কুল, শশা যাহা কিছু হাতের কাছে পায় তাহাই মুখে দেয়—অনেক বয়স্কব্যক্তিও এ সম্বন্ধে কোন সাবধানতা নিবার তত আবশ্যক মনে করেন না। পান-গুলা কেহ কেহ না ধুইয়াই মুখে গুজিতে থাকেন। কেহ বা ঐ সব মুখে দিবার পূর্ব্বে হাতে বা পরিধেয় বস্ত্রে একটু মুছিয়া নেন। পেয়ারা, কুল ইত্যাদি ফলগুলা



গাছতলায় মাটী হইতে কুড়াইয়া আনা হয়—সে মাটীতে কতপ্রকার রোগবীজাণু থাকিতে পারে। বিক্রেতা যে টুকরী করিয়া বিক্রয় করিতে আনে তাহাতেও কত কি থাকিতে পারে। বিক্রেতার হাতের সঙ্গেও কত কি ছাইমাটী ফলের গায়ে লাগিতে পারে। যিনি হাতে বা কাপড়ে মুছিয়া পরিষ্কার করেন তাঁহার হাতে বা কাপড়েও কত কি রোগ বীজাণু থাকিতে পারে। এ সব বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া সঙ্গত—নয় কি? ছেলেপিলে-দিগকে ছোট সময় হইতে সাবধান করিতে থাকিলে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা রীতিমত অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে—তাহাদিগকে যাহা অভ্যাস করান যায় তাহাই তাহারা শিক্ষা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে এই ত্রুটীটা খুব বেশীই দেখা যায়।

পান-তামাক-চা এই তিনটীই আজকাল ভদ্রলোকের অভ্যর্থনার জিনিষ। যাঁহারা খুসী তিনি এ সকলের অপকারিতা বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন বা বক্তৃতা দিন কিম্বা নিজে 'এ রসে বঞ্চিত দীন' হইয়া থাকুন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এই তিনটী জিনিষের ব্যবসাই এদেশে অতি লাভজনক ব্যবসা হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ঐ প্রকার প্রবন্ধ লিখা একপ্রকার অরণ্যে রোদন বা প্রবন্ধলেখকের 'বয়কট' হওয়া সুনিশ্চিত ব্যতিরেকে আর বিশেষ কোন ফল দেখিনা। আমি তামাক ও চায়ের বন্ধু দলে মিশিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটী কথা বলিতে চাই।

বোধ করি অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কোন কোন লোকের মুখে ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসে এমন একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায় যে দুই হাত দূর হইতেও তাঁহারা কথা বলিলে দুর্গন্ধে বমির উদ্রেক হয়। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে শতকরা নব্বই জন লোকেরই দন্তমাড়িতে, দাঁতের গোড়ায় ভুক্তদ্রব্যের অংশ, ময়লা এমন কি পূঁয পর্য্যন্তও থাকে। Pyorrhœa alocolaris নামক দুষ্ট রোগও যে কত লোকের আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উপদংশ বা গরমি (Syphilis) রোগের কথা সকলেই জানেন। এই রোগটা সাধারণতঃ লোকে গোপনই রাখিতে চায়। সারাগায়ে Eruption উঠিয়াছে এমন রোগীও নিজ ব্যারামের কথা পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন—ভদ্রলোককে অপমান করাটা ঠিক নয়, কাজেই তখন অবস্থা দৃষ্টে ব্যবস্থা দিয়া বিদায় করিতে হইয়াছে।

চিকিৎসকগণ ব্যারামের লক্ষণ দেখিয়া সহজেই এই ব্যারামের রোগীকে চিনিতে পারেন। কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা সহজ সাধ্য নয়। অথচ এই সব বিশ্রী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখের লালা সংস্রবে অন্যলোকের সে ব্যারাম হইতে পারে, যাহার ফল পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে আইনতঃ বাধ্য হয়!

জাতি বিশেষের পার্থক্যজনিত কাহারও বাটীতে বড় জোর ২।৩ টার বেশী হুকা থাকে না। হাটে বাজারে দোকানে কড়িগলায় হুকা ঠাকুর মহাশয়দের টিকির সম্মান সূচনা করে। সময় বিশেষে তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া জাতিবদলও চলে, আবার শূন্যগর্ভ হইয়া পৈত্যাত্যাগী মিষ্টার ভট্চাজ হইয়াও বসেন! এক এক তামাক খোর তাহার যতদূর সাধ্য মুখব্যাদন করিয়া হুকাটার প্রায় বারো আনাই মুখের ভিতর নিয়া প্রাণপনে টানিতে থাকেন—আবার ঐ হুকায়ই আরো দশজন নানা ভঙ্গিতে ধূমপানের পিপাসা মিটাইয়া নেন।

রেল-ষ্টীমার-দোকান-হোটেল প্রভৃতি স্থানে চায়ের পেয়ালায় কতলোকই না চা খাইতেছে—একই পেয়ালা কত লোকের ওষ্ঠসংলগ্ন হইতেছে! দোকানী-বাটলার বা হোটেলওয়ালার অবশ্য পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কাজ নয় তাহারা পরম পবিত্র গঙ্গাজলে এই চায়ের পেয়ালাগুলা ধুইয়া আবার আমাদের চক্রবর্ত্তী খুড়ার ছেলেকে দিবে কিম্বা আমি ডাক্তার বলিয়া আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ধুইয়া দোষশূন্য করিয়া দিবে।

আর বেশী বলা আবশ্যক করে কি? এমতাবস্থায় আমাদের উচিত নয় অপরের হুকায় মুখ লাগাইয়া তামাক টানা কিম্বা আমাদের উচিত নয় যেখানে সেখানে একটা চায়ের পেয়ালা বা চামচ মুখে দেওয়া। ভদ্রলোকের বাটী চায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে বর্ত্তমান যুগে বোধ করি একটু অসভ্যতাই প্রকাশ পায় কিন্তু

এমতাবস্থায় যিনি অনুরোধ করেন তাঁহারই বিশেষ সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আশা করি যিনি ভদ্রলোক হ'ন তিনি তাঁহার বাসার চাকর বাকরদের এ বিষয়ে খুব ভাল মতই শিক্ষিত করিবেন এবং নিজেও বিশেষ যত্ন নিবেন। আমি অনেক বুদ্ধিমানকেই এ বিষয়ে বড় উদাসীন দেখিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলা বাহুল্য।

অনেক লোক অতিরিক্ত ভালবাসা দেখাইতে যাইয়া ছোট ছোট ছেলে পিলেদের মুখে পান চিবাইয়া দেন ছেলে পিলে গুলাও 'পানের চাবা' খাইতে বড় ভালবাসে! কেহ বা নিজের উচ্ছিষ্ট দশ জনকে খাইতে দেন। শ্রীযুত গুরুঠাকুর মহাশয় শিষ্যবাটী আগমন করিলে এই প্রসাদ বিতরণের ঘটাটা বেশ একটু বাড়িয়া উঠে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিজের মুখে চিবান পান গুলা নির্দ্দোষী ছেলে পিলেদের মুখে গুজিয়া আদর না করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় কি? আর গুরু-ঠাকুরের 'প্রসাদ' প্রাপ্তিতে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কিম্বা 'মোক্ষলাভ' হয় হ'ক কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই একটু 'তত্ত্ব কথা' জানা থাকিলে মন্দ হয় কি! আমাকে পাষণ্ড বলিতে হয় বল কিন্তু গুরু ঠাকুরের রসামৃত আর ময়লা ফাদা মাখা বুড়-আঙ্গুলের কুনিনখ ধোয়া 'চরণামৃত' পান করিয়া স্বর্গে যাইবার অত ভক্তি প্রবৃত্তির জোর আমার মোটেই নাই।

সাহেবরা টেবিলে কাঁটা চামচ ধরিয়া খান। এ নিয়ম বড় বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাঁহাদের বাবুর্চ্চি খানার অবস্থা দেখিলে আমাদের অন্নারম্ভের ভাতটীও বাহির হইয়া আসিতে চায়। তাহারা পকরস্তার বড় পক্ষপাতি কিন্তু আমাদের মত ফলারে চিড়া কলা দই বা ক্ষীর কলা খই অমন ভাবে মাখিয়া খাইবার স্বাদটী বুঝিতে পারিলে বোধ করি বৈজ্ঞানিক প্রথাটা ছাড়িয়া দিতেন!

তবে আমাদের দোষের কথা এই যে, আমরা কুকুরের গায়ে হাত বুলাইয়া অমনি সেই হাতেই ভাত মাখিতে থাকি ঠান্‌দি ঠাকুরানী বাম হাতখানা যেমন তেমন করিয়া একটু মাটিতে ঘষিয়াই দুই হাতে পিঠা পাকাইতে থাকেন, নিমন্ত্রণ বাটীতে পরিবেশনকারী ডালের গামলায় আর দইয়ের হাড়িতে কনুই পর্য্যন্ত হাত ডুবাইয়া পরিবেশন করার সময় তাহার বগলের ঘর্ম্মও যদি পাতে পড়ে তবুও উপুড় হইয়া গিলিতে থাকি, প্যাচক ব্রাহ্মণ বাম হস্তে আলুটী ধরিয়া খোলা ছাড়াইবার সময়, তাহার উপর টানা কফ যদি নিতান্তই বে সামাল হইয়া উঠে তখন কফের মত অখাদ্য জিনিষটাকে তিনি ঘৃণার সহিত বাম হস্তে টানিয়া ফেলিয়া আবার সেই হস্তেই যখন আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন আমরা অতি তৃপ্তির সহিত সে 'আলুভাতে ভাত' খাইয়া আত্মা দেবতাকে তৃপ্ত রাখি,—কিন্তু,

স্বাস্থ্যের দিকে চাহিতে গেলে আহারের পূর্ব্বে আমাদের হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পরে আহার্য্যবস্তু হাতে ধরা উচিত কাহাকেও খাবার কোন জিনিষ দিতে হইলে যতটা সম্ভব হাতে না ধরিয়া হাতা কিম্বা চামচ অথবা পেয়ালায় তুলিয়া দেওয়া উচিত। প্রবৃত্তি সকলেরই সমান নয় তুমি তোমার হাতের বড় বড় নখ গুলা দাঁতে চিবাইতে ভালবাস কিন্তু অপরে তোমার নখ গুলা দেখিতেই ঘৃণা পায়। তোমার গায়ের ঘাম তোমার পোষা কুকুর বিড়াল চাটিয়া খুসী হইতে পারে কিন্তু তোমার তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুরও গায়ের ঘাম আর নাকের কফ তুমি খাইতে পার কি? যদি না পার তবে নিজ ক্রটীর জন্য সাবধান হইও। নিতান্তই যদি পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে হয় তবে তাহার পাকপ্রণালীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিও। এসব ব্যাপারে কতটা স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা, কত রকমই রোগ হইতে পারে তাহা একটু সামান্য চিন্তা করিলে কে না বুঝিতে পারে?

পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ছেলে পিলেই পেটের পীড়া ও কৃমি রোগে ভুগিয়া মরে। স্বাস্থ্যরক্ষায় আহারাদির বিষয়ে অভিভাবকগণের অমনোযোগিতাই ইহার কারণ একে ছেলে গুলা যখন যা পায় তাহাই খায় তাহার উপর যে হাতে খায় সে হাতের তো কথাই নাই



কত যে ময়লা হাতে থাকে তাহার আর সীমা নাই! পল্লীবাসী সাধারণ লোকের বিশ্বাস কলা আর মিষ্টি বেশী খাইলেই পেটে কৃমি হয়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে হাতের ময়লা সঙ্গে বা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে কৃমি ডিম্ব উদরে প্রবেশ করিয়াই কৃমির সৃষ্টি করে। কৃমি ডিম্ব অবশ্যই একটা হস্তি ডিম্বের সমান নয় যে তাহা সাদা চক্ষে দেখিতে পাইবেন! অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে তাহা চক্ষে দেখা যায় না। সুতরাং ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে এত ক্ষুদ্র জিনিষ একটী নখের কোনেই কত শতটী থাকিতে পারে! এসব জানিয়া শুনিয়াও কি আমরা সাবধানতায় এতটাই উদাসীন থাকিব? এজন্যই সাহেবদের কাঁটা চামচকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

তার পর সে খানার টেবিলের কথা। আমরা কি করি? আমাদের আসন আর থালা কি মন্দ? না কথাটা তা নয়।

সে কালে কি ছিল তা আর লিখিয়া প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহি না কিন্তু একালে আমরা বেশই অনুকরণ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছি তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অনুকরণ দোষের নয় ভাল যে টুকু তাহা অনুকরণে পরম উপকার হয়, উন্নতিই হয়। কিন্তু দুঃখ যে "শিব গড়িতে যাইয়া বানর তৈরী করি"।

পল্লীগ্রামে খুব কম লোকেই জুতা ব্যবহার করেন। যে প্রকার রাস্তা ঘাটের অবস্থা তাহাতে জুতা পায়ে সর্ব্বদা চলাও সম্ভব নয়। সহরে অন্ততঃ সভ্য সমাজে সকলেই জুতা পায়ে দিয়া থাকেন। পল্লীতে ইহা অনেকে 'বাবুগিরি' মনে করেন। কিন্তু বাবুগিরির জন্য জুতা পায়ে দেওয়া ইহা বড়ই ভুল বিশ্বাস। জুতা, পায়ে ঠাণ্ডা লাগার হাত হইতে নানা প্রকার আঘাত, সাপের কামড়, মশার কামড় ইত্যাদি অনেক বিপদ পর্য্যন্ত রক্ষা করে। যে সব স্থানে সাপ ও মশার উৎপাত বেশী তথায় বুট জুতার ব্যবহারই ভাল, অনেকটা নিরাপদ।

এই জুতা পায়ে আমরা যেখানে সেখানে যাই। মল-মূত্র-নিষ্ঠিবন কত কি যে জুতায় মাড়াইয়া আসি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই জুতা নিয়া আমরা রান্নাঘর শয়ন ঘর সর্ব্বত্রই যাতায়াত করি। যে জুতার তলায় করিয়া আমরা বাহিরের যত মালামাল, অত আপদ জড়াইয়া আনি তাহা শুধু কাপড়েরই হ'ক বা এমন কি হরিণের চামড়ার হইলেও অবশ্য কদর বাড়িতে পারে না। হিন্দুর রান্নাঘরে জুতা পায়ে প্রবেশ করার আপত্তিটা অনেকেই 'চামড়ার জাত' হিসাবেই করিয়া থাকেন নইলে যে কোন প্রকারের জুতাই যে 'প্রবেশ নিষেধ' এমন কথা বোধ করি কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তিও বলিবেন না।

কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যের হিসাবে বলি জুতার 'প্রবেশ নিষেধ' অন্ততঃ খাওয়ার স্থানে হওয়াটা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। একে তো আমরা মাটীতে আসন পাতিয়া খাইতে বসি, তাহাতে সামান্য একটু হাওয়া দিলেই কত ধুলা বালি আসিয়া পাতে পড়ার সম্ভাবনা এমতাবস্থায় যদি জুতার ঐ সব আপদও আসিয়া থালায় উঠে তবে খাদ্য সামগ্রী অবশ্যই দূষিত হইবে। এ সব কারণেই খাবার কোন জিনিষ এমন কি পানটী পর্য্যন্তও হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গেলে তাহা ভালমত না ধুইয়া আর মুখে তুলিতে নাই। ছেলে পিলেকে ভাত খাওয়াইবার সময় তাহাদের সে প্রকাণ্ড গ্রাসটীর কিয়দংশ, মুখের ভিতর স্থানাভাব বশতঃ মাটীতে পড়িয়া যাওয়ায় আবার তাহা কুড়াইয়া খাওয়াইতে দেখিয়াছি! ইহার উপর আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না।

এখন স্বাস্থ্যরক্ষায় পাণীয় জলের বিষয় দেখা যাক। আমাদের অন্নগত প্রাণ। একটু 'সুচারুরন্ধন' হইলেই ভাল ভাতটা তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ত্তি করিয়া জীবনের দিন কয়টা এক প্রকার কাটাইয়া দিতে থাকি। বড় জোর ৫০।৬০ বৎসর, তারমধ্যে ম্যালেরীয়ায় উপবাস আছে, অর্থের অভাবে উপবাস আছে, একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে অকাল বৈধব্যও আছে। এ সকলের হাত এক প্রকার এড়াইয়া চলিলেও একবার ওলাদেবীর অনুগ্রহ হইলেই হইল একেবারে পত্র পাঠ বিদায়, বিশেষ

হাঙ্গামার ধার ধারিতে হয় না! এই মহাদেবীর অনুগ্রহ প্রাপ্তি প্রায় বেশীর ভাগই পানীয় জলের মারফতে হইয়া থাকে, কথাটা নিতান্তই সহজ ভাবে একটু খুলিয়া বলি।

সকলেই বোধ করি জানেন কলেরার জীবাণু কলেরা রোগীর ভেদ ও বমন সঙ্গে বাহির হইয়া থাকে। উহারা 'হুক্‌ওয়ার্মের' মত গাছে উঠিতে পারে না "great climbers" কিম্বা বাতাসের গায়ে গ্যাসের মত মিশিয়াও থাকেনা। এই কীটাণু পানীয় জল কিম্বা আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে উদরস্থ হইয়াই সর্ব্বনাশ করে।

মনে করুন, পাড়ায় এক বাটীতে একটী লোক কোন মেলা হইতে কলেরার জীবাণু উদরে পুরিয়া ঘরে আসা মাত্রই রোগাক্রান্ত হইল। প্রথমে যত সময় তাহার চলিবার শক্তি থাকে, পায়খানায় গেল। তার-পার অতদূর আর যাইবার অবসর না পাওয়ায় ঘরের বাহিরে যেখানে সেখানে এমন কি ক্রমে শক্তি হারা হইয়া বিছানায়ই দাস্ত বমি হইতে লাগিল। ঘরের লোক তাহাকে নিয়া ব্যস্ত বিশেষতঃ কলেরার আতঙ্কটাও বড় বিষম, তখন দাস্ত বমি পরিষ্কারের দিকে আর কাহার খেয়াল থাকিতে পারে! ওদিকে পূর্ব্বসঞ্চিত আবর্জ্জনায় অসংখ্য মাছির আড্ডা; খবর পাইয়া তাহারা ফলারে বামুনের মত পালের পাল আসিয়া জুটিল।

দেবীর কৃপায় রোগী বাঁচিলে তো কথাই নাই, না বাঁচিলেও সময়মত তাহার কাপড় বিছানা কিম্বা বমির বাসন কিছু থাকিলে বাটি সংলগ্ন পুকুরে নিয়া সব ধৌত করা হইল। এখন ফলে জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ আর যাও কোথায়!

পুকুর হইতে কলসী ভরিয়া রোগ জীবাণু ঘরে আনিলে আর মাছি গুলা তাহাদের পায়ে বেশ করিয়া রোগ জীবাণু মাখিয়া তোমার ডাল ভাত তরকারীর উপর বসিল। তোমার অজানিত ভাবে এই প্রকারে কলেরা জীবাণু উদরস্থ হইয়া সেই দিনই না হইলেও ৮।১০ দিন মধ্যেই তোমাকেও পটল তোলাইল। এই ভাবেই এক এক সময় এক একটা পল্লী, এক একটা গ্রাম একেবারে উচ্ছন্ন যাইয়া থাকে। আমাশায় এবং টাইফডের আক্রমণটাও অনেকটা প্রায় এইরূপই হয়।

এখন ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম হইতে যদি আমরা সাবধান হই তবে আর এত বিপদের ভিতর পড়িতে হয় না। এমতাবস্থায় শুধু হরিসঙ্কীর্ত্তন বা রক্ষাকালীর পূজা না করিয়া আমাদিগকে আরও কিছু করিতে হইবে।

(১) রোগীর দাস্ত বমি প্রভৃতি তৎক্ষণাৎই জলাশয় হইতে দূরে কোথাও একটা গর্ত্ত করিয়া মাটি চাপা দেওয়া দরকার। উহা ফেনাইলে শোধন করিয়া ফেলাই ভাল।

(২) অবস্থায় কুলাইলে রোগীর বিছানা কাপড় ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবে নতুবা অগত্যা একটা টিনে ফিনাইল জল পুরিয়া তাহাতে খুব সিদ্ধ করিবে এবং পরে দূরে কোথাও জল টানিয়া নিয়া সাবান মাখিয়া কাচিবে।

(৩) আহার্য্য জিনিষ সব সাবধান মত ঢাকিয়া রাখিবে যেন তাহাতে মাছি পড়িতে না পারে। যেখানে মাছির আমদানী বেশী তথায় 'tanglefoot' ইত্যাদি দ্বারা মাছি ধ্বংস করা উচিত।

(৪) কলেরা জীবাণু খুব সহজেই মরিয়া যায়। পানীয় জল ফুটাইয়া তাহা পরিষ্কার মত ছাকিয়া নিলে সকল দোষ নষ্ট হয় সহজে কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) পটাশ পারম্যাঙ্গানাশও উক্ত প্রকারের সব দোষ নষ্ট করে। যাহারা কূপ জল ব্যবহার করেন, তাহারা কূপের ভিতর পটাশ পারমাঙ্গানাশের সলিউশন ঢালিয়া দিবেন জলের রং একটু ভায়লেট হওয়া উচিত।

(৬) কলেরার সময় পুষ্করিণীর জলে বাসনাদি ধুইয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখার পূর্ব্বে একবার গরমজলে বাসন-গুলা ধুইয়া নেওয়া ভাল।

(৭) কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা কারীর হাত পা ভালরূপে ফিনাইল জলে ধুইয়া পরে অন্যত্র যাওয়া কিম্বা আহারাদি করা উচিত। জুতা পায়ে রোগীর কাছে গেলে সে জুতার তলাও ফিনাইলে ধৌত করিয়া বাহির হওয়া উচিত।

(৮) আহারাদি সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক কিন্তু সে সব আর বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। মোট কথা স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন নিয়মই পালন করিতে হইবে।

এখন বস্ত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা একটু আলোচনা করা যাক। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সভ্যতার জন্যই বস্ত্রের প্রয়োজন। সভ্যতা সম্বন্ধে কোন কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেহের ভিতরকার অনেক ময়লা চর্ম্ম মধ্যস্থ লোমকূপ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা দ্বারা আমরা শরীর পরিষ্কার রাখি। জামা গায়ে থাকিলে বাহিরের কোন ময়লা গায়ে লাগিতে পারে না জামাতেই লাগে। গায়ের ময়লায় জামার ভিতর দিক অপরিষ্কৃত হয়। কেহ কেহ ময়লা লাগার ভয়ে সাদা জামা ব্যবহার করেন না কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ময়লা দেখার ভয়ই বলা যাইতে পারে। কাল বা অন্য কোন রংএর কাপড়ের এমন গুণ নাই যাহাতে ধুলা বালি বা কোন প্রকার কিছু না লাগিতে পারে। ফলে আমরা সে সব রঙ্গিন-বস্ত্র দীর্ঘকাল না ধুইয়া শুধু ময়লার বোঝাই বহিয়া মরি। কাহারও কাহারও জামা কাপড়ে এজন্য বিষম দুর্গন্ধ হইয়া উঠে।

ধূলিকণায় অসংখ্য রোগ বীজাণু থাকে। বিশেষতঃ যাহারা রোগীর কাছে যাতায়াত করেন তাহাদের বিশেষ



সাবধান হওয়া উচিত। অবস্থা গতিকে যিনি একাধিক জামা ব্যবহার করিতে না পারেন তিনি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিনও যেন সাবান দিয়া জামাটী ধুইয়া নেন। ময়লা নূতন জামা অপেক্ষা পরিষ্কৃত ছিন্ন জামাও ভাল। স্বাস্থ্যের সহিত মনেরও নিকট সম্বন্ধ। পরিষ্কার জামা, পরিষ্কার কাপড় খানি পরিধানে থাকিলে মনও প্রফুল্ল থাকে। অপরিষ্কার, ময়লা বস্ত্র পরিধানে নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ হইতে পারে।

একের ব্যবহৃত জামা অন্যের ব্যবহার করা নিতান্তই অন্যায়। বিশেষতঃ গামছা যার তার ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। ব্যারাম কখনো আপন পর বাছিয়া হয় না। পরিবার মধ্যেও গামছা এক এক জনের এক এক খানা থাকা দরকার। মূল্যবান টারকিস তোয়ালে না হইলেও অন্ততঃ পরিষ্কার কাপড়ের টুকরাও গামছার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যায়ামাদি অন্যান্য যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে স্বাস্থ্য-সমাচারে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আমার আর এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা বাহুল্য। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রায় সকলেই জানেন কিন্তু দুঃখের বিষয় জানিয়াও না যাঁহারা জানেন না তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলেও তদনুযায়ী চলিতে অনেকেই অবহেলা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত নিয়মাদির প্রতি অমনোযোগ প্রকাশ না করিয়া একটু সতর্কতার সহিত চলিলেই আমরা বোধ হয় অনেকটা সুস্থ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

# কৃত্রিম উপায়ে শিশুপালন ও তাহার অপকারিতা

ইয়োরপীয় আচারের অন্ধ অনুকরণ বশতঃ আমরা যে অনেক সময় আমাদের সমাজের কতদূর অনিষ্ট করি তাহা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কিরূপ অজ্ঞ তাহা বেশ প্রতীত হয়। সকলেই অবগত আছেন যে আজকাল আমাদের দেশে বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে সন্তান পালনের জন্য রবারের চুচুক, ফিডিং বট্‌ল ( Feeding bottle ) ও নানাবিধ পেটেণ্ট খাদ্য বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হয়। এই সব জিনিষের জন্য যে বেশ অর্থব্যয় হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু এই সমস্ত অর্থব্যয়ের বিনিময়ে উপকার পাওয়া দূরের কথা প্রভূত অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এতই জ্ঞানহীন যে এই সমস্ত চকচকে জিনিষ ব্যবহারের চলাচল কি বিষময় তাহা ভাবিয়া না দেখিয়াই অকাতরে এমন কি কষ্ট সাধ্য হইলেও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি গত ১৯১৭-১৮ সালের শীতকালে শিশু মৃত্যুর নিবারণ কল্পে বিলাতে যে জাতীয় অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এই সমস্ত রবারের চুচুক, ফিডিং বট্‌ল, পেটেণ্ট খাদ্য প্রভৃতি জিনিষ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে শিশু পালনের ফলাফল যে কি তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল ও অনেকগুলি ছাত্রকে এই সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই সভায় পরীক্ষার্থী প্রায় ৪০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সম্মুখে যে সব প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছিল একে একে আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

(১) রবার নির্ম্মিত চুচুক ব্যবহারের ফলাফল :— এই জিনিষটী একটী রবারের নলে নির্ম্মিত; শিশু পাছে কান্নাকাটি করে এই জন্য তাহার মুখে এই নলটী লাগাইয়া রাখা হয়। শিশু এইটী চুষিতে চুষিতে ক্রন্দনে নিরস্ত থাকে। কিন্তু এইরূপে জোর করিয়া শিশুকে "লক্ষ্মী ছেলে" করিতে যাইয়া তাহার দৈহিক প্রভূত অনিষ্ট করা হয়। প্রথমতঃ এই জিনিষটী অবলম্বন করিয়া অনেক দূষিত জীবাণু শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। অনেক সময় চুচুকটী মেঝের উপর পড়িয়া থাকে বা অন্য প্রকারে কোনরূপে অপরিষ্কৃত হয় এবং প্রায়ই সেই ময়লা যুক্ত নল শিশুর মুখে তুলিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় ঐ নলটীর উপর মাছি বসে তাহার ফলে নলটীতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণু উপস্থিত হয় এবং তাহারা অবাধে শিশুর দেহে প্রবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপে ক্রমাগত চুষিবার ফলে শিশুর তালু ও চোয়ালের গঠন স্বাভাবিক হইতে পারে না। শিশুর চোয়াল যে অনেক সময় সম্মুখের দিকে অযথা বর্দ্ধিত ও দন্তের গঠন অসমান হইতে দেখা যায়, তাহা এইরূপ চুচুক ব্যবহারের ফল।

তৃতীয়তঃ, এইরূপ অভ্যস্থ হইলে মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলা শিশুর অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে নাসিকা, গলদেশ ও কর্ণ সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই কদভ্যাসের ফলে পরিনামে শিশু পরিণত বয়সে ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইতে পারে।

Tube Bottle (টিউব বটল) এই জিনিষটী আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রচলনে আর কোন উপকার না হইলেও আসলে এই হইয়াছে যে ইহার দ্বারা দুগ্ধ খাওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বহু রোগের জীবাণু ও নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ খাওয়ান হইয়া থাকে। ইহার নলটী, যাহা দিয়া শিশুর মুখে দুগ্ধ যায়, সেটী পরিষ্কার করা অসম্ভব। তাহার ফলে নলের ভিতরের গায়ে কিছু দুগ্ধ লাগিয়া থাকে এবং ক্রমে সেই দুগ্ধের রাসায়নিক বিয়োগ সাধিত হইয়া ( Lactic Acid ) ল্যাকটিক্ এসিড্ নামক বিষাক্ত পদার্থ সঞ্জাত ও নানাবিধ জীবাণু উৎপন্ন হইয়া বেশ নির্ব্বিবাদে শিশুর উদরস্থ হইতে থাকে। অনেক সময় আবার দীর্ঘনলটী বায়ুপূর্ণ থাকে এবং সেই বায়ু শিশুর উদরস্থ হইয়া শিশুর অজীর্ণ হয়। আবার এই বোতল হাতে করিয়া ধরিয়া থাকাও অনেক সময় অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করা হয় সুতরাং সে অসুবিধা এড়াইবার জন্য বেশ একটী লম্বা নলযুক্ত বোতল ব্যবহার করা হয়। তাহার ফলে বোতলটী আর হাতে করিয়া ধরিয়া থাকিতে হয় না, সেটীকে শিশুর পার্শ্বে সংস্থাপিত করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিশুর পালয়িত্রীর কিছু সুবিধা হয় বটে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা শিশুর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয় না। এইরূপ ব্যবস্থায় অনেক সময় শিশু নল মুখে দিয়াই খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়ে ও ফলে মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে অভ্যস্থ হয় এবং আহারের সময়েরও ঠিক থাকে না, কারণ অর্দ্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সেই দুগ্ধ খাইতে আরম্ভ করে। অধিকন্তু অনেক সময় বোতলটী বায়ুপূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেই বায়ু উদরস্থ হইয়া শিশুর অজীর্ণতার সৃষ্টি করে।

Patent Foods—(পেটেণ্ট খাদ্য) আজকাল শিশুদের জন্য অনেক প্রকার পেটেণ্ট খাদ্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা সকলেরই জানা উচিত যে এই সমস্ত কৃত্রিম দ্রব্য যতই সাবধানে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হউক না কেন তাহা যে কখনও প্রকৃতি প্রদত্ত মাতৃ-দুগ্ধের সমতুল্য হইতে পারে না ইহা ধ্রুব। স্বভাব জাত খাদ্য দ্রব্যে যে সমস্ত শরীর পোষনের উপযোগী বস্তু পাওয়া যায় তাহা পেটেণ্ট খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে না। তাহার পর এই সমস্ত খাদ্যে অতিরিক্ত পরিমানে শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকায় সেগুলি ৯ মাসের নিম্নবয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হয়। অধিকন্তু এই সকল খাদ্য আবার শিশুর পালয়িত্রীদিগের



আলস্যতা ও অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত যথানিয়মে প্রস্তুত করা হয় না এবং কৌটা খোলার পর সাবধানে সেগুলি অনেক সময় বন্ধ করা হয় না তজ্জন্য তাহা নানাপ্রকারে দূষিত হইয়া যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। প্রয়োজন বোধে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১। স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গো-দুগ্ধ ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতা।

শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধই যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু তথাপি নানাকারণে গো-দুগ্ধের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের দেশে সকল শিশুই স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে গো-দুগ্ধ পান করে। কিন্তু এই গো-দুগ্ধ কিরূপ প্রণালীতে ব্যবহার করিলে নিরাপদ হয় ও শিশুর শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এ বিষয়ে কিছু জানিয়া রাখা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বোধ সকলেই স্বীকার করিবেন। গো দুগ্ধে প্রোটিনের ( Protein ) ভাগ অত্যন্ত বেশী এবং চর্ব্বি ও শর্করার ভাগ কম। এইজন্য গো-দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হইলে সমান অংশ দুগ্ধ ও সমান অংশ বিশুদ্ধ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কিছু শর্করা মিশ্রিত করিয়া লইলে উক্তরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ প্রায় মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য গুণবিশিষ্ট হয় এবং শিশুর পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হয়। গো-দুগ্ধ ব্যবহার কালে আরও একটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গাভীর অনেক সময় ক্ষয় রোগ বর্ত্তমান থাকে এবং সাধারণতঃ গো-দুগ্ধ স্থানান্তর হইতে আনিতে হয় তজ্জন্য দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং দুগ্ধবতী গাভী যাহাতে সুস্থকায় হয় তাহাতে লক্ষ্য রাখা উচিত। দুগ্ধ ফুটাইয়া না লইয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে কারণ গরম হইলে উহার সমস্ত দোষই নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে প্রায়ই দুগ্ধ গরম না করিয়া ব্যবহার করা হয় না। এ ব্যবস্থা যে অতি উত্তম ও বৈজ্ঞানিক তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। **শিশুর কর্ণপীড়া ও তাহার লক্ষণ :**—শিশুগনের প্রায়ই কর্ণপীড়া হইয়া থাকে। দূষিত জ্বর, রক্তজ্বর ( Scarlet fever) এবং হাম প্রভৃতির পরে অনেক সময় কর্ণরোগ হইতে দেখা যায়। একজিমা ( Eczema ) ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শিশু অস্থির হয় এবং মধ্যে মধ্যে পীড়াক্রান্ত কর্ণে হাত দেয় ও বালিসের উপর মাথা দিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া গড়াইতে থাকে।

৩। **শিশুদিগের ব্রংকাইটিস ( Brenchitis ) ও তাহার কারণ এবং নিবারণের উপায় :**—আজকাল এই পীড়া শিশুদিগের মধ্যে বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে আমাদের দেশে যে কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। প্রতিবৎসর দেশের অমূল্য সম্পত্তি ও ভবিষ্যতের আশা ভরসা বহুশিশু এই রোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে। যাহারা অনেক যত্নে ও পরিশ্রমের ফলে রক্ষা পাইতেছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইতেছে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় প্রায়ই শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ক সাধারণ নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবজ্ঞাই ইহার প্রধান কারণ। রৌদ্র ও বায়ুর সম্পর্কশূন্য বদ্ধগৃহের মধ্যে বাস, অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার, বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাব ইত্যাদিই এই সমস্ত রোগের মূল। অনেকে দারিদ্রের কঠোর পীড়নে নিপীড়িত হইয়া এই সমস্ত জানিয়াও অভাবের জন্য এই সমস্ত কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক সময় এই রোগ উপস্থিত হয়। এইজন্য শিশুগণের পরিচ্ছদ যাহাতে বেশ উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে সে বিষয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। অনেক সময় উক্ত রোগগ্রস্ত লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংস্রবে থাকিয়া এই রোগ শিশুদেহে সংক্রামিত হয়। আমাদের দেশে অনেক লোক এক শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যায়। সেই কারণে অনেক সময় রুগ্ন মাতা বা পিতার নিশ্বাস বায়ু হইতে এই রোগ সন্তানের দেহে সংক্রামিত হয়। শরীর দুর্ব্বল হইলে অতি সহজে শিশু ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য শিশুর শরীর যাহাতে সবল ও সুস্থ থাকে এবং যাহাতে পুষ্টিকর এবং উপযোগী আহার, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং উন্মুক্ত বায়ু প্রয়োজন মত শিশু প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় করা অতি প্রয়োজনীয়। শিশুদের যাহাতে হঠাৎ কোনরূপে ঠাণ্ডা না লাগে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ অনেকেই শরীরের আবশ্যকীয় উত্তাপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবগত নহে। যাহাতে শিশুশরীরে নিয়মানুগত তাপ রক্ষিত হয় ও গরম স্থান হইতে হঠাৎ কোন বেশী ঠাণ্ডা স্থানে লইয়া গিয়া ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে না পারে এই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত রাখিতে হইবে এবং যাহাতে শিশুর সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শিশু যে ঘরে শয়ন করিবে রাত্রিকালেও তাহার ২।১টী জানালা খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বাতাস ঠিক সোজাভাবে শিশুর শরীরে না লাগে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক শিশু মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করে। ইহা অতীব খারাপ। শিশুরা যাহাতে উক্তরূপ না করে এবং নাক দিয়া নিয়মমত নিশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ না করে তাহা দেখা কর্ত্তব্য কারণ তাহাতে ফুসফুসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও শিশুপক্ষে উপকার হইয়া থাকে। শিশুদের আহারের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহাতে কোনরূপে অস্বাস্থ্যকর আহার্য থাইতে না পায় তাহা সর্ব্বদা দেখিতে হইবে।

অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন কাঁরা সকল সময়ে সকলের বিশেষতঃ দরিদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব ও আমাদের অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য উপরোক্তরূপ নিয়মানুযায়ী চলিতে সক্ষম হইনা কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই সমস্ত দুর্গতির কারণ অনেক স্থলেই আমাদের আলস্যতা উদাসীনতা ও অজ্ঞতা বশতঃই হইয়া থাকে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সব অবস্থাতেই স্বভাবের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত এবং সেই স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সুস্থভাবে বহুবিধ রোগের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তির সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। কৃত্রিমতা যতটা ত্যাগ করিতে পারা যায় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল ইহা বোধ করি এক্ষণে অনেকেই স্বীকার করিবে না।



# মানব দেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

### চক্ষুঃ।

গঠন কৌশলে, যন্ত্রতন্ত্রের বৈচিত্রে এবং শক্তির চমৎকারিত্বে চক্ষুঃ বা দর্শনেন্দ্রিয় বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। সুতরাং আমরা চক্ষু সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ভ্রূযুগল, চক্ষের পক্ষমালা এবং নেত্র পল্লবদ্বয় চক্ষুদ্বয়ের বাহ্য উপাঙ্গ। ইহারা অক্ষি গোলকের রক্ষার্থ সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। নেত্র-পল্লব দ্বয় পৈশিক তন্তুমালা দ্বারা রচিত, উপরের পিঠ চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং ভিতর দিকের পিঠ অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ দ্বারা আবৃত। এই আস্তরণ বা সূক্ষ্ম ঝিল্লির নাম, (The Conjunctive) "যোজনিকা"। নেত্র পল্লবের উপাদানভূত পেশী তন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই পেশী-তন্তুর নাম (Orbicularis oculi) নেত্র-পরিবেষ্টক পেশী। এই পৈশিক তন্তুমালা যেমন নয়ন পল্লবের অভ্যন্তর ভাগটি আবরণ করিতেছে, সেইরূপ অক্ষি গোলকদ্বয়ের শ্বেত ভাগও আবৃত করিয়া রহিয়াছে। 'নেত্র পল্লবের "যোজনিকা" (Conjunctive) অতি সূক্ষ্ম বা পাতলা। সামান্য কারণে ইহা প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হয়। এই সব নেত্রের বাহ্য উপাঙ্গ ব্যতীত প্রতি অক্ষি-কোটরে খানিকটা করিয়া মেদ আছে, ঐ মেদ মধ্যে অক্ষি-গোলক সন্নিবিষ্ট। অক্ষিকোটরগত মেদপুঞ্জ দ্বারাও নেত্ররক্ষা কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। চক্ষের উপর মুষ্টাঘাতে অক্ষি-গোলক ছিন্ন ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু নেত্র-কোটরে সঞ্চিত মেদ চক্ষুকে ঐ বিপদ হইতে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।

চক্ষুর উপরিভাগটি এত কোমল যে সর্ব্বদা অক্ষি-মার্জ্জন ও প্রক্ষালন আবশ্যক। এই কার্য্য পরিচালনার জন্য "অশ্রুসেকগ্রন্থি" (Lachrymal gland) নামক একটি গ্রন্থি আছে। চক্ষুর যে অংশটি নাসিকা হইতে দুরবর্ত্তী সেই স্থানেই গ্রন্থি নিহিত। অশ্রুসেক-গ্রন্থি ক্রমাগত রক্তের কয়েকটি উপাদান সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদয়কে অশ্রুতে পরিণত করিতেছে। যে পরিমাণ অশ্রু অক্ষি-মার্জ্জনা ও উহাকে সরস রাখার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সাধারণতঃ অশ্রুসেকগ্রন্থি সেই পরিমাণ অশ্রু প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যখন ব্যাথিত ও ভাবোচ্ছাসের অধীন হয়, সে সময় এই গ্রন্থিযোগে প্রচুর অশ্রু উৎপন্ন হইতে থাকে এবং অশ্রুরাশি চক্ষুপ্লাবিত করিয়া দর বিগলিত ধারায় কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে। ঐ সময় অশ্রু চক্ষুর ভিতরের দিকের কোণে প্রবাহিত হয় এবং "অশ্রুনালী" (Tear-pipes) দ্বারা নাসা মধ্যে নীত হয়। এই জন্য যাহাদিগের শোক বা দুঃখাবেগ অত্যন্ত প্রবল হয়

তাহারা নাসাগত অশ্রু মোচন করিবার জন্য ঘন ঘন নাক ঝাড়িয়া থাকে।

মানব-দেহের শিল্পী মানবের অক্ষি গোলক দুইটি সুকোমল মেদ শয্যায় স্থাপন করিয়া এবং অশ্রুজল দ্বারা তাহাদিগের উপরিভাগ ধৌত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চক্ষু মুকুরে যাহাতে চারি পার্শ্বের পদার্থ সম্ভারের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং আমাদিগের জ্ঞানার্জ্জনের পথ মুক্ত হয় সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। অক্ষি-গোলকের সঞ্চালনের জন্য নূন্যকল্পে ছয় প্রকার পেশী আছে। এই ছয়টি পেশীর মধ্যে চারিটি "ঋজু-পেশী" ( Recti muscles ) এবং দুইটি "তির্য্যক্ পেশী" ( Oblique muscle ) নিম্নে নেত্রের যে প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, পাঠক তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ছয়টি পেশীর সাহায্যে অক্ষি-গোলকের সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝিতে পারিবেন।

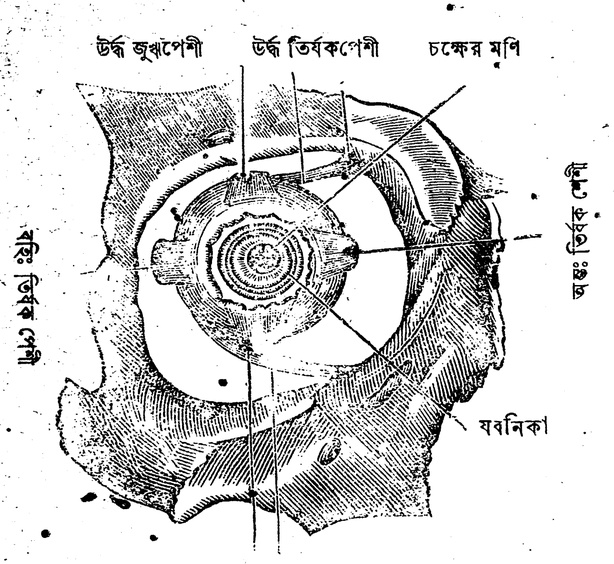




চিত্র ৭১—অক্ষিগোলকের বহিঃস্থ পেশী সমূহ।

অক্ষি-সঞ্চালক পেশী গুলির ক্রিয়া বড় জটিল। চক্ষু যাহাতে পাঠ্য পুস্তকের এক পংক্তি হইতে অন্য পংক্তিতে এবং একটি অক্ষর হইতে অন্য এক অক্ষরে সরিয়া যায় তজ্জন্য কিরূপ সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খলভাবে অক্ষি-পরিচালক পেশীর ক্রিয়া আবশ্যক, বোধ করি পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বলাবাহুল্য এই পেশীপুঞ্জের পরিচালনী যন্ত্র-শক্তি মানব-মস্তিকে নিহিত আছে। মস্তিষ্ক কোন কারণ বশতঃ আহত ও বিকল হইলে, চক্ষুর উপর উহার পূর্ব্ববৎ আধিপত্য থাকে না, সুতরাং চক্ষু একবার এদিকে, আবার অন্যদিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। যাহারা "ট্যারা"—( তির্য্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন ? ) চক্ষুর উপর তাহাদিগের অক্ষি-সঞ্চালক পেশী-সমূহের পূর্ণপ্রভাব বা আধিপত্য নাই। সেই জন্য তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহাদিগের চক্ষু যেন ঠিক তাহারা বিপরীত দিকে চাহিয়া থাকে।

এইবার আমরা চক্ষুর আস্তরণ বা ছদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মোটের উপর চক্ষুর প্রচ্ছদ তিনটি, যথা:—বহিঃপ্রচ্ছদ মধ্যপ্রচ্ছদ ও অন্তঃপ্রচ্ছদ। এই প্রচ্ছদত্রয়ের প্রতেকটি নেত্রের নির্দ্দিষ্ট অংশে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিশিষ্ট উপাঙ্গ (Structures) গড়িয়া তুলিয়াছে। চক্ষুর বহিঃপ্রচ্ছদে, "শ্বেতচ্ছদ" (Sclerotic coat) "স্বচ্ছচ্ছদ" (The cornea) নিহিত। মধ্য প্রচ্ছদে "কৃষ্ণচ্ছদ" (Choroid coat) "কৈশিকচ্ছদ" (Ciliary body) এবং "যবনিকা" (Iris) রহিয়াছে। এই যবনিকার মাঝখানে চক্ষের মণি (Pupil) নিহিত আছে।

অন্তঃপ্রচ্ছদটি স্নায়ু-জালক-নির্ম্মিত, ইহার নাম 'রেটিনা' (Ratina) বা অক্ষিমুকুর।

বহিঃপ্রচ্ছদটি চক্ষের শ্বেত এবং শক্ত আবরণ বা চর্ম্ম রচনা করিয়াছে। এই শ্বেত চর্ম্ম আবার অক্ষির অভ্যন্তরীণ সুকোমল প্রচ্ছদগুলিকে নানা উৎপাত উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতেছে। চক্ষের সম্মুখভাগে যেখানে কৃষ্ণতারকা নিহিত, সেখানে এই চর্ম্মের শ্বেত বর্ণ লোপ পাইয়াছে এবং উহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়াছে। এই স্থানটিকে চক্ষের Cornea বা স্বচ্ছচ্ছদ বলে। এই ছদটি সচ্ছ বলিয়া উহার নিম্নবর্ত্তী প্রচ্ছদের কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর কেন্দ্র স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।



মধ্যপ্রচ্ছদটি রঞ্জিত আস্তরণ বা ছদ। ব্যক্তি ভেদে এই আস্তরণের বর্ণরাগ কৃষ্ণ, ধূসর, হরিৎ, নীলাভ এবং রক্তাভ হইয়া থাকে। চক্ষুর সম্মুখভাগে যেখানে শ্বেতচ্ছদের বিরাম ঘটিয়াছে, ঠিক সেই খানে মধ্যপ্রচ্ছদ কয়েকটি ভাঁজে বিন্যস্ত হইয়া কৈশিকচ্ছদ (Ciliary body) গঠন করিয়াছে, তাহার পর ঠিক স্বচ্ছচ্ছদের (Cornea) পশ্চাতে একটু ঠেলিয়া উঠিয়া গোলাকার যবনিকা (Iris) নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই গোলাকার যবনিকার মধ্যস্থ গোলাকার গর্ত্তটি চক্ষের মণি (Pupil) চক্ষের এই মণিটীর আকার বড় পরিবর্ত্তনশীল। ছায়াতে চক্ষুর মণি সম্প্রসারিত হইয়া যতদূর সম্ভব সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করে, কিন্তু রৌদ্রে উহা সঙ্কুচিত ও আকারে ক্ষুদ্র হয়, তখন চক্ষুর মণি প্রয়োজনাতিরিক্ত রবি রশ্মির আগম রোধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কোমল ও সূক্ষ্ম উপাঙ্গগুলিকে সৌর করাভিঘাত হইতে রক্ষা করে। চক্ষের গোলাকার যবনিকায় যে সূক্ষ্ম পেশী সমূহ বিন্যস্ত আছে,

চিত্র ৭২—ছেদিত চক্ষু গোলকের প্রতিকৃতি।

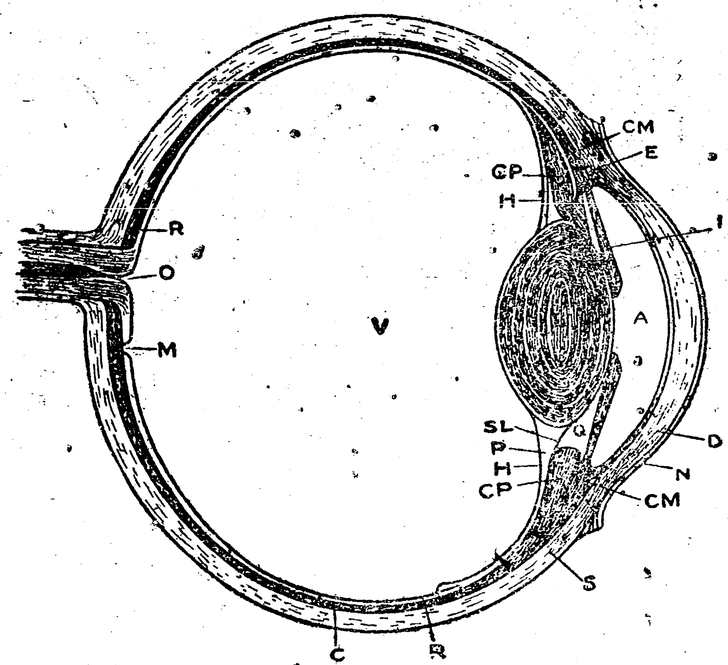




**DIAGRAM OF HUMAN EYE IN SECTION.**

S. Sclerotic.
D. Cornea.
N. Epithelial Layer of Cornea.
C. Choroid.
I. Iris.
C.P. Ciliary Processes.
C.M. Ciliary Muscle.
E. Canal of Schlemm.
R. Retina.
M. Macula Lutea.
O. Optic Disc
S.L. Suspensory Ligament of Lens.
H. Hyaloid Membrane.
P. Canal of Petit.
V. Vitreous Humour.
Q. Posterior Chamber.
A. Anterior Chamber.
L. Crystalline Lens.

তাহাদিগের আকুঞ্চন দ্বারা নেত্রের মণির আকারে পরিবর্ত্তন ঘটে। পাঠক, তাঁহার কোন বন্ধুর নেত্র সম্মুখে দুই মিনিট কাল হাত রাখিয়া তাঁহার চক্ষুতে আলোকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। চক্ষের সম্মুখে হাত রাখিয়া মাত্র আলোক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে প্রথমে চক্ষের মণি বড় হইবে, কিন্তু হাত সরাইবা মাত্র আলোক সংস্পর্শে চক্ষের মণি পূর্ব্বের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইবে।

চক্ষুর যবনিকার ঠিক পশ্চাতে "Lens" বা "স্ফটিক ফলক" বিন্যস্ত, ইহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং পলাণ্ডু বা পিয়াজের ন্যায় স্বতন্ত্র-স্তর-পরম্পরার বিন্যাসে সমুৎপন্ন। এই স্ফটিক ফলক বন্ধনী সমূহের দ্বারা কৈশিকচ্ছদ ( Ciliary body ) হইতে বিলম্বিত হইয়াছে। স্ফটিক-ফলক-সংশ্লিষ্ট কৈশিক পেশীমালার পরিচালনা ফলে, উহার বন্ধনীগুলি শিথিল এবং সংপ্রসারিত হইতে পারে। দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা বিষয়ে এই পেশীর (Ciliary muscle) উপযোগিতা কিরূপ তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রদর্শন করিব। যবনিকার সম্মুখভাগে এবং Cornea অর্থাৎ স্বচ্ছচ্ছদের পশ্চাতে দৃষ্টিজল (Aqueous Humour) নামে এক প্রকার জল আছে। আবার চক্ষুর যবনিকা ও স্ফটিক ফলকের পশ্চাতে যে বৃহৎ আধারটি আছে; ঐ আধরটিও এক প্রকার অর্দ্ধ তরল ও স্বচ্ছ জলীয় উপাদানে পূর্ণ। এই উপাদান বস্তুর নাম "স্ফটিকাকার জল" (Vitreous humour) আলোকরশ্মি গুলি চক্ষের মণির সাহায্যে চক্ষুর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক সকলের আগে 'দৃষ্টিজল' ভেদ করিয়া স্ফটিক-ফলকে প্রতিহত হয়, তাহার পর ঐ রশ্মিগুলি স্ফটিক ফলক (Crystalline lens) ও স্ফটিকাকার জল ভেদ করিয়া চক্ষুর উত্তেজনা প্রবণ অংশে উপনীত হয়। এই উত্তেজনাপ্রবণ অংশটিই চক্ষুর তৃতীয় আস্তরণ, উহার নাম 'রেটিনা' (Ratena) অর্থাৎ অক্ষি-মুকুর। চক্ষুর এই অংশটি জালের ন্যায় স্নায়ুতন্তুমালার দ্বারা নির্ম্মিত। এই অক্ষি-মুকুর অক্ষি-গোলকের ঠিক পশ্চাতে স্ফটিকাকার জলীয় বস্তুপূর্ণ আধারটি প্রায় চারিদিক বেড়িয়া রহিয়াছে। এই অক্ষি-মুকুর মস্তিষ্কের দ্বিতীয় স্নায়ু বা দৃষ্টি স্নায়ুর প্রান্তভাগগুলির দ্বারা রচিত। আমরা যে সকল বস্তু দেখি, অক্ষি মুকুরে তাহার একটি প্রতিবিম্ব পড়ে। ঐ প্রতিবিম্বটি উল্টা অর্থাৎ নিম্নমুখ ও উর্দ্ধপদ। এখন কথা হইতে পারে! আমাদিগের চক্ষে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব যখন আলোক রশ্মি দ্বারা এইরূপ উল্টাভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন আমরা আসল জিনিষগুলা উল্টা না দেখিয়া ঠিকমত দেখি কেন! অক্ষি-মুকুরে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব কি ভাবে পড়ে, সে কথা লইয়াই ত মানুষের বিচার, দৃষ্টবস্তুর আকৃতির অনুভূতিই তাহার দর্শনের বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে একটু বিচার করিয়া কথা কহিতে হইলে বলিতে হয়, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে চক্ষু দিয়া দেখি না মস্তিষ্ক দ্বারাই দেখিয়া থাকি, আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় বাহিরের প্রেরণা সংগ্রহের এবং তাহাদিগকে রূপান্তরদান পূর্ব্বক মস্তিষ্কের অনুভূতি গম্য করিবার যন্ত্র মাত্র।

কেহ যদি একটি বহিঃপ্রসারী ( Convex ) স্ফটিক-ফলকের সম্মুখে একটি জলন্ত বাতি রাখিয়া দেন এবং বাতিটার ঠিক বিপরীত দিকে উহার প্রতিবিম্ব ফুটাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রক্ষিপ্ত প্রতিবিম্বটি উল্টা অর্থাৎ নিম্নমুখ ও উর্দ্ধপাদ হইবে। যেখানে বাতিটি রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরবর্ত্তী একটি স্থানে প্রতিবিম্বগ্রাহী যবনিকা বা পর্দ্দা রাখিতে হইবে। এই যবনিকা বিন্যাসে ত্রুটি ঘটিলে বাতিটিকে যথাস্থান হইতে সরাইলে প্রতিবিম্ব অস্ফুট হইবে। মানব চক্ষুর দৃষ্টি-ক্রিয়া-সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যনেত্রের স্ফটিক ফলকটি বহিঃপ্রসারী ফলক ( Convex lens ), এবং রেটিনা বা অক্ষি-মুকুর প্রতিবিম্বগ্রাহী যবনিকা বা পট। এই পটের ( Screen ) উপরিভাগে বহিঃস্থ পদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠিতে পারে যে, বহিঃস্থ দর্শনীয় বস্তুসকল অক্ষির স্ফটিক-ফলকের কিছু দূরে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত, এ অবস্থায় দ্রষ্টব্য পদার্থ সকল দূরেই থাকু



কি কাছেই থাকুক, আমরা সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই কেন? এইবারে দর্শন কার্য্যটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য মানব-চক্ষুতে যন্ত্রতন্ত্রের,—অঙ্গোপাঙ্গের সুচারু সন্নিবেশ আছে ও সেই যন্ত্রতন্ত্র ও অঙ্গোপাঙ্গ সকল সর্ব্বদা কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। মানব-নয়নের স্ফটিক-ফলক ( Human Iens ) স্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ অবনমন ও উত্থানশীল উপাদানে নির্ম্মিত। সুতরাং প্রয়োজনানুসারে এই স্ফটিক ফলক আকুঞ্চিত হইতে এবং উহার বক্রভারও অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে। দর্শন ও পাঠকালে মানব চক্ষুর স্ফটিক ফলকের ঐ প্রকার আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং বক্রতার অবস্থান্তর প্রাপ্তি স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে। চক্ষুর কৈশিক পেশী ঐ প্রকার আকুঞ্চন ও প্রসারণ ও পরিবর্ত্তন সংঘটনে বিশেষ কার্য্যকর। যখন এই পেশীটি আকুঞ্চিত হয়, স্ফটিক ফলকের তখন উহার বন্ধনী গুলি ( Ligaments ) শিথিল হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্ফটিকফলক আকুঞ্চিত এবং অধিকতর বহিঃপ্রসারী হয়।

চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির ভিন্নতা বশতঃ কেহ দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন, কেহবা নিকট-দৃষ্টিশালী। যাহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা দূরস্থ বস্তু, আর যাহারা নিকট-দৃষ্টিশালী তাহারা নিকটস্থ বস্তু স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। সুতরাং দূর ও নিকটদর্শনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই দুই শ্রেণীর লোকদিগকে

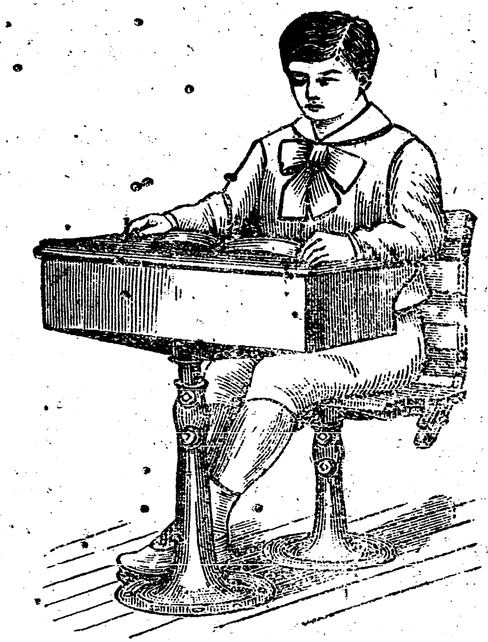

চিত্র ৭৪—পঠনকক্ষে যথোপযুক্ত ভাবে উপবেশন।

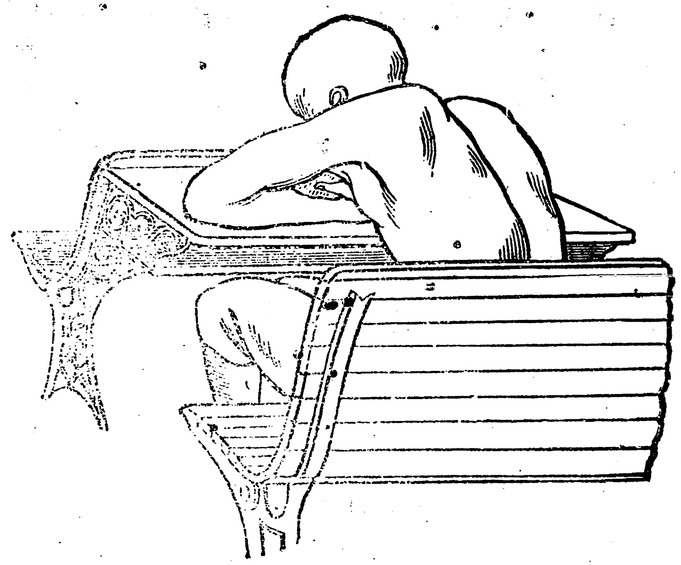

চিত্র ৭৩—পঠনকালে উপবেশনে ত্রুটি দেখান হইয়াছে।

চশমা ব্যবহার করিতে হয়। এই অবস্থায় চশমা ব্যবহার না করিলে, দর্শনকালে প্রয়োজনানুসঙ্গত চক্ষু গোলকের দৃষ্টিশক্তি বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য মানুষকে অতিরিক্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টিশক্তির বা নেত্রের উপর এইরূপ জবরদস্তির ফলে অনেক সময়ে বিষম শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। এইজন্য অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে থাকিলে তাহাদিগের চোখের দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হয়। শিরঃপীড়ায় কাতর বালক বালিকা বা যুবক যুবতীদিগের

নেত্র-পরীক্ষা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগের শিরঃ-পীড়া কেবল নেত্রের দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা প্রসূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

খর্ব্বদৃষ্টি ( Short Sighted ) ব্যক্তিদিগের নেত্র গোলক দীর্ঘ এইজন্য আলোক-রশ্মি তাহাদিগের অক্ষি-মুকুরে বস্তুর প্রতিবিম্ব-ক্ষেপ না করিয়া ইহার সম্মুখে প্রতিবিম্ব স্ফুরণ করে, সুতরাং ঐরূপ খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিরা অন্তঃপ্রসারী ( Concave ) চশমা ব্যবহার করিলে দৃষ্টিদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। দীর্ঘদৃষ্টি ( Long Sighted ) ব্যক্তিদিগের চক্ষের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। ইহাদিগের অক্ষি-গোলকের খর্ব্বত্ব হেতু আলোকরশ্মি অক্ষি-মুকুরে প্রতিভাত না হইয়া উহার পশ্চাতে প্রতিভাত হয়। সুতরাং চক্ষে যে প্রতিবিম্ব প্রক্ষিপ্ত বা উৎপন্ন হয়, তাহা খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিদিগের চক্ষুস্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় অস্পষ্ট। আমাদিগের দেশের অনেক ছাত্রর দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল। লিখন ও পঠনকালে উপবেশনের ত্রুটি বা দোষবশতঃ তাহাদিগের ঐরূপ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চিত্র দুইটি প্রদান করা হইয়াছে ( চিত্র সংখ্যা, ৭৩ ও ৭৪ ) তাহা দেখিলে, উপবেশনের ত্রুটি ঘটিলে আলোক রশ্মি অক্ষি মুকুরে পৌছিবার পূর্ব্বে করূপ বাঁকিয়া মুচড়াইয়া যায় এবং সম্মুখে বহি ঝুঁকিয়া ঋজুভাবে বসিলে কত সহজে আলোক রশ্মি নেত্র মুকুরে প্রতিবিম্বক্ষেপ করে তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

বালকবালিকাদিগকে টেবিলের উপর বা সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া লিখিতে পড়িতে বারণ করা সত্ত্বেও অনেক স্থলে বালকেরা সে কথা গ্রাহ্য করে না। বলা বাহুল্য এরূপ স্থলে যথেচ্ছাচারে বালকবালিকা দিগের দৃষ্টির দোষ ঘটিয়া থাকে।

আমরা পাঠকদিগকে চক্ষুর এবং উহার অভ্যন্তরীণ বিচিত্র অঙ্গোপাঙ্গের দর্শন ক্রিয়ার অনেক পরিচয় দিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চক্ষুর 'রেটিনা' (Ratena) অর্থাৎ অক্ষি-মুকুরটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনাশীল বা ক্রিয়া-শক্তি সম্পন্ন (Sensative) এই অঙ্গের উপাঙ্গগুলি (Structures) নয়টি বা দশটি স্তরে বিন্যস্ত, যথা দণ্ড ও কোণিকাময় স্তর, (Layer of rods and cones), স্নায়ু-কোষিকাময় স্তর, (Layer of nerve cells), স্নায়ুতন্তুময় স্তর (Layer of nerve febers), প্রভৃতি। এই স্তর সকলের মধ্যে দণ্ড ও কোণিকাময় স্তরটি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিবিম্বগ্রাহী স্তর। কারণ যেখানটিতে দৃষ্টি স্নায়ু (Optic nerve) অক্ষি-গোলকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে দণ্ড ও কোণিকা সকল (Rods and cons) নাই, এখন যদি ঐখানটিতে কোন প্রতিবিম্বপাত হয় তথাপি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই স্থানটির নাম অন্ধক-স্থান (Blind spot) নিম্নে প্রকাশিত চিত্র দ্বারা পাঠক এই উক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

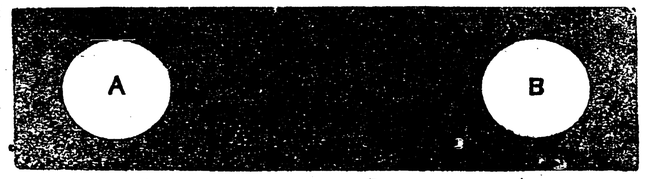


চিত্র ৭৫—চিত্রে অন্ধক-স্থানের অস্থিত্ব বোঝান হইয়াছে।

পরীক্ষা প্রণালী।—বাম চক্ষু মুদিয়া অভিনিবেশ সহকারে A অক্ষরটি নিরীক্ষণ কর, তাহার পর বহি খানি কাছের দিকে হউক কি দূরের দিকে হউক সরাও। খানিক দূরে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে B অক্ষরটি দেখা যাইবে না, কেননা উহার প্রতিবিম্ব অন্ধক-স্থানে পড়িয়াছে, সুতরাং দৃষ্টি স্নায়ুতে উহার কোন ক্রিয়া বা অনুভূতি হয় নাই।

---

# বিবিধ সংগ্রহ।

বে-সরকারী চিকিৎসালয়ে গভর্মেণ্টের সাহায্য গত তিন বৎসর যাবৎ গভর্মেণ্ট বঙ্গের বে-সরকারী চিকিৎসালয় সমূহের সাহায্যার্থ বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৮১ টাকা ব্যয় করিতেছেন।

---

হাঁসপাতালে দান—ময়মনসিংহ হাঁসপাতালের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজা শ্রীযুত শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ১লক্ষ টাকা এবং গৌরীপুরের জমিদার মান্যবর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ৪০ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হাঁসপাতালের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতল" করা হইয়াছে। এই হাঁসপাতালের নব-প্রতিষ্ঠিত যে গৃহে 'নার্সগণ বাস করিবেন. সেই গৃহের নাম হইবে 'রাজেন্দ্রকিশোর নার্স হোম'।

---

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মৃত্যু—গত ৪ঠা পৌষ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ ইহাঁরই অদম্য উৎসাহের ফল। বেলগাছিয়ার পূর্ব্বেকার মেডিকেল স্কুল আর 'জি:করের স্কুল' নামেই খ্যাত ছিল। ইনি বহু চিকিৎসাগ্রন্থও প্রনয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভীষণ প্রকোপ—বিলাতের প্রসিদ্ধ 'টাইমস্' পত্রে প্রকাশ—"প্রবল প্রকোপের সময় ১২ সপ্তাহের মধ্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে 'ব্লাক ডেথ্' (Black death) নামক মহামারী হইবার পরে এ পর্য্যন্ত আর কোন মহামারীই সমগ্র পৃথিবীর উপর এইরূপ সংক্রামতার বিস্তার করিয়া এতাদৃশ ভীষণ ধ্বংসলীলা প্রকট করে নাই। লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশের আবশ্যকতাও আর কোনও মহামারী এমন জোরে জাগাইয়া দেয় নাই।'

---

দিল্লীর ধাত্রী বিদ্যালয়ে প্রবেশের নিয়ম—দিল্লীতে নবজাত শিশুগণের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নব প্রসূতি-গণের শরীর রক্ষা ও শিশুপালন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি জন্য রমণী স্বাস্থ্য পরিদর্শিকাগণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রবেশার্থিনীগণের বয়স ২১ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক। তাহারা ম্যাট্রি-কুলেশন বা তাদৃশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এবং ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দেখাইতে হইবে; ইংরাজী ভাষায় এবং দেশীয় কোন একটি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেটও চাই। ছাত্রিগণকে মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য এম, আই, বালফুর, এম, বি, ডব্লিউ, এম, এস,

অবৈতনিক সম্পাদক কাউণ্টেস ডাফরিন ফাণ্ড, শিমলা এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

---

জেলাবোর্ডের সাহায্য—এ বৎসর সমর জ্বরে সমগ্র বঙ্গদেশে মহামারী উপস্থিত হইয়া বহুলোকের প্রাণ-নাশ ঘটিয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন জেলাবোর্ড সমূহ দরিদ্র ও বিপন্ন অধিবাসীবৃন্দের চিকিৎসার সাহায্যার্থ নিম্নলিখিতরূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন:—বর্দ্ধমান ৬৫০০৲ টাকা, বীরভূম ৫০৮০৲ টাকা, বাঁকুড়া ১৯১৬৲ টাকা, মেদিনীপুর ৩০৯২৲ টাকা, হুগলী ৩০০২৲ টাকা, হাওড়া ৪৭০৲ টাকা, নদীয়া ৪০০০৲ টাকা, মুর্শিদাবাদ ১২৩৩৲ টাকা, যশোহর ১৪০০৲ টাকা, খুলনা ১১০১৲ টাকা।

---

ভারতের স্বাস্থ্যবোর্ড—ভারতীয় স্বাস্থ্য কন্‌ফারেন্সের গত অধিবেশনে সার্জ্জন জেনারল এডওয়ার্ড সুপ্রকাশ করিয়াছেন—"ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে স্বাস্থ্য বোর্ড আছে। প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিশনার উহার কর্ত্তা। তাঁহাকে দুই, তিন, চারি বা পাঁচজন ডেপুটী স্বাস্থ্য কমিশনার সাহায্য করেন। কতিপয় জিলার দ্বারা গঠিত এক একটি মার্কেন ইহাদের অধীনে আছে। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য রক্ষার কোন কার্য্য এই বোর্ডে একরূপ করেন না। তথায় কিরূপে কার্য্য করা যাইতে পারিবে উহার একটি প্রস্তাবনা গবর্মেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

স্বাস্থ্য বোর্ডের বিধি ব্যবস্থা প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য ভারতগভর্মেণ্ট ইহার উপদেষ্টা মাত্র। এতৎ সংক্রান্তে জীবানুমত্ত্ব বিভাগ ভারত গভর্মেণ্টের শাসনে আছে। ইহা ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের অঙ্গীভূত। উক্ত বিভাগের ৩০ জন সরকারী সেণ্ট্রাল গবেষনা ইনিষ্টিটিউট, পাস্তুর ইনিষ্টিটিউট, প্রাদেশিক বীক্ষণাগার সমূহে মৌলিক তত্ত্বানু সন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।"

---

জাল কুইনাইন।—গভর্মেণ্ট নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন:—গভর্মেণ্ট জ্ঞাত হইয়াছেন যে, কলিকাতায় ও মফস্বলে, কতকগুলি অসাধু লোক সাল্‌ফেট অফ কুইনাইনে প্রস্তুত বলিয়া এক প্রকার ট্যাবলেট বা চাকৃতি তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। এইগুলি দেখিতে ডাকঘরে গোল শিশিতে বিক্রিত গভর্মেণ্টের কুইনাইনের চাকৃতির মত। কখনও ছোট ছোট পিজবোর্ডের বাক্সে, আবার কখনও টিনের চোঙ্গায় করিয়া এই সকল চাকৃতি বিক্রয় করা হইতেছে এবং বাক্স বা চোঙ্গার উপর "সাল্‌ফেট অফ্ কুইনাইনের ট্যাবলেট," বা "ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেট" এইরূপ লেবেল বা ছাপা কাগজ মারা আছে। আবার লেবেলের উপর নানারকমের নামের আদ্যক্ষর ছাপা আছে, যেমন—"আর, এন্, এস্, এণ্ড কোং," "বি এন্, ডি," "জে, বি, ডি" "আর, টি" "এস্, এন্, আর," "এ, এন্, টি," "এম্, টি, এণ্ড এ," "জে, এল্, ডি," আর্, এল্, ডি," "জে, সি ডি,"। এই সকল অক্ষরের ছাপ সচরাচর চাকৃতিগুলির উপরও থাকে এবং ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এগুলি গভর্মেণ্টের কুইনাইনের চাকৃতি নয়। কারণ, গভর্মেণ্টের কুইনাইনের চাকৃতির উপর একটি চওড়া তীরের ছাপ মারা থাকে। ঐ চাকৃতির নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের মধ্যে কুইনাইন প্রায় একেবারেই নাই এবং রোগ দূর করিবার কোন শক্তি উহাদের থাকিতে পারে না। এই প্রবঞ্চনা বন্ধ করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, এবং এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে ঠকাইবার চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে।




# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২৫ সাল | ১১শ সংখ্যা


## আলোচনা

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কথা—বর্ত্তমান বর্ষের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি বড়লাট বাহাদুর বক্তৃতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"গ্রেট ব্রিটন ও তন্মিত্রগণ মহাসমরে সাফল্য লাভ করিতে না করিতে পৃথিবীময় আর এক মহা উৎপাত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মহামারী অতি অল্প সময় মধ্যে পৃথিবীর বহু লক্ষ্য লোকের প্রাণ হরণ করিয়াছে।

চিকিৎসকগণ এই ভীষণ ব্যাধি দমন করিবার চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটী করিতেছেন না। ভারতবর্ষে এবং অপর যে সকল দেশে আধুনিক সুচিকিৎসার উৎকৃষ্টতর আয়োজন আছে সেই সমস্ত দেশেই ব্যাধি এমন অতর্কিত ভাবে নূতন লক্ষণসহ সহসা উপস্থিত হইয়াছে যে চিকিৎসকগণ তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। উক্ত ভীষণ মহামারীর সময়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে যে সহায়তা পাওয়া গিয়াছিল তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতবর্ষের চিকিৎসা বিভাগ ইহার ক্ষিপ্রতদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই রোগ নিবারণের নিমিত্ত টীকার বীজ প্রস্তুত প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। ইহার বিশেষ তদন্তের নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন।

কেহ কেহ এমন অভিযোগ করিতেছেন যে, এই মহামারীর প্রতীকার প্রচেষ্টায় ভারতগভর্মেণ্ট অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাহারা স্মরণ রাখিবেন যে, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসকগণও ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সফলতা লাভ করেন নাই। এইরূপ ব্যাপারে আগৌণে প্রতীকার লাভ মানব শক্তির অতীত। যদি প্লেগ বা অপর ভীষণ ব্যাধির প্রবল আক্রমণ হইতে আমরা ইতঃপূর্ব্বে সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই মহামারী আমাদিগকে সুশিক্ষা দান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, গত দুই মাসে বঙ্গের জিলা সমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গভর্মেণ্ট দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে "যাহাদের বরাবরে গভর্মেণ্ট মৃত্যু সংবাদ সংগ্রহ করেন তাহারা যথোপযুক্তরূপে রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং গভর্মেণ্ট এইরূপ হিসাব দিতে পারিলেন না।

এই রোগে গ্রামে ও নগরে কোথায় তুলনায় অধিক লোক মরিতেছে উহা বলিবার মত হিসাব গভর্মেণ্ট প্রাপ্ত হন নাই।"

গভর্মেণ্টের নিকট হইতে হিসাব পাওয়া না যাইলেও অনেকের মতে এদেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় যে বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনস্ কন্‌ফারেন্স—গত মাসের প্রথম দিকে কলিকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে নিখিল ভারতীয় সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনস কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতের সকল অংশ হইতেই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ৬ শত হইয়াছিল। বঙ্গের হাঁসপাতাল সমূহের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ মেজার জেনারল রবিন্‌সন্ সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর প্রথম দিন সভায় উপস্থিত হইয়া কন্‌ফারেন্স সংলগ্ন প্রদর্শনীয় দ্বার উন্মোচন করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম পৃথক স্থানে মুদ্রিত করা হইল।

কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন—"মহাসমরে সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ অতি প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া গভর্মেণ্ট ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষদের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের বেতন বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন আমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু ঐ বৃদ্ধি কোন কোন প্রদেশে চলিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র হয় নাই। বৃদ্ধির হার এখনও সন্তোষজনক হয় নাই। আমরা তজ্জন্য প্রত্যেক বৎসরই আন্দোলন করিতেছি। মিউনিসিপ্যালিটী ও জিলাবোর্ড এখনও বর্দ্ধিত হার গ্রহণ করেন নাই। চিকিৎসকদের রবিবার শনিবার নাই, সকল দিনই তাহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের বিদায় কাল বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। চিকিৎসকদিগের বাসের জন্য যে বাড়ী দেওয়া হয় উহা অতি জঘন্য। তাহাদের বাসস্থানের উৎকর্ষ সাধিত হওয়া উচিত।"

সভাপতি বলিয়াছেন—"বঙ্গদেশের সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের বেতন বাড়িয়াছে, অন্য প্রদেশেও বাড়িবে বলিয়া আশা করি। স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের হস্তে অর্পিত হইবে। উহাতে তাহারা উচ্চ বেতন পাইবেন। উক্ত প্রস্তাব এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।"

গঙ্গাসাগর মেলা ও বিসূচিকা—গত মাসের প্রথমে মেলার শেষে সাগর দ্বীপ হইতে কলেরা রোগাক্রান্ত এত অধিক সংখ্যক লোক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল যে, ঐ রোগীদের দ্বারা মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পবেল হাস্পাতালের কলেরার ওয়ার্ড পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভবানীপুর হাস্পাতালের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার্ডকে কলেরা ওয়ার্ডে পরিণত করা হইয়াছিল। কলিকাতায় যখন এত কলেরা রোগী আসিয়া পড়িতেছে তখন ব্যাধির বীজাণু ছড়াইয়া ব্যাধি পরিব্যাপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—সকলেরই মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যাহাতে বিস্তৃতি না ঘটে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সাধারণকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুখের বিষয় সহরে এই রোগের বিস্তৃতি ঘটে নাই।

শুশ্রূষাকারীর পুরস্কার।—মৈমনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে সেই জেলার বসন্ত রোগীর গ্রাম্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীদিগকে দুই সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এজন্য উক্ত বোর্ড হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে "১৯১৯-২০ সালে শুশ্রূষাকারী কবিরাজগণ মোট কত সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেন তাহার ফলাফল কোন সরকারী কি বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তির সার্টিফিকেট সহ বোর্ডে পাঠাইলে বোর্ড পুরস্কারের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন।" মৈমনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণে যাহাতে লোকে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হয় তাহার সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। বঙ্গের জেলা সমূহ অবস্থানুসারে মৈমনসিংহের এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে অর্থের সদ্ব্যবহার ও সুফল লাভের আশা করা যায়।



মেডিকেল ছাত্রদের প্রতি অনুগ্রহ।—১৯১৬ সালের নবেম্বর মাসে যে সকল ছাত্র ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকল্টির পরীক্ষায় এক কি দুই বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন গভর্মেণ্ট তাহাদিগকে আগামী নবেম্বর মাসের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অনুমতি দিয়াছেন। এ ব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্মেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

খোলা জায়গায় পাঠের ব্যবস্থা। "সঞ্জীবনী" পত্রে প্রকাশ, বিহার ব্যবস্থাপক সভা মাননীয় গ্রোপবন্ধু দাসের উপস্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন;—

"এই ব্যবস্থাপক সভা সকৌন্সিল ছোট লাটকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, এই প্রদেশের নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপনার ব্যবস্থা যথাসম্ভব ঘরের বাহিরে খোলা হাওয়ায় করা হউক এবং এখন যেমন ব্যয় সাধ্য প্রণালী ক্রমে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ বিধি রহিয়াছে উহা বিদ্যালয় মঞ্জুর করিবার সর্ত্ত হইতে পরিত্যাগ করিয়া খোলা জায়গায় অধ্যাপনা চালাইবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হউক।"

বিহার গভর্মেণ্টের সভ্য মিঃ লেমস্থরিয়ার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা উক্ত গভর্মেণ্টকে ধন্যবাদ করিতেছি। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ কালে মিঃ লেমস্থরিয়ার বলেন, "প্রস্তাবক মহাশয় তাহার প্রতিষ্ঠিত সত্যবাদী বিদ্যালয়ে এই বিধি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আমরা এই প্রথা যথা সম্ভব এই প্রদেশে খাটাইব। যক্ষ্মারোগের তত্ত্বাবধান কালে ডাক্তার ল্যাংকেষ্টার ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এইরূপ খোলা হাওয়ায় অধ্যাপনার উপকারিতার প্রতি জিলা বোর্ড ও শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তবে সদস্য মহাশয়ের সহিত গভর্মেণ্ট একমত হইয়া ইহা স্বীকার করেন না যে, বিদ্যালয়ের গৃহ সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য প্রণালী ক্রমে প্রস্তুত হয়। তবে তাঁহার প্রস্তাবিত খোলা হাওয়ায় অধ্যাপনা প্রণালী যে স্থলে সম্ভব অবলম্বিত হইবে। সকল ঋতুতে সকল সময়ে বাহিরে ক্লাস বসান যাইতে পারে না সদস্য মহাশয় উহা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই জ্ঞাত আছেন।"

পাঠ্য সাজ সরঞ্জাম এবং বিদ্যালয়গৃহ ব্যতীতও যে বিদ্যালয় চলিতে পারে, বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় বীরভূম জিল্লায় বোলপুরের প্রান্তর মধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রমে উহার উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সেখানে তরুমূলে কম্বল আসনে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ছাত্রগণ তথায় মধ্যাহ্নে অবসর প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সেখানে ছাত্রদিগকে আহারের অব্যবহিত পরে ভারাক্রান্ত উদরে পুস্তক কক্ষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিদ্যালয়ে ছুটিতে হয় না। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ছাত্রগণকে দ্বিপ্রহরের উত্তাপে ক্লান্তদেহে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধপ্রায় গৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়! এমন ব্যবস্থা যে অস্বাস্থ্যকর তাহাতে সন্দেহ নাই। বিহার গভর্মেণ্ট ইহার প্রতীকারার্থ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

মাদক নিবারণ—"মার্কিণযুক্তরাজ্যের ৩৬টী ষ্টেট সমস্বরে বলিয়াছেন যে, তাহারা যুক্তরাজ্য মধ্যে মদ প্রস্তুত এবং উহার কারবার করিতে দিবেনা।" এই সংবাদ সংবাদ পত্র সমূহে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি লাহোরের বিশিষ্ট মুসলমানগণের উদ্যোগে মাদক নিবারক আন্দোলনের জন্য একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রস্তাব হইয়াছে—"ভারত গভর্ণমেণ্ট মার্কিনদের অনুকরণে আইন প্রণয়নপূর্ব্বক মদ্য প্রস্তুত, উহার আমদানী ও রপ্তানি নিবারণ করুন।"

উক্ত সভা ভারতবর্ষের মাদক নিবারণী ও অপর প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই নিমিত্ত আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই এই শুভ আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

# গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

( সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনস্ কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতার কতকাংশ।)

আপনাদিগকে রণক্ষেত্রে আপনাদের দেশের কল্যাণ সাধনা করিবার সুযোগ দেওয়াতে আপনারা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও এজন্য আনন্দিত। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নানা বিপদ ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও আপনারা যে ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদের প্রশংসা করিতেছি। আমি বাঙ্গালার কথাই বলিতে পারি। বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসমেত ৪০১ জন সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন; তাঁহাদের মধ্যে ৮৩ জন স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিলেন। এই ৮৩ জনের মধ্যে ৫০ জন ভারতের ভিতরে এবং ৩২ জন ভারতের বাহিরে সমুদ্র পারে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন। সমুদ্র পারে যাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন, যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কার্য্য শেষ হয় নাই। যুদ্ধে বহু দেশ ধ্বংস হইয়াছে; এখন তাহার পুনঃ-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখন সর্ব্বত্রই কার্য্যে ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার কর্ম্মক্ষেত্র।

বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়ায় সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন-গণের জন্য বিপুল কর্ম্ম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। গভর্মেণ্ট সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগকে এই দেশে কর্ম্ম করিবার জন্য বেতন প্রভৃতির যেরূপ উদার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমার আশা হয় আপনাদের মধ্যে অনেকেই এই দেশে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখন আর সামরিক গভর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, এখন সিভিল গভর্মেণ্ট তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সিভিল গভর্মেণ্টের অধীনেই আপনারা কর্ম্ম করিবেন।

স্বাস্থ্যোন্নতির পথে বাধা।

দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমি যে চেষ্টা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের কার্য্যই এখন বিরাট কার্য্য এবং ইহা একটী মহা সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানও দুরূহ। এ কার্য্যে সিদ্ধি লাভে বিস্তর বাধা বিঘ্ন বিদ্যমান। প্রথম দেখুন—দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে দূর করিবার জন্য আমাদিগকে এনোফেলিস মশকবংশ ধ্বংস জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পীতজ্বরের আক্রমণ সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ষ্টেগোমিয়া মশকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বক্রমুখ কৃমিকীটগুলিকে বিনষ্ট করিবার জন্য সমগ্র দেশের বহুদিনের কুঅভ্যাস—ঘাটে মাঠে বাগানে মল ত্যাগের স্বভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

(১) জ্ঞানের বহুল প্রচার; (২) বিপুল অর্থ; (৩) বিস্তর উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই তিনটী প্রয়োজনীয় জিনিষই এ কার্য্যে আবশ্যক; জ্ঞানের পরিবর্ত্তে আমাদের ঘোর অজ্ঞানতা; অর্থের পরিবর্ত্তে আমাদের ঘোর অর্থ কষ্ট ও দারিদ্র্য রহিয়াছে। তবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-গণের সরবরাহ সম্বন্ধে আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। এইটী করিতে হইলে সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যক।



# স্নায়বীয় উত্তেজনা

আমাদের মানসিক ও শারীরিক সমুদায় কার্য্যই স্নায়ুর অধীন। আমরা যে কোন কার্য্য করি বা যে কোন বিষয়ের চিন্তা করি, স্নায়ুই তাহার মূল। বাষ্পীয় যন্ত্রের পক্ষে যেমন বাষ্প, দেহ যন্ত্রের পক্ষে তেমন স্নায়ু-বিধান ( Nervous System )। বাষ্প রুদ্ধ করিয়া দাও অমনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যন্ত্রের যে চাকা, হাতল প্রভৃতি জোরে ঘুরিতেছিল তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িবে। শরীরের পক্ষেও ঠিক এইরূপ। স্নায়বীয় বিধানে কোন আঘাত লাগিলেই কতক বা সমগ্র ইন্দ্রিয় অসাড় হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটিবে। দেহ-যন্ত্রের কলকারখানার মধ্যে গঠন-কৌশলে স্নায়বীয় বিধানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। আমরা কি করিয়া চিন্তা করিতে পারি, কোনও বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারি ও স্মরণ রাখিতে পারি, ইত্যাদি এবং কোন কার্য্যের জন্য কি করিয়াই বা মনস্থির করিতে পারি আবার কি করিয়াই বা ভাল-বাসিতে, ঘৃণা করিতে, আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি স্নায়বীয় বিধানের আলোচনা করিলেই এ সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। এ প্রবন্ধে স্নায়ু মণ্ডলের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে কারণ এতৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্য-সমাচারে 'মানব দেহে শিল্প-সৌন্দর্য্য' প্রবন্ধতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে কি করিলে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এই স্নায়বীয় বিধানের উত্তেজনা হয় ও সেই উত্তেজনার ফল কি?

আজকাল সর্ব্বত্রই আমাদের মধ্যে স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। সেইজন্য এখন সকলেরই ইহার প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। এইরূপ স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন।

এই স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার ফলে এখন প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ভীষণ রোগ সর্ব্বদাই হইতেছে। কোন্ কোন্ কারণে এই সমস্ত হয় এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের প্রতিকার্য্যে সংসার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রতিযোগিতা। আমাদের আহারে, বিহারে, আমাদের অদম্য সুখলালসা প্রভৃতি প্রতিকার্য্যেই সকলকে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম সর্ব্বদাই করিতে হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতি কার্য্যেই প্রতিযোগিতা, এই ভীষণ প্রতিযোগিতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রায়ই নিজ নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতে অবসর পাই না। আমার সমশ্রেণীর অপর ব্যক্তি ব্যবসায় আমার অপেক্ষা উন্নতি করিতেছে অতএব আমাকেও যে কোন রকমেই হউক তাহার উপরে উঠিতেই হইবে। এইরূপ অস্বাভাবিক আর্থিক উন্নতির লালসা আজকাল আমাদের প্রধান বিষয় এমন কি একটা নেশার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের শরীর তাহা পারিয়া উঠে কই? সে দিকে আমাদের লক্ষ্য মোটেই নাই। কেবল কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইব, কি করিলে সংসারে আমার ধনের যশ প্রচারিত হইবে—দিবা রাত্রি, জাগরণে, নিদ্রায় এই চিন্তা, এই স্বপ্ন। শরীরের কিন্তু একটী সীমাবদ্ধ সহ্য করিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। আমাদের মানসিক অদম্য লালসার সহিত কখনও শারীরিক বল ও কার্য্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে না, তাহা আমরা মোটেই বুঝি না কেবল চাই অর্থ, কোথা অর্থ, কোথা যশ করিয়া শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। এই ভাবে অদম্য লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা শ্রম দিবারাত্র খাটিয়া মরি, অস্বাভাবিক রূপে মস্তিষ্কের ও শরীরের চালনা করি কিন্তু তাহার

পরিবর্ত্তে মোটেই শরীরকে বিশ্রাম দিতে পারি না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ শরীরের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে থাকি। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের প্রতি কার্য্যে শরীরের ক্ষয় সাধিত হয় এবং আহার নিদ্রা ও উপযুক্ত বিশ্রামের দ্বারা আবার সেই অভাব দূর হয়। নিজেদের অত্যাচারের ফলে ক্রমে আমাদের স্নায়ু সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং যখন আমরা ধনী হইতে সক্ষম হই তখন তাহা অপেক্ষা অমূল্য ধন যাহা অর্থের বিনিময়ে খরিদ করিতে পারা যায় না আমাদের সেই অমূল্য স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া জীবন বিষময় করিয়া ফেলে। এইরূপ যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই এই একই রকম দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিচক্ষণ ও অভিমানী বৈজ্ঞানিক সংসারের বিবিধ আবিষ্কারের সহিত নিজের অস্তিত্বের তুল্যতা বজায় রাখিতে যাইয়া আহার নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক নিয়মাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই এক মনে এক প্রাণে একটী নূতন আবিষ্কারের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করেন না যে এইরূপ অত্যাচার কতদিন সহ্য হইতে পারে। এই ত' গেল বহির্জগতের কথা। আমাদের সর্ব্ব-কার্য্যেই এই একই প্রকার।

এতদ্‌ভিন্ন স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের অপর একটী প্রধান কারণ সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। আজ কাল অনেকেই অধিক পরিমাণে বহুবিধ নেশার বশবর্ত্তী হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেকে অতি শৈশব হইতেই নানারূপ উত্তেজক বস্তু ব্যবহার করিতেছে। তামাক, সিগারেট, মদ, গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য অতিরিক্ত মাত্রায় চলিতেছে, কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার যে কত ক্ষতিজনক তাহা বর্ণনাতীত। দুঃখের বিষয় যে এখন সে সমস্ত দ্রব্যের অপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইলে কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, অনেকস্থলে উহা পাগলের প্রলেপ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু! সকলেই সর্ব্বদা নিজ নিজ সুখের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছি কিন্তু আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়া পড়িতেছি কি না ইহা চিন্তা করা কি কর্ত্তব্য নহে? অনেকে হয়ত বলিবেন যে তবে কি আমাদের সংসারের কর্ত্তব্যের মধ্যে কেবল শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভিন্ন আর কিছু নাই? তাহার উত্তরে আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে যাহা সম্ভব তাহাই চেষ্টা করা উচিত। যে কার্য্য বা আকাঙ্ক্ষা করিতে আমাদের শরীর অপারগ হইতেছে তাহার অনুসরণ করা কি মূর্খতা নহে। জগদ্‌বিখ্যাত নেপোলিয়ানের মত বীর পৃথিবীতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? বোধ হয় সকলেই বলিবেন তাঁহার তুলনা কোথায়? তিনি বলিতেন যে "অসম্ভব এ কথা মূর্খেরাই বলিয়া থাকে" কিন্তু তিনি এক দিনও চিন্তা করেন নাই যে সর্ব্ব কার্য্যের উপর শরীরের প্রতি কর্ত্তব্যই প্রধান। যদি তিনি এক দিনের জন্যও একথা ভাবিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার সংসার মঞ্চের ক্রীড়া অত শীঘ্র তাহাকে শেষ করিতে হইত না। সংসারে আমাদিগকে সবই করিতে হইবে নিজের চরম উন্নতিও লাভ করিতে হইবে সত্য কিন্তু যতক্ষণ আমাদের শরীর পারিবে ঠিক ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অদম্য উদ্যমে, অবাধে অগ্রসর হইতে পারিব এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই আমাদিগকে আর অন্যায় ও অসম্ভব আশার প্রলোভনে না ভুলিয়া থামিয়া পড়িতে হইবে।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে আমাদের স্নায়ুর অশেষ ক্ষতি সম্পাদিত হয়। দেহের সর্ব্বত্র কোথায় কি হইতেছে ও ঘটিতেছে এই সকল স্নায়ু দ্বারা তাড়িত বার্ত্তা যোগে অনবরত তাহার সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। মস্তিষ্ক সেই সকল সংবাদ পাইবা মাত্র পুনরায় তৎক্ষণাৎ স্নায়ুসূত্রের যোগে প্রত্যেকটীর কোথায় কি করিতে হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে তাহার আদেশ বার্ত্তা প্রেরণ করে। স্নায়ু-সূত্র সকল দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত, উহারা অতি সূক্ষ্ম এবং অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এই স্নায়ু-সূত্র গুলির প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কার্য্য আছে, এবং সকলেই



একটী মৌলিক নিয়মের বশবর্ত্তী। এই নিয়ম ঠিক থাকিলেই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হয় এবং এই সমস্ত সূত্র সুস্থ থাকিয়া নিয়মিত রূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহাদের অস্বাস্থ্যকর কোন কারণ উপস্থিত হয় তখনই তাহারা আর নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে শরীরের মধ্যে বিষ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করে এবং তাহার ফলে এবং উত্তেজনায় এই সমস্ত কোমল স্নায়ু-সূত্র সমূহ ক্রমে অসাড় হইয়া পড়ে ও কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হইয়া যায়। মাদক দ্রব্য ব্যবহারে ইহাদের ক্রমোন্নতির যৎপরোনাস্তি ব্যাঘাত ঘটায় ও তাহাদের পুষ্টি সাধন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে মাদক দ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তি-গণের স্নায়ু অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। এই সমস্ত কারণের নিমিত্তই ঐরূপ ব্যক্তিগণ সাধারণ সুস্থ লোকগণ অপেক্ষা সহজে উত্তেজিত হয়। অনেকে এরূপ আছেন যে তাঁহারা প্রত্যহ অল্প মাত্রায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেইরূপ ব্যবহারে যদিও সঙ্গে সঙ্গে কোন কুফল দেখা যায় না তথাপি পরিণামে তিলে তিলে যে উহা তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে থাকে তাহা নিশ্চিত। এই রূপে বহুদিন অভ্যাসের পর তাঁহাদের শরীরের সর্ব্বস্থানের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও অনেকের পক্ষাঘাত প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি হয়।

মোট কথা অতিরিক্ত যাহাই করিব তাহাতেই আমাদের অনিষ্টপাত হইবে। সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে যখনই কোন একটী অভ্যাস বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের ক্ষতি করিতেছে বলিয়া বুঝি বা যদি তৎক্ষণাৎ নিজের মনুষ্যত্বের চালনার দ্বারা সেই অভ্যাস ত্যাগ করি তবে নিশ্চয় আমাদের উপকার হইয়া থাকে। আমাদের মস্তিষ্ককে সর্ব্বদা উপযুক্ত কার্য্যের দ্বারা চালনা করিতে হইবে এবং পুষ্টিকর ও হিতজনক আহার এবং বিশ্রাম দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

আমরা বড়ই অনুকরণ প্রিয়। আহার বিহার সম্বন্ধেও অনেক সময় এইরূপ করিয়া থাকি কিন্তু তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের আশা কম। আহার ইত্যাদির সম্বন্ধে নিজ নিজ শরীর ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ বিষয়ে মূর্খের ন্যায় অনুকরণ করিলে কেবল নিজেরই ক্ষতি করা হইবে মাত্র। অনেকে এক প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিতে যাইয়া অপর এক প্রকার অভ্যাস করেন। তাহারা বলেন যে যাহারা ঐরূপে অভ্যস্ত তাহারা কোন না কোন একটী ব্যবহার না করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে কিন্তু ইহা অতি বাজে কথা। এক প্রকার খারাপ নেশা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ত্যাগ করিতে যাইয়া অপর একটীর বশবর্ত্তী হওয়া যে সম্পূর্ণ মূর্খতা তাহা বলাই বাহুল্য। সকলেরই জানা উচিত আমরা অস্বাভাবিক উপায়ে শরীরকে কর্ম্মপটু ও আনন্দিত করিবার যতই কেন চেষ্টা করিনা তাহারা কেহই প্রকৃতদত্ত স্বাস্থ্যকর বিমল আনন্দদায়ক জিনিষের হইতে পারিবে না।

এক্ষণে কেন এই সমস্ত স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হয় তাহা আমরা অনেকটা অবগত হইলাম। কারণ পাইলেই তাহার নিবারণের চিন্তা সকলেই স্বভাবতই করিয়া থাকেন। আমাদের উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে দেখিতেছি যে কোনরূপ আত্ম বিশৃঙ্খলতাই স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বা উত্তেজনার কারণ। এখন কি করিলে ইহা ভাল হইবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? যাহা উশৃঙ্খলতা হইতে উৎপন্ন মিতাচরণদ্বারা যে তাহার নিবৃত্তি হইবে ইহা সকলেই জানেন। কোন একটী অভ্যাস যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা ত্যাগ করিয়া সুফল পাইলে বোধ হয় অপর কুঅভ্যাস সকল ত্যাগ করিতে সকলেই চেষ্টা করিবেন। মদ্যপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করিয়া উপকার পাইয়াছে দেখিলে আহিফেন সেবী তাহার অভ্যাস ত্যাগ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে ইহা বোধ হয় আশা করা যাইতে পারে। ফলতঃ প্রাকৃতিক বিধান সর্ব্বদাই প্রতি-পালনীয়, অস্বাভাবিক ব্যবহার ও অভ্যাস সর্ব্বদাই

অহিতকারী। আত্ম উশৃঙ্খলতা যখন সর্ব্বপ্রকার স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ তখন আত্মশাসন যে তাহার প্রকৃত প্রতিষেধক তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের কষ্ট ও রোগকে আমরাই আনয়ন করি আবার আমরাই অবসর দিলে ও উপায় করিলে তাহারা চলিয়া যায়।

---

# হুকওয়ার্ম

দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-সমাচারে "হুকওয়াম জনিত পীড়া" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর এই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছেন। এই ভীষণ কীট আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে বহু ব্যাধিগ্রস্ত করিতেছে। নিম্নে উক্ত ব্যাধির লক্ষণাদি এবং নিবারণের উপায় বর্ত্তমানে যেরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

অনেকেই "হুকওয়াম"কে একটী নূতন রোগ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রাজিল (Brazil) প্রদেশে Piso যে কতকগুলি রোগের লক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগের প্রকৃতি দেখিলে এক্ষণে তাহাদিগকে এই "বক্র-কীট" জনিত পীড়ার লক্ষণ বলিয়াই মনে হয় কিন্তু তখন এই কীটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ করা হয় নাই। কেবল অল্পদিন পূর্ব্বে রোগের লক্ষণাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উক্ত কীট মানব শরীরের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

দুই প্রকার কীটের অস্তিত্ব উপস্থিত জানিতে পারা গিয়াছে (১) Anchylostomum duodenale ও (২) Necator Americanus, এই উভয় শ্রেণীর কীটই সর্ব্বপ্রথমে সিংহল (Ceylon) প্রদেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ কীট সকল লম্বায় ১ ইঞ্চির ⅓ অথবা ½ অংশ পরিমিত হইবে এবং তাহারা দেখিতে শ্বেত কিম্বা কিঞ্চিৎ পীত বর্ণের।

স্ত্রী কীটসকল মানব শরীরের অভ্যন্তরে ডিম্ব প্রসব করে এবং পরে মলমূত্রের সহিত নির্গত হইয়া ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের বংশবৃদ্ধির উপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইলেই তাহারা ৮ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্তান প্রসব করিতে পারে এবং ঐ নবপ্রসূত কীট সকল ৫।৬ দিনের মধ্যেই মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ বিষাক্ত করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হয় ও শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা মানুষের চর্ম্ম, মুখ বিশেষতঃ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সংশ্রবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে দেহ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহারা পায়ের চামড়া দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে একসঙ্গে অনেক কীট শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। চর্ম্মদ্বার দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহারা রক্তবহা শিরায় পৌঁছায় এবং তথা হইতে হৃদয়ে আসে এবং ক্রমে ক্রমে ফুস্‌ফুসে যাইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং পরে পাকস্থলীর ভিতর দিয়া অন্ত্রে পৌঁছিয়া তথাকার রক্ত ও রস ইত্যাদিতে পরিপুষ্ট হয় ও সেইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুখগহ্বর দিয়া প্রবেশ করিলে একবারে অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। তাহাদের এই অবস্থায় অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন সাধারণ-চক্ষে তাহাদিগকে দেখা যায় না। এইভাবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অন্ত্রস্থ রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া তাহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রায় ৬ কিম্বা ৮ সপ্তাহ পরে তাহারা পুনরায় ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক স্ত্রীকীট দৈনিক আন্দাজ ২০০০ হাজার কিম্বা তাহারও অধিক ডিম্ব প্রসব করিতে সক্ষম। এই রোগের



তীব্র অবস্থার রোগীর দেহ হইতে ৫০০০ সহস্র কীট বাহির করা হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে যাহারা এই রোগ দ্বারা ভীষণ-রূপে আক্রান্ত তাহাদের শরীরে এই কীটের সংখ্যা কত হইতে পারে। কাজেই কোন ব্যক্তি একবার এই রোগাক্রান্ত হইলে ক্রমে তাহার দ্বারা উহা যে কত বেশী পরিমানে বিস্তার পায় ও ক্রমে সেই ব্যক্তি সাধারণের স্বাস্থ্যের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায় তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে এই "হুকওয়াম" কীটাণু সকল মানব দেহে ৮ হইতে ১০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই কালের মধ্যে যদি তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তবে অনেক সময় তাহারা স্বাভাবিক ভাবেই নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অনুমান করা যায় কিন্তু একবার এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার আশা আছে বলিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে কারণ এই সকল কীটাণুদিগকে বিনা চিকিৎসায় এত অধিকদিন শরীরে অবস্থান করিতে দিলে ফলে বহুবিধ কঠিন রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

লক্ষণ:—Dock এবং Bass তাঁহাদের "হুকওয়াম জনিত পীড়া" নাম পুস্তকে তিনটী শীর্ষকে এই পীড়ার লক্ষণাদি সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—(ক) প্রথমাবস্থা (খ) স্বল্পতীব্র অবস্থা (গ) তীব্র অবস্থা। এই শ্রেণী বিভাগ মত নিম্নে এই ব্যাধির লক্ষণাদি আলোচিত হইল।

প্রথমাবস্থা:—এই রোগের প্রথম অবস্থায় যদিও কোনরূপ বাহিক বা আভ্যন্তরিক বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না তথাপি ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যের যে বিশেষ হানিকর তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ কারণ রোগের এই অবস্থাতেও যদি রোগীর মলমূত্রের কোনরূপ সতর্ক ব্যবস্থা করা না যায় তবে তাহা হইতেই ক্রমে মলমূত্রের সহিত নিঃসৃত কীট সকল বিস্তার পাইয়া থাকে।

এই রোগের প্রথম লক্ষণ যাহাকে আমরা "Ground Itch" বলি; ইহা অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপক রোগের প্রথমাবস্থাতেও লক্ষিত হয়। ঐ ক্ষুদ্র কীট সকল চর্ম্মের মধ্য দিয়া যখন প্রবেশ করে তখন চর্ম্মের সেই স্থানে একপ্রকার প্রদাহজনক বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে একরূপ যন্ত্রণাপ্রদ চুলকানি উপস্থিত হয়। এই অবস্থা হইলে অনুমান করিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির শরীরে "হুকওয়াম" প্রবেশ করিয়াছে এবং অন্যূন ৬ ছয় সপ্তাহ কাল মধ্যেই তাহারা সেই ব্যক্তির মলের সহিত নির্গত হইয়া বিস্তার লাভ করিবে। রোগের এই অবস্থায় প্রায়ই রোগীর বর্ণ ক্রমে মলিন হয়, স্বাভাবিক ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ কমিয়া যায়, এবং হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বৃদ্ধি পায়। অগ্নিমান্দ্য, পাকস্থলীর অসুস্থতা, পেটফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়। রোগী অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মনঃবৃত্তি সকল জড়তা প্রাপ্ত হয়। অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, এবং কার্য্যে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ৯০ ভাগ Hæmoglobin রক্তে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু এই অবস্থায় শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ হইয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐ কীট সকলই শরীর হইতে রক্ত শোষন করে। এই জন্যই Anæmia বা "হুকওয়াম রোগজনিত বিবর্ণতা" রোগীতে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

স্বল্প তীব্র অবস্থা:—সিংহল প্রদেশে রোগের এই অবস্থা অন্য দেশ অপেক্ষা অধিকমাত্রায় লক্ষিত হইয়াছে। রোগের এই অবস্থায় উপরের লিখিত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, পাণ্ডুরতা, ঘর্ম্মের স্বল্পতা, বমনেচ্ছা, উদ্গার এবং বমন প্রভৃতি লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়, জিহ্বা অপরিস্কৃত হয় ও তাহার উপরে এক প্রকার পলি পড়ে, বক্ষে বেদনা অনুভব হয় ও হস্ত পদাদি দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অতি অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিরঃপীড়া হয় এবং রোগী অকর্ম্মন্য ও নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে। হস্ত পদাদির গাঁইটগুলিতে এত বেশী যন্ত্রণা হয় যে অনেক সময় চিকিৎসকগণও ভ্রম বশতঃ তাহাকে বাতের বেদনা বলিয়া অনুমান করেন। রক্তের

Hæmoglobin শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ হইয়া পড়ে।

তীব্র অবস্থা :—এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে রোগী অতিরিক্ত বিবর্ণ বা রক্তশূন্য হয়, ক্ষুধা হয়ত একবারেই থাকে না কিম্বা অতিরিক্ত লোভী হয় এবং সর্ব্বদাই বমনেচ্ছা, বমি, উদরাময় লাগিয়া থাকে।

অতি অল্প কোনরূপ পরিশ্রম করিলেই রোগী একবারে হাঁপাইয়া পড়ে এবং অনেকসময় উদরী কিম্বা পদাদির স্ফীতি বা সোথ লক্ষিত হয়। রোগীর খারাপ দ্রব্যাদি আহারের ইচ্ছা হয়। হুকওয়াম পীড়াজনিত রোগীদের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগীর অনেক সময় মাটী, ছাই, চুল, চুণ ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণে ইচ্ছা হইতে দেখা যায়। এই প্রকার দ্রব্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র প্রায়ই "হুকওয়াম" রোগী, অনেক ক্ষেত্রে রোগের ঈদৃশ অবস্থায় রোগীর দুর্ব্বলতা, রক্তাল্পতা বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্গে এক প্রকার খারাপ পূযনিস্রাবী ক্ষত হয় ও তাহা সহজে আরোগ্য করা যায় না। অবসন্নতা প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় এবং মানসিক বৃত্তি সমূহ অতি মলিন হইয়া রোগী একবারে নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে ও সর্ব্বদাই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জ্বরও হইয়া থাকে। রোগের এই অবস্থায় শতকরা ৫ হইতে ৩০ ভাগ Hæmoglobin মাত্র রক্তে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে রোগীর প্রাণের আশা ক্রমে খুব কম হইয়া পড়ে। এমন কি রোগের এই অবস্থায় উপনীত হইলে বিশেষরূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আরোগ্য হয় না। কাজেই এই ভীষণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত রূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হুকওয়াম জনিত রোগ হইতে কেহই মুক্ত নহে। কেবল জাতি বিশেষের স্বভাব ও অভ্যাসের জন্য এবং তদ্দেশীয় প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য লোকে অল্প বা অধিক মাত্রায় এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশীয় লোকসকলও এই রোগ হইতে একেবারে মুক্ত নহে তবে হুকওয়াম কীট গরম দেশে অধিকতর বিস্তার লাভ করিতে পারে বলিয়াই উষ্ণপ্রধান দেশে ইহার আক্রমনের মাত্রা অধিক। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে অন্য কোন রোগ অপেক্ষা এই রোগ দ্বারাই লোক অধিক আক্রান্ত হইয়াছে এবং ইহা যৌক্তিক বলিয়া মনে হয় যে আন্দাজ ১০০,০০০,০০০ লোক এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। যদি বিজ্ঞান এই রোগের তত্ত্বসমূহ এবং নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিত তবে এতদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহের পরিণাম বোধ হয় দুঃখময় হইত।

পল্লীবাসীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ হইতে ৯৫ জন এই রোগগ্রস্ত ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং চা বাগান প্রভৃতি স্থানের মজুরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত, শৈশবে এই ভীষণ শত্রু শরীরে প্রবেশ করিলে সেই বালক তাহার পাঠ্যাবস্থায় কখনও উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না এবং পরে তাহার জীবন সংগ্রামেও সে প্রতিকার্য্যে বিফল হয় কারণ এই রোগের প্রধান লক্ষণ যে ইহা রোগীকে অতি অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে এবং সেইজন্য সে কখনও জীবনে কোন কার্য্যে স্বাভাবিক বা উপযুক্ত মাত্রায় পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয় না।

এ পর্য্যন্ত অনেক লোককে চিকিৎসার দ্বারা এই রোগমুক্ত করা হইয়াছে। এই রোগ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে তাহাদের স্বাস্থ্যেরও এক আশ্চর্য্য উন্নতি প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতেই চিকিৎসার ফলোৎপাদক শক্তি সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপও অনেক হইয়াছে যে চিকিৎসা ব্যতিত যাহারা মরিতে বসিয়াছিল চিকিৎসা গুণে তাহারাও রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে উদ্যমের সহিত জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতেছে। কোন একটী বাগানের কার্য্যাধ্যক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে মাত্র ৪ মাসের চিকিৎসাতেই তাঁহার মজুরদিগের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহাও যে চিকিৎসারই ফলে হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



প্রতিরোধক উপায়—উপযুক্ত পায়খানার প্রতিষ্ঠা, প্রচলন ও ব্যবহার এই রোগের একটী প্রধান প্রতিরোধক উপায়। এই কীটগণের ডিম্ব হইতে মানব দেহের মধ্যে সন্তান উৎপাদিত হয় না। বরং স্যাঁতা ও গরম স্থানে মলের সহিত ঐ সমস্ত ডিম্ব নির্গত হইয়া তথায় তাহা হইতে কীট জন্মে। তজ্জন্য মাটীর উপর মল পরিত্যাগ করিলে এই রোগ বিস্তারের সুবিধা হয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পায়খানায় মল ত্যাগ করিলে উক্ত কীটগণের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং যদিও হয় তাহা হইলেও উহারা মাটীতে বিস্তার লাভ করিতে পারে না, তবে পায়খানা কূপ পায়খানা হইলে ভাল হয়। "হুকওয়াম" কীটানুসকল ভূমিষ্ট হইবার পর ২ হইতে ৫ দিন মধ্যে সংক্রামক ক্ষমতাপন্ন হওয়ার পর মানব দেহে প্রবেশ করিবার কোন সুবিধাজনক উপায় না পাইলে প্রায় ৬ হইতে ১০ মাস কাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। মানুষের শরীরের চামড়ায় তাহাদের প্রবেশ করিবার জন্য কোন ছিদ্র থাকিবার প্রয়োজন হয় না কারণ তাহারা নিজেই নিজেদের জন্য করিয়া লইতে সক্ষম। সমতল স্থানে মল পরিত্যাগ না করিয়া উল্লিখিত রূপ কূপ পায়খানা প্রভৃতি স্থানে মল পরিত্যাগ ব্যবস্থা করিলে উঁহাদের বিস্তারের অনেক লাঘব হইয়া যায়। সুতরাং "হুকওয়াম" নামক মানুষের এই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে এবং তন্নিবন্ধন উদরাময়, জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত যদি উক্ত প্রকার মল পরিত্যাগের বিশিষ্ট স্থান নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করিলেই রক্ষা পাওয়া যায় তবে তাহা কি সকলেরই সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য নহে? আমরা এই সমস্ত বিষয় অবহেলা করি বলিয়াই নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিষময় করিয়া তুলি। কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি সামান্য সামান্য নিয়মের এবং আমাদের দৈনিক শারীরিক প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে চলিলেই আমরা অনেক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইতে পারি এবং আমাদের জীবন উন্নতির পথে যথাযথ ভাবে নিয়োগ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা জানিয়া শুনিয়াও এবং স্থানে স্থানে অবগত হইবার উপায় থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ অসাবধানতা ও মূর্খতার জন্য নিজেরা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকি অধিকন্তু এক জনের পাপে সমগ্র দেশকে ক্রমে ক্রমে দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলি।

উপরের লিখিত উপায় ছাড়া আরও কয়েকটী নিবারক প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আহার করিবার কিম্বা আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে আমাদের হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য এবং আমাদের ভৃত্যগণ কিম্বা অন্যান্য যাহারা ঐ সংশ্রবে থাকে তাহারাও যাহাতে ঐ ভাবে চলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক স্থানে মল জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঐ রকম জমী হইতে উৎপন্ন কোন দ্রব্যই সিদ্ধ না করিয়া আহার করা উচিত নহে। আহার্য্য নিয়মিতরূপে প্রস্তুত করিয়া তাহা অনাবৃত অবস্থায় রাখা কিম্বা শীতল হইলে তাহা আহার করা কোন মতেই ভাল নহে এবং যে ব্যক্তি পরিবেশন করিবে তাহার হস্ত পদাদি উত্তম রূপে ধৌত না করিয়া যাহাতে আহার্য্য স্পর্শ না করে বা অন্য কেহ ঐরূপ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় আহারীয় স্পর্শ না করে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে যে পরিণামে বিষময় ফল ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের পানীয়ের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদিও পানীয় হইতে এই রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় বিস্তার পাইয়া থাকে তথাপি সময় সময় পানীয় হইতেও উহাদের বিস্তারের সম্ভাবনা আছে তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

আরোগ্যসাধক প্রক্রিয়া :—মাটালি প্রদেশে সৈন্যদিগের অবস্থিতি কালে এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই সময় তথায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই রোগের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল হইয়াছিল। অন্যূন ৩৫০০ লোক এইরূপ চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়াছিল। সেখানে

চিকিৎসার জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক রোগীকে ১টী করিয়া টীনের ছোট পাত্র দেওয়া হইত এবং প্রত্যহ সেই পাত্রে তাহাদের পরিত্যক্ত মলের কিঞ্চিৎ অংশ প্রত্যহ রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হইত। পরে সেই মল অনুবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠান হইত। পরীক্ষার ফলে যেরূপ দেখা যাইত তদনুযায়ী চিকিৎসা করা হইত। যে গুলির মধ্যে ক্রিয়াকরণক্ষম কীটাণু বর্ত্তমান থাকিত তাহাদিগকে চিকিৎসকের নিকট পাঠান হইত এবং সেই রোগীদের উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসা করা হইত। Chenopodium এবং Thymol তৈল এই রোগের বিশেষ প্রতিষেধক বিশেষতঃ প্রথমটী সর্ব্বপ্রকার কৃমি রোগেরই ফলপ্রদ ঔষধ। প্রায় সকল রোগীর শরীরেই ৩।৪ রকম কীট আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছিল। পর পর দুই বার ঔষধ দিয়া ৭।৮ দিন কোন ঔষধ দেওয়া হইত না এবং তাহার পর পুনরায় তাহাদের মল পরীক্ষা করিয়া যদি তাহাতে কার্য্যক্ষম কীটাণুর চিহ্ন দেখা যাইত তাহা হইলে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করা হইত। এরূপ ঔষধ বন্ধ করিবার কারণ এই যে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত শরীরের মধ্যে ঐ ঔষধের ক্রিয়া চলিতে এবং এই সময়ের পরে রোগীর মল পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কার্য্যক্ষম কীটের চিহ্ন পাইলে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করা হইত। এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া অনেক রোগী সুস্থ হইয়াছিল।

এই ভীষণ রোগের প্রধান কারণ "হুকওয়ার্ম" কি করিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট সাধন করে এবং তন্নিবন্ধন রোগের লক্ষনাদি ও মোটামুটি প্রতিষেধক উপায় সম্বন্ধে কতক পরিমাণে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তাহাদের সমূলে বিনাশ সাধন করা যায় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত উপযুক্ত পায়খানা নির্ম্মাণ করা ও নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণও যাহাতে ঐরূপ করে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। যদি পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ঐ কীট শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা হইলে যাবৎ উহা শরীর হইতে সম্পূর্ণ নষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত উত্তমরূপে চিকিৎসা করা উচিত এবং যাহাতে সকলেই এই ভাবে চলে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৩। যাহারা এই রোগের বিষয় অবগত নহে তাহাদের প্রত্যেককেই এই রোগের লক্ষণ এবং নিবারণের উপায় প্রভৃতি সমস্ত তথ্য অবগত করাইয়া দেওয়া উচিত।

৪। বাড়ীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তমরূপে সর্ব্ব কার্য্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চালিত করা কর্ত্তব্য।

৫। কৃত্রিম উপায়ে পরিস্কৃত জল যদি ব্যবহারের জন্য পাইবার কোন উপায় না থাকে তবে সিদ্ধ করা জল ব্যবহার করা ভাল।

৬। যদি কোন ব্যক্তি পায়খানা ইত্যাদি উপযুক্ত স্থানে মল পরিত্যাগ না করে তবে তাহাকে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের শত্রু বলিয়া মনে করিতে হইবে ও আর যাহাতে এরূপ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিতে হইবে।

এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এবং কোন রোগ কি কারণে, বিস্তার পায় ও কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং দেশ হইতে সমূলে বিনষ্ট হয় তাহার উপায় স্থির করা ও তৎসম্বন্ধে সকলেরই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য কারণ তাহা হইলে ক্রমে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ও ফলে স্বাস্থ্যের সঙ্গে সেই জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় ও জীবন সুখময় হইয়া থাকে।



# নিশ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

আমাদের হৃৎপিণ্ড যখনই তাহার নিয়মিত কার্য্য-করণে অক্ষম হয় তখনই তাহার জন্য সমস্ত শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে অধিকন্তু মানসিক শক্তিগুলিও বিকৃত হয়। ফুস্‌ফুসের সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর যেমন আমাদের দেহের কল্যান নির্ভর করে আমাদের মনোবৃত্তি সমূহের স্বাস্থ্যও ঠিক সেই ভাবে উহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মানসিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় (যথা ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদির সময়ে) সেইরূপ ফুস্‌ফুসের কার্য্যের সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুযায়ী অনেক সময় মানসিক বৃত্তি সমূহ চালিত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের এরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণ এই যে মস্তিষ্কের শীরা সমূহের হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই বরং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সহিত উহাদের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য যেরূপ নিয়মিত ভাবে ও সুচারুরূপে চালিত হইবে মানসিক শক্তিও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। একের সুস্থতার উপর অপরের সুস্থতা ও একের অসুস্থতার উপর অপরের অসুস্থতা নির্ভর করিয়া থাকে।

পেশী কোষ-সমূহ অপেক্ষা শিরা কোষ সকল অনেক বেশী এমন কি প্রায় চতুর্গুণ অম্লজান নিঃশেষ করে; রক্তে যে পরিমাণ অম্লজান বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশ মস্তিষ্কে অপচিত হয়। সাধারণ মানসিক অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের গুরুত্বের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য বিশষতঃ যাহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে অম্লজান (Oxygen) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইহা সকলেই অবগত আছেন। প্রতি ৩.৪ মিনিট সময়ের মধ্যে আমাদের শরীরের সমস্ত রক্ত শোধিত হইবার নিমিত্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুসের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে যখন ফুস্‌ফুসস্থ ধমনীযোগে রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াছে তখন উহা কৃষ্ণাভ রংএর এবং মলময় ছিল। কিন্তু তৎপরেই এই সকল মল পরিত্যাগ করতঃ ফুস্‌ফুস্ হইতে প্রচুর পরিমাণ অম্লজান পরিপূর্ণ হইয়া উহার রং উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে ও শরীরের পোষণোপযোগী হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অম্লজান ফুস্‌ফুসে নীত হয়। নিশ্বাসের সহিত যদি অধিক পরিমাণ অম্লজান প্রবিষ্ট না হয় তবে ফুস্‌ফুসস্থ রক্ত উত্তমরূপে শোধিত না হইয়াই মস্তিষ্কের ও শরীরস্থ অন্যান্য সর্ব্বস্থানে নীত হয়। আমাদের শ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অম্লজান শরীরস্থ হইবে সেই পরিমাণ শরীরের উপকার হইবে।

দূষিত রক্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ ও মনোবৃত্তি বিকলতার প্রধান কারণ সেই জন্য যাহাতে রক্ত যথাসম্ভব পবিত্র থাকে তাহার চেষ্ট করা কর্ত্তব্য। শ্বাস কার্য্যে উদরকক্ষ (Diaphragm) ব্যবহার করা ভাল। এই রূপ শ্বাস গ্রহণ করা অভ্যাস করিলে পাকস্থলী যকৃত এবং অন্ত্র ইত্যাদির কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে সাধিত হয়। যাঁহারা এইরূপে শ্বাস গ্রহণ করেন না অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ কালে কেবল মাত্র বক্ষঃস্থল পর্য্যন্তই নিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং উদর কক্ষ এই কার্য্যে নিয়োজিত হয় না তাঁহাদের মস্তিষ্ক ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদি তাহাদের প্রয়োজনমত অম্লজান প্রাপ্ত হয় না এবং ফলে দেহের অমঙ্গল সাধিত হয়। এই প্রকারে শ্বাস গ্রহণে অনভ্যস্থ বক্তি যদি প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ এই ভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ক্রমে অভ্যস্থ হইতে পারেন।

অনেক সময় আমরা অনেকের নিশ্বাসের সহিত একপ্রকার দুর্গন্ধ পাইয়া থাকি। যদি কেহ পেঁয়াজ কিম্বা রসুন খাইয়া আসে তবে তাহার নিশ্বাসের সহিত

উহার গন্ধ নির্গত হয়। সাধারণতঃ যাহারা অধিক পরিমাণে পেটুকের মত আহার করে কিম্বা অস্বাস্থ্যকর পানীয় অধিক পান করে তাহাদের নিশ্বাসে প্রায়ই দুর্গন্ধ নির্গত হয়। উপর্য্যুপরি এইরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করিলে আহার্য্য সকল ভাল করিয়া পরিপাক হয় না এবং অজীর্ণ হয় ও যকৃতের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং কোষ্ঠ বদ্ধতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়। ক্রমে এই সমস্ত অতিরিক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে জমিয়া থাকে ও পচিয়া দুর্গন্ধময় হয় এবং যকৃতের ও তাহারা যে রাস্তা দিয়া গমনাগমন করে সেই স্থান সমূহের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। ক্রমে উহারা হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছিলে উহাদের দুর্গন্ধের নিমিত্ত নিশ্বাস দুর্গন্ধময় হয়। এইরূপে যাহাদের কৃমি ইত্যাদি রোগ আছে তাহাদের নিশ্বাসও বিশেষ দুর্গন্ধময় হয়। অতিরিক্ত ভোজন ও তজ্জন্য নিশ্বাসের বিকার প্রাপ্তি শরীরের পক্ষে যে কত বেশী অনিষ্টকর তাহা বোধ করি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

শরীরের মধ্যে বিশেষতঃ পাকস্থলীর ভিতর বিষাক্ত বাষ্প জমিয়া নিশ্বাস এইরূপ দুর্গন্ধময় হইলে প্রথমতঃ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

বিশুদ্ধ বায়ু সকল অবস্থাতেই উপকারী। অনুজান আমাদের শরীরের পক্ষে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং উহা বিশুদ্ধ বায়ুতেই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। বিশুদ্ধ বায়ু ব্যবহার করিলে শরীরের সমস্ত দোষ শোধিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পানীয় আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পানীয় আমাদের শরীরের সমস্ত মল শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। যাহাদের নিশ্বাস এইরূপ দুর্গন্ধ পূর্ণ ও বিষাক্ত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করা বিশেষ উপকারী। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে হৃৎপিণ্ডের বিষয় একটু দেখা যাক। অনেকেই হয়ত পাঁটার "কালিজা" দেখিয়াছেন। ইহার আকৃতি অনেকটা নোনা ফলের ন্যায়। ইহা একটী ফাঁপা মাংসল যন্ত্র বিশেষ। স্বতঃ প্রবৃত্ত পেশী তন্তু (involuntary muscular fibre) দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। ইহা রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রাবলীর প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা শিরা সমূহে রক্ত চালনা করিবার দমকল বিশেষ। হৃৎপিণ্ডের গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের বিষয় নহে। তৎসম্বন্ধে "মানব দেহে শিল্প-সৌন্দর্য্যতে" বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে আমরা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিব। হৃদপিণ্ড অনেক কারণেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইতে পারে কিন্তু সমস্ত বিষয় সঠিক ভাবে বর্ণনা করা উপস্থিত সম্ভবপর নহে। তৎসম্বন্ধে মোটামুটী দুই একটী বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

সাধারণতঃ দুইটী কারণে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইহার একটী বিশেষ কারণ, এইরূপ দ্রব্য ব্যবহারে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের হৃৎপণ্ডটী যেন চারি কামরা বিশিষ্ট একটী দোতালা বাড়ী। ইহার উপর তলায় দুইটী ঘর, একটী ডান ও অপরটী বাম দিকে। দোতলার ঘর দুটীতে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার কোন পথ নাই কিন্তু প্রত্যেকটী কামরার উপর তলার ঘর হইতে উহার ঠিক নিচের তলায় যাইবার পথ আছে। যে পেশী খণ্ড দ্বারা এই কামরা গুলির দেওয়াল প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে হৃদয়ের পেশী নির্ম্মিত দেয়ালগুলি হৃৎকোষের দেয়াল অপেক্ষা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। এককোষ হইতে অপর কোষে যাইবার এইরূপ বিভিন্ন পথ ও পেশী নির্ম্মিত প্রাকৃতিক পথ আছে এই কপাটগুলি এমনি সুকৌশলে গঠিত যে হৃৎকোষ হইতে রক্ত প্রবাহ এই পথে হৃদুদরে আসিবার কালে কিছু মাত্র বাধা প্রাপ্ত হয় না কিন্তু হৃদুদর হইতে রক্ত প্রবাহ হৃৎকোষে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিলে উক্ত কপাটের পাল্লায় আটকিয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ পথটী



রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে অবিরাম হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চলিতেছে কিন্তু ঐ সমস্ত মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায় ও ঐ সমস্ত পেশী নির্ম্মিত কপাট ও পথ গুলিকে ক্রমে দুর্ব্বল ও অবশ করিয়া ফেলে এবং তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্য করিতে পারে না। সেই জন্য হৃদয়ের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা অলস, অকর্ম্মণ্য ও অতিভোজী তাহাদেরও এই পরিণাম। আমাদের শারীরিক অন্যান্য পেশী যেরূপ হৃদয় ও সেই রকম একটী আভ্যন্তরীক পেশী মাত্র। নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে যেমন সমস্ত পেশী কর্ম্মঠ ও সুস্থ থাকে সেই রকম নিয়মিত এবং পরিমিত ব্যবহারে আমাদের হৃৎপিণ্ড সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকে। রক্তবহানালী দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র প্রয়োজনমত রক্ত সরবরাহ করাই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। কেবল যে শোধিত রক্ত ইহার ভিতর হইতে বাহির করাই ইহার কার্য্য তাহা নহে, হৃদয় হইতে বাহির হইয়া শরীরের কার্য্যে নিয়োজিত হইবার পর পুনরায় তাহাকে শোধণের নিমিত্ত আনয়ন করাও ইহার কার্য্য। এইরূপে দৈনিক অনেক রক্ত ক্রমাগত হৃদয় হইতে যাতায়াত করিতেছে মোট কথা আমাদের দেহের মধ্যে যত যন্ত্রাদি আছে তন্মধ্যে হৃৎপিণ্ড একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র।

আমরা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছি যে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনী, কৈশিক নাড়ী, শিরা প্রভৃতি দিয়া ঘুরিয়া আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। এই কৈশিক নাড়ী কেশের ন্যায় সরু রক্তবহানালী বিশেষ। শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার জন্য এই কৈশিক নাড়ী অতীব প্রয়োজনীয়। যাহারা তামাক কিম্বা অন্য প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদের সেই কদভ্যাসের ফলে এই সমস্ত নাড়ী ক্রমে কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ে এবং তাহাদের হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্য্যের ক্ষতি হওয়ার জন্য ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মাদকতার পরিচালনে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক নিয়ম অপেক্ষা দ্রুত গতিতে কার্য্য করে ও তাহার ফলে সেইরূপ ব্যক্তিগণের হৃদয় ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য ফলে ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হয়।

অলস ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণের হৃৎপিণ্ডেরও একই পরিণাম। তাহাদের আলস্যতা জন্য তাহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। আমাদের শরীরের যেখানে ও যাহাতেই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে তাহাতেই বিপত্তি। বেশী খাটিলেও বিপদ আবার অলস ভাবে হাই তুলিয়া শুইয়া বসিয়া জীবন কাটাইলেও বিপদ। অলস ব্যক্তিগণের হৃদয়ের কার্য্য ঠিক তাহাদের স্বভাবানুযায়ী ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয়। তাহাদের হৃদয় হইতে শরীরের প্রয়োজনীয় রক্ত অতি অলস ভাবে হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হয়। কিন্তু মানুষের জীবন কখনও এক ভাবে যায় না, সকলেই জানেন জীবন পরিবর্ত্তনশীল। যে কোন রকমেই হউক হটাৎ সেই শ্রেণী লোকগণের কোন বিপদ কিম্বা বিশেষ দরকারী কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহারা নিশ্চয় অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং সেই অবস্থায় তাহাদের হৃৎপিণ্ড যাহা চিরদিন অতি অলস ভাবে "নবাবী চালে" কার্য্য করিতেছিল তখন তাহাদিগকে বিশেষভাবে ছুটাছুটী করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যে হৃৎপিণ্ড এত দিন অতি অলস ভাবে কার্য্য করিতেছিল তাহাকে হটাৎ এখন অতিরিক্ত দ্রুতভাবে কার্য্য করিতে হইবে, ফলে যে কি হইবার সম্ভব তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। ইহার পরিণাম যে বিশেষ সুখের হয় না তাহা কি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? পরে যদি এই শ্রেণী ব্যক্তির হৃদয় ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহাদের হৃদয়ের সমস্ত পেশীগুলি বেশ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ না হইয়া বরং তাহাদের উপর বেশ উত্তমরূপে চর্ব্বি জমিয়া রহিয়

বিনা কারণে উহাদের হৃৎপিণ্ডের ঐ অবস্থা ঘটে নাই তাহাদের নিজের স্বভাবই তাহাদের অবস্থার জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডে এইরূপ চর্ব্বি জমিবার মূলে লোকের আলস্যতা ও অতি ভোজন। খাইবার সময় তাহাদের জ্ঞান থাকে না বিশেষতঃ যদি পরের বাড়ীতে হয় কিন্তু দেহ খাটাইবার সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের চক্ষুস্থির। তাহারা জানে না শরীর সুস্থ, সবল এবং কর্ম্মঠ রাখিতে হইলে ও জীবন সুখময় করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে একদিকে পরিমিত ভাবে যেমন আহারের প্রয়োজন অপর দিকেও তদ্রূপ নিয়মিত পরিশ্রমের বিশেষ আবশ্যক।

আমাদের দেশে আজ কাল এই শ্রেণী লোক বিশেষতঃ একটু অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বসিয়া বসিয়া কেবল "পিতৃধন বিনস্যতি" করিতে থাকেন আর তাকিয়া ঠেসান দিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের অলস জীবন কাটাইতে থাকেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ত, পয়সার আধিপত্য নাই, ঠিক যাহা হইবার তা' হইবেই। ক্রমে তাঁহাদের নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয় ও তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড কার্য্যাভাবে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহারাও একটু উঠিয়া বসিতে গেলেই "Palpitation, nervousness" ইত্যাদি হইতেছে বলিয়া নিজ পরিবেষ্টিত বন্ধুগণের মধ্যে নিজকে গর্ব্বিত মনে করেন। কিন্তু আহারের বেলায় ত্রুটী হইবার উপায় নাই এই ভাবে সময় কাটাইয়া ঘড়ি ধরা সময় উপস্থিত হইলেই আবার আহারে প্রবৃত্ত হন। যদি কেহ এই লোকদের দৈনিক ৩।৪ মাইল করিয়া ঘোড়দৌড় করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারে তবে সম্ভবতঃ তাহাদের শরীরের বিশেষতঃ হৃদয়ের কার্য্য স্বাভাবিক ভাবে চলিতে পারে এবং বড় লোকদের patent "nervousness, debility" ইত্যাদি বলিয়া বৃথা অহঙ্কার না করিয়া বরং যাহা প্রকৃত গর্ব্বের বিষয় সেই অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুখে দিন কাটাইতে পারেন।

উল্লিখিত বিষয় গুলি ভিন্ন আরও বিশেষ কারণে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিলেও উহা হইতে পারে। বায়ু প্রথমতঃ আমাদের নাকের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উহার পেঁচাল আকা বাঁকা রাস্তা দিয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করে। নাকের ভিতর দিয়া প্রবেশ কালে বায়ু ছাঁকা ও গরম হয়। নাসিকার ভিতর যে লোম আছে তাহা ছাঁকনীর কাজ করে। এজন্য যাহারা নাক দিয়া নিশ্বাস না নিয়া মুখ দিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে তাহাদের ফুস্‌ফুসের ভিতর ময়লা ঢুকিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং ফুস্‌ফুসের ভিতর হটাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। নাকের ভিতরকার ঘুরান পথ দিয়া যাইবার সময় বাহিরের শীতল বায়ু ক্রমে উষ্ণ হইয়া অভ্যন্তরে গমন করে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই অনর্থ হইবে তাহা সকলেই বুঝিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আমাদের শারীরিক সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এবং কার্য্যে যদি আমরা নিয়মিত ভাবে ও স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া চলি তাহা হইলে যে বহুবিধ রোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।



# নিদ্রার কথা

নিদ্রা সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে অনেক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কিভাবে নিদ্রা যাইতে হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শরীর পালনের সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই কিছু কিছু করিয়া অবগত আছি। কি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং কি করিলেই বা শরীর অসুস্থ হয় তাহা মোটামুটি ভাবে আমরা জানি। কিন্তু সে জ্ঞান আমাদের থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। কারণ জানিয়াও আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করি না। মানব-চরিত্রে এমনই একটী বিশেষত্ব দেখা যায় যে যাহা আপাত মধুর তাহাতেই সকলেরই রুচি। কিন্তু ইহার ফলভোগ তাহাদিগকে পদে পদে করিতে হয়। পশুগণের মধ্যে ইহার বিপরীত ভাব দর্শিত হয়। পশুদের শরীর অসুস্থ থাকিলে তাহারা আহার্য্য স্পর্শও করিবে না কিন্তু আমরা শরীর খারাপ হইলেও উপাদেয় সামগ্রী সম্মুখে পাইলে বন্ধুর অনুরোধের ভাণ দেখাইয়া অক্লেশে আহার করিয়া থাকি। যাক্ এখন উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে দেখা যাউক।

কি ভাবে নিদ্রা যাইতে হইবে তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে নিদ্রা কি, নিদ্রার প্রয়োজন ও উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেছি যে এই বিষয় লইয়া এতাবৎ অনেকে অনেক প্রকার লিখিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া কি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই সামান্য লিখনের প্রতি অতি অল্প সময়ের জন্যও মনোনিবেশ করিবেন না? ফলের সম্বন্ধে বলিতে পারি না তবে অনেকেই বিশেষতঃ যাঁহারা একবারও অনিদ্রার জন্য কষ্ট পাইয়াছেন তাঁহারা যে সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন তাহা বোধ হয় আশা করিতে পারি।

"নিদ্রা নিয়ত পরিচালিত দেহযন্ত্রের প্রাকৃতিক বিশ্রাম"। আমাদের মস্তিষ্ক, শিরা ও শরীরের যাবতীয় যন্ত্রাদি দিবারাত্র আমাদের প্রতিকার্য্যের সহিত পরিশ্রম করিতেছে—পরিশ্রম করিলেই বিশ্রামের প্রয়োজন তাই সর্ব্বনিয়ন্তা উহাদের বিশ্রামের জন্য আমাদের নিদ্রা দিয়াছেন। নিদ্রাকালীন রক্তের স্রোত অপেক্ষাকৃত মৃদুগতিতে চলিতে থাকে। দিবা-ভাগে কিম্বা যখনই আমরা কার্য্যে রত থাকি তখন আমাদের রক্ত সর্ব্বদাই তীব্রতার সহিত চলিতে থাকে, নিদ্রার সময় কিঞ্চিৎ নরমভাবে চলাচল করিয়া কতক প্রকৃতিস্থ হয়। দিবসের বিবিধ কার্য্যের জন্য আমাদের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নিদ্রায় সেই ক্ষয় পরিপূর্ণ হয় ও দেহে নব বলের সঞ্চার হয়। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য নিদ্রার বিশেষ প্রয়োজন।

সাধারণতঃ কার্য্যের জন্য দিন ও নিদ্রার জন্য রাত্রি। উদ্ভিদ ও পক্ষিগণ সমস্ত রাত্রিই নিদ্রা যায়। শিশুগণ দ্বাদশ ঘণ্টা কি তদূর্দ্ধকাল নিদ্রা গিয়া থাকে—নিদ্রার সময় কাহারও ঠিক করা কঠিন উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত শরীরের উপর নির্ভর করে। তবে স্বাস্থ্যের জন্য যে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাওয়ার প্রয়োজন হয় না ইহা স্বীকার্য্য। ৩।৪ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রা ৮।১০ ঘণ্টা স্বপ্ন বিজড়িত নিদ্রাপেক্ষা অধিক উপকারী। সাধারণতঃ দেখা যায় যে গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন থাকে না। নিদ্রার অভাব হইলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয় ইহা বলাই বাহুল্য। একটী লোকের কতক্ষণ নিদ্রার প্রয়োজন ইহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। কারণ কেহ কেহ বলেন ৩।৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট আবার কেহ কেহ ৫।৬ ঘণ্টা ও ৭।৮ ঘণ্টা ইত্যাদি নানারূপ বলিয়া থাকেন। এইরূপ কতক্ষণ নিদ্রার প্রয়োজন এই লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঠিক একটী সময়

নির্দ্ধারণ করা কঠিন তবে ইহা সত্য যে অধিকক্ষণ বা দীর্ঘ নিদ্রা অপকারী। কারণ নিদ্রা যত দীর্ঘ হয় ততই উহাতে স্বপ্নাধিক্য ঘটে। তবে এ কথা বলা আবশ্যক যে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষা শীতকালে, সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা অসুস্থ ব্যক্তির, বালক অপেক্ষা শিশুর, যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের ও শারীরিক পরিশ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিক নিদ্রার প্রয়োজন।

নিদ্রা যাইবার জন্য কিরূপ বিছানা ব্যবহার করিতে হইবে ইহা একটী মহা সমস্যার বিষয়। নিদ্রা যদি গাঢ় হয় তবে বিছানার তারতম্যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। ইহা অনেকাংশে অভ্যাসের অধীন। নাবিক ও সৈন্যগণ যখন যেখানে ইচ্ছা হয় নিদ্রা যাইতে পারে। শক্ত বিছনার উপর শয়ন করিলে শরীরের ভার নরম বিছানা অপেক্ষা অল্প পরিমিত স্থানের উপর থাকে। সাধারণতঃ যাহারা রোগা ও যাহাদের শরীর ক্ষীণ তাহারা নরম বিছানাতে ও যাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল তাহারা শক্ত বিছানাতে শয়ন করিতে পারে। যাহাদের শরীর ক্ষীণ তাহাদের পক্ষে শক্ত শয্যায় শয়ন করা কষ্টকর হইয়া থাকে সাধারণতঃ সকল অবস্থার লোকেই কোমল শয্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসে। শয়নের জন্য কিরূপ শয্যা ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছেন যে তিনি নিজে তাঁহার জীবনে অনেক রকমের সুকোমল স্প্রিং, পালকের, আবার কাঠের এমন কি মাটীর উপর পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে শয্যার কোমলতা কঠিনতার সঙ্গে নিদ্রার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই—উত্তম দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাতেও নিদ্রাবিহীন ভীষণ রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় আবার কঠিন কাষ্ঠের উপর শয়ন করিয়াও সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হওয়া যায়। তবে তিনি বলেন যে এক ব্যক্তির শয়ন করিবার জন্য একখানি ৩৬ ইঞ্চি চওড়া ও ৭৮ ইঞ্চি লম্বা কাষ্ঠের চৌকির উপর বেশী মোটা বিছানা মাদুর গদি ইত্যাদি না দিয়া সর্ব্বের নীচে ১ খানি মাদুর কিম্বা ঐরূপ অন্য কোন জিনিষ রাখিয়া তাহার উপর তুলার ২ খানি তোষক ও চাদর ইত্যাদি পাতিয়া সেই শয্যা ব্যবহার করাই উত্তম। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে বিছানা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার যত সুবিধা হয় শয্যা মোটা ও অধিক হইলে ততটা পরিষ্কার রাখা সম্ভবপর হয় না। শয্যার আড়ম্বর অপেক্ষা অল্প অথচ পরিষ্কার বিছানাই শ্রেয়ঃ। শয্যা একটু নষ্ট হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে নূতন পরিষ্কার শয্যা ব্যবহার করা বিশেষ আরামদায়ক। এক বিছানা বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করা ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে পুরাতন গুলিকে বদলাইতে হয়। অনেক সংসারে এরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা গদি না হইলে শয়ন করিতে পারেন না কিন্তু সে গদি হয়ত পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—তাহার ভিতরের তুলা মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—সেরূপ বিছানা মোটেই ভাল নহে।

সুনিদ্রার পক্ষে পরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, উত্তম ও ন্যায্য আহার, দৃঢ় শয্যা, বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু, অন্ধকার ও নিস্তব্ধ ঘর, অনেক সময় মৃদুবাদন, নিশ্চিন্ততা, মানসিক সুস্থিরতা, নিয়ম ও সময় নিষ্ঠা ইত্যাদি অনুকূল।

নিদ্রায় যথাক্রমে, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক সর্ব্বশেষে নিদ্রাগত হয়। মস্তিষ্ক অনেকসময় মোটেই নিদ্রাগত হয় না। নিদ্রার মধ্যেও উহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় না হইলে নিদ্রার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সংশোধিত হয় না। মস্তিষ্ক নিদ্রিত না হইলে তাহাকে সুনিদ্রা বলা যায় না। সুতরাং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মনকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য করা আবশ্যক।

নিদ্রাকালে জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীরে চলিতে থাকে। নিশ্বাসযোগে শরীরে অক্সিজেন ( Oxygen ) গৃহীত এবং প্রশ্বাস সহ কার্ব্বণিক এসিড (Carbonic Acid) বহির্গত হয়। অক্সিজেন গ্রহণের আধিক্য বশতঃই বলের সঞ্চার হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ ঘটে, সুতরাং সুনিদ্রার



পক্ষে নিদ্রাকালেও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কিরূপ প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

নিদ্রায় পাকস্থলীও বিশ্রাম লাভ করে। সুতরাং রাত্রিকালে লঘু আহার করাই সঙ্গত, নচেৎ খাদ্যবস্তু উত্তমরূপে পরিপাক হয় না এবং পাকস্থলীও বিশ্রামের অভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই আহারের পরক্ষণেই নিদ্রা যাওয়া দূষণীয়।

নিদ্রিতাবস্থায় মস্তকে রক্তের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং তামাক, চা, সুরা ইত্যাদি যে সমস্ত সেবনে মস্তকে রক্তাধিক্য ঘটে ( অন্ততঃ শয়নের পূর্ব্বে ) তাহা সেবন করা উচিত নহে। মস্তকে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে রক্ত দূরে অপসারিত হয় এই কারণে নিদ্রা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বে মুখ, চক্ষু, কর্ণপ্রদেশ, ঘাড়, গলা ইত্যাদি বেশ শীতল জলে ধৌত করা ভাল।

নিদ্রায় কি ভাবে শয়ন করিতে হইবে তাহা একটী চিন্তার বিষয়। নিদ্রার আবেশ হইলে যে কোন অবস্থাতেই শয়ন করিয়া সুনিদ্রা উপভোগ করা যায়। অনেকে বসিয়া বসিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে। অনেকে বলেন যে বাম পার্শ্বে শয়ন করা ভাল নহে কারণ বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে পাকস্থলীর উপর ভারযুক্ত যকৃতের এবং হৃৎপিণ্ডের উপর পাকস্থলীর চাপ পড়ে। পূর্ণোদরে বাম পার্শ্বে শয়ন করা নিতান্ত অন্যায়। চিৎভাবে শয়ন করিলে রক্ত চলাচলের বিঘ্ন ঘটে, স্নায়ু সমূহের উপর চাপ পড়ে এবং মেরুদণ্ড উত্তপ্ত হয় বলিয়া স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া অতি সুনিদ্রায় মগ্ন থাকেন এবং নিদ্রান্তে অতি সুস্থ বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করা ভাল এইরূপ অনেকে বলেন। কারন এই অবস্থায় যকৃৎ নিম্নেই থাকে এবং পাকস্থলী আরামে থাকে।

অনেকে মুখ, নাক ঢাকিয়া শয়ন করেন তাহা নিতান্ত অন্যায়—ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু নির্গত হয় আবার তাহাই শরীরে প্রবেশ করে। গায়ে দিবার জন্য বেশী মোটা ও ভারি কোন জিনিষ ব্যবহার করা ভাল নহে। আমাদের মধ্যে আরও একটী বিশেষ কদভ্যাস আছে দেখা যায়। অনেকে দিনে যে জামা ব্যবহার করেন শয়নকালেও তাহাই গায়ে দিয়া শয়ন করেন কিন্তু শরীরের পক্ষে ইহা অতীব হানিকর। একত্র এক বিছানায় বেশী লোক শয়ন করা উচিত নহে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বিছানা হওয়াই ভাল। নিদ্রা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সুনিদ্রা ভিন্ন স্বাস্থ্য কখনও ভাল থাকিতে পারে না।

# মেদবৃদ্ধি বা স্থূলতা

মোটা হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়। সকল স্নেহময়ী মাতাই ইচ্ছা করেন যে তাঁহার পুত্র বা কন্যা সুস্থ ও সবল হউক। রোগা কঙ্কাল সার ব্যক্তি সত্যসত্যই দেখিতে অতি কুশ্রী। কিন্তু আবার অপর দিকে দেখিতে হইলে অতিরিক্ত স্থূলব্যক্তি অতীব কদাকার। অতিরিক্ত স্থূল কদাকার কেন বোধ হয় অকর্ম্মণ্যও হইয়া থাকে। সেইজন্য দেখা যাইতেছে রোগা হওয়াও দোষ আবার অতিরিক্ত মোটা হইলেও বিপদ। এখন কোনদিকে যাওয়া যায়—এই সমস্যার যেটি সোজা উত্তর সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের উপরই তাহার মীমাংসার ভার দেওয়া হইল। উপস্থিত আমাদের যাহা বক্তব্য বিষয় এখন তাহা লইয়াই একটু আলোচনা করা হইবে।

দেহের অতিরিক্ত স্থূলতা বা ভার যে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে তাহা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন কারণ এইরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাদের দেহ যে কতদূর ভার ও বিষময় বোধ হয় তাহা ভুক্তভোগীগণই আমাদের অপেক্ষা উত্তম বুঝিবেন। অতিরিক্ত স্থূল ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবনে কখনও কোন কার্য্যেই স্বাভাবিক মাত্রায় পরিশ্রম করিতে পারেন কি না তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। অন্য কাজ ত' দূরের কথা নিজের নিত্য করণীয় কার্য্যও বোধ হয় অপরের বিশেষ সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন না। যে ব্যক্তিকে প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তাঁহার জীবনে শান্তি কোথায়? পাঠকগণ সকলেই হয়ত এ কথায় সায় দিবেন।

এই কারণে যাহাতে এত অসুবিধা ও অশান্তি উৎপাদন করে তাহা নিবারণ করিতে সকলেই চেষ্টা করেন। শরীর যখন অধিক মোটা হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই অদম্য গতির যাহাতে রোধ হয় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সর্ব্ব প্রথম উপদেশ দেওয়া হয় যদি তাহাতে কোন ফল না হয় তবে অগত্যা সেই অসীম মাংস পিণ্ডবৎ দেহের স্থূলতা ও ভার যাহাতে কমে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাধারণতঃ মানুষ অতিরিক্ত আহার, অতিরিক্ত পান, অধিক ধূমপান ইত্যাদি কারণে বেশী মোটা হইয়া পড়ে। তাহাদের উত্তমরূপে পরিপাক হয় না বলিয়া খাদ্যদ্রব্য যথাযুক্ত নিয়মে শরীরের মধ্যে গৃহীত হয় না ও খাদ্যের পরিত্যাজ্য পদার্থগুলি যথানিয়মে শরীর হইতে নির্গত হয় না। প্রায়ই তাহারা হয় শরীরের পক্ষে যাহা অনুপযুক্ত সেইরূপ দ্রব্য আহার করে কিম্বা অতিভোজন করিয়া পরিপাক যন্ত্র সমূহকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। সেইজন্য পরিপাক যন্ত্রাদি সুস্থভাবে ও নিয়মিতরূপে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না ও সেই সমস্ত অপরিপাচ্য খাদ্য নিয়মিতরূপে শরীরে নিয়োজিত হয় না কিম্বা পরিত্যাজ্য অংশগুলি উত্তমরূপে শরীর হইতে নির্গত হয় না। ক্রমান্বয়ে এইরূপ ভাবে শারীরিক প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে ও ফলে দেহের অযথা পুষ্টি ও অঙ্গে অতিরিক্ত জল সঞ্চয় হইতে থাকে।

খাদ্যের সহিত আমরা নানাবিধ দ্রব্য আহার করিয়া থাকি। সুস্থ দেহের জন্য একপ্রকার দ্রব্য আহারে—সর্ব্ব প্রকার শারীরিক অভাব মোচন হয় না। বসা বা চর্ব্বি যুক্ত (Fatty) দ্রব্য আহার করিলে এবং নিয়মিত নিষ্ক্রমণ প্রণালীর বিকলতা হইলে ঐ সকল চর্ব্বি দেহের সর্ব্বত্র জমিতে থাকে। ক্রমে এই সমস্ত সঞ্চিত চর্ব্বি একরূপ নরম মাংসে পরিণত হয়। যদিও এইরূপ সঞ্চিত মাংস শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকর বা অস্বাস্থ্যকর না হইলেও ক্রমে ক্রমে তাহারা বিনা বাধায় একত্রিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক শরীরের কোন অংশে সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রথমে মাংস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে উদর, উরু ও নিতম্ব কিম্বা দাবনা প্রদেশে অধিক মাংস জমিয়া থাকে। এতদ্দশাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যকরণের ক্ষমতা ও অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় উপস্থিত আমাদের বক্তব্য বিষয় নহে তবে কিরূপে তাহাদের শরীরের এই অবাঞ্ছনীয় ও বিশেষ অপ্রীতিকর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তাহাই এক্ষণে বলা হইবে।

শারীরিক প্রথার ব্যতিক্রম ঘটার নিমিত্তই স্থূলতা জন্মে আবার এই অবস্থার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলেও সেই শারীরিক প্রক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। প্রধানতঃ—খাদ্যের ব্যবস্থা বিশেষ সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। অনেকের ধারণা উপবাসে উপকার হয় কিন্তু উপবাসে বিশেষ কোন ফল হয় বলিয়া মনে হয় না। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও চর্ব্বিযুক্ত আহার্য্য পরিত্যাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। মেদবৃদ্ধিতে অনেকে Turkish Bath বিশেষ উপকারী এইরূপ বলিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাতে কোন বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায় না। Steam Bathএ শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া ১০০ হইতে ১৪০ ডিগ্রি উত্তাপ উৎপাদন করে। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় বলিয়া স্নানের পরক্ষণেই দেহের ওজন কিঞ্চিৎ



পরিমাণে লঘু হয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেহের ভারের এই লঘুত্ব অতি ক্ষণস্থায়ী। কারণ আহারের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলে তৎপরে অল্পকাল মধ্যেই ঘর্ম্মের দ্বারা যে পরিমাণ দেহের জল নির্গত হইয়াছিল তাহা পুনরায় সঞ্চিত হয় কিন্তু চর্ব্বির বৃদ্ধি সমভাবেই হইতে থাকে। শরীরের এইরূপ অস্বাভাবিক স্থূলতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত অনেকে সেঁক দেওয়া ও আহারের নির্দ্ধারিত প্রণালী স্থির করিয়া দেন ও রোগীকে তদনুযায়ী চালিত করেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থাতেও বিশেষ কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগ কমাইতে হইলে রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও তাহাই স্থায়ী উপায়। উপস্থিত ক্ষেত্রেও এইরূপ মেদবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ গুলিকে দমন করিলেই বেশী উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অতি ভোজন, অতিরিক্ত পান এবং নিতান্ত অল্প পরিশ্রমের ফলেই এইরূপ হয়। এই কারণ গুলিকে দমন করিতে পারিলেই রোগেরও উপকার হইবে।

সাধারণতঃ শরীরকে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ রাখিতে হইলে দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি পরিত্যাজ্য। শাকসব্জী যেরূপ শরীরের পক্ষে উপযোগী মাংস তাহা অপেক্ষা অনেক কম বিশেষতঃ স্থূল ব্যক্তিগণের মাংস ডিম্বাদি অপেক্ষা শাকসব্জী আহার করাই ভাল। অনেকে অর্দ্ধপেট করিয়া খাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু আহারে এই সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করিলে পেট ভরিয়া খাইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পানের জন্য অন্য কোন পানীয় অপেক্ষা কেবল জল ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। বেশ তৃপ্তির সহিত দৈনিক এইরূপ আহার্য্য ৩ বার করিয়া আহার করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। নিজ নিজ পরিপাক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া শাকসব্জী যত অধিক পরিমাণে খাইতে পারা যাইবে, ততই দেহ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্চিত চর্ব্বি নির্গত হইয়া যাইবে। কাজেই মেদবৃদ্ধিরোগের বিশেষ উপকার তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শরীরের অযথা চর্ব্বি সঞ্চয়ের নিমিত্তই দেহ অধিক স্থূল হইয়া পড়ে।

এইরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে শাকসব্জী ফলমূল আহার বড়ই উপযোগী। নিজ পরিপাকের ক্ষমতামত প্রত্যেকে যত ইচ্ছা আহার করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সব্জীর মধ্যে যাহা যথার্থ উপযোগী হইতেছে না, তাহা অবশ্য পরিত্যজ্য।

কোনরূপ মাদকদ্রব্য, সুরা, চা, কফি প্রভৃতির ব্যবহার ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এমন কি অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ জল পান ক্ষতিজনক। দৈনিক একজন ব্যক্তির পক্ষে ১ পিণ্ট (Pint) প্রায় অর্দ্ধসের জলই যথেষ্ট। তরকারী ও সবজী আহারে শরীরের চর্ব্বি নষ্ট হয় ও নিয়মিত রূপে দেহের ক্লেদ নির্গমণের সাহায্য করে। রক্ত সঞ্চারের সহায়তা করে এবং দেহের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

পূর্ব্বের অনিয়মে যে চর্ব্বি শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পরিশ্রমে ও উল্লিখিত রূপ আহারে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে। উপবাস ইত্যাদি হইতে বিশেষ কোন ফল পাইতে প্রায়ই দেখা যায় না। মেদবৃদ্ধি হইতে যতপ্রকার চিকিৎসাই ব্যবস্থা করা হউক না তন্মধ্যে অজীর্ণ, অতিভোজন, অতিরিক্ত পান ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যথানিয়মে নিরামিষ ভোজন করিলে উপকার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। সংসারে সকলেই সুস্থভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে আহারের রুচি ও মাত্রা ভেদেই বিবিধ রোগ ও বিপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহা অতি সরল সমস্যা এবং একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই সকলেই নিজ নিজ আহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয় ও নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতে পারে।

রসায়নতত্ত্ববিদ্‌গণ আহার সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ ও নিয়ম দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্য তাঁহারাই করিতে থাকুন। তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণা

তাঁহারা গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকুন। তাঁহারা বলিবেন যে প্রত্যেক লোকের পক্ষে এত পরিমাণে Protein, এই পরিমাণে Carbohydrate ইত্যাদি প্রয়োজন কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিতে বলা যতটা সহজ কার্য্যে পরিণত করা তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন।

হস্তী অপেক্ষা স্থূল দেহ জগতে অন্য কোন জীবের আছে কি না সন্দেহ। তাহার কোন লিখিত বা প্রদর্শিত মার্গ অনুযায়ী আহারাদি করে না কিন্তু না করিয়াও অতি সুস্থ ও সবলভাবে অন্ততঃ ২০০ শত বৎসরকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। স্থূল ব্যক্তিগণের পক্ষে শাকসবজী যে বিশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

# ভারতের কুষ্ঠরোগী

"সঞ্জিবনী" হইতে উদ্ধৃত।

রেভারেণ্ড ওলড্রিভ কলিকাতা নগরে এক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে এখন কুষ্ঠব্যাধি পীড়িত নরনারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার। বক্তা একান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কুষ্ঠরোগীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র পূর্ব্ববৎ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই রোগ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করা হইত। এখনও এই রোগাক্রান্ত হতভাগ্যগণকে আত্মীয়েরা গৃহ হইতে বহিস্কৃত করেন, তাহারা কোথায় মাথা রাখিবে কি খাইবে, কি তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন না। হতভাগ্যেরা ভিক্ষায় উদর পূরণ করে। এই জন্যই কলিকাতার রাজপথে এত অধিক সংখ্যক কুষ্ঠরোগী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

### কুষ্ঠাশ্রম।

৪৪ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক আইরিশ ধর্ম্ম প্রচারক উত্তর ভারতে আম্বালায় কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন। যখন তিনি ব্রিটেন গমন করিয়াছিলেন তখন কুষ্ঠ রোগী মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ মিশন ১২টা দেশে কার্য্য [illegible]। ভারতবর্ষে মিশন বিশেষভাবে কার্য্য করিতেছেন। এইখানে মিশন ৩৬টি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অপর ৯টি আশ্রমে অর্থদানে এবং ৯টিতে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া সাহায্য করিতেছেন। মোট ৫৬টি কুষ্ঠাশ্রমের সহিত মিশন সংযুক্ত রহিয়াছেন।

### কুষ্ঠ সংক্রামক ব্যাধি।

কুষ্ঠ ব্যাধি সংক্রামক। এই জন্য উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। মিশনের ৩৬টি আশ্রমে ৪০৩০ জন ব্যাধি পীড়িতকে এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে রাখা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টি আশ্রমে ৬ সহস্র কুষ্ঠ রোগী মিশন হইতে সাহায্য পাইতেছে।

### কুষ্ঠ আইন।

কুষ্ঠ রোগ সংক্রান্ত সরকারী আইন সন্তোষজনক নহে। ঐ আইনের পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ত্তৃপক্ষ যদি দেখেন যে রাস্তায় কোন কুষ্ঠরোগীর অঙ্গে ক্ষত আছে তবে তাহাকে ধরিয়া কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ক্ষত সারিলেই তাহাকে কুষ্ঠাশ্রম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গোবরার কলিকাতা কুষ্ঠাশ্রমে ইহাই করা হয়। এই প্রকার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে।



### সরকারী সাহায্য।

মিশনের কার্য্যে গভর্মেণ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ঐ কার্য্যে বৎসর ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার সাহায্য করেন।

### আশ্রমের ও বাহিরের রোগী।

কুষ্ঠাশ্রমের রোগীরা পরিধেয় বস্ত্র ও উপযুক্ত আহার্য্য পাইয়া থাকে। বাহিরে যে সকল কুষ্ঠরোগী আছে তাহাদের তেমন আহার ও পোষাক সংগ্রহ করা অসাধ্য প্রত্যেক কুষ্ঠাশ্রমেই রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসালয় আছে।

কুষ্ঠরোগীদিগকে কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। তাহারা আপনাদের আহার্য্য প্রস্তুত এবং বাসস্থান পরিষ্কার করে। কোন কোন কুষ্ঠ নিবাসে রোগীরা বাগানে কার্য্য করিয়া ফলমূল উৎপাদন করে।

### কুষ্ঠরোগ হইতে কি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করা যায়?

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করা যায় কিনা? এই বিষয়ে সার লিওনার্ড রোজার্স যে চিকিৎসা প্রণালী সংপ্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা তদনুসারে চিকিৎসা করাইয়া বিলক্ষণ সুফল পাইয়াছি। তবে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে এমন কথা জোর করিয়া এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

### বিদ্যাশিক্ষা।

কুষ্ঠাশ্রমে ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা আছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মোপদেষ্টারা স্বেচ্ছায় এই কার্য্য করিতেছেন। অধিকাংশ কুষ্ঠনিবাসে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রোগীরা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হয়।

### কুষ্ঠব্যাধি বংশানুগত নহে।

কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কুষ্ঠ ব্যাধি বংশানুগ নহে। কুষ্ঠাশ্রমবাসী রোগীদের ৪ হইতে ৫ শতের মত সুস্থ পুত্রকন্যা আছে। ঐ শিশুদিগকে এই ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে নাই। কুষ্ঠাশ্রম সংলগ্ন বিশেষ ভবনে তাহারা বাস করে। এই সকল বালক বালিকার প্রতিপালন অতি মহৎ কর্ত্তব্য। সযত্নে প্রতিপালিত হইলে ইহারা সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইবে।

### ইউরোপীয় কুষ্ঠাশ্রম।

ভারতে কতিপয় ইয়ুরোপীয় কুষ্ঠরোগী আছে। ইহাদের জন্য সিমলার নিকটে সুবথু নামক স্থানে একটি কুষ্ঠরোগী-নিবাস আছে। তথায় ৯ জন রোগী আছে।

### ব্যয়।

মিশনের ভারতীয় কুষ্ঠাশ্রম সমূহে মোট ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬৭ টাকা ব্যয় হয়। এতন্মধ্যে ব্রিটেন হইতে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৪ টাকা ও প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট সমূহ হইতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৪৩ টাকা পাওয়া যায়। মিশনের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য এখন দেড় লক্ষ টাকার দরকার। মিশনের এই কার্য্যের জন্য কলিকাতায় এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। সাঁর আর, এন, মুখার্জ্জি, সার কৈলাশ চন্দ্র বসু এবং সার লিওনার্ড রোজার্স প্রমুখ ব্যক্তিগণ কমিটির সভ্য আছেন।

---

## বিবিধ সংগ্রহ।

**আদম স্মুমারি।**—দশ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে লোক গণনা করা হয়। ১৯২১ সালে উক্ত গণনা হইবে। সংপ্রতি গভমেণ্ট উহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

---

**ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎস।**—স্থইডেনের এক চিকিৎসক তাপ ও আলোকের সাহায্যে রোগীকে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া বহু জনকে ইন্‌ফুয়েঞ্জা রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন।

---

**বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুতের আয়োজন।**—১৮৬৪ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলায় লবণ প্রস্তুত হইত। ঐ সালে লবণের কারখানা উঠিয়া যায়। সম্প্রতি কাঁথি মহকুমায় বঙ্গোপসাগর কুলে সমুদ্রপুর নামক স্থানে মেসার্স এণ্ড ইয়ুল কোম্পানী লবণ প্রস্তুতের কারখানা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত করা লবণ ৪মাস মধ্যে বাজারে পাওয়া যাইবে। উহা পৃথিবীর কোন স্থলের লবণ হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না।

---

**হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ।**—বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও একটি ভৈষজ্য উদ্যান খোলা হইবে। কলিকাতার একজন দানশীল মাড়োয়াড়ী আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান যুগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নুতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হইবে।

**দোক্তায় মৃত্যু।**—কাঁথি মহকুমার বাহিরী গ্রামের এক ব্যক্তি কয়েক দিন হইল কাঁথি হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পানের দোকান হইতে পান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে। পানে দোক্তা দেওয়া ছিল। লোকটী পান খাইয়া কিছু পথ চলিয়া যাওয়ার পর তাহার মাথা এবং শরীর হইতে খুব ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। সে তখন কাঁপিতে থাকে! সে পথিপার্শ্বে পড়িয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

---

**নানাস্থানে অন্নকষ্ট।**—গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তথায় মানুষ ও গরুর খাদ্য যথেষ্ট নাই। গভর্মেণ্ট ৪০১২ টাকা ঋণ দিয়াছেন। নিরাশ্রয় লোকদের খাটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। চাউল এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহ অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। লোকে লতাপাতা খাইয়া উদর পূরণ করিতেছে।

বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দুইই আরম্ভ হইয়াছে। জেলাবোর্ড কূপ খনন আরম্ভ করিয়াছেন। ৪৬২ জনকে সাহায্য করিতে হইয়াছে। প্রায় নয় শত লোক জেলা-বোর্ডে কর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

পাবনা জেলার বহু স্থানে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য সংগ্রহার্থ পাবনার সদর সবডিবিসনাল অফিসার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

---


# স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৭ম বর্ষ | চৈত্র ১৩২৫ সাল | ১ম সংখ্যা


## আলোচনা

**ধূমপান নিবারণ আইন**—বঙ্গীয় গভর্মেণ্ট ধূমপান নিবারণ আইন পাশ করিয়াছেন। শুনা যায় যে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ঐ আইন কলিকাতায় বলবৎ হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত আইন অনুযায়ী কার্য্যের কোনরূপ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না। প্রকাশ্য রাজপথে অল্পবয়স্ক বালকগণ যথারীতি অবাধে ধূমপান করিতেছে। বিক্রেতাগণও অল্পবয়স্ক বালকগণকে সিগারেট ইত্যাদি বিক্রয় করা যে আইনানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা জ্ঞাত নহে। কলিকাতায় অসংখ্য পান সিগারেটের দোকান আছে, গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে সেই সকল দোকানদারদিগকে আইনের বিষয় জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আইন অনুযায়ী কার্য্যের কোনরূপ ব্যবস্থা না হইলে আইন পাশ হওয়া, না হওয়া উভয়ই সমান। আমরা এ সম্বন্ধে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য আইনের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করা হইল।

**বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা**—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক ইউরোপীয় সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "এ দেশের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও খাস সরকারী স্কুল কলেজ সমূহে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ের শিক্ষা-দানের জন্য বজেটে ব্যবস্থা করা হউক।" গভর্মেণ্ট উত্তরে জানাইয়াছেন, "স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক প্রায় সকল স্কুলেই পড়ান হয়। আপনি যাহা চাহিতেছেন গভর্মেণ্ট তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন।" আমাদের মতে, বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বাস্থ্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। স্বাস্থ্য শিক্ষার ফলে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের যথোচিত উন্নতি হইতেছে কি না সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সময়ে অসময়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা পুস্তক সাধারণ ভাবে পড়াইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে বিশেষ সুফলের আশা করা যাইতে পারে না। ইউরোপে ও আমেরিকায় বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য শিক্ষার বিশেষরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা ছাত্রগণের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা যাইতেছে। অন্য সকল দেশের ছাত্র অপেক্ষা বঙ্গীয় ছাত্রেরা স্বাস্থ্য সম্পদে হীন। এ বিষয় বিবেচনা ক[illegible]

গভর্মেণ্টের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বঙ্গে মাদকতার বৃদ্ধি—বঙ্গে মদ্য পানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক স্থলে মদের কাটতি এবং তৎসঙ্গে আবগারী আয় বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া গভর্মেণ্টের অর্থসচিব উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৪-১৫ সালে বঙ্গদেশে ৭ হাজার ৬৪৯ জন মাতলামির জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৯১৭-১৮ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯ হাজার ৭৮৪তে উঠিয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণার পরে পৃথিবীর অনেক দেশে মদ্যপান নিবারিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্য যে এখানে বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। মাদকতা নিবারণী সভা সমূহ নিজেদের সাধ্য মত মাদক নিবারণ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গভর্মেণ্টে একার্য্যে বিশেষ সহায়তা না করিলে আমরা কোনরূপ স্থায়ী সুফলের আশা করিতে পারিতেছি না।

স্বর্গীয় কবিরাজ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম্, এস, গত ১লা ফাল্গুন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তী হন এবং যথাসময়ে যোগ্যতার সহিত এল, এম, এস উপাধি লাভ করেন। মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিতেছেন সুরেন্দ্রনাথই তাঁহাদের পথ প্রদর্শক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেই ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অসুস্থ অবস্থাতেও মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-সমাচারে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বঙ্গ সাহিত্যেরও ইনি সাধক ছিলেন। কয়েকখানি শিক্ষাপূর্ণ উপন্যাস নাটক এবং কবিতাপুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে মেডিকল স্কুল—"বাঙ্গলা গভর্মেণ্ট বর্দ্ধমানে এক মেডিকেল স্কুল স্থাপন করিবেন। তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।" এসংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসকের বিশেষ অভাব আছে, চিকিৎসা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, সে অভাব পূরণ হইবে না। দুইটী মেডিকেল কলেজ ব্যতীত বঙ্গে ঢাকা ও ক্যাম্পবেল মাত্র এই দুইটি মেডিকেল স্কুল আছে। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া ক্ষুন্ন মনে অন্য পন্থা অবলম্বন করেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র বিদ্যালয়ে স্থান পায়। বর্দ্ধমানে স্কুল স্থাপিত হইলে, অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রকে আর বিফল মনোরথ হইতে হইবে না, এবং দেশেও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। অধিক স্কুল এক সঙ্গে স্থাপনের সুবিধা না হইলেও বর্ত্তমানে অন্ততঃ রাজসাহী ও চট্টগ্রামে একটি করিয়া মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে বঙ্গের পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া স্কুল হইবে এবং সেই সেই বিভাগের ছাত্রদের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অনেকটা সুবিধা হইবে। বাঙ্গলা গভর্মেণ্ট এ বিষয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। গভর্মেণ্ট স্কুল ব্যতীত জনসাধারণের চেষ্টায় ও স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।



# ধূমপান নিবারণ আইন

## ১৯১৯ সালের ২ আইন

তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ধূমপান নিবারণের জন্য আইন।

হেতুবাদ।

যেহেতু তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ধূমপান নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা গেল :—

সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি এবং আরম্ভ।

১৮৯৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন।

১। (১) এই আইনটীকে তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ধূমপান বিষয়ক ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ১৮১৯ সালের কলিকাতার মিউনিসিপাল আইনের ৩ ধারার ৭ দফায় কলিকাতা শব্দের যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেইমত কলিকাতা নগরে এই আইন প্রথমতঃ প্রচলিত হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গভর্মেণ্ট, কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সময়ান্তরে বঙ্গদেশের অন্তর্গত অপর কোন নগর কিম্বা স্থানে এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন।

(৩) স্থানীয় গভর্মেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া, যে তারিখে আদেশ করেন সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

অর্থ নির্দ্দেশ।

২। এই আইনে বিষয় বিবেচনা কিম্বা পূর্ব্বাপর কথায় বিরুদ্ধ ভাবের কিছু না থাকিলে—

(ক) "সিগারেট" বলিতে কাগজে পাকান কাটা তামাক, দোক্তা, কিম্বা ধূমপানের জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ ধরণের অপর যে কোন দ্রব্যও বুঝাইবে;

(খ) "পুলিশ কর্ম্মচারী" বলিতে কোন প্রতিষ্ঠিত পুলিস দলের হেড কনেষ্টবলের অপেক্ষা উচ্চপদের যে কোন লোককে বুঝাইবে; এবং,

(গ) "তামাক" বলিতে যে কোন আকারের তামাক বুঝাইবে ও তামাকের বদলে ব্যবহার হইবার জন্য অভিপ্রেত যে কোন ধূমপানের জন্য মিশান দ্রব্যও বুঝাইবে।

তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে তামাক ইত্যাদি বিক্রয় করা নিষেধ।

৩। (১) দেখিতে ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে, নিজের তাহার ব্যবহারের জন্য হউক বা না হউক, কোন ব্যক্তি কোন তামাক, পাইপ, কিম্বা সিগারেটের কাগজ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

কিন্তু দেখিতে ষোল বৎসরের কোন ব্যক্তিকে সিগারেট ছাড়া অন্য তামাক বিক্রয় করা হেতু এই প্রকরণ মতে কোন লোক কোন অপরাধে অপরাধী হইবে না, যদি তাহার জানা না থাকে ও বিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকে যে ঐ তামাক সেই ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যই কেনা হইয়াছিল।

(১) যদি কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের বিধান লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সরাসরি-ভাবে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, তাহার দশ টাকার অনধিক জরিমানা, এই দ্বিতীয়বার অপরাধের বেলা কুড়ি টাকার অনধিক জরিমানা, এবং পরবর্ত্তী অপরাধের বেলা পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারিবে

### কোন কোন স্থানে তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট পাওয়া তামাক প্রভৃতি পুলিশ কর্ম্মচারী ও অপরাপর ব্যক্তির ধৃত ও নষ্ট করিবার ক্ষমতা।

১। উর্দ্দিপরা কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা এতৎ-পক্ষে স্থানীয় গভর্মেণ্টের নিকট যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর যে কোন লোক বা যে কোন শ্রেণীর লোক, দেখিতে যোল বৎসরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে কোন রাস্তায় অথবা সাধারণ স্থানে ধুমপান করিতে দেখিলে, তাহার অধিকারে থাকা তামাক, পাইপ কিম্বা সিগারেটের কাগজ ধৃত করিতে এবং ঐরূপ কোন দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

### নালিশ রুজু করা।

৫। এইরূপ ব্যাপারে যে তরুণবয়স্ক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে তাহার পিতা, মাতা, কিম্বা অভিভাবক, অথবা ৪ ধারামতে ধৃত করণে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্ম্ম-চারী বা অপর ব্যক্তি অভিযোগ কিম্বা প্রার্থনা না করিলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এই আইনঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

### কোন কোন স্থলে আইন খাটিবে না।

৬। যে ব্যক্তিকে তামাক, পাইপ বা সিগারেট কাগজ বিক্রয় করা হয়, বা যাহার নিকট তাহা পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই সময়ে যদি এমন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন, বা পাইকারি বা খুচরা হিসাবে ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাহা হইলে এই আইনের বিধান সকল খাটিবে না।

---

# মন ও শরীরের উন্নতি সাধন

শরীর ও মনের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, যাহার ফলে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আমাদের শরীর যখন যে অবস্থায় থাকে মনও ঠিক তাহার অনুগত ও অনুরূপ অবস্থায় থাকে এবং একটীর পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপরটীর মধ্যেও ঠিক অনুরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সেই জন্য দৈহিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গেই মনের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমরা শরীরকে যে অবস্থায় উপস্থাপিত করিতে চাই মন যদি তাহার বিরুদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহা হইলে আমরা যতই প্রয়াস পাই না কেন কিছুতেই শরীরকে আশানুরূপ অবস্থায় আনা যাইবে না। দেহ ও মনের সম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ট ও পরস্পর সাপেক্ষ।

বহুবিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেই এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে [illegible] নিরাময় করিতে হইলে রোগীর মনে একটা শুভ বিশ্বাস উৎপাদন করা প্রয়োজন। তবে অনেক সময় আলোচ্য বিষয়টী অংশতঃ স্বীকৃত হইলেও পূর্ণ ও সমগ্র ভাবে স্বীকার করা হয় না। তাহার ফলে মনের উন্নতি সাধনের দিকে লক্ষ্যহীন হইয়া শরীরের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা হয়। ইহাতে অনেক সময় কতক ফল পাইলেও ইহা যে নিতান্ত অল্পকালস্থায়ী হয় তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যায়ামশালায় দেখা যায় যে অনেকে প্রথমতঃ ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরের উন্নতি হইলেই যেমন ব্যায়াম ত্যাগ করে অমনি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে ইহাদের শরীর ও মনের অবস্থা অনুরূপ ও অবিরুদ্ধ নহে, ইহারা শরীরের উন্নতি করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে মনের উন্নতির প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখে নাই।



চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। রোগী সাধারণতঃ ডাক্তার বৈদ্যের কথায় যত-দিন ঠিক চিকিৎসাধীন থাকে বা অবস্থাগতিকে পালন করিতে নিতান্ত বাধ্য হয়, ততদিনই পালন করে। তাহার পর নিজের ঠিক সাধারণ জীবন ধারণ প্রণালী অবলম্বন করে। তাহার ফলে এইরূপ চিকিৎসায় যে শারীরিক উন্নতি হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যায়ামকারীর ন্যায় একইরূপ ক্ষণস্থায়ী হইয়া যায়। সকলের এইটুকু মনে রাখা উচিত যে কেবল যতদিন আমরা চিকিৎসাধীন থাকিব ততদিনই যে কেবল মন ও শরীর এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহার পরও অন্ততঃ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে শরীর ও মন ঠিক পরস্পর সাপেক্ষ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে কি না। আমরা সাধারণতঃ খেয়াল ও অনুশীলন এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ অনুভব করি তাহা ঠিক এইরূপ। একজনের কাছে এটী নিতান্ত সাময়িক ও অন্য জনের কাছে জীবন ব্যাপী সাধনার বিষয়।

শারীরিক বা মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য সাময়িক চেষ্টা উপকারী হয় কি না এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। আপাততঃ উন্নতি কতকটা সাধিত হইলেও পরে শীঘ্রই একটা ঘোরতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীরের অবস্থা পূর্ব্বের সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য দেখা যায় যে যাহারা দৈহিক বলের জন্য বিখ্যাত তাহারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না। যে উপবাসী সে আহারে বসিলেই অতিভোজন করিবে এবং যে অত্যধিক ব্যায়াম করিয়াছে সে প্রায়ই আলস্যের প্রশ্রয় দিবে।

এইরূপ সুক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে আমরা অনেক সময় মারাত্মক ভ্রম করি। অনেক সময়ে যথেষ্ট ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলেও আমরা লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া যাই যে অজ্ঞাতসারে অতিভোজন দ্বারা শরীরকে আক্রান্ত করিতেছি। ইহাও জানা কথা যে কোন বিষয় পাইবার জন্য অতিমাত্রা ব্যস্ত হইলে প্রায়ই অভীপ্সিত ফললাভ হয় না। শরীরের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল ব্যায়াম লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে ঐরূপ মনে করা ভুল। দিনের মধ্যে ৩০ মিনিট সময় ব্যায়ামের জন্য ব্যয় করিলেই যথেষ্ট। পশ্চিমের পালোয়ানের মত কেবল আখড়ার জমি ও ডালরুটীই একমাত্র সার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মানসিক পরিশ্রম সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ৮।১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া বিশেষ গৌরব বোধ করি। কিন্তু ঠিক এতখানি সময়ের উপার্জ্জন যে আমাদের জীবন যাপনের জন্য দরকার হয় তা' সকল সময়ে নয়। একটু ভাবিলেই বুঝা যায় যে এই প্রবৃত্তি এবং এই পরিশ্রম আমাদের অদম্য অর্থ পিপাসার ফল মাত্র এবং অনেক সময়ে ইহার মূলে একটা ভ্রান্ত আত্মপ্রসাদ বর্ত্তমান থাকে।

আমাদের শরীরের প্রতিনিয়তই ক্ষয় হইতেছে। আমরা যে সময়ে আহার করি সেই সময়ের মধ্যেও দেহের ক্ষয় হইতে থাকে; নিদ্রিত হইলেও নিদ্রার কতক অংশ নিদ্রা ভঙ্গের সাধনে ব্যর্থ হয়। তাহা হইলে মোটের উপর আমরা ৩০ মিনিটকাল ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করিলেও ৬ ঘণ্টা বা ৮ ঘণ্টা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকি যাহা প্রধানতঃ শরীরের ক্ষয় সাধন করে। ইহার ফলে ক্ষয়ের ভাগটী অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায় এবং শরীর রক্ষা দুষ্কর হয়। এই বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে আমরা মানুষের "জীবন" বলিতে ঠিক যাহা বুঝি এই মনুষ্যবিহিত সমাজের কৃত্রিমতা, অস্বভাবিকতা ও আতিশয্যের মধ্য হইতে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে তথাকথিত সমাজ ও সভ্যতার আতিশয্য ও কৃত্রিমতাগুলিকে বাদ দিলে জীবনের যে সহজ সরল মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহাই ইহার স্বরূপ। স্বরূপ বলিতে এই জীবনটাকে সমগ্রভাবে ধরিয়া লইতে হইবে, ইহার মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি নিচয়ের একটী সামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হইবে। অতি সরল ও অনায়াস লব্ধ

বিষয়াদির মধ্য দিয়া এই জীবনের অভিব্যক্তি। অতি সাধারণ দ্রব্যাদি, মুক্তবাতাস, জল, সাধারণভাবে পাক করা, আড়ম্বর শূন্য আহার্য্য, সামান্য ও অল্প পরিধেয় বস্ত্র, সরল ও সহজ চিন্তা এবং সরল ও সহজ আচার ব্যবহার এই সকল জীবনের স্বরূপ। বিলাসিতা জিনিষটাকে অবশ্য একবারেই উঠাইয়া দেওয়া যায় না কারণ পরিমিত বিলাস জীবনের স্বভাব। তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইহার স্থান জীবনের নিতান্ত ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পশ্চাতে এবং ইহাকে কখনও জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করা যায় না। অন্যথা যে ৩০ মিনিট কাল জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্য ব্যয় করে ও ৬ কি ৮ ঘণ্টা বিলাসে যাপন করে তাহাকে এই অস্বাভাবিক আচরণের ফলে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা শরীর রক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া ৩০ মিনিট কাল মাত্র বিলাস ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দৈহিক বৃত্তির অনুশীলনে সুফল লাভ করিতে হইলে জীবনের সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ যেরূপ ধারণা পোষণ করি তাহার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন এবং শরীর ও মনের জন্য সমান পরিমাণ সময় ব্যয় করিতে হইবে। মনের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে মনের ক্রিয়া যতটা দেহের ক্রিয়ার অনুগত ও সাপেক্ষ দেহের ক্রিয়া তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানসিক ক্রিয়ার অনুগত ও সাপেক্ষ।

শরীরকে কার্য্য করিবার যথোপযুক্ত অবসর দিতে হইলে জীবন যাত্রা প্রণালী সরল, সহজ ও আড়ম্বর শূন্য করা দরকার। আমরা যে সমস্ত কাজ নিজে পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি তাহা আলস্য কিম্বা বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া অপর ব্যক্তিকে দিয়া করাইয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। ইহাতে শরীরের দুর্ব্বলতা সাধিত হয়। পেশীসমূহ যথোপযুক্ত চালনার অভাবে বলহীন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মনের পক্ষেও ঠিক এই কথা। সরলভাবে জীবন নির্ব্বাহ করার অর্থ যে নিষ্ক্রিয়তা ও আলস্য এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম। সরল ও কৃত্রিমতা শূন্য জীবন কর্ম্মবহুল। এই প্রকার জীবনে মানুষ সাক্ষাৎ ভাবে মুক্ত প্রকৃতির সংসর্গে আসিয়া দাঁড়ায়। জল বাতাস আলো সমস্তই অবাধে আমাদের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের জীবনকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলে। এই সরল জীবনের অর্থ কতকগুলা কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ ও অস্বাভাবিক বিধি নিয়মের হাত হইতে আপনাকে উদ্ধার করা। সরল ব্যবহার, জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনীয় নিত্যস্থায়ী কার্য্যাবলী, স্বাভাবিক নিয়মে আহার ও নিদ্রা, মুক্ত বায়ু সেবন ও জীব জগৎব্যাপী দ্বন্দের শমতা। এই মুক্ত অকৃত্রিম প্রকৃতির ক্রোড়ে জীবন যাপন করিতে হইলে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেরও পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিতে হইবে। এই জীবন সরল ও অকপট; এখানে বড় একটা কিছু লুকান চলিবে না, এখানে গোপন রাখিবার কিছুই থাকিবে না; অসাধু ব্যক্তির এই সমাজে থাকিবার স্থান হইবে না। মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে, মুক্ত সূর্য্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে শুধু যে নিজ পরিচ্ছদের অনাবশ্যক অংশটা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয় সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ত্তমান কৃত্রিম সমাজের কৃত্রিম ও কপট চিন্তাগুলিও ত্যাগ করিতে হইবে। সোজা কথায় বর্ত্তমানে আমরা যে কপটতার আবরণে পরস্পরকে পরস্পর হইতে পৃথক ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখি তাহা ত্যাগ করিয়া আমাদের উজ্জ্বল স্বরূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া শরীরের প্রতি অমনোযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। কাজেই এক্ষণে আমাদের শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রথম কথা শরীরটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সোজা ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কথাটা সাধারণ লোকের নিকট অনেক সময় নিতান্ত সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ এইটীই প্রথম কথা। হেঁট হইয়া থাকা দূষণীয়—ইহাতে শরীরের অমঙ্গল সাধিত হয়। আবার সদাসর্ব্বদা শরীরকে জোরপূর্ব্বক সোজা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করাও ভাল নহে। যখন শরীর ও মন ক্লান্ত তখন শরীরকে সোজাভাবে রাখা অস্বাভাবিক, আবার শরীরও মনের অবস্থা যখন সম্পূর্ণ সুস্থ তখন শরীরকে নত বা বক্র অবস্থায় রক্ষা করাও অন্যায়। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম চলিতে পারে না শরীর ও মনের আন্তরিক অবস্থা অনুসারে শরীরকে নত বা সোজা অবস্থায় রক্ষা করাই স্বভাবিক। তবে মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে শরীর ও মনের অবস্থা সুস্থ ও অক্লান্ত থাকিলে শরীরকে নত ও বক্র অবস্থায় রক্ষা করা অন্যায়। দেশের জলবায়ু, সভ্যতার প্রকৃতি ও অভ্যাসের বিশিষ্টতা অনুসারে আমরা গৃহমধ্যে লেখাপড়া ইত্যাদি কাজে যতটা সময় ব্যয় করি তাহার তুলনায় অতি অল্প সময়ই শারীরিক অনুশীলনের জন্য ব্যয় করি। এই অবস্থার বিপর্য্যয় সাধন করা সম্ভব না হইলেও আমাদের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত যেন এই কাজ কর্ম্মের মধ্য হইতেই আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারি। প্রত্যেক ব্যাপারই আমরা যাহাতে সুন্দররূপে করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা উচিত। অতি সাধারণ বিষয়ে এমন কি চলাফেরা, নিশ্বাস ফেলা, বেড়ান, শরীরের অঙ্গ সমূহের আকুঞ্চন ও সংপ্রসারণ ইত্যাদি সকল ব্যাপারই সৌন্দর্য্য, বিলাস ও লালিত্যের সহিত নিষ্পন্ন করিতে হইবে। শয়ন, উপবেশন, নিদ্রা প্রভৃতি যে সমস্ত অবস্থায় আমরা সাধারণতঃ শরীরকে রক্ষা করি সে সকল বিষয়ে আরও মনঃ সংযোগ করা উচিত। নিদ্রার প্রারম্ভে মনের অবস্থা উদ্বেগশূন্য ও প্রশান্ত রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে পরস্পরের সমতা রক্ষাই শরীর ও মনের উন্নতি সাধনের মূলসূত্র।



# স্বাস্থ্য কমিশনারের বক্তৃতা

( স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি ঢাকায় সামাজিক হিতসাধন প্রদর্শনীতে যে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম।

স্বাস্থ্যের সহিত সমাজ সেবার বিশেষ যোগ আছে। লোক সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে-কোন চেষ্টাকেই সমাজ সেবা বলা যায়। সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যিনি যেখানে যে কার্য্য করিতেছেন তিনি জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে সমাজ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমি একান্ত আগ্রহ সহকারে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সভ্য হইয়াছি। সময় পাইলেই আমি ঐ সমিতির সভায় যোগদান করিয়া তাহাদের মহৎ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকি।

### শিশু মৃত্যু।

গত ১৫ বৎসর যাবৎ ইউরোপে জনসাধারণের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছিল যে অবস্থাপন্ন সমৃদ্ধের ঘরের শিশুরা, কম মরিলেও যাহারা স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহাদের মধ্যে হাজার করা ১৮০ হইতে ২৫০ জন শিশু মরিয়া থাকে। গত শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটনে শিশু মৃত্যু হাজার করা ১৩০ ছিল কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের ফলে এখন মৃত্যু সংখ্যা ১০০এ নামিয়াছে। নিউজিলাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে হাজার করা মৃত্যু ৫০ হইতে ৭০এর বেশী নহে। সুতরাং গ্রেটব্রিটনে আরও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

### ভারতবর্ষের কথা।

কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অপর বৃহৎ নগর গুলিতে এতকাল যত শিশু জন্মিত তাহার অর্দ্ধেকই মরিত। যত শিশু জন্মিত উহাদের শতকরা ( হাজার করা নহে )—৫০ জনই মরিত। বঙ্গদেশের সম্বন্ধে মোটা মুটি বলা যায় যে এই দেশে ৩টি শিশু জন্মিলে

মাস অতীত না হইতে উহাদের ১টি মরিয়া থাকে। এই ভীষণ শিশু মৃত্যুর ৪/৫ ভাগ চেষ্টার দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। যাহারা এই দুর্গতি অন্তরে অনুভব করেন তাহাদিগের শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা শিশু-মৃত্যু নিবারণের জন্য কত সুব্যবস্থা করিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রত্যেক নগরে শিশুদের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র হাস্পাতাল আছে। এই সকল হাস্পাতালের ব্যয় লোক সাধারণের দাতব্য হইতে চলিয়া থাকে। এই দেশের লোকের মনে ধারণা এই যে গভর্মেণ্টকেই সমস্ত করিতে হইবে।

বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৫ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী।

বঙ্গদেশে যক্ষ্মা ব্যাধি অতি ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের কোন কোন স্থলে মৃতদের দশমাংশই যক্ষ্মারোগে প্রাণ হারাইয়া থাকে। এক্ষণে খুব সম্ভব ৫ লক্ষ লোক বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছে। অথচ এই ব্যাধির প্রকোপ প্রশমনের জন্য এই দেশে প্রায় কোন চেষ্টাই করা হইতেছে না। কয়েকটি হাস্পাতালে এই রোগীদের বাসের স্থান আছে এই পর্য্যন্ত।

লোকের মনে, এই বোধ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে সূর্য্যের কিরণ, আলোক ও বাতাস এই রোগ নিবারণের মহৌষধ। ইহাই এই রোগ চিকিৎসার সরলতম পন্থা।

মাছির দ্বারা এই রোগ বাহিত হইয়া থাকে। এই দেশের মিঠাইর দোকান গুলি অতি ভীষণ। সেখানে সর্ব্বদা মাছি ভন ভন করিতেছে। মাছি গুলি পচা দুর্গন্ধময় স্থানে জন্মে, সেই খানেই বর্দ্ধিত হয়। তাহাদের লোমময় পা গুলির দ্বারা তাহারা সর্ব্ববিধ রোগের বীজাণু বহন করে। যখন এই সকল মাছি কোন খাদ্য দ্রব্যের উপর পড়ে তখন উহার উপরে রোগের বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এক বাটী দুধের উপরে কোন মাছি বসিলে সেই মাছি ৫ মিনিটে ঐ দুধের মধ্যে ২ সহস্র রোগ বীজাণু এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া যায়।

মাছি ও অন্যরোগ।

মাছির দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজাণু ব্যাপ্ত হয়। এই দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাছির এই ভীষণতা বুঝিয়াছেন এবং ইহার উৎপাত নিবারণের চেষ্টাও কোন কোন স্থলে হইতেছে। পরিচ্ছন্নতা যত বাড়িবে মাছির উৎপাত তত কমিবে।

ঢাকার কদর্য্যতা।

ঢাকায় এখন মাছির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ভূগর্ভে নর্দ্দমা নির্ম্মিত হইলে উহা কমিবে। ইহা হইতে ঢাকায় কলেরা ও টাইফয়েড ব্যাধিও কমিয়া যাইবে।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ।

ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া এক সমস্যা। সংপ্রতি দারজিলিংয়ের বাজারে এক স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী ৪০ প্রকার দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে এক প্রকার দুগ্ধও বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হয় নাই।

ম্যালেরিয়া ও মশক।

আমেরিকায় পানামা, নিউঅর্লিন্স, রিও-ডি-জেনেরিও এবং ইটালীতে মশক বিনাশ দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হইয়াছে। রিও ডি-জেনেরিও সহরে ৮ লক্ষ লোক বাস করে। ঐ সহরে মশক নিবারণ করিবার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। অসংখ্য মাছির দংশনে ঢাকা সহরের অধিবাসীরা প্রত্যহ জালাতন হইতেছে। মশকের হাত হইতে এড়াইবার জন্য এখন এই নগরের অধিবাসীরা মশারির জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। এই অগণিত মশকের সংখ্যা যদি হ্রাস করা যাইত তাহা হইলে ঢাকার অধিবাসীরা নানা প্রকার জ্বর ও ব্যাধির হাত এড়াইতে পারিত। ইহাতে লোকের মশারির ব্যয়ও হ্রাস হইত।



# বসন্তে মুষ্টিযোগ

(১) লক্ষণ ও প্রকার ভেদ।

বসন্ত অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগ প্রতীকারের উপায়ে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিদের যে সকল সহজলব্ধ, নিরাময় ও আশু ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ উপনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এস্থলে সাধারণের উপকার প্রত্যাশায় লিখিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।

'বসন্ত' বলিলে সকলেই বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, শরীরে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক সমূহের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারই নাম 'বসন্ত' বা 'মসূরিকা'। 'হাম' বা 'লুণ্ডি' এবং জল বা পানি বসন্তও বসন্ত রোগেরই অবান্তর ক্ষুদ্র ভেদ মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেই কারণ পরম্পরার মধ্যে কফ ও বায়ু অপেক্ষা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বসন্তের নিদানের অন্তর্ভুক্ত সেইরূপ পিত্তপ্রকোপকারক আহার ও ব্যবহার দ্বারা শরীরে রক্তেরও প্রদুষ্টি ঘটিয়া থাকে। এই সকল অনিবার্য্য কারণ বশতই বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব কালে পিত্ত বা রক্ত-দুষ্টিকারক আহার ও ব্যবহার হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিবৃত্ত থাকা, নিজ মঙ্গলকামনায় সকলেরই কর্ত্তব্য।

পিত্ত বা রক্ত দুষ্ট হইলে যে বসন্তরোগ জন্মিয়া থাকে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গসেন-কৃত সন্দর্ভে তাহা এইরূপে উক্ত হইয়াছে—

'পিত্তং শোণিতসংসৃষ্টং যদা দূষয়ন্তি ত্বচম্।
তদা করোতি পিড়কাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেহিনাম্ ॥'

রক্তের সহিত মিলিত পিত্ত, ত্বক্ দুষ্ট করিয়া সকল শরীরে পিড়কা (স্ফোটক) জন্মাইয়া থাকে, উহাই বসন্ত বা মসূরিকা।

আয়ুর্ব্বেদে বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নিপাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের প্রধানতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। রোমান্তি (হাম বা লুণ্ডি) কফ ও পিত্তজাত। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র আশ্রয় করিয়া বাত, পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক বসন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল বসন্তেই পিত্ত বা রক্তের প্রকোপই মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। উপরে তাহার প্রমাণ উল্লেখ করা গিয়াছে। এই রসকে আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত উৎপন্ন হয়, সাধারণে তাহাই 'পানবসন্ত' বা 'জলবসন্ত' বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত সকল প্রকার বসন্তের মধ্যে ত্বক্‌গত, রক্তজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ বসন্ত সুখসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বাত, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ বসন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পাইতে পারে। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সন্নিপাত বশতঃ জাত, এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রগত বসন্ত একেবারেই অসাধ্য, অর্থাৎ এই সকল বসন্ত রোগ যথা রীতি সুচিকিৎসা ও সুশ্রূষা করিলেও কিছুতেই উপশম প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জীবননাশকরই হয়।

বসন্ত অতি ভীষণ ব্যাধি। চিকিৎসা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাবপ্রকাশ বলেন,—

'বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি। কেচিৎ প্রয়োজয়ন্ত্যেব' ॥

সাধ্য ও অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রোগে ঔষধ প্রয়োগ বিষয়েও চিকিৎসকবৃন্দের মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একশ্রেণীর চিকিৎসক বলেন এই রোগে কোন প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার অন্য শ্রেণীর চিকিৎসকগণ বলেন, যখন মানবের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যেই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকটিত হইয়াছে, তখন

অবশ্যই তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করা আবশ্যক। এই শেষোক্ত মতই অবশ্য অবলম্বনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ বলিয়া গিয়াছেন,—

'কাশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিধ্যন্ত্যাশু মসূরিকাঃ।
দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিধ্যন্তি বা নবা॥
কাশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ॥"

কোন কোন প্রকার বসন্ত বিনা চিকিৎসাতেও আপনা আপনি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কোন কোন বসন্ত কখনও বা উপশম প্রাপ্ত হয়; কোন কোন্ প্রকারের বসন্ত যথারীতি চিকিৎসিত হইলেও কিছুতেই উপশম প্রাপ্ত হয় না।

শাস্ত্রে রোগের যেরূপ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, কার্য্যতঃও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন চিকিৎসক বসন্তরোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ বা ঐ রোগের নিকটে অবস্থিতি করাও বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।

অপর দিকেও দেখা গিয়া থাকে, অনেক বসন্তরোগ আপনা আপনিই অতি অল্প দিনে উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর কোন বসন্তরোগী আপনার অধিকারে পাইলে, তাহার চিকিৎসক লোকসমাজ হইতে সত্য সত্যই অতিরিক্ত ধন্যবাদ লাভ করিয়া আপনাকে বাস্তবিক কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন।

বসন্তরোগ আরোগ্য হওয়ার পরেও যদি কুরর, মণিবন্ধ ও অংসফলকে শোথ জন্মে, তাহাও অসাধ্য বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়।

এস্থলে মোটামুটি ভাবে লক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া রোগের মুষ্টিযোগ মতে সংক্ষেপে চিকিৎসা উল্লেখ করা যাইতেছে।

২। অনাগত প্রতিষেধ।

যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে শরীরে বসন্ত-রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না, তাহাই 'অনাগত প্রতিষেধ'। (ক) শিবাস্থি সকল কেহ কেহ বলেন, শিবা হরীতকী—তাহার অস্থি আঁটি, উহার ধারণ করা। বসন্তরোগ নিবারণকল্পে হরীতকী আঁটি ধারণ করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, শিবাস্থি শব্দে শৃগালের অস্থি 'রুদ্রাক্ষ' বসন্তরোগের প্রতিষেধক এই জন্য কেহ কেহ বলেন, শিবাস্থি নহে শিবাক্ষ অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ, ইহার ধারণ করাও বসন্ত-রোগ প্রতিষেধকারক। সুতরাং ইহাও সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

(খ) ডাবের জল, আতপ চাউলের ভাত, খুব বিবৃদ্ধভাবে রাঁধিয়া উহার ২।৩ গ্রাস তিন দিন বা সাত-দিন আহারের পূর্ব্বে খাইবার ব্যবস্থা কোন সাধু একটি রমণীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐরূপ ব্যবহার সেই বংশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

(গ) চৈত্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে একটি নূতন কলসীতে চূণ মাখাইয়া রক্তবর্ণ পতাকার সহিত তাহাতে স্নুহী (মনসাসিজ) বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিলে বসন্তরোগের আক্রমণভীতি নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঐরূপ স্নুহী বৃক্ষ রোপণ করিতে এখনও দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু ইদানীন্তনকালে স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত ভাবের বাহুল্যই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে এইরূপ ব্যবহার যে প্রাচীন ঋষিযুগেও বর্ত্তমান ছিল, প্রসিদ্ধ চরক সংহিতায় দ্রব্যের প্রভাব বর্ণনার প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

'বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমনং যা চ তৎ প্রভাবপ্রভাবিতম্॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎপ্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে॥'

কোন দ্রব্যের যে সকল গুণ আছে, বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত গুণ সেই দ্রব্যের না থাকিলেও যেখানে অচিন্ত্য দ্রব্যশক্তি বশতঃ সেইরূপ কার্য্যান্তরের সংঘটন হইতে দেখা যায়, তাহাকেই ঐ দ্রব্যের প্রভাব বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বিষ যে শক্তিবলে অন্যবিধ বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, এবং ঊর্দ্ধগামী হয়, উহাই তাহার প্রভাব। মণি বিশেষ



ধারণ বশতঃ যে নানাবিধ ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাও প্রভাবের বলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। সংশোধন ক্রিয়া।

বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক সংশোধন ক্রিয়া অগ্রে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বমন ও বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়াকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সংশোধন ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে।

বসন্তের প্রথম অবস্থাতে পলতা, নিমছাল ও বাসক-পাতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও ময়নাছাল চূর্ণ যথোচিত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, বমন হইয়া থাকে।

বমন করাইলেও যদি এইরূপ বিবেচিত হয়, যে রোগীর শরীর হইতে দোষ সমূহ সম্পূর্ণ নিঃসৃত হয় নাই, তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্তরূপে বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া থাকিলে, সংশোধক ঔষধ না দিয়া, অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে দোষের অর্থাৎ বাত পিত্ত ও কফের শমন কারক ঔষধ প্রদান করিতে হইবে। শোধন ক্রিয়ার দ্বারা দোষের লাঘব হইলে, বসন্তে কোনরূপ বিকার থাকে না, বেদনার লাঘব হয়, ব্রণ সমূহ শীঘ্রই পাকিয়া উঠে এবং উহাতে অল্প পরিমাণে পূয সঞ্চিত হইয়া থাকে।

৪। রোগের উপক্রম।

বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় কুমারিয়ালতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দুই আনা মাত্রায় হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করান কর্ত্তব্য।

শেয়াল কাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করাইলেও বসন্তের প্রতীকার হইয়া থাকে।

হলুদের পাতা ও তেঁতুলের পাতা যথোপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলেও রোগের উপশম হয়।

৫। রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা পরিহার।

শাস্ত্রকারকগণ বলিয়া গিয়াছেন, শরীরে সর্ব্ব প্রথমে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র, সে অবস্থাতে যে কয়েকটা বসন্তের স্ফোটক দৃষ্ট হইবে, পীড়িত ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই কয়েকটি চালিতার পাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, আর বেশী ফোড়া হইবার শক্তি থাকে না। 'হিতবাদী'।

# ঢাকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা

(বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়র মিঃ উইলিয়মস্ ঢাকায় সামাজিক হিতসাধন প্রদর্শনীতে উক্ত নগরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম।)

আমি সরল ভাবে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমার অভিজ্ঞতায় ঢাকা নগরে স্বাস্থ্যনীতি যেমন উপেক্ষিত হইতেছে আমি দ্বিতীয় কোন প্রধান নগরে স্বাস্থ্যনীতির এমন অবমাননা প্রত্যক্ষ করি নাই। এই নগরের পায়খানা গুলি এত কদর্য্য যে উহা অতি ভয়াবহ। সহস্র সহস্র পায়খানা এমন কুৎসিত ভাবে নির্ম্মিত যে উহা পরিষ্কৃত হইতেই পারে না। পায়খানার ময়লা জমির উপরে, জমি হইতে পুষ্করিণী বা খালের মধ্যে পতিত হয়। যে জলে এইরূপে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মল পতিত হইতেছে সেই মললিপ্ত জল দ্বারাই নগরের অধিবাসীরা তাহাদের ভোজনপাত্রগুলি ধৌত করে। এই নগরের পায়খানার অবস্থা কি উহা চিত্রদ্বারা আপনাদের নয়ন গোচর করিবার জন্য প্রদর্শনী গৃহে উহা রাখা হইয়াছে। উক্ত ছবিতে যে বীভৎস [illegible] হইয়াছে আমি প্রচার দ্বারা ততোধিক বর্ণনা করিতে পারিব না।

ঢাকার বাজারে যে খাদ্য বিক্রয় হয় উহা কত কলুষিত তাহাও ঐ চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে।

শিক্ষিতেরা উদাসীন।

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বঙ্গের এই দ্বিতীয় রাজধানীর শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত ভীষণ অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়াও উদাসভাবে উহা প্রত্যহ সহ্য করিতেছেন।

শিক্ষিতদের এই উদাসীনতার একটি কারণ এই যে এমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ঢাকা সহরে মৃত্যু সংখ্যা যত অধিক হওয়া সম্ভব ছিল বস্তুতঃ তত অধিক নয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মৃত্যুর রেজিষ্ট্রীতে মৃত্যু সংখ্যা যাহা দেওয়া থাকে উহা সকল সময়ে ঠিক হয় না। ঢাকা সহরে এমন ভীষণ কদর্য্যতার মধ্যেও মৃত্যু সংখ্যা কম হইবার কারণ ৩টি।—

(১) লোকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইতেছে।

(২) ঢাকা নগরের স্বাভাবিক অবস্থানই এই নগরের স্বাস্থ্যের কারণ। ভূমি এমন ক্রমোন্নত যে, স্বভাবতঃই জমি ধুইয়া পরিস্কৃত হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকের জমি বর্ষাকালে এমন সুধৌত হয় যে, ঢাকায় ম্যালেরিয়া হয় না।

(৩) দূষিত খাবার খাইতে চিরকাল অভ্যস্থ বলিয়া এখানকার লোকদিগের ঐরূপ খাদ্য খাইয়াও তত অধিক কলেরা আমাশয় রোগ হইতেছে না।

যাহা হউক তবু ইহা বলিতে পারি যে ইংলণ্ডের যে কোন নগরের তুলনায় এই নগরে মৃত্যু সংখ্যা ভয়ানক বেশী এবং এই নগরের অধিবাসীরা স্বাস্থ্য রক্ষার অতি স্থুল নীতিগুলি মানিয়া চলিলে এই নগরের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে। এখানকার অস্বাস্থ্যকর বিধির জন্য প্রত্যেক বৎসর নিঃসন্দেহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। এই নগরের চারিদিকে যে সকল জিনিষ নর্দ্দমায় পচিতেছে, উহার এবং মলের দুর্গন্ধে নগরবাসীরা এমন অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে যে তাহারা উহা নীরবে সহিতেছে।

ঢাকায় কি কি ব্যবস্থেয়।

ঢাকা নগরের কদর্য্য... দূর করিবার জন্য কি ... করিতেছি।

(১) পায়খানার মল নির্গমের পথ পাকা সিমেন্ট হইবে।

(২) সমস্ত পায়খানা স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে নূতন গঠন করিতে হইবে।

(৩) যে সকল পায়খানা মেথরে পরিষ্কার করে সেইগুলি যাহাতে অনায়াসে পরিস্কৃত হইতে পারে তাহা করিতে হইবে।

বড় বাড়ী গুলিতে পায়খানা যাহাতে কলের জল দ্বারা ধৌত হইতে পারে তাহা করিতে হইবে।

(৪) ময়লা ফেলিবার বর্ত্তমান রীতি বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৫) যাবতীয় তরল কলুষিত দ্রব্য যাহাতে সুনির্ম্মিত নর্দ্দমার দ্বারা বাহিত হইয়া ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমায় পতিত হয় উহা করিতে হইবে।

(৬) যত সম্ভব ভূমির উপরে কোথায়ও জল জমিতে দিবে না।

(৭) নগরের ময়লা যাহাতে খালে না পড়িতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) আভ্যন্তরিক নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৯) খালগুলিকে কেনালে পরিণত করা আবশ্যক।

(১০) গৃহ হইতে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা প্রত্যহ সম্পূর্ণ রূপে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

(১১) মিউনিসিপাল বাজার ও কসাই খানা স্থাপন করিতে হইবে।

(১২) গৃহকার্য্যের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

(১৩) অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

ঢাকা ১৫০ বছর পিছে।

বহু অভিজ্ঞতার ফলে ইয়ুরোপে এক্ষণে যে স্বাস্থ্যবিধি চলিতেছে উহাই সর্ব্বত্র প্রচলন করিতে হইবে। ইউরোপের নগরগুলির অবস্থা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল ঢাকার অবস্থা এখন তাই।



প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সকল রোগ নোংরা অবস্থা হইতেই জন্মে। স্বাস্থ্যবিধির দ্বারা ইয়ুরোপ হইতে ঐ সকল দূরীভূত হইয়াছে।

কলিকাতার দৃষ্টান্ত।

কলিকাতানগরের স্বাস্থ্যবিধি অনুকরণ করিলে ঢাকা উপকৃত হইবে। ১ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে শোচনীয়তম অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তনের ফলে এখন ঐ নগরের মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব শতাব্দীর অর্দ্ধেক হইয়াছে।

জলের অপব্যয়।

ঢাকার জল সরবরাহের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে নগরের অধিবাসীরা যে যত খুসী জল ব্যবহার করিতে পাইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই জন্য মোট যত জল ব্যয় হইবে, জল ব্যয় করিতে হইবে, জল সংগ্রহ তদনুরূপ হইবে। এই দেশে জলকর দ্বারা এই টাকা আদায় হয়।

যাঁহারা স্বাস্থ্যবিৎ তাঁহারা কদাচ জলের ব্যবহার অনাবশ্যক সংক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী নহেন। যে জল ব্যবহৃত হয় ঐ জল যদি নর্দ্দমা দিয়া বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে যত জল ব্যয় হইবে লোকের স্বাস্থ্য তত ভাল হইবে। তবে যে স্থলে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল সরবরাহ করিতে পারেন সেই স্থলে ইহা দেখিতে হইবে যে, জলের কল যাহাদের কাছে থাকে তাহারা অনাবশ্যক বেশী এবং দূরের লোকে কম জল ব্যয় না করে। ইহার জন্য মিটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

# বঙ্গের আবগারী আয়

("সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত।)

বঙ্গদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমেই আবগারী আয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে। ১৯১৯-২০ সালে গভর্মেণ্ট নানাবাবদে ৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইবেন। সম্ভাবিত আয় পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বাড়িবে। এই কিঞ্চিদধিক ৭ কোটি টাকার মধ্যে গভর্মেণ্ট আশা করিতেছেন যে আবগারী বিভাগ হইতে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ পাওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের অর্থ সচিব সার্ হেন্‌রি হুইলার —আবগারী আয় বৃদ্ধিতে উল্লাস প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—"আবগারী আয় অতিক্রত বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অর্থাগমের প্রধান উপায় ও নির্ভর স্থল হইতেছে। আমাদের আবগারী আয় এবার ৯ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ১ কোটি ৮৪ লক্ষ হইবে। হুগলি, হাওড়া, কলিকাতা ও ২৪শ পরগণায় দেশী মদের কাট্‌তি বিশেষরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় আমাদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে হাওড়া, হুগলি, ২৪শ পরগণা ও কলিকাতায় অতিরিক্ত মদের কাট্‌তির জন্য আমরা দেশী মদের উপর মাশুল বাড়াইয়াছি এবং উহার দাম বৃদ্ধি করিয়াছি। ইহাতে রাজস্ব কমিবে বলিয়া মনে হয় না। যদি বিক্রয় কমে তাহা হইলে বর্দ্ধিত মাশুলে উহা পূরণ হইবে। ভারত প্রস্তুত বিদেশী মদের বিক্রয় বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। যে সকল তালগাছের রসে তাড়ি জন্মে মান্দ্রাজে ঐ সকল গাছের উপর কর ধার্য্য করিয়া বিস্তর কর আদায় হইতেছে। আমরা হুগলি ও হাওড়ায় ঐরূপ গাছের উপর ট্যাক্স বসাইয়াছি। ইহাতেও বিস্তর টাকা আদায় হইবে।

বঙ্গদেশে আবগারী আয় প্রত্যেক বৎসরই বাড়িতেছে। এই আয় গভমেণ্টের স্বীকার উক্তি মতে One of the chief main stays of our finance. অর্থাৎ আবগারী আয় সরকারী আয়ের অন্যতম প্রধান নির্ভর স্থল।

কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই মদের কাট্‌তি এবং আবগারী আয় বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯১৫-১৬ সালে মান্দ্রাজে আবগারী আয় ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৫৮ টাকা ছিল। ১৯০৮-১৯ সালে উহা বাড়িয়া ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৩২ হাজার হইয়াছে। কি ভীষণ বৃদ্ধি।

গভমেণ্ট এই আয় বৃদ্ধির জন্য যে কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন উহা এই যে, লোকের অবস্থা উত্তম হইয়াছে বলিয়াই আবগারী আয় বাড়িয়াছে। মদের দ্বারা কত পরিবার নিরন্ন হইতেছে, কত সহস্র লোক মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর অধম হইতেছে, টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া গভমেণ্ট উহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। আমেরিকার যুক্তরাজ্য কোটি কোটি টাকা অপেক্ষা জাতির নৈতিক বলকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন বলিয়া দেশ হইতে মদের কারবার তুলিয়া দিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ও ভারতের শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা স্বীকার করিবেন না। আমরা একদিন নয় শত দিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দরিদ্র সাঁওতাল শ্রমজীবী সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে যে কয়টি পয়সা পাইয়াছে বাড়ী যাইবার পথে তাড়ির দোকানে প্রবেশ করিয়া উহা সমস্ত ব্যয় করিয়া পয়সা দিয়া বিষ কিনিয়া পান করিয়াছে। হতভাগ্য দিনের উপার্জ্জন এইরূপে ব্যয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া অনশনে রাত্রি যাপন করিয়াছে।

এই দেশে মদের তৈয়ার ও উহার ব্যবহার—আইনের দ্বারা একেবারে একদিনে বন্ধ করা অত্যাবশ্যক। পানদোষ এখন ইতর সাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আতঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে? সার ডেনিয়েল হেমিল্টন বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীতে কলিকাতায় চামারদের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন:—What is his life? He works hard for the Kabuli and drinks hard for the Government. ইহার জীবন কি? সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাবুলীর জন্য এবং প্রচুর মদ্যপান করে গভমেণ্টের জন্য অর্থাৎ হতভাগ্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা পায় উহা কাবুলী মহাজনের সুদ জোগাইতে ও মদের জন্যই ব্যয়িত হয়। মদ আমাদের দেশে এখন পূর্ব্ব অপেক্ষাও ভীষণতর ক্লেশ ও দারিদ্র্য উৎপাদন করিতেছে। আমরা গভমেণ্টকে বলি,—গভমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য আবগারী আয়ের মায়া ত্যাগ করুন।



# পানীয়ের আবশ্যকতা

আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ জলপান, সুপক্ক নির্দ্দোষ খাদ্য ভক্ষণ, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং পরিষ্কৃত গৃহে অবস্থান এই কয়টীর বিশেষ প্রয়োজন। ইহাদের যে কোনটীর অভাবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। উপস্থিত অন্য গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া জল পানের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের কি সম্পর্ক তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

জল না পাইলে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদা নানা প্রকারে জল নির্গত হইতেছে, তাহার পূরণের জন্য জলপান করিবার আবশ্যকতা হয়। পানীয় জল ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য হইতেও আমরা জল অল্পাধিক পরিমাণে আহরণ করিয়া থাকি।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে মানবদেহের জন্য তিন প্রকার খাদ্যের আবশ্যক হয় যথা—(ক) মাংসোৎপাদক (খ) মেদ বা উত্তাপোৎপাদক এবং (গ) খনিজ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লবণ এবং জল প্রধান। জল সকল প্রকার খাদ্যেই বিদ্যমান আছে। দেহরক্ষার জন্য খাদ্য ব্যতীত পানীয়েরও বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের শরীরে জলের ভাগ এত বেশী যে উহার প্রায় তিন ভাগ জল। শিশুরা সাধারণতঃ জল পান করিতে ভাল বাসে। জলপানের পরিমাণ অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত দিনে অন্ততঃ দুইসের জলের আবশ্যকতা হয়।

আমাদের দেহ রক্ষার জন্য আমরা বহুবিধ দ্রব্য আহার করিয়া থাকি, এবং সেই সমস্ত দ্রব্যের কতক-অংশ রক্তে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে এবং খাদ্যের অপরাংশ মলমূত্র ইত্যাদি হইয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। শরীরের এই নিঃসরণ ক্রিয়া নিয়মমত চলিলেই শরীর সুস্থ থাকে এবং ইহার ব্যাঘাত ঘটিলেই শরীরে নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়। শরীরের এই সমস্ত ময়লা নিয়মিত ভাবে শরীর হইতে নির্গত হইতে না পারিলে দেহের নিঃসরণ প্রণালী সমূহ ক্রমে ক্রমে অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং নিয়মিত নিঃসরণের অভাবে পরিত্যজ্য পদার্থগুলি শরীরের মধ্যে জমিয়া রক্ত দূষিত করে ও ক্রমে সমস্ত শরীরকে দূষিত করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে।

শরীরের পুষ্টি সাধন করিবার জন্য ও শরীরকে সবল এবং কার্য্যে পটু রাখিবার জন্য যেমন একদিকে আহারের প্রয়োজন সেইরূপ দেহের স্বেদ যাহাতে উত্তমরূপে নির্গত হইয়া যায় তাহারও ব্যবস্থা আবশ্যক। আমাদের খাদ্যের আহারের সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমাদের দেহের প্রায় তিন ভাগ জল সুতরাং যাহাতে আমাদের আহার্য্য হইতে আমরা ঐ পরিমাণ মত দ্রব্য পাই সেইরূপ আহার করাই কর্ত্তব্য।

অতিরিক্ত আহার কিম্বা নিতান্ত অল্প আহার এই উভয়ের একটী অভ্যাস আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই যে নিজ নিজ আহার্য্য যথা-সম্ভব পুষ্টিকর দ্রব্যের মধ্যে স্থির করিয়া লইতে চেষ্টা ও ইচ্ছা করে তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ ক্ষমতায় কুলাইলে দুগ্ধ, ঘি, মাংস প্রভৃতি ছাড়িয়া কে ইচ্ছা করিয়া কেবল শাকপাতা খাইয়া থাকিতে চাহে কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে শুষ্ক ও পানীয় এই উভয় প্রকার দ্রব্যই দেহের পুষ্টির জন্য আবশ্যক কেবল শুষ্ক খাদ্য আহার করিলে রক্ত ক্রমে গাঢ় হইয়া পড়ে এবং পেশী সমূহও কঠিন হয়।

নিয়মিত মাত্রায় জল পান করিলে রক্তের তারল্য বজায় থাকে এবং শরীরের সর্ব্বত্র নিয়মিতরূপে রক্ত চলাচল হয় ও পেশী সমূহ কোমল ও সুস্থ থাকে।

ব্যতীত শরীরের সর্ব্বস্থানে যে সমস্ত ক্লেদ সঞ্চিত হয় জল পান করিলে সেই সমস্ত মল সহজে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। শরীরের সর্ব্বত্রই যে কোন রূপেই হউক জলের প্রয়োজন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শারীরিক পেশী সমূহ নিয়মিত ভাবে ও প্রয়োজন মত জল পাইলে বেশ সহজ ও সরল ভাবে তাহাদের কার্য্য করিয়া যাইতে পারে এবং ইহার অভাব হইলেই তাহাদের কার্য্যও নিয়মিতভাবে চলিবে না। আমরা যে পরিমাণ আহার করি প্রায় সেই পরিমাণ বাতিল দ্রব্য শরীর হইতে বহির্গত হওয়া দরকার। যদি দৈনিক এই ভাবে পরিত্যক্ত দ্রব্য দেহ হইতে নির্গত না হয় তাহা হইলে শরীরের অভ্যন্তরে সে সব জমিতে থাকে ও নানারূপ বিষাক্ত বাষ্প ইত্যাদি জন্মায়। কিন্তু প্রয়োজন মত ও নিয়মিত ভাবে জল পান করিলে এই সমস্ত দ্রব্য দেহ হইতে উত্তমরূপে নির্গত হইয়া যায়। চর্ম্মের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা যেমন প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকি সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য যথেষ্ট জল পান করা কর্ত্তব্য। দেহের ভিতরের ক্লেদ পরিষ্কারের জন্য প্রচুর মাত্রায় জল পান করা অপেক্ষা উত্তম উপায় আর কিছু নাই। দেহের উপরের ময়লা পরিষ্কার করা অপেক্ষা যে অভ্যন্তরের ময়লা পরিষ্কার করা অধিক আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ঘর্ম্মের সহিত যে সমস্ত ময়লা চর্ম্মের উপরে আসে পরিষ্কৃত না হইলেও তাহার পুনরায় লোমকূপ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না কিন্তু যে ময়লা শরীরের ভিতর হইতে বাহির না হইয়া জমিয়া থাকে তাহা অতি সহজেই পচিয়া বিষাক্ত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া উৎকৃষ্ট ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া থাকে।

দেহের ঠিক প্রয়োজন মত জল গ্রহণ আবশ্যক। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর তাপে আমাদের দেহ অত্যন্ত গরম হইয়া পড়ে। সেই সময় যথেষ্ট জল ব্যবহার করিলে শরীরের ঘর্ম্ম নিঃসরণের সুবিধা হয় এবং শরীর হইতে নিয়ম মত ও উত্তমরূপে ঘাম বাহির হইয়া গেলে আমাদের শরীরও বিশেষ স্নিগ্ধ বোধ হয় দারুণ গ্রীষ্মে দেহের জলীয় অংশ অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। তজ্জন্য ঐ সময়ে ফল মূল বিশেষতঃ যে সমস্ত ফলে জলের পরিমাণ বেশী থাকে তাহা খাইতে আমাদের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয় এবং প্রকৃতি দেবীও মানুষের এই অভাব বুঝিতে পারিয়া আমাদের জন্য সেই সমস্ত সময়ে অসংখ্য প্রকারের ফল উৎপাদন করেন।

আমাদের আহারের সমস্ত দ্রব্যই বিশেষ সাবধান সহকারে ও শরীরের প্রকৃত অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক করা উচিত। সকলের পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে একই প্রকার কোন একটী নিয়ম থাকিতে পারে না, কারণ আহারাদি অনেকটা দেশীয় জল বায়ুর সাপেক্ষ; কেবল তাহাই নহে ব্যক্তিগত স্বভাব ও ব্যবহারের উপরও প্রত্যেকের আহারাদির নির্ব্বাচন নির্ভর করে। যদি কোন লোকের পক্ষে সমস্ত দিনে ৵২ সের জল পান করিলেই যথেষ্ট হয় তবে যে সেই পরিমাণ জল প্রত্যেকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে ইহার কোন কারণ নাই। কাহারও উহা অপেক্ষা বেশীও প্রয়োজন হইতে পারে, আবার কাহারও উহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ জলের প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে তাহার একজন সাধারণ অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী ঘর্ম্ম নিসঃরণ হয়। এজন্য তাহার শরীরের সেই অভাব মোচন করিতে হইলে অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জলপান না করিলে তাহার চলিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেহের প্রায় ৩ ভাগ জল সেই জন্য আমাদের আহার্য্যে যদি জলীয় ভাগ কম থাকে তবে যে কোন রকমে হউক শরীরের সেই পরিমাণ জলের অভাব পূরণ করিতেই হইবে। আহারের জন্য কেবল শুষ্ক খাদ্য নির্ব্বাচন করা নিতান্ত অন্যায়। সেই জন্য আমাদের দেশে



একটী চলিত কথা আছে যে "চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়" এই চারি প্রকার হইলে তবে আহার নিয়ম মত হইবে অন্যথা আহারের অঙ্গহানি হইবে। পানীয়ের অভাব হইলে শরীরের যে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

জ্বর হইলে আমাদের তৃষ্ণা খুব বেশী হয়। সেই সময় লিমনেড্ কিম্বা অন্য কোন প্রকার অম্ল পানীয় দিলে তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে এবং কোন কোন সময় ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হইয়া রোগীর ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া শরীর শীতল হয়। কিন্তু এই সময় যদি আমরা রোগীকে জল পান করিতে না দিই তবে তাহার শরীরের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঘর্ম্ম নিঃসরণ কম হয় কিম্বা হয় না এবং ক্রমে ক্রমে দেহের রক্ত অতিরিক্ত উষ্ণ হইয়া পড়ে ও রোগীর মস্তিষ্ক গরম হইয়া রোগী প্রলাপ পর্য্যন্ত বকিতে পারে। সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই জল আমাদের বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজন।

শরীরের অসুস্থতা অবস্থায় এইরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে যে কোন রকমেই হউক, গামছা ভিজাইয়া গাত্র মুছাইয়া দিলে কিম্বা অল্প অল্প জল সময় সময় পান করাইলে ক্রমে ক্রমে রক্ত শীতল হইয়া পড়ে ও আস্তে আস্তে শরীরের উত্তাপ কমিয়া গিয়া দেহ প্রকৃতিস্থ হয়।

আমাদের শরীরের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ রক্তের চলাচল হইতেছে ইহা আমরা সকলেই অবগত আছি। এই রক্ত চলাচল যত সুচারুরূপে হইবে ততই দেহ সুস্থ ও সবল এবং রোগমুক্ত থাকিবে ও শরীরের অনাবশ্যকীয় ক্লেদ সমূহ নির্গত হইয়া যাইবে। কিন্তু জলের অভাবে যদি রক্ত অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া পড়ে তবে সে রক্তের চলাচল নিয়মিতভাবে হইতে পারে না। পানীয় আমাদের রক্তের তারল্য রক্ষা করে। রক্ত গাঢ় হইলে শরীরের সর্ব্বত্র উত্তমরূপে চলাচল হইতে পারে না। শরীরের প্রণালী গুলির নিয়মিতরূপে ক্লেদ নিঃসরণ হইতে হইতে পারে না বলিয়া সেগুলি অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে ও সমস্ত পরিত্যাজ্য ও অপকারী ময়লা শরীরের মধ্যেই জমিতে থাকে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানি ঘটে।

---

# খাদ্য ও পরিপাক

খাদ্য কাহাকে বলে? আমরা যাহা খাই, তাহাকেই যে খাদ্য বলা যাইবে ইহা কখনও হইতে পারে না। যাহা আমরা খাই এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টি সাধন ও শক্তি সঞ্চয় হয়, তাহাই যথার্থ খাদ্য। এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে যেমন দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি। আবার কতকগুলি আছে যাহাদের রন্ধনাদি কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা আহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। মোট কথা যাহাতে আমাদের শরীরের অভাব মোচন, ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধন করিতে পারিবে তাহাই প্রকৃত খাদ্য।

আমরা খাই কেন এ বিষয়ের মীমাংসা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না কারণ সাধারণ ভাবে দেখিলেই দেখা যায় যে যাঁহারা অধিক দিন উপবাস করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে উপবাসে শরীর কিরূপ দুর্ব্বল ও কার্য্যে অপটু হয়। দুর্ভিক্ষের সময় কত হতভাগ্যের দেহ আহারের অভাবে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ লোককে কিছুদিন খাইতে দিলেই আবার তাহারা সবল ও পুষ্ট হয়। ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আহার না পাইলেই শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রধানতঃ খাদ্য দুইটী কার্য্য সাধন

(১) শরীরেব পুষ্টি সাধন (২) বলবিধান। আমরা যে কার্য্যই করি না কেন তাহাতেই আমাদের শরীরের ক্ষয় সাধন হয়। চলা, ফেরা, উঠা, বসা আবার পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের দ্বারাও শরীরের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণ করিবার নিমিত্তই আহারের প্রয়োজন। কেবল ক্ষতি পূরণ করাই আহারের কার্য্য নহে; তাহা ছাড়া শরীরের পুষ্টি সাধন; তাপ জনন এবং বল উৎপাদন এই চারিটী কার্য্যই আহারের দ্বারা সম্পাদন হয়। কিন্তু সকল খাদ্যই এই চারিটী কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে, কোন খাদ্য শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী আবার কোন খাদ্য তাপ উৎপাদনের সাহায্য করে। সেই জন্যই কোন এক প্রকার মাত্র খাদ্য আহার করিলে শরীরের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন হয় না।

আহার্য্য দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়াই শরীরের পুষ্টিসাধন করে। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যই আমরা আহার করি না কেন, উহারা শরীরের মধ্য দিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে পর শরীর পোষণের উপযোগী হয়। উহারা দেহের বিবিধ যন্ত্র ও পাচকরসের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা খাদ্য শরীরের উপযোগী হয় তাহাকে পরিপাক ক্রিয়া বলে। কোন্ কোন্ যন্ত্র দ্বারা কিরূপে খাদ্য দ্রব্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ও ফলে দেহের উপযোগী হয় এস্থলে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল।

একটী বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটী প্রবেশ দ্বার এবং একটী নির্গম-দ্বার আছে। সুড়ঙ্গের প্রবেশ দ্বার আমাদের মুখ এবং মলদ্বার ইহার নির্গমের পথ। মুখের ভিতর দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রাদি আছে তাহারা সকলেই প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করিয়া থাকে।

যে সব দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয় তাহাকে পাকযন্ত্র বলে। পাকাশয় যকৃৎ ও পাক্বলিক পাকযন্ত্র সমূহের মধ্যে প্রধান। মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে নল মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার নাম পাকনালি। আমরা মুখ দিয়া আহার গ্রহণ করি খাদ্য মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় আমাদের দাঁতগুলি যাঁতার কাজ করে। পরে সেগুলি লালারসে মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে তখন পাকক্রিয়া আরম্ভ হয়।

জিহ্বা—খাদ্য দ্রব্য মুখের ভিতর প্রবেশ করিলে পর দন্তদ্বারা উহা উত্তমরূপ ছিন্ন ও চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়। আমাদের জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রিত এবং দন্তের নিকট উহাদিগকে আনিয়া দেয়। জিহ্বা যে কেবল খাদ্যের স্বাদ লইবার জন্যই আছে তাহা নহে উহা নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

মুখের ভিতর খাদ্য যে কেবল চর্ব্বিত হয় তাহা নহে। চর্ব্বনকালে মুখের লালার ( Saliva ) সহিত উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। আমাদের মুখের আশে পাশে তিনটী লালাগ্রন্থি ( Salivary Gland ) আছে, তন্মধ্যে লালা প্রস্তুত হইয়া নালিযোগে মুখের ভিতর আসে এবং খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে ভিজাইয়া দেয় এবং খাদ্যের শ্বেতসার ভাগকে শর্করায় পরিণত করে। এই শ্বেতসার পদার্থ লালারসের সহিত মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে অদ্রবণীয় থাকে কিন্তু যখন উহা শর্করায় পরিণত হয় তখন পাকস্থলীতে অতি সত্বর গলিয়া যায় এবং পরিশেষে রক্তে পরিণত হয়। এইজন্যই খাইবার সময় ভাল করিয়া না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিলে খাদ্যের সহিত লালারস মিশ্রিত হইতে পারে না এবং পরিপাক ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের দেশে "নাকে মুখে গোঁজা" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে; এই কদভ্যাসটী যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা বলাই বাহুল্য।

খাদ্য পরিপাকের যে সুড়ঙ্গ পথের উল্লেখ করা হই-



য়াছে অন্ননালী তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত। ইহার মধ্যে যে মাংসপেশী আছে তাহাদিগের আকুঞ্চন দ্বারা খাদ্যের পিণ্ড ক্রমে নীচে নামিয়া আমাশয়ে উপস্থিত হয়। ভুক্তদ্রব্য মুখ হইতে গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে আসে ইহার আকার ভিস্তির ক্ষুদ্র মশকের ন্যায়; ইহার একদিক্ অন্ননালীর সহিত ও অপর দিক ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত। ইহার মধ্যে যে মাংসপেশী আছে, সেগুলির আকুঞ্চনে ভুক্ত দ্রব্য আমাশয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া আমাশয় নিঃসৃত পাচক রসের সহিত উত্তমরূপে মিলিত হয়। আমাশয়ের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগ্রন্থি আছে; তাহাদিগের মধ্যে এক প্রকার পাচক রস ( Gastric Juice ) প্রস্তুত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয় এবং উহার পরিপাক সাধন করে।

আমাশয়ের পরেই অন্ত্র। অন্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine) এবং বৃহৎ অন্ত্র ( Large Intestine )। পাঁচ প্রকার রস সংযোগে অন্ত্রের পরিপাক হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে যতদূর সম্ভব জীর্ণ হওয়া উচিত ততদূর জীর্ণ হইলে তথা হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে উহা পিত্ত ও অন্ত্ররসের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ সকল রসের সংযোগে খাদ্যের পুষ্টিকর পদার্থ দুগ্ধবৎ আকারে নির্গত হইয়া অন্ত্রের অসংখ্য শোষণী নাড়ীপথ দিয়া শোণিতের সহিত মিলিত হয় ও শরীরের পোষণের জন্য দেহের সর্ব্বত্র নীত হয়। খাদ্যের অসার অংশ শোষিত না হইয়া বৃহৎ অন্ত্রে আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের গাত্রে যে বৃত্তাকার মাংসপেশী আছে তাহা জীর্ণ খাদ্যদ্রব্যের উপর ক্রমাগত আকুঞ্চিত হইয়া উহাকে নিম্নদিকে ঠেলিয়া মল নিঃসরণের সহায়তা করে।

খাদ্য কিরূপে রক্তে পরিণত হয় এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। আমরা খাদ্য যখন মুখে পুরি তখন জিহ্বা তাহা দন্তের কাছে লইয়া যায় এবং দন্তদ্বারা তাহা উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় এবং চর্ব্বনকালে লালাগ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া খাদ্যে মিশ্রিত হয়। শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের উপর (যথা ভাত ইত্যাদি) লালার বিশেষ ক্রিয়া হয়। উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইবার পর খাদ্য ডেলা বাঁধিয়া যায়। তৎপরে গিলিবার সময় গলকক্ষের চারিদিকের মাংসপেশী গুলি তখন একটী একটী করিয়া সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং ডেলাটীকে চাপিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে লইয়া যায়। এইরূপে অবশেষে পাকস্থলীতে নীত হয়।

চর্ব্বিত খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র সেই স্থানের পেশীর বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমাগত আন্দোলিত হইয়া তোলাপাড়া হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পাকস্থলীর ভিতর হইতে প্রচুর পাচক রস নির্গত হইতে থাকে। পাচকরসের ক্রিয়ায় উক্ত খাদ্য অতি সত্বরে গলিয়া যায়। তখন রক্ত এই খাদ্যের সার অংশের এবং লালা রসের দ্রব শর্করাময় পদার্থের কতক অংশ পাকস্থলীর ধমনী দ্বারা চুষিয়া লয়। তৎপরে এই খাদ্য পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। এইখানে পিত্ত-কোষ হইতে পিত্তরস ইত্যাদি নির্গত হইয়া উহার উপর ক্রিয়া করিতে থাকে। যে সকল মেদময় পদার্থ এখনও অবশিষ্ট থাকে তাহার উপর পিত্ত রসের ক্রিয়া দ্বারা অতি সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত হইলে অন্নরসবাহী নালী সেই সকলকে শুষিয়া লয়। এইরূপে খাদ্য হইতে রক্ত হয় এবং আমাদের জীবনরক্ষা করে।

মিশ্রিত খাদ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু এস্থলে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। আমাদের দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারক এবং যবক্ষার বাষ্প নির্গত হইয়া যায়। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই উভয় উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের আবশ্যক। আমরা যদি একপ্রকার খাদ্য ব্যবহার করি তাহা হইলে দেহরক্ষার উপাদান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উহা অতিশয় অধিক পরিমাণে খাইতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে এই হইবে যে অনাবশ্যক উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িবে। একজন যদি কেবল আলু খাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহা হইলে শরীর রক্ষার পক্ষে যতটা যবক্ষার উপাদান বিশিষ্ট [illegible] প্রকার সেই পরি-

সংগ্রহের জন্য দৈনিক অনেক পরিমাণে আলু খাওয়া দরকার। কিন্তু এত অধিক আলু খাইলে আবার এত অধিক অঙ্গারক উপাদান বিশিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হইবে যে তাহা একবারেই অনাবশ্যক। কারণ আলুর মধ্যে যবক্ষার উপাদান বিশিষ্ট পদার্থ অতি অল্প এবং অঙ্গারক উপাদানবিশিষ্ট পদার্থ অধিক। এই কারণে এক প্রকার যে কোন খাদ্য ব্যবহার করা হইবে তাহাতেই এইরূপ দোষ হইবে।

---

# মশক সমস্যা

মশক জাতি সম্বন্ধে এতাবৎ বিবিধ প্রকার তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের স্বাস্থ্য-সমাচারেও ইতি-পূর্ব্বে ইহাদের চরিত্র, বংশবৃদ্ধি, বিনাশের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিষয় আলোচিত হইয়া গিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে "এনোফেলিস্" নামক একজাতীয় মশকের দংশন ফলে মনুষ্যদেহে একপ্রকার জীবাণুর প্রবেশলাভ হয়; সেই জীবাণুর প্রভাবেই মনুষ্যদেহে ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে কাম্ব্রিজ ইউনিভারসিটীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক, অধ্যাপক এ, ই, সিপ্‌লে মশক জাতির ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। মশক কি খায়, কি চায়, কোথায় থাকিতে ভালবাসে ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে মশক চরিত্র জানিতে পারিলে মশক নিবারণের উপায়ও আমরা উদ্ভাবন করিতে পারিব এইরূপ তিনি বলিয়াছেন। মশক সম্বন্ধীয় এই সমস্ত সংবাদ আমরা অনেক প্রকারে কিঞ্চিৎ অবগত আছি কিন্তু মশক জাতির গতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত খুবই অল্প সংখ্যক পত্রিকায় বা পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

মশক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই মশক জাতী এক দেশ হইতে অন্য দেশে কোন [illegible] যাইতে সক্ষম [illegible] যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে উহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে না তাহা হইলে ইহা সত্য যে যদি কোন দেশের বা গ্রামের সমস্ত মশক কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারা যায় ও তাহাদের জন্মিবার ও বাস করিবার মত সুবিধাজনক স্থান সমূহ উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন করিতে পারা যায় তবে নিশ্চয়ই সে দেশ বা গ্রাম মশক জাতির হস্ত হইতে পরিত্রান পাইবে। কিন্তু এরূপ অনেক পরিশ্রম করিয়াও মশকদের সমূলে বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় নাই। সেইজন্য ইহা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে মশকগণ যে কোন উপায়েই হউক তাহাদের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম। মশকজাতি কতদূর উড়িয়া যাইতে পারে এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজকাল অনেকেই বলিতেছেন যে সর্ব্বপ্রকার মশক উড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম কি না তাহাতে সন্দেহ আছে কিন্তু এক জাতীয় মশক আছে যে তাহারা বাতশূন্য দিনেও প্রায় ৪০ মাইল উড়িয়া যাইতে পারে এবং যদি তাহারা বাতাসের সাহায্য পায় তাহা হইলে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। নিজ দেশে বা গ্রামের মশক বিবিধ প্রকারে বিনাশ করা সম্ভব পর হইতে পারে কিন্তু যদি উহারা দূরদেশ হইতে দলে দলে উড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হয় তবে যে বড়ই বিপদের কথা। সম্প্রতি মশক সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মশক ঠিক কতদূর উড়িয়া যাইতে পারে অর্থাৎ



তাহাদের উড়িবার শক্তি কিরূপ তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি Massachusetts Agricultural Collegeএর প্রফেসার Mr. S. C. Ball নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহুবিধ অনুসন্ধানে ও চেষ্টায় তিনি এতদ্‌সম্বন্ধে যেরূপ স্থির করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই পরীক্ষার জন্য তিনি Rebecca Shoal নামক Light Stationএ প্রায় ১ মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে যখন বেগে বায়ু প্রবাহিত হইত তখন আন্দাজ ১০ ঘণ্টার মধ্যে Florida ও Cubar দিক হইতে অসংখ্য মশক উড়িয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি যে স্থানে ছিলেন সে স্থান হইতে Florida ১৫০ মাইল ও Cuba ৯৫ মাইল। Mr. Ball এই সমস্ত মশকদের মধ্যে বিবিধ প্রকারের মশক দেখিতে পাইয়াছিলেন। Mr Ballএর এই [illegible] অনুসন্ধানের ফলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবজাতি তাহাদের ভীষণ শত্রু মশক জাতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার বিবিধ প্রকার উপায় হইয়াছে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছে। বহুস্থানের অপরিষ্কৃত স্থান, পচা জলাশয়, জঙ্গল প্রভৃতি মশকের বাসস্থান সমূহ নষ্ট করা হইয়াছে। উহাদের নিবারণার্থ বহু অর্থ খরচ করা হইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এত যত্ন, এত চেষ্টা ও এত অর্থব্যয় সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ইহাদের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাই। কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই ধারণা করিতে পারে নাই যে উহারা ৫০, ৬০ এমন কি ১৫০ মাইল দুরস্থিত দেশ হইতে এক দিনে অপর স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে।

আমাদের অপর একটী ভুল ধারণা আছে যে যখন বাতাস খুব জোরে বহিতে থাকে তখন মশকগণ উড়িতে পারে না কিম্বা তাহারা অধিকক্ষণ স্থায়ী ভাবে উড়িতে অক্ষম। কিন্তু Professor Ballএর এই অদ্ভুত আবিষ্কারে আমরা এক্ষণে জানিতে পারিলাম যে উহা অতি ভ্রমমূলক ধারণা। কারণ মশকগণ যে খুব জোর বাতাসেও উড়িতে পারে এবং এককালে ১৫ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাদের ডানার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে তাহা তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন। তবে ইহা সত্য যে মশকগণ তাহাদের নিজের ডানার জোরে ১৫০ মাইল উড়িতে পারে না। কেবল যখন জোরে বাতাস হয় তখনই মশকগণ এতদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষমতাতেই হউক আর বাতাসের সাহায্যেই হউক আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান কারণ কোন না কোন দিক হইতে সর্ব্বক্ষণই বাতাস বহিতেছে। এখন মশকদের সম্বন্ধে এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইতে দেখিতে পাইতেছি যে আমরা কোন উপায়ে নিজ ঘরের কিম্বা নিজ গ্রামের মশককুল ধ্বংস করিলেও কিম্বা তাহাদের জন্মিবার পক্ষপাতী স্থান সমূহের সুবন্দোবস্ত করিলেও তাহারা ৫০ হইতে ১৫০ মাইল দুরবর্ত্তী দেশ হইতে আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে সক্ষম। ইহা অতীব ভয়ের কথা।

মশকগণ কি করিয়া এবং কোথায় ডিম্ব প্রসব করে তাহা আমরা অবগত আছি। মশকগণ সাধারণতঃ পচা পুষ্করিণী ও গর্ত্ত ইত্যাদিতে যেখানে জল অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে থাকে সেই সমস্ত স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। আমাদের দেশের পল্লীগ্রাম সমূহে এই শ্রেণীর গর্ত্ত ও পুষ্করিণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই যে সমস্ত পল্লীগ্রামে ঐ শ্রেণীর অপরিষ্কার পুষ্করিণী আছে সেই সব স্থানেই মশা বেশী হয় ও সেই সব স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কিন্তু কেবল মাত্র এক শ্রেণীর মশকই এই ভাবে ডিম্ পাড়িয়া থাকে ইহা ভিন্ন অপর এক জাতীয় মশক আছে তাহারা শুষ্ক মাটীর গর্ত্তে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। পরে বর্ষা সমাগমে যখন ঐ সকল গর্ত্ত জলে পুরিয়া উঠে তখন সেই সমস্ত ডিম্ব হইতে রাশি রাশি মশক জন্মে। এই জাতীয় মশক অতি ভয়ানক এবং গ্রীষ্ম কালেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। অভিজ্ঞেরা বলেন যে অন্ততঃ পক্ষে ৫০০ শত রকমের [illegible] পৃথিবীতে বর্ত্তমান

প্রত্যেক জাতীয় মশকের সন্তান প্রসবের প্রণালী বিভিন্ন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরীক্ষা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে মশকগণ একটী তেতালা বাড়ী যতটা উচ্চ হয় তাহার বেশী উচ্চে উড়ে না কাজেই যাহারা চার তালা বাড়ীতে বাস করিতে সক্ষম হন তাঁহারা এই শত্রুদের হস্ত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাইতে পারেন। কিন্তু ইহারা যদি কোন রকমে একবার সেই স্থানেও প্রবেশ করিতে পারে তবে সহজে আর বাহির হইবে না।

মশক আমাদের শরীর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম শত্রু। আমরা যে সমস্ত স্থানে বাস করি সেই সব স্থানকে যথা সম্ভব মশক শূন্য করিতে সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মশক ধ্বংসের বিবিধ উপায় শুনিতে পাওয়া যায়। Prof. Rene Bache যে উপায় অবলম্বন করিতে সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

Prof. Rene বিবিধ উপায় দেখাইয়াছেন তন্মধ্যে যে-গুলি আমাদের পক্ষে সম্ভব পর এবং উপযোগী তাহার কতকগুলি দেওয়া হইল। গৃহের মধ্যে মশক আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই গৃহে উত্তমরূপে ধূপ ইত্যাদি পুড়াইয়া ধূম দেওয়া উচিত। একটী মধ্যম আকারের গৃহে অন্ততঃ ১ পাউণ্ড ধূপ পোড়াইতে হইবে। তাহা হইলে মশককুল অনেক মরিয়া যাইবে। মশক বেশী থাকিলে প্রত্যহ কিছুক্ষণ এই ভাবে ঘরে ধূম দেওয়া ভাল।

তাঁহাদের স্থায়ী ভাবে বিনাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ যে সমস্ত স্থানে তাহারা জন্মিতে পারে সেই সমস্ত স্থানের বিহিত ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাড়ীর ভিতর কিম্বা নিজ গ্রামে কোথাও কোনরূপ ময়লা বা জল জমিতে না পায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; এমন কি নিজ বাড়ীতে চৌবাচ্চায়, টিন, বালতি কিম্বা কোন বোতলেও ১০ দিন এক ভাবে জল জমিয়া থাকিতে না পায় দেখিতে হইবে। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে যে যে স্থানের জল বাহির করিবার কোন উপায় নাই তাহা হইলে তাহাতে কেরোসিন তৈল কিছু ফেলিয়া রাখা ভাল। ১৫ বর্গ ফুট স্থান পরিপূর্ণ জলে ১ আউন্স কেরোসিন তৈল দিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ সাধারণ নিয়মগুলি দেখিয়া চলিলে মশকদের হস্ত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকে।